শ্রীচৈতন্য

অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ



দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

সুবর্ণা

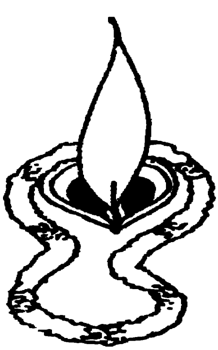
সুবর্ণা প্রকাশনী
৯২, নিমু গোস্বামী লেন, কলকাতা-৫

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ▫ ১৯৫৯

প্রকাশক
বিমলকান্তি সাহা
সুবর্ণা প্রকাশনী
৯২, নিমু গোস্বামী লেন
কলকাতা-৭০০০০৫

প্রসেসিং ও প্রিন্টিং
বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী
কম্পু কলার
৬এ, আশুতোষ শীল লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

টাইপ সেটিং
দি বেঙ্গল পিটিএস এণ্ড
কম্পিউটার সেন্টার
৯এ, রায় বাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬



ঃ উৎসর্গ ঃ

পিতৃপ্রতিম জ্যেঠামশাই
দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
এবং
পিতৃদেব
হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

জাহের বান চিহ্ন রূব ন জানী
সো কইসে আগম বেএঁ বখানী।।
কাহারে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক চান্দ জিম সাচ না মিচ্ছা।।
লুই ভণই ভাইব কীষ
জা লই অচ্ছম তাহের উহন দিস।।"

(আচার্য লুইপাদ / ২২ নং চর্যা)

যার বর্ণ চিহ্ন রূপ কিছুই জানা যায় না বেদ আগম দ্বারা তার ব্যাখ্যা হবে কেমন করে? জলে প্রতিবিম্ব স্বরূপ চান্দ্রের মতো এ মিছে নয়, সত্যিও নয়। কি বলে আমি এর পরিচয় দেব? লুইপাদ বলেছেন, কিই বা আর ভাববো, যা নিয়ে আছি নিজেই তার দিশে জানি না।

লেখকের নিবেদন

গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারের পাতায় তারিখটা সেদিন ছিল ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি। বাঙলার রাজঋতুর মাস। এমন এক অতিক্রান্ত দিনে, সুপ্রোথিত জ্যোৎস্নার সুসমা মেখে একটি অশ্রুতপূর্ব শিশুর জন্ম হয়েছিল এক অনন্যা বঙ্গজননী শচীমাতার কোলে। মাতৃপ্রতিম অদ্বৈত গৃহিনী সীতাদেবী নবজাতকের নামকরণ রাখলেন 'নিমাঞি', অর্থাৎ নিমাই। নি-মাই অর্থ যার মা নেই। আবার কেউ কেউ মনে করেন এই নিমাই কথাটির মধ্যে যে 'নিম' (সুকুমার সেনের মতে) শব্দটা রয়েছে, যা সর্বার্থে তিক্ত, সেহেতু এহেন বিস্বাদ বস্তুর মধ্যে যমে স্পৃহা থাকবে না। পুরন্দর শচীমাতার আট আটটি কন্যা সন্তানের মৃত্যুজনিত কারণই বোধকরি এরকম নামের স্বার্থকতা।

বস্তুত, সর্বার্থে এক ঘোর অবক্ষয়ানক নৈরাজ্যের মধ্যে জন্ম হয়েছিল নিমায়ের। যুগপৎ কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সব কিছুই তখন চলছিল এক গ্লানিকর বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়ের পথ ধরে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙলার সমাজ জীবন তখন বদ্ধ জলাশয়ের মতো অন্ধ কুসংস্কারের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। তখন একদিকে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের জাতপাতের ঘৃণ্য নাগপাশে পিষ্ট হয়ে চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ ও অন্তেবাসী শ্রেণীর মানুষেরা মনুষ্যত্বের অধিকার বঞ্চিত জীবন যাপন করছে, অন্যদিকে একাধারে অহঙ্কার, জাত্যাভিমান, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে সমাজ জীবন আচ্ছন্ন। হিন্দু সনাতন ধর্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের অত্যাচার হাজার হাজার অন্তেবাসী মানুষ তখন ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করছে নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে। বস্তুত, হিন্দু সমাজে শূন্যগর্ভ অহঙ্কার ব্যতীত প্রকৃত হিন্দুয়ানা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। বোধকরি সহজিয়া বৌদ্ধ প্রভাবিত অধঃপতিত হিন্দু সমাজের এটাই সবচেয়ে তামসিক সময়। কবি জয়ানন্দের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে 'শিশ্নোদরপরায়ণ'। শৈব বা শাক্ত ধর্মাশ্রিত মানুষ তখন সর্বোপরি 'ম'কার সাধনায় মত্ত। ধৈর্য, ক্ষমা, অচৌর্য শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধী, বিদ্যাভাস, সত্যকথন, অক্রোধ ধর্ম সমর্থক ও ধর্ম সদর্থক সব কিছুই তখন সমাজে বড়ো দুষ্প্রাপ্য। এমনই এক ধ্বংসাত্মক ও বিপন্নতার সময়কে স্মরণ করে অন্যতম চৈতন্য চরিতকার কবি কর্ণপুর তাঁর 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের এক জায়গায় লিখেছেনঃ 'ন শৌচং নো সত্যং ন চ শমদমৌ নাপি নিয়মো ন শান্তির্ণ ক্ষান্তিঃ শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া।' (২/১)। অর্থাৎ শৌচ, সত্য, শম-দমন, নিয়ম, শান্তি, ক্ষমা, দয়া সমাজে তখন অবশিষ্ট ছিল না। চৈতন্য সমসাময়িক কবি কর্ণপুর আরও লিখেছেন, তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ দ্বিজচিহ্ন যজ্ঞসূত্রমাত্র ধারণ করে 'ষষ্ঠে কর্মনি' অর্থাৎ শিষ্যদের কাছে কলাটি মূলোটি বাগাতে তৎপর হয়ে উঠেছিল, ক্ষত্রিয়গণ হয়ে উঠেছিল প্রজাপালনে অসমর্থ, দেশের রাজা হয়ে উঠেছিল অপদার্থ, বৈশ্যগণ বৌদ্ধপ্রায় ও শূদ্রগণ পণ্ডিতম্মন্য হয়ে ধর্মপোদেশ দানে উৎসুক হয়ে উঠেছিল (২/২)।

এবং নীতিবোধহীন এহেন সমাজের অস্থির পর্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরেক চরিতকার জয়ানন্দ লিখেছেন :

'মা বাপ ছাড়িল পুত্র স্বতন্ত্রা যুবতী।
পরদারে রত হইল লঙ্ঘে নিজ সতী।।
স্নান সন্ধ্যা দেবার্চন ছাড়িল ব্রাহ্মণে।
শূদ্রের জীবিকা করে ভয় নাঞি মানে।।
শূদ্র স্ত্রী সঙ্গম করে শূদ্র ভক্ষে রত।
মৎস মাংসে লোলুপ ব্রাহ্মণ সব যত।।'

পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে মানুষ হয়ে উঠেছিল একাধারে ধর্মান্ধ ও তান্ত্রিকতা এবং সহজিয়াচারের দাস। এসময় নদীয়া নবদ্বীপের মানুষ ধর্ম বলতে বুঝতো লৌকিক দেবতা বাসুলি আর বিষহরিকে। চণ্ডী পূজা ছিল ঠ্যাঙাড়ে আর চোর ডাকাতদের প্রিয় পার্বণ। ষষ্ঠী পূজাও প্রচলিত ছিল সমাজে। যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত মানুষ পরম আনন্দে শুনতো। সেই সঙ্গে ছিল মদ্যমাংস ও মেয়েমানুষ সংযোগে যক্ষ পূজার ধুম।

মূলত, এই যে জগাই মাধাই, পাষণ্ডী গোপাল চাপাল এদেরকে আমরা মধ্যযুগীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাজের প্রতীকী হিসেবে ধরে নিতে পারি। এরা সকলেই এক একজন ব্যক্তি ছিলেন যদিও। কিন্তু তাদের অগতানুগতিক কার্যকলাপ এবং কার্যকলাপের অপ্রতিহত প্রবণতা তাদের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না। নয়টি দ্বীপ বিশিষ্ট নবদ্বীপ নগরীর প্রায় বত্রিশ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট, লক্ষাধিক নরনারীর মধ্যে তা স্বল্প বিস্তর সংক্রামিত হয়ে পড়েছিল।

একদিকে মুলুকপতি, মৌলবী ও কাজীদের অত্যাচার, অন্যদিকে উচ্চকোটি ও নিম্নকোটি অন্ত্যজ মানুষদের মধ্যে বর্ণাবর্ণের ভিন্নতা, ক্রমে পঞ্চদশ শতকের গৌড়-বাঙলা হয়ে উঠেছিল 'ফেৎকারী' বা 'উড্ডামরেশ্বর' এবং শৈব শাক্তদের 'ম'কার সাধনার পীঠস্থান। এবং এরই মাঝে ছিল বহির্জগত থেকে সম্পর্কহীন, অদৃষ্ট নির্ভর মধ্যযুগীয় বাঙালীর পথচলা।

অতঃপর সমাজ সংসার যখন নিচ্ছিদ্র তমিস্রাবৃত, মানুষ ও তার মনুষত্ব হয়ে উঠেছিল 'শিশ্নোদরপরায়ণ' ঠিক এমন এক ক্ষয়িষ্ণু তথা ধ্বংসাত্মক মুহূর্তে 'গীতা'র সেই অমোঘ বাণী 'ধর্মসংস্থাপনার্থ'র উদ্দেশ্যে মানুষ ও তার স্বতোবিরোধী সমাজকে কলুষমুক্ত করতে অবিসম্বাদী চৈতন্যের আবির্ভাব।

তাঁর পোষাকী নাম ছিল বিশ্বম্ভর। বিশ্বরূপের ভাই বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর মিশ্র। কিন্তু দৈবানুগ্রহপুষ্ট রূপ ও স্বর্ণকান্তি বর্ণের জন্য প্রতিবেশী ও নাগরিযারা তাঁকে গোরা গৌরাঙ্গ বলে সম্বোধন করতো। বোধকরি এই ঐশ্বরিক রূপের মোহে মোহিত হয়ে কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁর শিব পূজার জন্য গ্রন্থিত মল্লিকার মালাখানি অক্লেশে নিমাঞির গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন পুণ্যতোয়া সুরধুনীর বিজন উপকূলে। কিন্তু এ প্রেমের আশ্বাস বিবাহের মাধুর্যে নিমায়ের জীবনে পূর্ণতা পায়নি। যেন তাঁদের প্রাণের আকূতি স্ফূরিত হবার আগেই লক্ষ্মীপ্রিয়া চলে গেলেন বিশ্বম্ভরের জাগতিক চোখের আড়ালে। নিমায়ের চৈতন্য হওয়ার সেই শুরু।

অতঃপর ঊষর মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, বিপন্ন, সংসার-নিস্পৃহ নিমাই পত্নী-বিরহ জনিত বিপর্যয় প্রকোপিত, বিধ্বস্ত জীবন থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। মুক্ত হতে চাইলেন সাংসারিক গহনতা ও মমত্ব সংসারের অতলস্পর্শ বন্ধন থেকে। এই এক অমোঘ মুহূর্তে প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো কমলাক্ষ ভট্টাচার্য এসে দাঁড়ালেন নিমায়ের সম্মুখে। বাহান্ন বছরের কনিষ্ঠ নিমাই অক্লেশে আচার্যের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন গতানুগতিক চৌহুদ্দির বাইরে। তখন গৈরিক পথ ও অন্তহীন পথের অনন্ত সন্ধানই হলো তাঁর ঘরের প্রান্তর।

বললেন এসো, জীবন তাড়িতরা এসো, মরণ পীড়িতরা এসো, ভোগীরা এসো, বুভুক্ষুরা এসো, সুখীরা এসো দুঃখীরা এসো, আমীর গরীবরা এসো, অন্ত্যজরা এসো, কারু পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সবাইকে ডাকলেন ক্রমান্বয়ে। কেউ এলো, কেউ এলো না। কেউ আসবো আসবো করে মধ্যপথে থেমে গেল।

চৈতন্য বললেন, 'চণ্ডালোপি দ্বিজোশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ'। চৈতন্যের আগে এমন কথা এমন করে কেউ বলেনি। একাধারে যবন হরিদাস বা খোলাবেচা শ্রীধর অথবা ধনপতি বুদ্ধিমন্ত খান সবাই তাঁর কাছে ছিল একই সাগরে মেশা অসংখ্য নদীর মতো। তাঁর ব্রাত্য- ব্যাপৃত জীবনের আরেক অভূত ও অশ্রুতপূর্ব অবদান, 'তৃণাদপি সুনীচেন তাবারপি সহিষ্ণুনা' মন্ত্র। তিনি মানুষকে বললেন, তৃণাপেক্ষা নীচ ও বৃক্ষাপেক্ষাও সহিষ্ণুনা হয়ে জীবন যাপন করতে। আর নিজের পক্ষ থেকে বললেন :

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি।।'

বললেন, হে ঈশ্বর! আমি ধন দৌলত কামনা করিনা, কোন মানুষতেও আমার কাম্য নয়, কোন সুন্দরী নারী বা কাব্য- পন্ডিত্যেও আমার কাম্য না, হে পরমেশ্বর! জন্ম জন্মনি আমার অহৈতুকী ভক্তি কেবল তোমার প্রতি অবিচল হউক।

এই চৈতন্যের, এই নিরবধি নিত্যকার ও অনিঃশেষ চৈতন্যের, যাঁর গূঢ় ভাবময়তা, ব্যাপ্ততা ও জীবনকে যুগপৎ পূর্ণতা ও তৃষ্ণার্ত করে- এই চৈতন্যের নির্গমনের ঘটনাটি বড়ো বিস্ময়কর। তাঁর প্রাক আগমন মুহূর্তে সন্নাসী ঈশ্বরপুরী ঘোষণা করেছিলেন রাজ আগমনের কথা। এবং তার আগমনোত্তর সময় কৃতবিদ্য পন্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী বললেন, 'ত্রৈলোক্য ভাগ্যোদয় পুণ্যকীর্তি ঃ'। সবই তাঁর জীবনে বর্ণে বর্ণে ফলিত হয়েছিল। এমন ব্যাপৃত মানুষ একদিন অতলান্ত সমুদ্রের জলে তলিয়ে গেলেন। সমুদ্র কি বলে? আর কেউ বললো, 'কলারে কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি।' অর্থাৎ জগন্নাথের কালো অঙ্গে কৃষ্ণরূপ চৈতন্য মিশে গেলেন। কেউ বললো, জগন্নাথের হাঁ করা মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন তিনি। এরকম আরও গল্পগাথা আছে। কিন্তু এটাই আজ ইতিহাসের বড়ো সত্য কথা।

তো ইতিহাস কি? মনুসংহিতা বলেছে ঃ

'ধর্মার্থ কাম- মোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্ত- কথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে।।'

অর্থাৎ ধর্ম - অর্থ - কাম - মোক্ষ (লাভ)এর উপদেশ সমন্বিত কথাযুক্ত পূরাবৃত্তই ইতিহাস।

অতঃপর যুগকাল অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের অনুভব ও তার ইতিহাস ব্যুৎপত্তিরও রকমফের ঘটলো। আবারো ইতিহাসের ইতিহাস লিখলো মানুষ। লিখলোঃ 'History, in its broadest sense, is the story of man's past. More specially it means the record of that past, not only in chronicles and treaties on the past, but in all sorts of forms.' (The columbia Britannica)

ইতিহাসের বহিরঙ্গের সেই আনুপূর্ব্বিক বিবর্তনের স্বাভাবিক কারণে দুটি শিবির গজিয়ে উঠলো। একটি মিলনাত্মক অন্যটি বিরোধাত্মক। একদল প্রাচীন পন্থী। অপর দল নবীন পন্থী। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের বহুল বিবর্তন এবং ইতিহাস ও মানুষের এ অভিঘাত চলে আসছে।

সুতরাং 'কলারে কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি' জনিত তথ্যপুঞ্জের পরিমার্জন ঘটলো একদিন। পরিবর্তিত ইতিহাসে লেখা হলো ঃ 'This they did to make time for burying him within the temple. If he left the world at 4 P.M. the doors, we know were kept closed till 11 P.M. this was taken for burying him and repairing the floor after burial. The priests at 11 P.M. opened the gate and gave out that chaitanya was incorporated with the image of Jagannath. (Chaitanya & His age).

এরপর ৫-৮-৫৬ তারিখে পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি দীর্ঘ পত্রে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখলেন, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে গুম খুন করা হয়েছিল পুরীতেই এবং সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের দেহের কোন অবশেষের চিহ্নও রাখা হয়নি কোথাও। এবং তা হয়নি বলেই তিনটি কিম্বদন্তী প্রচারের প্রয়োজনও হয়েছিল।'

শুধু নীহাররঞ্জন অথবা দীনেশ সেন মশাই না, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, অমূল্যচন্দ্র সেন, ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়, মালীবুড়ো ও তস্য প্রভুজী মাই অধুনা ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু মশাই পর্যন্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বারম্বার প্রতিস্থাপন করেছেন সেইসব তথ্য যার পটভূমিকা নীহাররঞ্জন, দীনেশ সেনের অনুকূলে কথা বলে। 'শ্রীচৈতন্যঃ অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ' সেই প্রগাঢ় পরিবর্তিত ইতিবাচকতার সম্ভবপর প্রয়াস মাত্র। চৈতন্য কি ও কেন, এবং কোন পরিস্থির সম্ভাবনায় তিনি ঘোর সংসারী হয়েও মাতার অঁথে স্নেহ ও সর্বাঙ্গ সুন্দরী পত্নীর অচ্ছেদ্য পিছটান ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করলেন এবং কেনই বা তাকে অসময়ে ঝরে যাওয়া ফুলের মতো অকালে অন্তর্হিত হতে হলো পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রুদ্ধদ্বার অভ্যন্তরে-এ গ্রন্থে তারই যথার্থতার সীমিত মূল্যায়ণ করা হয়েছে।

* * *

এ গ্রন্থ রচনার নেপথ্যে যার প্রেরণা ও আনুকূল্য সর্বাধিক তিনি সবার, সবাকার। তিনি সতত কৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্নতার বহুল উর্ধ্বে। দ্বিতীয়ার্ধে, যিনি চৈতন্য রচনার ভিত প্রস্তর স্থাপন ও গন্থের নামকরণ করেছেন আমার মানসিকতায় তিনি আমার বয়োঃজ্যেষ্ঠ বন্ধু বিমলকান্তি সাহা। বিমলদা একাধারে আমার পাঠক, সমালোচক, উপদেষ্টা এবং প্রকাশক। তারই আগ্রহে ও আনুকূল্যে এ গ্রন্থের প্রকাশনা তরান্বিত, দীর্ঘায়ত ও সম্ভবপর হলো। অন্তত এর রচনাকালীন সময় তাঁকে আত্মবিস্মৃত থাকার অবকাশ ছিল না।

অতঃপর আরও কতোগুলি প্রকৃষ্ট নাম- যাদের কৃতবিদ্য ভাণ্ডার আমার জন্য অবারিত ও উন্মুক্ত ছিল তাঁরা হলেন পুরীর (ওড়িশা) পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা। ইনি একাধারে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গবেষক, ওড়িশার রাজ্য মিউজিয়মের উপদেষ্টা, ভারত সরকারের প্রত্নতত্ব বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য, এবং ওড়িশার প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণ বিভাগ ও রাজ্য সাহিত্য আকাডেমির সদস্য। এই অশীতিপর বৃদ্ধ গবেষক পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এসে টের পেয়েছিলাম ফলবতী বৃক্ষ ও মানুষ কতোখানি নিরভিমান। ইনিই আমাকে স্থির নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন চৈতন্যের পবিত্র সমাধি। এরপর যার আকর্ষণে বাঙলাদেশ থেকে বারম্বার ওড়িশার পুরীধামে ছুটে গিয়েছি ইনি আরেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়' আই-সি-এস পিতার একমাত্র সন্তান কি ভীষণ ঐশ্বর্য পেয়ে পার্থিব সমস্ত কিছু সুখ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে চারণিক ও দীনহীন জীবনযাপন করতে পারেন তা একমাত্র জয়দেববাবুকে দেখলে জানা যায়। এই জয়দেববাবুর কাছেই ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সেই অবিস্মরণীয় চিঠিটি দেখেছিলাম। সেই সঙ্গে কিছু অবিস্মরণীয় প্রয়াত ইন্দিরাজীর চিঠি। পুরী গেলে জয়দেববাবুর এক চিলতে পুঁথি বইপত্র ভরা ঘরটিই ছিল আমার জানার দীক্ষার প্রিয় আস্তানা। বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নিতান্ত বাল সুলভ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করেছি, তিনি অবাধে উত্তর দিয়েছেন। যিনি কারু সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেন না, তিনিই হাসিমুখে খিড়কি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন আমাকে। নির্দ্বিধায়।

এছাড়া পুরীর তোটা গোপীনাথ মন্দিরের মহান্ত হরেকৃষ্ণ দাস, গম্ভীরা মন্দিরের প্রধান মহান্ত, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা রাধাগোবিন্দ খুন্টিয়া, রঘুনন্দন লাইব্রেরীর (পুরী) লাইব্রেরিয়ান ও মুখার্জী ট্রাভেল এজেন্সির বাপী গোস্বামী প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। চৈতন্যের নীলাচল লীলার অনেক অজানা তথ্য ও পুস্তক এঁদের আনুকূল্যে আমার সংগ্রহ সম্ভার পূর্ণ করেছে।

চৈতন্য সংক্রান্ত লেখা চলাকালীন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সুভাস মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক সুরথ চক্রবর্তীর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। কেননা. তাঁদের সুদীর্ঘ পত্র আমার জিজ্ঞাসা ও শোধনের বিকাশ ঘটিয়েছে।

এছাড়াও ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর শ্রীপাঠ

পুরুনীয়া (বাঁকুড়া) নিবাসী মধুসূদন গোস্বামী, গগন গোস্বামী, শচীনন্দন গোস্বামী ও নবদ্বীপ মায়াপুরের গৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদ রাইদুলাল মহারাজ এবং কলকাতা নাকতলা গৌড়ীয় মঠের মহান্ত দায়ালবন্ধুজীর কাছে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহায়তা আমি এই সুবাদে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের বিখ্যাত সংগ্রহশালা বরাহনগর পাঠবাড়ীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিনের পর দিন এই পবিত্র স্থান ও এখানকার মানুষ জনের সংস্পর্শে এসেছি। এছাড়াও খিদিরপুর হরিসভা, জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে স্টোরস্ ডিপার্টমেন্ট লাইব্রেরি এবং বাকসাড়া (হাওড়া) তরুণ সংঘ লাইব্রেরির যথেচ্ছ সাহায্য নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে সেই মহান মানুষটির কথায় আবারো ফিরে আসি। আমি যখন ছিলাম না তখন তিনি ছিলেন। আমি যখন এলাম তখনো তিনি ছিলেন। আমি যখন থাকবো না তখনো তার উজ্জ্বল উপস্থিতি ভক্ত কবির ছন্দে ছন্দে ছড়িয়ে পড়বে শাপলা-শালুক ধান সিঁড়ি আর শঙ্খচিল ওড়া বাঙলার আকাশে বাতাসে।

'অদ্যপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।'

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়।
সাঁতরাগাছি / হাওড়া।



শচীমাতার কোলে শিশু নিমাঞি । পাশে কৃষ্ণনাম জপরত পিতা পুরন্দর মিশ্র ।



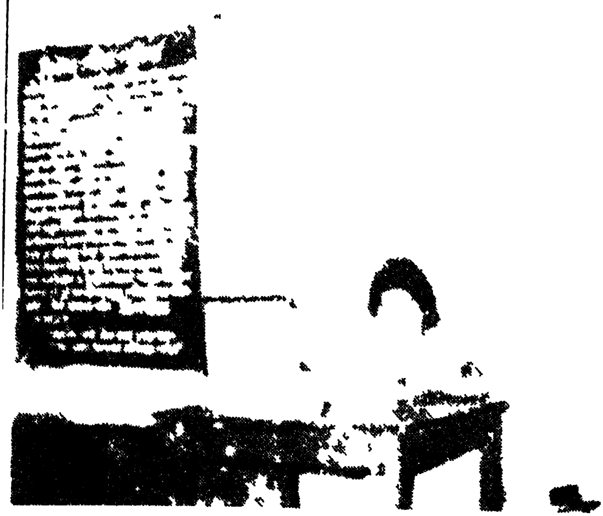
চৈতন্যের গৃহত্যাগ। ঘুমিয়ে আছেন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া



চৈতন্যের পাদুকা পুজা করছেন বিষ্ণুপ্রিয়া



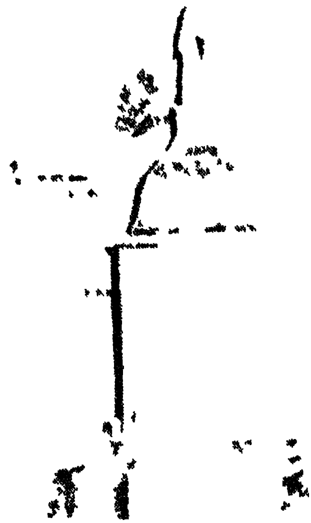
নিমাই স্ব-পার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তন করতে করতে কাজীর গৃহাভিমুখে চলেছেন।



কাশী মিশ্রের বাড়ি (গম্ভীরা)। এখানেই শ্রীচৈতন্য জীবনের শেষ আঠারো বছর কাটান।



পুবীব মন্দিবে জগন্নাথ বিগ্রহেব
পদতলে সংজ্ঞাহীন শ্রীচৈতন্য



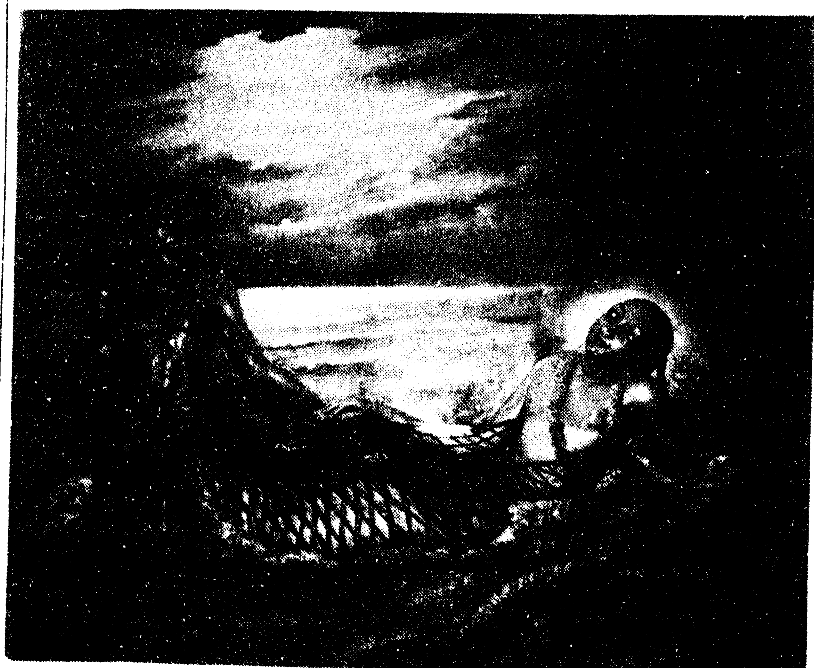
গম্ভীরার এই গৃহে চৈতন্য বাস করতেন
এখন এখানেই চৈতন্যেব ব্যবহৃত
জিনিসপত্র এবং পাদুকা সংবক্ষিত আছে।



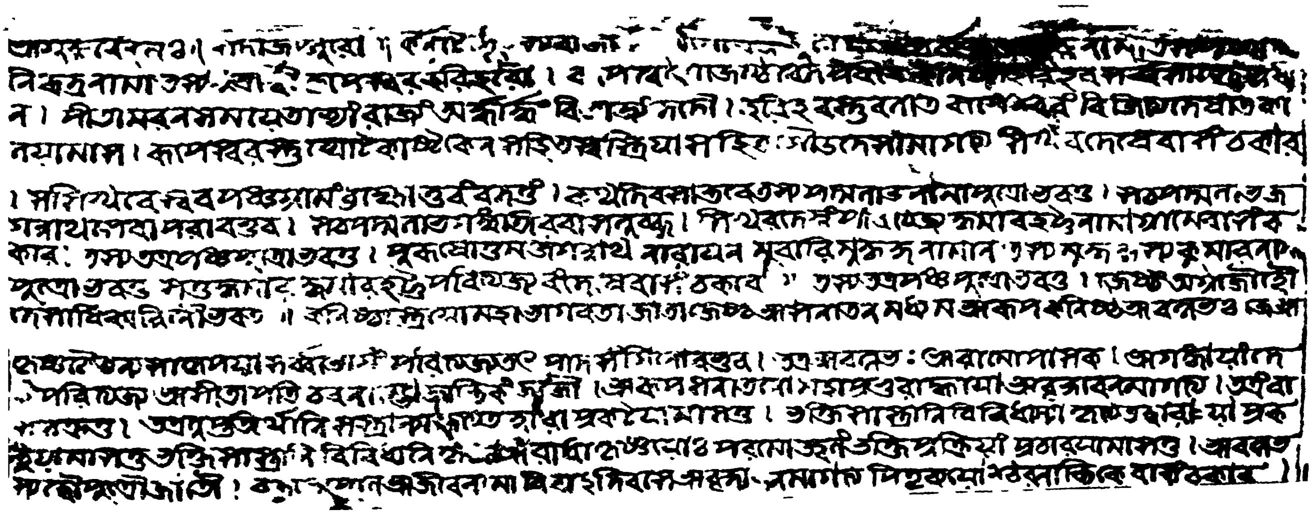
রথযাত্রার পূর্বে নৃত্যরত শ্রীচৈতন্য



যবন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে নিয়ে শোকান্মত্ত শ্রীচৈতন্য।



জালিয়াদের জালে উঠে এলেন শ্রীচৈতন্য



সনাতন-রূপ জীবের পরিচয়-পাতড়া প্রথম পৃষ্ঠা



তুলসীচৌরা :

চৈতন্য বিশেষজ্ঞের (পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা) মতে এটাই চৈতন্যের নির্ভরযোগ্য সমাধি

পূর্ব কথন

নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য, যা রচিবে তুমি
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনভূমি,
রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

['ভাষা ও ছন্দ', রবীন্দ্রনাথ]

* * *

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনীকার অজস্র। এক কথায় অসংখ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর মধ্যে আংশিক, খণ্ডিত, পূর্ণ, পূর্ণাতিপূর্ণ সকলেই আছেন। তার মধ্যে ওড়িয়া আছেন, বাঙালি আছেন, অসমিয়া আছেন, আছেন গুজরাতী, মারাঠী, ব্রজভাষী। এ'ভাবে হিন্দী, দক্ষিণ ভারতীয়, তেলেগু, পাঞ্জাবী, মনিপুরী- প্রায় সর্বভারতীয় ভাষাভাষীদের হৃদয় জয় করে, বিস্ময়কর ভাবে, ভারতীয় ভৌগোলিক সীমা অতিক্রান্ত করে মহাপ্রভু পৌঁছে গেছেন সাগর পারে। কেমন করে ? এর সদুত্তর দেবে ইতিহাস।

মহান ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখেন। কিন্তু উত্তরসূরীর কাছে, ভাবী প্রজন্মের কাছে তাঁদের দায় বা দায়িত্বভার থাকে না ইতিবৃত্তের স্পষ্টতর জবানী লেখার। তবু এর মধ্যে বেশি কুহেলিকাচ্ছন্ন থেকে যায় জীবনের ইতিহাস। কার জীবনের ইতিহাস ? হরিপদ কেরানীর জীবনবৃত্ত কোনদিন ইতিহাস মনে রাখে না। যাঁরা আকবর বাদশা হয়ে এসেছেন, আসবেন, তাঁদের জন্য ইতিহাস 'যো হুকুম' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই এক মানুষ ও মনুষ্যত্বের অমোঘ নিয়তি। যীশাস ক্রাইস্টের জন্য ঘৃন্যতম জুডাস অথবা এ'নিবন্ধের শিরোনামা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য বারমুখী নামী বেশ্যারা ইতিহাসে স্থান পায়, কিন্তু বুকের রক্ত দিয়ে যারা পিরামিড গড়লেন, দিগন্তবিস্তারী চীনের প্রাচীর গড়লেন, ইতিহাস তাদের কথা বলে না। ইতিহাস মানেই রাজা-মহারাজা, জমিদার, অথবা প্রতাপান্বিত ধর্মগুরু বা চটুল নয়না রাজেন্দ্রাণীর জীবনী আলেখ্য। এক কথায় কুখ্যাত রত্নাকর বা বিখ্যাত বাল্মিকীবৎদের সত্য-মিথ্যা ও কিংবদন্তী জড়িত কাহিনীর নামই হলো ইতিহাসের ইতিবৃত্ত।

হ্যাঁ, মিথ্যে কথাও ইতিহাসে থাকে। মহান ঐতিহাসিকেরা লেখেন। লিখতে হয়। রাজভয়ে লিখতে হয়। ধর্মভয়জনিত কারণেও লিখতে হয়। কেউ কেউ ভাবাবেগে, ভাবাবিষ্ট হয়েও লেখেন। কিন্তু আমার মনে হয়, একজন ঐতিহাসিক ইতিহাসের চেয়েও সত্য। তাঁরা বাধ্যতাবাধ্য হয়ে ইতিহাসের সত্যটুকু মিথ্যার কুয়াশায় ঢেকে রাখেন। কিন্তু যা কিছু শাশ্বত, চিরায়ত সত্য, তাকে মিথ্যার কুয়াশাজালে ঢেকে রাখার নাম সত্যের অপলাপ নয়। এক প্রজন্মের রহস্য পরবর্তী প্রজন্মের রহস্যভেদী সূর্যালোকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। পৃথিবীর এই নিয়ম। মহান ঐতিহাসিকেরা তা জানেন। তাই তাঁরা ইতিহাসের শাশ্বত উপাদানটুকু ইতিহাসেই লুকিয়ে রাখেন। চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে ভাবী কালকে তা খুঁজে নিতে হয়।





তুলসী চৌরা ঃ

চৈতন্য বিশেষজ্ঞের (পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা) মতে এটাই চৈতন্যের নির্ভরযোগ্য সমাধি

পূর্ব কথন

নাবদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য, যা বচিবে তুমি
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি তব মনভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

['ভাষা ও ছন্দ'/রবীন্দ্রনাথ]

* * *

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব অজস্র। এক কথায় অসংখ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর মধ্যে আংশিক, খণ্ডিত, পূর্ণ, পূর্ণাতিপূর্ণ সকলেই আছেন। তাব মধ্যে ওড়িয়া আছেন, বাঙালি আছেন, অসমিয়া আছেন, আছেন গুজরাতী, মারাঠী, ব্রজভাষী। এভাবে হিন্দী, দক্ষিণ ভারতীয়, তেলেগু, পাঞ্জাবী, মনিপুরী প্রায় সর্বভারতীয় ভাষাভাষীদেব হৃদয় জয় কবে, বিস্ময়কর ভাবে, ভারতীয় ভৌগোলিক সীমা অতিক্রান্ত কবে মহাপ্রভু পৌঁছে গেছেন সাগর পারে। কেমন করে? এব সদুত্তর দেবে ইতিহাস।

মহান ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখেন। কিন্তু উত্তরসূরীর কাছে, ভাবী প্রজন্মের কাছে তাঁদেব দায় বা দায়িত্বভার থাকে না ইতিবৃত্তেব স্পষ্টতর জবানী লেখার। তবু এর মধ্যে বেশি কুহেলিকাচ্ছন্ন থেকে যায় জীবনেব ইতিহাস। কার জীবনেব ইতিহাস? হরিপদ কেরানীব জীবনবৃত্ত কোনদিন ইতিহাস মনে রাখে না। যাঁরা আকবর বাদশা হয়ে এসেছেন, আসবেন, তাঁদের জন্য ইতিহাস 'যো হুকুম' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই এক মানুষ ও মনুষ্যত্বের অমোঘ নিয়তি। যীশাস ক্রাইস্টেব জন্য ঘৃন্যতম জুডাস অথবা এ নিবন্ধের শিরোনামা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেব জন্য বারমুখী নামী বেশ্যারা ইতিহাসে স্থান পায়, কিন্তু বুকের রক্ত দিয়ে যারা পিরামিড গড়লেন, দিগন্তবিস্তাবী চীনের প্রাচীর গড়লেন, ইতিহাস তাদের কথা বলে না। ইতিহাস মানেই রাজা মহারাজা, জমিদার, অথবা প্রতাপান্বিত ধর্মগুরু বা চটুল নয়না বাজেন্দ্রাণীর জীবনী আলেখ্য। এক কথায় কুখ্যাত বত্নাকর বা বিখ্যাত বাল্মিকীবৎদের সত্য-মিথ্যা ও কিংবদন্তী জড়িত কাহিনীর নামই হলো ইতিহাসের ইতিবৃত্ত।

হ্যাঁ, মিথ্যে কথাও ইতিহাসে থাকে। মহান ঐতিহাসিকেবা লেখেন। লিখতে হয়। রাজভয়ে লিখতে হয়। ধর্মভয়জনিত কাবণেও লিখতে হয়। কেউ কেউ ভাবাবেগে, ভাবাবিষ্ট হয়েও লেখেন। কিন্তু আমার মনে হয়, একজন ঐতিহাসিক ইতিহাসের চেয়েও সত্য। তাঁরা বাধ্যতাবাধ্য হয়ে ইতিহাসের সত্যটুকু মিথ্যার কুয়াশায় ঢেকে বাখেন। কিন্তু যা কিছু শাশ্বত, চিরায়ত সত্য, তাকে মিথ্যাব কুয়াশাজালে ঢেকে রাখাব নাম সত্যের অপলাপ নয়। এক প্রজন্মের রহস্য পরবর্তী প্রজন্মের রহস্যভেদী সূর্যালোকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। পৃথিবীর এই নিয়ম। মহান ঐতিহাসিকেরা তা জানেন। তাই তাঁবা ইতিহাসের শাশ্বত উপাদানটুকু ইতিহাসেই লুকিয়ে রাখেন। চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে ভাবী কালকে তা খুঁজে নিতে হয়।



অতঃপর একটি লজ্জাকর ঘটনার অবতারণা করি। বেশ কয়েক বছর আগের ইতিবৃত্ত। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন পালি ভাষায় লিখিত 'জাতক' কাহিনী ও রামায়ণের তুলনামূলক দিকগুলি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জাতক কাহিনীর 'দশরথ জাতক' আখ্যায়িকায় রাম সীতা ভাইবোনের উল্লেখ আছে) তখন এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ আচার্যকে টেলিফোনে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, রামায়ণের চিরন্তন কাহিনীকে বিকৃত করলে আমরা আপনাকে সহ আপনার নাতিকে কিডন্যাপ করবো। আচার্য চট্টোপাধ্যায় সেদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'এই তো আমাদের দেশ।' [আনন্দবাজারপত্রিকা/৩১-৫-৭৭]

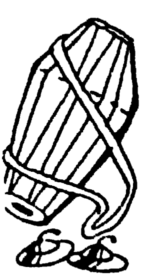
কাহিনী এখানেই শেষ নয়। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আচার্য চট্টোপাধ্যায় আরেক সমস্যায় পড়লেন। তাঁকে প্রাণের ভয় দেখানো হলো। চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য নিয়ে গবেষণারত রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন নিন্দিত হলেন। ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেনের অবস্থা হলো আরও শোচনীয়। তবু সহস্র বিপদ, মৃত্যুভয়ের মাঝেও রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, আচার্য সুনীতিকুমার প্রমুখেরা চৈতন্যের মৃত্যুজনিত ঘটনাটিকে 'হোমিসাইড' বলে বর্ণনা করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্রের ধারণা ছিল, পুরীর জগন্নাথের পাণ্ডারা চৈতন্যকে নির্মমভাবে পিটিয়ে মেরেছে। কিন্তু পাণ্ডারা প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যকে কেন পিটিয়ে মারলো ? কি এমন মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছিলেন তিনি ? ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—সকলেরই এই একই প্রত্যয়। অন্যত্র বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস বাবাজী তার 'চৈতন্য চকড়ায়' লিখেছেন, 'চৈতন্যদেবের মৃতদেহ রাত্রি ১০ দণ্ডের সময় গরুড় স্তম্ভের পিছনে পড়ে ছিল।' এটা নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

'রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হল।
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে ॥'

[চৈতন্য চকড়া]

তারপর ?

তারপর কাহ্নাই খুঁন্টিয়া ও শিখি মহান্তি নামে মহাপ্রভুর দু'জন ওড়িয়া ভক্ত চৈতন্যের মৃতদেহটা ধরাধরি করে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে নিয়ে এলো। তারপর আর কিছু নেই।



অতঃপর যদি তর্কের সুবাদে ধরেই নেওয়া হয়, চৈতন্যের মৃত্যু পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরেই ঘটেছিল, এবং রাত্রি দশ দণ্ডের সময় (১১টা নাগাদ) তার মৃতদেহ গরুড় স্তম্ভের পিছনে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন বৈষ্ণবদাস নামক জনৈক ওড়িয়া চৈতন্য ভক্ত এবং পরে কাহ্নাই খুন্টিয়া ও শিখি মাহান্তি প্রভুর মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে এলেন তোটা গোপীনাথের মন্দিরে, তাহলে তো স্বভাবতই একটা প্রশ্ন আসে, মানুষটির মৃতদেহটা গেল কোথায় ? আরও প্রশ্ন ওঠে, চৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত (মৃত্যুর দিন যিনি চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন) চৈতন্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই গদাধর পণ্ডিতই বা হারিয়ে গেলেন কোথায় ? শুধু গদাধর পণ্ডিত নয়, চৈতন্যের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর আরও বেশ কয়েকজন প্রিয় ভক্ত, যেমন স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতিরা পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেলেন। বাকী ভক্তরা নীলাচল ছেড়ে পালিয়ে গেলেন সুদূর বৃন্দাবনে। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, চৈতন্যের মৃত্যুর

সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ হয়ে গেল ওড়িশায় । কিন্তু কেন ? কার ভয়ে ?

এরকম অজস্র রহস্যজালে আবৃত শ্রীচৈতন্যের জীবন কাহিনী । চৈতন্য নিজেই বলেছেন, 'সন্ন্যাসীর কাছে রাজদর্শন ও স্ত্রী দর্শন বিষ ভক্ষণ তুল্য (চৈতন্য চরিতামৃত ২-১১/২-১০) কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য রাজা প্রতাপরুদ্রকে বহুবার দর্শন দিয়েছেন । শুধু তাই নয়, রাজা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে বহু রাজনীতির আলোচনা করেছেন তিনি । শুধু আলোচনা নয়, চৈতন্যচরিত পাঠ করলে মনে হবে তিনি স্বয়ং রাজনীতির কুম্ভিপাকে জড়িয়ে পড়েছিলেন । চরিতামৃত-এর ২/১১/৬ অংশে চৈতন্য বলেছেন, 'নারী জাতির মুখ দর্শন বিষ ভক্ষণের সমান ।' কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম নেওয়ার পর অন্তত বেশ কয়েকজন দেহপোজীবী মেয়ের সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল । এদের মধ্যে বারমুখী, লক্ষীবাঈ ও সত্যবাঈ অন্যতম । ['বাঙলার ইতিহাস'/রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়/২য় খণ্ড/পৃঃ ২২৮-৩৬]

প্রেমের ঠাকুর চৈতন্য । জগাই মাধাই কর্তৃক মাথায় কলসীর কানা মারা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রেমদান করেছিলেন । সেই চৈতন্যই আবার কেন কাজীর বাড়ি ও ফুলের বাগান ভাঙচুর করার আদেশ দিলেন ভক্তদের ? কেন কাজীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে চাইলেন ? বৈষ্ণব ধর্মের মূলমন্ত্র যদি হয় প্রেম তবে একজন পরম বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চৈতন্যকে কেন এক রাগী যুবকের ভূমিকায় বার বার অবতীর্ণ হতে দেখা যায় ? দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ও মা শচীদেবীকেও মারধোর করতে যেতেন । কিন্তু কেন ? চৈতন্যের জীবনের আরও বিস্ময়কর কাহিনী আছে । যেমন নারায়ণী । চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-তনয়া ছিলেন নারায়ণী । বাল্য বিধবা । এই বাল্য বিধবা চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট পান খেয়ে গর্ভবতী হন । শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস সেই সন্তান (উদ্ধব দাস কৃত 'গৌরপদ তরঙ্গিনী' দ্রষ্টব্য) । এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

'সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস ।
অবশেষ পাত্র—নারায়ণী গর্ভজাত ॥'

['চৈতন্য ভাগবত' ৩/৬/২২১]

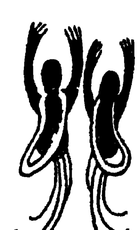
এবং চরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস লিখেছেন,

'নারায়ণী- চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন ।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥'

['চৈতন্য চরিতামৃত' ১/৮/৩৭']

কিন্তু উচ্ছিষ্ট পান খেয়ে কোন রমণী সসত্ত্বা হয় কেমন করে এ' বিজ্ঞানের যুগে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ।

এবং তারও চেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া যাচ্ছে লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে । লোচন তাঁর গ্রন্থে নদীয়া-নাগরীদের সাথে চৈতন্যের যে সব পরকীয়া রঙ্গ-রসের আভাস দিয়েছেন তা যেমন চাঞ্চল্যকর, তেমনি বিস্ময়করও । যথা একটি উদাহরণ—



'গৌরাঙ্গের নয়ন সন্ধান শরাঘাতে ।
মানিনীর মান মৃগ পলায় বিপথে ॥
অথির নাগরীগণ শিথিল বসন
মাতল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন ॥'

['শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'/আদিখণ্ড/পৃঃ ৩৪]

শুধু লোচন দাসই নয়, নদীয়া নাগরীদের সাথে চৈতন্যের দেহজ-প্রেমের কথা আরও অনেক পদকর্তা লিখে গেছেন। এর মধ্যে বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার, শেখর প্রভৃতি মহাজনের নাম সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মহাপ্রভু চৈতন্য-এর মৃত্যু ও মৃত্যুকালীন ঘটনাই শুধু রহস্যাবৃত নয়। তাঁর ৪৭ বছর চার মাস ১০ বা ১২ দিন জীবনের অনেক ঘটনা আজও তমসাবৃত রয়ে গেছে। এই স্বল্পকালীন জীবনে অনেকগুলি সত্য বা মিথ্যা কলঙ্কের ভাগীদার হয়েছেন শ্রীচৈতন্য। এমন কি হত্যা, আত্মহত্যা বা মৃগী রোগে মৃত্যু প্রভুর জীবনে যাই ঘটুক, মৃত্যুর পরও মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপানো হয়েছে।

প্রভু কি সত্যিই কলঙ্কিত?
তারই সত্যাসত্য সন্ধানে-
"শ্রীচৈতন্যঃ অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ"

[এক]

ভগবান চৈতন্য

'The influence of Shri Chaitanya is all over India ... most of his so-called disciples in Bengal do not know how his power is still working all over India.'

* * *

একজোড়া প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর যৌন সাহচর্যের (Sexual Companionate) ফল স্বরূপ কোন জাতক বা জাতিকার জন্ম হয়ে থাকে। যাবৎ পৃথিবীর সমগ্র প্রাণীকুলের ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রযোজ্য। ক্ষেত্র বিশেষে এর রকমফের আছে মাত্র। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে একটি প্রাণের জন্ম যুগপৎ জৈবিক কারণে ও প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ে থাকে।

কোন মানুষের ঘরে মানুষের সন্তান সন্ততি রূপে মানুষই জন্মগ্রহণ করে থাকে। এর থেকে মহান বা মহত্তর পরিচয় আর কিই বা থাকতে পারে। ধন নয়, মান নয়, একজন মানুষের শেষ ও শ্রেষ্ঠত্বর পরিচয় হওয়া উচিত সে মানুষ। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ ঈশ্বরের চেয়েও বড়ো। কেননা ঈশ্বর মানুষেরই সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ নয়।



উপরোক্ত কথাগুলি বলার প্রয়োজন ছিল এ'জন্য যে, মানব পুত্র মানব চৈতন্যকে আমরা ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছি। আর এ' অতি কাল্পনিক অপবাদ তাঁর মাথায় বর্তেছে জন্ম লগ্ন থেকেই। চৈতন্য যখন মাতৃগর্ভে তখন থেকেই শুরু হয়েছে চৈতন্য জীবনীকারদের এ ধরণের আধি-দৈবিক প্রচেষ্টা।

'এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্ত রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥
শচীগর্ভে বৈসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ॥'

['শ্রীচৈতন্য ভাগবত'/আদিখণ্ড/১৮৯, ১৯০]

আরেক প্রসিদ্ধ চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ, যাঁকে আমরা এরপর থেকে কবিরাজ গোস্বামী নামে অভিহিত করবো, সেই পরম বৈষ্ণব কবিরাজ

গোস্বামীর কলমেও সেই একই আধি ভৌতিক ও আধি দৈবিক চিন্তাধারা ঝরে পড়েছে। যথা—

'চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ শচী দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে॥'

• • •

'শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে॥'

(চৈতন্যচরিতামৃত/আদিলীলা)

এ'ভাবে বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত, জয়ানন্দ দাস (ইনি কবি-কর্ণপূর নামে খ্যাত); বাসু ঘোষ, লোচন দাস, কৃষ্ণ দাস কবিরাজ প্রভৃতি বাঘা চৈতন্য জীবনীকাররা চৈতন্যকে হয় ঈশ্বর, আবার কোথাও বা ঈশ্বরের অবতার ভুক্ত করেছেন। সম্ভবত এটাই চৈতন্যের জীবনের সর্বপেক্ষা বড়ো বিড়ম্বনা। এক শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবতেই চৈতন্যকে সুস্পষ্ট ভাবে ১৫ বার 'কৃষ্ণ' বলা হয়েছে। পয়ারগুলি হলো, ১/১/১০৬, ১/১/১২৫, ১/২/৭৯, ১/৮/২৬২, ১/৮/২৬৫, ১/৯/১৪৩, ১/১০/৪, ২/২/৪৮-৫৩, ২/৯/২৮৭, ২/২২/১৪, ২/২৩/২৮৫, ২/২৩/২৬২, ২/২৪/১৫, ৩/১০/১৭৩ ও ৩/১০/৩৭০। এবং উক্ত চৈতন্য ভাগবতে অন্তত ৪০ বার চৈতন্যকে নারায়ণ, বৈকুণ্ঠনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি কাল্পনিক বাক্যে স্তুতি করা হয়েছে। •

ভক্ত যদি তার ভক্তিস্পদ মানুষটিকে ভগবান বা অবতার রূপে বিশ্বাস করেন, ও প্রচার করেন, সেটা সেই ভক্তের ক্ষেত্রে কোন দোষণীয় নয়। কেননা, সেক্ষেত্রে তার ভক্তিজনিত কল্পনা বাস্তবের চেয়েও সত্য কিন্তু সেই

• এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্যর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশা ও বাঙলাদেশে (তৎকালীন যুক্ত বাঙলার কথা বলা হচ্ছে) সুদীর্ঘ ৫০ বছর বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। এসময় গৌড়ে ও উৎকল প্রদেশে বৈষ্ণব বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করে। (ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'Chaitanya & his age P 259 10 দ্রষ্টব্য)) ফলে বৈষ্ণবরা সুদূর বৃন্দাবনে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই সুদীর্ঘকাল বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসার স্তব্ধ হওয়ায় চৈতন্য মূল্যায়ণের ধারাবাহিকতা ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়। কেননা, সুদীর্ঘ ৫০ বছর প্রচারহীন থাকায় পরবর্তী কালে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও চৈতন্যের অবমূল্যায়ণ ঘটা বিচিত্র নয়। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁর 'শ্রী অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে লিখছেন, 'যখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের প্রভুর অসীম কৃপায়, শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন তাহার অনেকের শরণাগত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারে না। যাঁহারা গোস্বামী, পণ্ডিত, তাঁহারা শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামী গ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানে না। যিনি বড় জানেন তিনি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেও যেখানে লীলাকথা আছে সেখানে নয়, যেখানে সেখানে তত্ত্বকথা আছে সেখানে। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়া যে একখানা গ্রন্থ আছে, অনেকেই তাহার সংবাদ রাখিতেন না। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম কি, প্রভু কে, তিনি কি করিয়াছেন, ইহা প্রায় কেহই জানিতেন না। (শ্রী অমিয় নিমাই চরিত/পঞ্চম খণ্ড/পৃঃ ৯৮)। বেশি দিনের কথা নয়, শিশিরকুমার বাংলা ১৩১৮ সালের ২৬শে পৌষ পরলোকগমণ করেন। আর এখন ১৩৯৬ সাল। ৭৭/৭৮ বছর আগেও শ্রীচৈতন্য তথা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ কতোখানি অজ্ঞ ছিলেন ভাবলে বিস্ময় জাগে।



'কল্পলোকের ঈশ্বর' তাঁর ভক্ত বা ভক্ত মণ্ডলীর কাছে সীমাবদ্ধ। তিনি ইতিহাসের ঐতিহাসিক ঈশ্বর হতে পারেন না। আর তা হলে তার্কিকের তর্জনী প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে।

যদি যুক্তি তর্কের বিচারে ধরেই নেওয়া হয়, ভক্ত তাঁর চিরাচরিত নিয়মে, গতানুগতিকার পথ ধরে কোন ধর্মীয় নেতাকে ভগবান-ভুক্ত করলেন তাঁর একান্ত আনুগত্য দেখানোর জন্য, সে ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি ঐতিহাসিকতা লঙ্ঘন করলেও ন্যূনতম মানবিকতা বোধে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। সম্ভবত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সেটা কষ্টকল্পিত হলেও অনুচিত হবে না। কিন্তু একজন ভক্ত যদি তাঁর একান্ততম ধর্মীয় গুরু বা প্রভুপাদকে একেবারে সরাসরি অ্যারাবিয়ান নাইটের সেই বিস্ময়কর প্রদীপ বানিয়ে ফেলেন তাহলে সেটা রোমাঞ্চকর থ্রিলার হতে পারে, জীবনের পরিচিতি হতে পারে না।

যদিও কবিরাজ গোস্বামী তার চরিতামৃতের মধ্যলীলায় তাঁর সেই অতিশয় সত্য কথাটি লিখেই দিয়েছেন–

'আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥'

['চৈতন্য চরিতামৃত'/মধ্যলীলা/অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ]

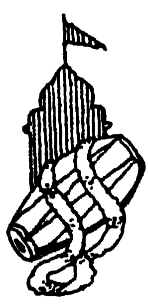
কবিরাজ গোস্বামীর এধরণের উপদেশ মেনে নিলে চৈতন্যকে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক অবতার ধরে নেওয়ার পিছনে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য যেহেতু একজন মানুষ, এবং চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ যেহেতু চৈতন্যের জীবনী ও ইতিহাসের উপাদান, সেহেতু মানুষ চৈতন্যের মানুষী প্রবৃত্তি গুলিকে আমরা নীতিগত ভাবে মেনে নেব। তাঁর অলৌকিকতা, তাঁর অতি মানুষতা ধর্মপ্রিয় জাতির স্বার্থে মেনে নিলেও, ইতিহাসের বাস্তবতার স্বার্থে তা গ্রহণীয় অনুচিত হবে। •

অতঃপর দেখা যাক, মানুষ চৈতন্যকে তাঁর চরিত্রকাররা কতোখানি অতিমানুষ বানিয়েছেন। চৈতন্য ভাগবতে কমপক্ষে অন্তত ১৩ জায়গায় চৈতন্যের নানা রূপের অলৌকিকত্ব বর্ণনা রয়েছে। নানা রূপ বলতে বর্তমান কালের সত্যান্বেষী গোয়েন্দাদের মতো কখনো সাধু কখনো ফকির বা পাগল–ঠিক তা নয়। একেবারে আধিভৌতিক ব্যাপার। দেখা যাচ্ছে, দু'হাতধারী মানুষ চৈতন্য ছ'হাতধারী এক ভয়াবহ অতিমানুষে পরিণত হয়েছেন। কখনো বা ভয়ংকর রূপধারী দৈত্যে। কখনো বা তীক্ষ্ণ দাঁতঅলা শূকর রূপে। আবার কখনো মা কালী বা জটাজুট ধারী দিগম্বর শিবরূপে। সেই সব রোমহর্ষক স্থানগুলির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরলাম। যথা–

(এক) মা শচীদেবীর কাছে চৈতন্যের কৃষ্ণরূপ প্রকটন।

[চৈতন্যভাগবত/২/৮/৬৩-৬৬]

(দুই) মুরারি গুপ্তের কাছে বরাহ রূপ প্রকটন (ঐ-২/৩/১৮-২৪)। (তিন)



• এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে। এক দিনে আম্রবীজ বপন ও তাহা হইতে বৃক্ষ ও ফলোদ্গম, স্পর্শমাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য লাভ, সুদর্শনচক্রের আহবানমাত্র আকাশ হইতে উক্ত চক্রের আর্বিভাব, ষড়ভুজ প্রকাশ ইত্যাদি। এসব সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। এই সকল প্রকৃত হইলেই বা ইহাদের কি মূল্য তাহা বুঝিতে পারি না। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'/১ম খণ্ড/পৃঃ ২৯৭)।

মাধায়ের কাছে চতুর্ভুজ-রূপ প্রকটন (ঐ-২/১০/১৯৩-৯৫) । (চার) চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে রুক্মিনী-আদ্যাশক্তি-রূপ প্রকটন (ঐ-২/১৯)

অধ্যায়) । (পাঁচ) অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের কাছে বিশ্বরূপ প্রকটন (ঐ-২/২৩/৪৭-৬০) । (ছয়) সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে ষড়ভুজ রূপ প্রকটন (ঐ-৩/৩/১০১-২) । (সাত) শ্রীধর পণ্ডিতের কাছে কৃষ্ণ বলরাম রূপ প্রকটন (ঐ-২/৯/১৯০-৯৫) । (আট) শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে নৃসিংহ রূপ প্রকটন (ঐ-২/২/২৫-৫৯) । (নয়) অদ্বৈতাচার্যের কাছে অপূর্ব কৃষ্ণরূপ প্রকটন (ঐ-২/৫/৭৪; ৮৫) । (দশ) শিবের গায়েনের কাছে শিব-রূপ প্রকটন (ঐ-২/৮/৯৫-১০১) । (এগারো) মুরারি গুপ্তের কাছে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা রূপ প্রকটন (ঐ-২/১০/৬-১০)। (বারো) নিত্যানন্দের কাছে ষড়ভুজ রূপ প্রকটন (ঐ-২/৫/৮৮-৯০) । এবং তৈর্থিক নামক বিপ্রের কাছে কৃষ্ণ-রূপ প্রকটন (ঐ-১/৩/২৬৩-৭০) প্রভৃতি ।

এরকম প্রায় সকল চৈতন্য জীবনীকারদের গ্রন্থে মানুষ চৈতন্যকে অল্প বিস্তর অতি-ভৌতিক, আবার কোথাও বা অতি-শাক্তিক (almighty) পরিণত করা হয়েছে । অর্থাৎ তিনিই সর্ব ও সর্বজ্ঞ । তিনিই 'যয়া-ত্বয়া জগৎস্রষ্ঠা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ ।' বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র পাঁচশো বছর আগে এক সাধারণ পরিবারের অতি সাধারণ সাংসারিক মানুষকে নিয়ে কেন এমন আধিদৈবিক গল্প করা হয়েছিল ভাবলে সততই বিস্ময় জাগে । যদি ঈশ্বরবাদীদের ভগবানের মতো চৈতন্য সর্বশক্তিমান পুরুষ হতেন, তাহলে, তাঁকে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে নিষ্ঠুর আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হতো না । [সদ্য আবিষ্কৃত পুঁথি বৈষ্ণবদাস কৃত 'চৈতন্য চরুড়া' দ্রষ্টব্য । প্রাপ্তিস্থান—২১/২ বিডন স্ট্রীট। কল-৬] সুতারং চৈতন্যের ইতিহাস ঐতিহাসিক ভুল না আমাদের বোধগম্যের অজ্ঞতা আগে তার সমুচিত সমাধান হওয়া দরকার ।

[দুই]

চৈতন্য কেন ভগবান

চৈতন্য ১৪০৭ শকাব্দের (ইং ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ ।

'ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয় ।
সেই কালে দৈব যোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ।'

[চৈতন্যচরিতামৃত/আদি]



চৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কবিরাজ গোস্বামীর সুরে সুর মিলিয়ে এ যুগের তিনজন দিকপাল ঐতিহাসিক যথাক্রমে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় (বাঙ্গালার ইতিহাস/২য় খণ্ড/পৃ-২২৯), রমেশচন্দ্র মজুমদার (বাংলাদেশের ইতিহাস/২য় খণ্ড/পৃঃ-৩৭২), এবং সুকুমার সেন (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস/১ম খণ্ড পূর্বার্ধ/পৃঃ-২৭৭) গ্রন্থে সেই একই পুনরুক্তি করেছেন । কিন্তু চৈতন্যের একদা সহপাঠী ও পরবর্তী কালে পার্ষদ ও চৈতন্য জীবনীকার মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' থেকে জানা যাচ্ছে যে, চৈতন্যের জন্ম মুহূর্তকালে চাঁদে

গ্রহণ লাগেনি। চন্দ্রগ্রহণের পূর্বেই চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

'তস্য জন্মসময়েহনু শশাঙ্কং
রাহুর গ্রসদলং এর্পয়েব।
কৃষ্ণপক্ষবদনেন নির্জ্জিতঃ
প্রাবিশৎ সুররিপোর্মুখং বিধু ॥'

[কড়চা'/১/৫/২৩]

মুরারি গুপ্তের মতো কবি কর্ণপূরও সেই একই কথা বলেছেন, আগে চৈতন্যের জন্ম হয়েছে, তারপর চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয় [চৈতন্যচন্দ্রোদয়/২/৪৪]।

চৈতন্যের জন্ম মুহূর্তটি নিয়ে আমরা এরকম একটা বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে যেতে চাইছি এ'জন্য যে, জাতকের জন্ম মুহূর্ত সঠিক ভাবে জানা থাকলে জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে তার প্রকৃত আয়ুষ্কাল ও মেধাশক্তির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য আনুমানিক বিচারে জ্যোতির্বিদ্যা কতোখানি ঐতিহাসিক উপাদানের পরিপূরক, এবং তা হলেও সেটা সার্বিক গ্রহণযোগ্য কিনা বলা দুষ্কর। তবে চৈতন্যের ক্ষেত্রে এ' বিষয়টি জাতকের ভবিতব্য প্রসঙ্গে একটা আলোকপাত করলেও করতে পারে। কেননা স্বয়ং চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী একজন সে যুগের সুবিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। এছাড়াও তিনি কন্যা ও জামাতার সংসারের তত্ত্বাবধানও করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ হিসাবে নবদ্বীপ অঞ্চলে হিন্দু সমাজে তাঁর প্রবল প্রতিপত্তি ('চৈতন্যাবদান'/সুকুমার সেন/পৃ-২৮ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই নীলাম্বর চক্রবর্তীর উদ্যোগে চৈতন্যের একটা জন্মপত্রিকা তৈরী হওয়া বিচিত্র না। বরং সেটাই সম্ভব ছিল। সম্ভব বলছি এ'জন্য যে, আট আটখানা কন্যা সন্তান মারা যাওয়ার পর বিশ্বরূপ (চৈতন্যের ৮/১০ বছরের বড়ো দাদা) ও বিশ্বম্ভর (চৈতন্যের প্রথম নাম) জন্ম হয়। স্বাভাবিক কারণেই সন্তানের ভবিষ্যত জানবার জন্য জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন চৈতন্যের মা বাবা। নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনার কথা 'চৈতন্য ভাগবত' ও কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতেও রয়েছে। তবে দুটির বক্তব্য দু'রকম। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, চৈতন্যের জন্মের আগেই নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রসূতির লক্ষণ দেখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

'হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিলা গণিয়া।
এই মাসে শুভ হৈবে শুভক্ষণ পাঞা ॥'

[আদিলীলা/ত্রয়োদশপরিচ্ছেদ]

অন্যত্র বৃন্দাবন দাস তাঁর ভাগবতে লিখছেন অন্যকথা। সেখানে আগে চৈতন্যের জন্ম, তারপর নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনা।



'শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাম্বর।
প্রতিলগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥
মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইয়া বিস্ময়ে ॥
'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বোলে "সেই বা জানিব তাহা পাছে।"
মহাজ্যোতির্বিৎ বিপ্র সভার অগ্রেতে।
লগ্ন অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে—॥'

[আদি/২য় অধ্যায় ২৩১-২৪২]

তা জন্মের আগে বা পরে হোক, নাতি চৈতন্য সম্পর্কে নিলাম্বর চক্রবর্তী ভবিষ্যতবাণী কিছু করেছিলেন। কিন্তু চৈতন্য চরিতে যে রাশিচক্রের বর্ণনা আছে তা অবশ্যই জাতকের জন্মের পর তৈরি হয়েছিল। সম্ভবত সেটা নীলাম্বর চক্রবর্তী করে থাকবেন। এবং চৈতন্য জীবনীকারেরা—বিশেষত মুরারি গুপ্তর পক্ষে সেটা উদ্ধার করা বেশি সম্ভব ছিল। একই সম্ভাবনা ছিল স্বরূপ দামোদরের পক্ষেও। কেননা এরা দু'জনই চৈতন্যের সমসাময়িক। ও চৈতন্যের আদি জীবনী লেখক। পরবর্তী লেখক কবি কর্ণপূরও মুরারি গুপ্তের সঙ্গে একমত ছিলেন।

মুরারি ও কবি কর্ণপূর কৃত গ্রন্থে চৈতন্যের রাশিচক্রটি এরকমঃ

'প্রকাশমাত্রেণ সুদক্ষিণা গ্রহা
বভূবুরস্য প্রথমং সুতুঙ্গকাঃ
বভূব রাশিঃ স তু সিংহসংজ্ঞিতো
নক্ষত্রমুখ্যাপি চ পূর্বফাল্গুনী।'

['মহাকাব্য'/২/৪৪]

কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাস দু'জন চরিতকারই তাঁদের জীবনী গ্রন্থে চৈতন্যের জন্ম-সময় প্রসঙ্গে অভিন্ন ও ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী অবশ্য বৃন্দাবন দাসের বই থেকেই এ তথ্যটি সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তিনিও লিখেছিলেন চৈতন্যের জন্ম মুহূর্তে চন্দ্র রাহুগ্রস্থ—অর্থাৎ গ্রহণ ছিল। বৃন্দাবন লিখেছিলেন,

'ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কার
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥

হেনই সময়ে সর্ব জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥

['চৈঃভাগবত'১/২/২২/২৩]

এবং কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবন দাসের ভুল তথ্য হুবহু উদ্ধৃত করলেন তাঁর বইতে।

'ফাল্গুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈব যোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥'

['চৈতন্যচরিতামৃত'/আদি]

'পরে তিনি নিজের ও বৃন্দাবন দাসের ভ্রম-সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন যে প্রথমে সন্ধ্যা যোগে শ্রীচৈতন্যের জন্ম এবং পরে গ্রহণ হয়।' ['শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'/বিমানবিহারী মজুমদার/পৃঃ ২]

বলাবাহুল্য, মুরারি গুপ্ত ও কবি কর্ণপূরের রচনা পড়েই কবিরাজ গোস্বামী তাঁর ভুল সংশোধন করেছিলেন। এতে আরেকটা জিনিস প্রমাণিত হয়, তা হলো, কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের অন্তত আদিলীলা লেখার সময় কর্ণপূর, মুরারি গুপ্ত প্রমুখের বই পড়েন নি। সেজন্য একটা প্রচ্ছন্ন সংশয় তাঁর থেকে গেছলো।



তাহলে এ'পর্যন্ত আলোচনা ভিত্তিক দুটো জিনিস স্পষ্টতর হচ্ছে, তাহলো, (১) নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনার ওপর চৈতন্যের আদি জীবনীকাররা নির্ভরশীল হতে পেরেছিলেন। এবং (২) কবিরাজ গোস্বামী (যিনি মূলত স্বরূপ দামোদরের কড়চা ও রঘুনাথ দাসের মৌখিক উক্তি ও নোটের ওপর নির্ভর

করে চরিতামৃতের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন)।

'স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল
রঘুনাথ দাস মুখে যেসব শুনিল।
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া॥'

[চৈঃ চরিতামৃত ৩/৩]

সেই কবিরাজ গোস্বামীও অন্যতম চৈতন্যচরিত রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের চেয়েও আদি রচয়িতাদের (বিশেষত মুরারি গুপ্তের কড়চা) বেশি নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেছেন।

সুতরাং এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চৈতন্যের জন্ম মুহূর্তে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয় নি। চন্দ্রগ্রহণ লেগেছিল জন্মের বহু পরে। চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল সন্ধ্যায়। আর চাঁদ রাহুগ্রস্থ হয়েছিল রাত্রি আটটায়। প্রায় ৬০ বছর আগে, তদানীন্তন বিখ্যাত জ্যোতিষী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় চৈতন্যের আবির্ভাব সময়ের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকায়। শিরোনাম 'কবি শশাঙ্ক'। এই প্রবন্ধে তিনি জ্যোতিষিক গণনা করে দেখিয়েছেন যে, ১৪০৭ শকাব্দে (ইং ১৪৮৬ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসে নবদ্বীপে পূর্ণিমা ছিল প্রায় ৪০ দণ্ড। দিবামান ২৯ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছিল। ['প্রবাসী'/ পৌষ সংখ্যা/১৩৩৬ সাল] এবং চৈতন্যের জন্মের দিনটি ছিল শনিবার। ২৩-এ ফাল্গুন। জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী। এবং বর্তমান গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার হিসাবে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী। ['শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'/বিমানবিহারী মজুমদার/পৃঃ-৪]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের দাদামশায় নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনা ক্ষেত্রবিশেষে নিখুঁত ও নির্ভুল ছিল। নীলাম্বর চক্রবর্তী কৃত চৈতন্যের জন্ম কুণ্ডলীটি ছিল এরকম:

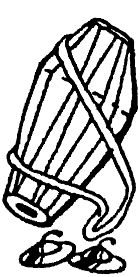
'প্রকাশমাত্রেণ সুদক্ষিণা গ্রহা
বভূবুরস্য প্রথমং সুতুরঙ্গকাঃ
বভূব রাশি স তু সিংহসংজ্ঞিতো
নক্ষত্রমুখ্যাপি চ পূর্বফাল্গুনী॥'

কবিরাজ গোস্বামী যার বঙ্গানুবাদ করেছেন

'সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥'

[চরিতামৃত/১।১৩।৯০]

'অর্থাৎ প্রভুর আবির্ভাব কালে সিংহ লগ্ন ও সিংহ রাশি। রবি, বুধ ও রাহু (মূল ত্রিকোণে) কুম্ভস্থ: বৃহস্পতি স্বগৃহে উচ্চ প্রায় মঙ্গল সহ ধনুতে; শনি উচ্চ প্রায় বৃশ্চিকস্থ; শুক্র উচ্চ প্রায় মেষস্থ; চন্দ্র ও কেতু মূল ত্রিকোণে সিংহ লগ্নস্থ ছিল। ঐ লগ্ন রবির ক্ষেত্র, চন্দ্রের হোরা, মঙ্গলের দ্রেক্কা; শুক্রের নবাংশ; শুক্রের দ্বাদশাংশ ও বুধের ত্রিংশাংশ—এইরূপ শুভ ষড়বর্গ যুক্ত। নবমপতি মঙ্গল, দশমপতি শুক্র ও সপ্তমপতি শনি উচ্চপ্রায়; বৃহস্পতি স্বস্থ হয়ে ধর্মস্থানগত শুক্রকে পূর্ণভাবে দৃষ্টি করেছেন। মঙ্গল ও বৃহস্পতি পঞ্চমে শুভ যোগ, লগ্নে ছিল বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি।' [ব্যাখ্যা—যুধিষ্ঠির আনা]



এরপর দেখা যাচ্ছে, মাতামহ নীলাম্বর নাতি চৈতন্যের কোষ্ঠী গণনা করে যা যা বলেছিলেন চৈতন্যের পরবর্তী জীবনে তা বহুলাংশে মিলে গেছলো। নীলাম্বর বলেছিলেন,

(১) জাতক 'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' অর্থাৎ গৌড় বাঙলার বিদ্যৎ সমাজে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি পাবে।

(২) জাতক ক্রমে মহাপুরুষ রূপে প্রচারিত হবে।

(৩) এই জাতক কর্তৃক ভবিষ্যতে 'সর্ব্ব ধর্ম্ম হইব স্থাপন' অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী বন্ধন স্থাপন হবে।

(৪) এই জাতক ভবিষ্যতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক রূপে চিহ্নিত হবে।

(৫) হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী 'বিষ্ণুদ্রোহী' অপরাপর মানুষও ভবিষ্যতে এই জাতকের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে।

এ পর্যন্ত বলে নীলাম্বর চক্রবর্তী থামলেন। সকলেই বিস্ময়ে তাকালেন জ্যোতিষী নীলাম্বরের দিকে। চৈতন্যের মা বাবাও। শিশুর জন্মলগ্নে উপস্থিত স্থানীয় প্রতিবেশীরা। কিন্তু নীলাম্বর তখনও নীরব। বাকরুদ্ধ। তখন তাঁর চোখে মুখে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের ইঙ্গিত। কিন্তু সে সর্বনাশের কথা বলতে গিয়েও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তী। শুধু বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

'হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস॥'

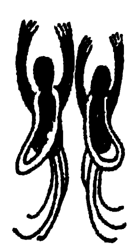
তাহলে দেখা যাচ্ছে, জ্যোতিষী নীলাম্বর তাঁর জ্যোতিষ গণনায় চৈতন্যের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার কথা আগেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু 'হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ' তাই মুখ ফুটে কথাটা মেয়ে জামাইয়ের কাছে বলতে পারেন নি। অতঃপর সততই প্রশ্ন জাগে, চৈতন্যের স্বল্পায়ুর ব্যাপারটাও কি নীলাম্বর আঁচ করতে পেরেছিলেন? জানিনা, আজ পাঁচশো বছর পরে জানার উপায়ও কিছু নেই। তবু প্রচ্ছন্ন একটা প্রত্যয় জাগে, সম্ভবত জ্যোতিষী নীলাম্বর নাতির স্বল্পায়ুর ঘটনাটা ধরে ফেলেছিলেন। চৈতন্যের কোষ্ঠী ও তাঁর জ্যোতিষ বিষয়ক কোন পুঁথি-পত্রে হয়তো লিখেও রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বরূপ-দামোদর, মুরারি গুপ্তরাও সেটি জানতেন। কিন্তু জেনেও চৈতন্য চরিত গ্রন্থে এ অপ্রিয় কথাটি লিখতে পারেন নি। কারণ, তাঁরা ভক্ত হিসেবে চৈতন্য চরিত লিখেছিলেন, ঐতিহাসিক হিসেবে নয়। যেমন প্রমাণস্বরূপ চৈতন্যের কথাটি ধরা যাক। কি ভাবে চৈতন্যের জীবনে মৃত্যুর যবনিকা নেমে এসেছিল প্রায় সকল চৈতন্য সমসাময়িক চৈতন্যচরিত রচয়িতারা তা ভালো ভাবেই জানতেন। যেমন—

'শ্রীমুরারি গুপ্ত বোঝে প্রভুর অন্তরীণ।
সকল জানায়ে সেই ভকত প্রবীণ॥'

অথবা—

'প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভেতর॥'

কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের মৃত্যু রহস্যের সমস্ত কিছু জেনেও মুখ খোলেন নি। আর স্বরূপ দামোদর—যিনি ছিলেন চৈতন্যের অন্ত্যলীলার প্রধানতম সাক্ষী। সেই স্বরূপ দামোদরের লেখা 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা', নামক পুঁথিটা তো আজ পর্যন্ত আবিষ্কারই হয়নি। কি ছিল সেই পুঁথিতে? সম্ভবত এমন কিছু ছিল যা পীড়াদায়ক, বৈষ্ণব ভক্তদের বিহ্বলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং শুধুমাত্র সেই কারণে, এহেন পুঁথিটি আকস্মিকভাবে 'গুম' হয়ে গেল একদিন।



পৃথিবীর নিয়মই এরকম। কোন ব্যতিক্রম নেই। যীশু, বৌদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ—সকলেই মানব সন্তান। কিন্তু ভক্তদের কাছে মহাপুরুষ, ঈশ্বরের প্রতিভূ। চৈতন্যও তাই ছিলেন। তাই চৈতন্য জীবনীকাররা চাননি নিছক মৃত্যু বা মৃত্যুজনিত কিছু লিখে ভগবান চৈতন্যকে মানুষের কাছাকাছি আনতে। এবং তা ঘটলে বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীরও শ্লাঘার কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

'চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ।
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভয়ে উৎকণ্ঠিত মন ॥'

[চৈঃচরিতামৃত/আদি]

চরিতামৃত লেখার সময় চৈতন্যপন্থী ভক্তদের হেডকোয়ার্টার ছিল বৃন্দাবন। কোন অজ্ঞাত কারণে বাংলা ও ওড়িশা থেকে ততোদিনে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সঙ্গীত দুটোই উৎখাত হয়ে গেছে, ('For fifty years after the Tirodhan of the great teacher, the Vaisnab community lay exervated by the great sheek. Their Kirthana music which hnd taken the whole country by surprise, stopped for a time after the melancholy went and was not heard for nearly half a century in the great provinces of Bengal and Orissa.' 'Chaitanya & his age' PP/259.) তাই বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের উৎকণ্ঠার ভয়ে, চৈতন্য চরিতকাররা সব কিছু জেনেও, চৈতন্যের মৃত্যুর ঘটনাটি চেপে গেছেন। তৎকালীন ধর্মান্ধ মধ্যযুগীয় সমাজে এটাই অনিবার্য ছিল।

সমানুপাতিক ওই একই কারণে, জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তীর কৃত চৈতন্যের কোষ্ঠী ও ভবিষ্যতবাণীর অনেক কথাও বেমালুম চেপে গেছেন চরিতকাররা। ধরেই নিলাম, চৈতন্যের গৃহত্যাগ—সন্ন্যাস, ছন্নছাড়া জীবন—অকালমৃত্যু সব কিছু জেনেও নীলাম্বর মুখ খোলেন নি। কিন্তু চৈতন্যের জন্মের পর জাতকের একটা জন্ম ছক (তা ঠিকুজি হোক, কোষ্ঠী হোক) নিশ্চয়ই তৈরি করেছিলেন। 'চৈতন্য ভাগবত'-এ অবশ্য কোষ্ঠীর কথাই আছে—

'হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান।
'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম হইল ইহান ॥'

['চৈতন্যভাগবত'/২।২৫৬]

কারণ ওইরকম কুলুজি ঠিকুজি একটা না থাকলে জ্যোতিষী নীলাম্বর মুখে মুখে এতোগুলো কথা বলতে পারতেন না। কোন জ্যোতিষীর পক্ষে সঙ্গত কারণেই সম্ভব ছিল না। তাহলে চৈতন্যের কোষ্ঠী একটা ছিল। এবং আদি চৈতন্য জীবনীকার স্বরূপ-দামোদর, মুরারি গুপ্তরা তা বিলক্ষণ জানতেন। সচক্ষে দেখেও থাকবেন। দেখাটাই স্বাভাবিক। চৈতন্যের গৃহত্যাগের সময় জ্যোতিষী নীলাম্বর জীবিত ছিলেন কিনা জানা যায় না। থাকলে তাঁর মুখেও শুনতে পারেন। কন্যা শচীর দুঃখের দিনে তাঁর মুখ দিয়ে অনেক কথাই বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল।

তবুও, সবকিছু জেনেও, স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্তরা চৈতন্যের জীবনের অনেক গূঢ় সংবাদ চেপে গেছেন। নিছক মরণশীল মানুষের মতো মৃত্যু দোষ ত্রুটির খবর লিখে ভগবান চৈতন্যের ভক্তবৃন্দের কাছে অপ্রিয় হতে চাননি। বরং মানুষ চৈতন্যকে ভগবান চৈতন্য প্রতিপন্ন করে ধর্মপ্রাণ ভক্তদের কাছে হাততালিই কুড়িয়েছেন।

এ যুগ হলে—চৈতন্যের নামে অনেক মিথ্যে কেচ্ছা বেরিয়ে পড়তো। কারণ এখন মানুষ মনের দিক থেকে সেটাই পছন্দ করে। বিনোদন হিসাবেও করে। তখনকার দিনে ধর্মের ব্যাপারটাই ছিল এইরকম। কথায় কথায় অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, মানুষকে ভগবান-অবতার বানানোর মতো অন্ধ সংস্কারগুলি মানুষ পছন্দ করতো। কি পড়ুয়ার টোল পাঠশালা, চণ্ডীমণ্ডপ, এমন কি সে যুগে নরহত্যা, শরীরী ব্যভিচার সব কিছুর মধ্যেই থাকতো ধর্মাধর্মের কচকচি।•

তাই চৈতন্য চরিতকাররাও যুগ-কালের মুখ চেয়ে আঁচড় টেনেছেন পুঁথির পাতায়। একটু বেশি করেই টেনেছেন। কারণ লেখক হওয়ার ক্ষেত্রে তখন এটাই নিয়তি ছিল। তারপর সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর কেটে গেছে। চাঁদে মানুষ পৌঁছেছে। তবু 'বাবা বলেছেন চণ্ডী' ট্রাডিশন থেকে আজও আমরা বেরুতে পারিনি। পাঁচশোবছর পরেও মানুষ চৈতন্যকে 'মানুষ' বলার এটাই বড়ো অন্তরায়।

আমরা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি, 'একজন মহান ঐতিহাসিক ইতিহাসের চেয়েও সত্য।' এবং এও বলেছি, একজন ঐতিহাসিক ইতিহাসসত্য যাবৎ উপাদান সমূহ ইতিহাসেই লুকিয়ে রাখেন। সময়ের নিয়মে, ধর্মাধর্মের দায়ে অথবা একান্ত রাজরোষের ভয়ে লুকোচুরির খেলা তাঁদের খেলতে হয়। তখন শাশ্বত সূর্যকে বাধ্যতাবাধ্য হয়ে তাঁরা ঢেকে ফেলেন কৃত্রিম মেঘ সৃষ্টি করে। সেই চিরশাশ্বত সূর্য হলো 'মানুষ চৈতন্য'। 'ভগবান চৈতন্য' সেই সূর্যকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৃত্রিম মেঘ-স্বরূপ আভরণ মাত্র।

একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ : নীলাম্বর চক্রবর্তী চৈতন্যের জন্ম-পত্রিকা গণনা করে চৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান (নারায়ণ) বলে রায় দিয়েছেন।

বিপ্র বোলে, "এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হইতে সর্ব্বধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥"

['চৈতন্যভাগবত'/১।২।২৪৬]

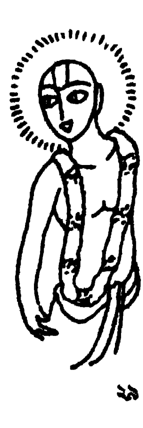
এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, চৈতন্য 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। এবং দ্বিতীয়ত, চৈতন্য কর্তৃক 'সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপন'। ধরেই নিলাম এ' বক্তব্য 'হানড্রেড পার্সেন্ট' নীলাম্বর চক্রবর্তীর। বেশ। কিন্তু এই যদি জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তীর বক্তব্য হয়, তাহলে, ভাগবতের 'সাক্ষাৎ নারায়ণ', 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এ স্বীকৃত হলেন না কেন? চরিতামৃতের লেখক কবিরাজ গোস্বামী তো 'চৈতন্যভাগবত'-এর রচয়িতা বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন,

'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥'

অন্যত্র লিখেছেন,

'বৃন্দাবনদাস-পাদপদ্ম করি ধ্যান
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥'

এখন প্রশ্ন হলো, যে বৃন্দাবন দাসকে 'চৈতন্য লীলার ব্যাস' অথবা যে



• স্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা'-য় চৈতন্য বিষয়ক অজানা তথ্য কিছু নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু চৈতন্য-ভক্ত স্বরূপের ক্ষেত্রে তা বিশদ লিখে রাখার কথা নয়। কারণ চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়ের তিনিই ছিলেন 'চার্চ ফাদার' (Church Father)। এবং বর্তমানে স্বরূপ দামোদরের নামে বাজারে যে 'কড়চা' গ্রন্থ চালু আছে সেটি আসল নয়, সম্পূর্ণ জাল।

বৃন্দাবন দাসের 'পাদপদ্ম করি ধ্যান' বলে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি দিয়েছেন কবিরাজ গোস্বামী, সেই 'চৈতন্য লীলার ব্যাস' বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য 'সাক্ষাত নারায়ণ'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ও যুগ-উপযোগী কথাটিকে কেন তিনি মেনে নিলেন না। দ্বিধান্বিত হলেন। জ্যোতিষী নীলাম্বর যদি চৈতন্যকে 'স্বয়ং নারায়ণ' বলে খ্যাপন করেন। তাহলে, সেটা তো ইতিহাসসত্য কথা। তা নীলাম্বর চক্রবর্তী শত কল্পনাপ্রসূত হয়ে বললেও। সেক্ষেত্রে চৈতন্য যৎ-সাধারণ মানুষ হলেও নীলাম্বর উদ্ধৃত চৈতন্য 'স্বয়ং নারায়ণ' লিখতে চৈতন্য জীবনীকারদের কোন বাধা থাকে না। থাকে না কোন দায় বা দায়িত্বভার। কারণ জীবনীকাররা জীবনের ইতিহাস লেখেন। কিন্তু সে জীবনের অতি ভৌতিক অথবা অতীব কাল্পনিক অধ্যায়টিও তাঁরা বর্জন বা পরিমার্জন করতে পারেন না। ঘটমান চরিত্রের কোন ঘটনার সমালোচনা (Review) করার অধিকারও তাঁদের নেই।

তবুও, ভগবত বর্ণিত জ্যোতিষী নীলাম্বরের সেই চাঞ্চল্যকর উদ্ধৃতি চৈতন্য 'স্বয়ং নারায়ণ' কথাটিকে কবিরাজ গোস্বামী কেন তাঁর গ্রন্থে আবশ্যিক বর্ণিতব্য বলে বিবেচিত করলেন না।

কারণ একাধিক, অন্তত তিনটি।

যথা—জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তী যদি সত্য সত্য চৈতন্যকে 'স্বয়ং নারায়ণ' বলতেন তাহলে 'চৈতন্য চরিতামৃত' ও 'চৈতন্য ভাগবত' দুটি গ্রন্থেই অভিন্ন কথার উল্লেখ থাকতো। কারণ দুটি গ্রন্থের দু'জন রচয়িতা হলেও ঘটমান বক্তব্য দু'রকম হবার কথা নয়। এবং বিশেষ বক্তব্যের ক্ষেত্রে তো তা কঠিন ভাবে প্রযোজ্য। এখানে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। কেন ?

এর উত্তর হয়—

(ক) চৈতন্য ভাগবত-এর ঐতিহাসিক ক্রমহীনতা।

(খ) চৈতন্য ভাগবতের অসম্পূর্ণতা।

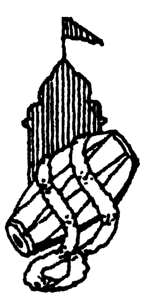
(গ) চৈতন্য ভাগবতের যত্রতত্র কিংবদন্তীর আশ্রয়।

সুতরাং সেজন্য কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাস কৃত ভাগবতের চৈতন্য 'স্বয়ং নারায়ণ' নামক রোমহর্ষক কথাটি জেনেও তাঁর গ্রন্থে ঠাঁই দিতে পারেন নি। পরন্তু তিনি মুরারি গুপ্তর গ্রন্থ অনুসরণ করেছেন।

'আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক রচিত।
সূত্র রূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রথিত ॥'

['চৈতন্যচরিতামৃত'/১।১৩]

সুতরাং নীলাম্বর চক্রবর্তী কথিত চৈতন্য 'স্বয়ং নারায়ণ' কথাটি যদি সর্বান্ত সত্যি হতো, তাহলে, সে কথা শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবতে থাকতো না, মুরারির 'কড়চা'তে-ও থাকতো। এবং সেক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে-ও বর্ণিত হতো অবশ্যম্ভাবীরূপে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। যদিও চরিতামৃতেও চৈতন্যকে একাধিকবার ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা ভক্তের তুলিতে আঁকা নিছক ভগবানের ছবি। সম্ভবত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের মারপ্যাঁচ এখানেই।



[তিন]

চৈতন্য কেন ভগবান /২

বাঙলাদেশের এক চরম সঙ্কট মুহূর্তে চৈতন্যের জন্ম। সঙ্কট ছিল রাজনীতিতে, সঙ্কট ছিল ধর্মীয় ব্যবস্থায়। এবং স্বভাবতই তার ক্ষতিকারক প্রতিবিম্ব পড়েছিল দৈনন্দিন সমাজে। এরকম একটা অবস্থা, যখন নীতিধর্মের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে, সর্বপরি দেশের শাসক কাজী ও গোড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ ঘোষণা জরুরী হয়ে পড়েছিল। ঠিক এমন এক দুর্যোগ মুহূর্তে যুগাবতার চৈতন্যের জন্ম।

সেটা ১৪০৭ শকের কথা। ইংরাজী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সময় বাঙলার সুলতান জলাল্ উদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যের জন্ম।

চৈতন্যের যখন জন্ম হয় তখন বাঙলাদেশে মূলত দুটি সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। হিন্দু ও মুসলমান। বলাবাহুল্য, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় মত ও পথ ছিল আলাদা। তখন হিন্দুদের মধ্যে ধর্মভেদ ও বর্ণভেদ দুটোরই চলন ছিল। অন্যত্র মুসলমানদের মধ্যে বর্ণভেদ ছিল, কিন্তু ধর্মভেদ তেমন উল্লেখ্যযোগ্য কিছু ছিল না।

তাছাড়া তখন বাঙলাদেশে আরেকটি সম্প্রদায় ক্ষীণ ভাবে বিদ্যমান ছিল, সেটা হলো বৌদ্ধ বা বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়। বাঙলাদেশে পাল রাজত্ব (৭৫০—১০৯৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত বৌদ্ধদের বেশ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু সেন রাজত্বে — বিশেষত বল্লাল সেনের সময় (১১৫৮—১১৭৯ খ্রীঃ) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৌদ্ধদের দাপট কমে যায়। এসময় অনেকে বৌদ্ধ সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হয়। ফলে তারা মানসিক দিক থেকে মুসলমানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে (বাংলা দেশের ইতিহাস /মধ্যযুগ/পৃঃ ২৩২ দ্রঃ)। পরবর্তী কালে এই পতিত বৌদ্ধরাই 'পাষণ্ডী' নামে পরিচিতি পায় (শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভূমিকা /রাধাগোবিন্দ নাথ /পৃ-৫৪)। বিভিন্ন চৈতন্য চরিতে এই সব পাষণ্ডীদের নানান অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত আছে। চৈতন্য যতদিন বাঙলাদেশে ছিলেন ততোদিন এই

পাষণ্ডীদের সাথে প্রায়শ তিনি প্রত্যক্ষ সংঘাতে লিপ্ত ছিলেন। * বশেষত প্রাক সন্ন্যাস ও সন্ন্যাস কালে।

এছাড়াও চৈতন্যের সময় হিন্দুদের মধ্যে তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অনেকগুলি ধর্মীয় উপ সম্প্রদায়ও ছিল, যেমন সৌর, গাণপত্য, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, কাপালিক, কৌল প্রভৃতি। কিন্তু জৈন সম্প্রদায়ের তেমন কোন অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। তবে সেসময় হিন্দুদের মধ্যে সব চেয়ে তেজী ছিল গোড়া পণ্ডিত বা ভট্টাচার্যরা।

এই সময় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কথায় কথায় স্মৃতিশাস্ত্র আওড়াতেন। এবং জীমূতবাহন, শূলপানি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতদের ছকে বাঁধা কানুনের বাইরে তাঁরা এক পা-ও হাঁটতেন না। বলা বাহুল্য, স্মৃতিশাস্ত্রকাররা তাঁদের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে মনুসংহিতা'-কেই বেছে নিয়েছিলেন। যে মনুসংহিতায় মেয়েদের কোন স্বাতন্ত্রতার অধিকার নেই। স্বাধীনতার অধিকার ছিল না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সম্ভবপর মেয়েদের অধিকার খর্ব করার কথা মনু ও অন্যান্য সংহিতায় বলা হয়েছে। এতে সমাজের প্রাক-বিবাহ স্বেচ্ছাচার (premarital license) বিবাহোত্তর ব্যভিচারের (extramarital sex relation) কথা উল্লেখ পায়। (মনুসংহিতা-৯/৫১-৫৩/অত্রি সংহিতা-১৮৯, ১৯৪, ১৯১-৯২/বিষ্ণু সংহিতা-১৫/১৩-১৪।) মেয়েদের ব্যাপারে মনুর ধারণা ছিল বিস্ময়কর। যে মেয়েরা এ যুগে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন, নির্ভয়ে দুরন্ত বাধা অতিক্রম করে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছেন, সেই মেয়েদের প্রসঙ্গে বহু—সম্মানিত মনু একদা বলেছিলেন—

'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' অর্থাৎ স্ত্রী জাতি স্বাধীনতার যোগ্য নয়। সম্পূর্ণ বক্তব্যটি এরকম, 'পিতা রক্ষতি কৌমারে/, ভর্তা রক্ষতি

* এই 'পাষণ্ডী' শব্দটি সম্রাট অশোকের সময়কার শিলালিপিতে পাওয়া যায়। যথা–'দেবানম্ পিয়ো পিয়োদসি রাজা সর্ব্বত ইচ্ছতি সবে পাসংডা বসেয়ু সবে তে সচ ভাবশুধিং চ ইতি।' এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য–"পাষণ্ডী" ইহা বৌদ্ধগণ অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন। হিন্দুদের "ম্লেচ্ছ" মুসলমানের "কাফের" খৃষ্টানের "infidle" যে অর্থে ব্যবহৃত হয় বৌদ্ধগণও "পাষণ্ডী" শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন। বৈষ্ণবগণ এই শব্দ বৌদ্ধগণের নিকট হইতে ধার করিয়া বিধর্মীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য/পৃঃ-৪১৯)।

যৌবনে/রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা/ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।'

তো এ'হেন মনুসংহিতাকে দোহাই দিয়ে তদানীন্তন স্মার্ত পণ্ডিতরা তাঁদের স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। অবশ্য প্রামানিক হিসেবে শুধু মনুসংহিতা নয়। যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রী, পরাশর, বশিষ্ঠ কৃত সংহিতা থেকেও তাঁরা স্বল্প-বিস্তর গ্রহণ বর্জন করেছেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে স্মার্ত পণ্ডিতগণ সংহিতা অনুসরণ করেছেন এমন নয়। মৌলিক চিন্তাধারাও এর মধ্যে ছিল। কিন্তু জাতপাতের বিচার ও ধর্মীয় বেড়াজালের নিগড় বন্ধনে এর যা কিছু ভালো মন্দের মধ্যে ঢেকে গেছলো। তবে এ কথাও ঠিক, মধ্যযুগে চৈতন্যের সময় স্মৃতিশাস্ত্রের চেয়েও স্মৃতিশাস্ত্র বিকৃতির ছাপ অধিকতর সমাজ জীবনে পড়েছিল। এবং এর জন্য অবশ্যই দায়ী তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজ। যারা ৮০ বছর বয়সে ১৩ বছর বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু সেই বালিকা যৌবনে ব্যভিচার করলে, বা মৃত স্বামীর সহমৃতা না হলে তাঁদের ধর্ম নাশের কারণ হতো।

শিক্ষিত চৈতন্য ব্রাহ্মণ্য সমাজের এধরণের নীতি বিরুদ্ধ গোড়ামি বরদাস্ত করতে পারেন নি। তার অর্থ এই নয় যে চৈতন্য-এর কোন গোড়ামি ছিল না। তাঁরও গোড়ামি ছিল। তিনিও বলেছিলেন—স্ত্রী দর্শন বিষ ভক্ষণের তূল্য (চৈতন্য চরিত্রামৃত/২-১১/২-১০)। কিন্তু তাঁর এসব কথা ও কাজের মধ্যে কোন সঙ্গতি ছিল না। তিনি (চৈতন্য) স্ত্রী সঙ্গের ভয়ে যৌবনবতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সেই সন্ন্যাসী চৈতন্যই আবার অন্যতম পার্ষদ সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাই সূর্যদাস সরখেলের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করবার জন্য আদেশ করছেন [শ্রীচৈতন্য ভাগবত/অন্তখণ্ড/রাধাগোবিন্দ নাথ/পৃ-২৫৬-৭]। বস্তুত মনের দিক থেকে চৈতন্য কোন দিনই সন্ন্যাসী ছিলেন না। মা ও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গৃহী হতেই চেয়েছিলেন। প্রিয় পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকালমৃত্যু না ঘটলে চৈতন্যের এই গৃহত্যাগী, ভবঘুরে বাউণ্ডুলে জীবন হয়তো অন্যরকম হতো।

গার্হস্থ্য জীবনে সকলের যেমনটি হয় তা হয় নি। লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্মৃতি বিক্ষত রক্তাক্ত করেছিল চৈতন্যের মানসিকতাকে। মনোরোগে আক্রান্ত করেছিল। সে অভাব বিষ্ণুপ্রিয়ায় পূর্ণ হয়নি। তবু চেষ্টা করেছিলেন চৈতন্য, সন্ন্যাস জীবন ছেড়ে পুনরায় গৃহে ফিরে আসতে। মা শচীদেবীর কাছে সে কথা একবার প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সম্ভব হয় নি। কারণ, অদ্বৈত নিত্যানন্দরা ততোদিকে

চৈতন্যকে ভগবান বানিয়ে ফেলেছেন। সেখানে মানুষ চৈতন্য কদাচ গৃহী হতে চাইলেও ভগবান চৈতন্যের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

অবশ্য চৈতন্য ভগবান বা অবতার তৈরি করার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র অদ্বৈত নিত্যানন্দরা দায়ী তা নয়। মানুষ চৈতন্যকে ভগবান চৈতন্যে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে তদানীন্তন সামাজিক আবহাওয়াও বেশ অনুকূল ছিল। চৈতন্যের সময় টিকিঅলা ব্রাহ্মণ্য সমাজের দাপট ছিল অনেকটা মহাভারতের দুর্বাশা মুনির মতো। মানুষের মধ্যে উঁচু নিচু, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের দুরন্ত ব্যবধানের হোতা ছিলেন এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই। সমাজের নীচু স্তরের মানুষদের তাঁরা ক্রমবর্ধমান দাস জীবন যাপনে বাধ্য করেছিলেন। অপর দিকে তাঁদের সংকীর্ণতা ও কঠোর বিধানে নারী জাতির অবস্থা হয়েছিল অনেকটা 'মার্শাল ল' জারি হওয়া দেশের নাগরিকদের মতো।

মধ্যযুগের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতের বিষয়ে অনেক লৌকিক গল্প চালু আছে। এসব গল্পে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা-সামাজিকতা বা মহানুভবতা কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং তাঁদের বর্বরতা, অমানুষতাই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এমন অনেক গল্পই ইতিহাস সত্য।

'সুলতান হোসেন শাহ্ যখন সাধারণ মানুষ সৈয়দ হোসেন খাঁ ছিলেন তখন সুবুদ্ধি রায় সে সময়ে সুলতানের অধীনে গৌড়নগরের শাসনকর্তা ছিলেন (এখনকার দিনের মেয়রের মতো)। গৌড় শহরের কাছে একটা প্রকাণ্ড দীঘি খোঁড়বার প্রয়োজন হওয়াতে সে কাজের ভার সুবুদ্ধি রায় দিয়েছিলেন সৈয়দ হোসেন খাঁর ওপর। হোসেন খাঁ কাজের বিশেষ গাফিলতি প্রদর্শন করায় সুবুদ্ধি রায় তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন চাবুক মারার আদেশ দিয়ে। হোসেন খাঁ তাঁর মনিব সুবুদ্ধি রায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, তাই সিংহাসনে আরোহণ করেও তিনি সুবুদ্ধি রায়কে মন্ত্রীত্বে বহাল করেছিলেন। একদিন সুলতানের বেগম স্বামীর খালি গা দেখে পিঠে একটা দাগ লক্ষ্য করলেন। বার বার জিজ্ঞাসা করায় সুলতান অত্যন্ত অনিচ্ছুক ভাবে বলেছিলেন· ওটা তার পিঠে চাবুকের দাগ। তারপর জেদ করে বেগম চাবুক মারার কারণও জেনে নেন এবং সুবুদ্ধি রায়কে শাস্তি দেবার জন্য নির্বন্ধ করতে থাকেন। পত্নীর অনুরোধে সুলতান সুবুদ্ধি রায়কে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবে সে শাস্তি নামমাত্র। তাকে সুলতানের জলপাত্র থেকে জল খাওয়ানো হয়েছিল। এই সামান্য শাস্তিতে মর্মাহত সুবুদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রার্থনা করলে তাঁদের অনেকেই বললেন জলন্ত ঘি খেয়ে

আত্মহত্যা করতে।'

তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুবুদ্ধি রায় এলেন চৈতন্যের কাছে বিধান চাইতে। চৈতন্য হেসে বললেন, এতে মরবার কি আছে। গৌড় দেশ ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যাও। কৃষ্ণনাম করো। জীবনের সব গ্লানি কেটে যাবে। চৈতন্যের বিধানই মেনে নিলেন সুবুদ্ধি রায়।

এই ঘটনার পর হৈচৈ পড়ে গেল সমগ্র গৌড় দেশে। সবারই নজর পড়লো চৈতন্যের ওপর, কে এই চৈতন্য। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তেরিয়া হয়ে উঠলেন। কিন্তু চৈতন্য দমলেন না। যবন হরিদাসের মতো মুসলমানদের সঙ্গে ওঠা বসা করতে লাগলেন। কীর্তনের দল গড়ে গৃহস্থের মেয়েদের ডেকে ডেকে পথে নামালেন। এসব দেখে শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন নবদ্বীপ শান্তিপুরের তামাম পণ্ডিতেরা। শুরু হলো চৈতন্য বিরোধী ষড়যন্ত্র। তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে শাসক কাজীর কাছে নালিশ জানালেন। এদিকে চৈতন্যের নতুন দল পাকানো দেখে কাজী (এঁর আসল নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন কাজী) ভয়ও পেয়ে গেছলেন বেশ। তাছাড়া এসময় একটা গুজব গৌড়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। গুজবটা ছিল, অচিরেই মুসলমানদের খেদিয়ে হিন্দুরাজা গৌড়ের সিংহাসনে বসবে। কিন্তু কে এই অবিসম্বাদিত রাজা ? নদীয়া শান্তিপুরের পথে ঘাটে তখন চৈতন্যের নাম ডাক। সুতরাং কাজীর সব রাগ গিয়ে পড়লো ওই হিন্দু ছোকরার ওপর। এর ওপর আগুনে ঘি ঢেলে দিলেন চৈতন্য বিরোধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অতঃপর —

'যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে।।
কাজী বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ।।' *

* কাজী বা চাঁদকাজী। এর আসল নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজী। নবাব হুসেন শাহের ১৮ জন পুত্র কন্যা ছিল। চাঁদকাজী সম্পর্কে নবাব শাহের দৌহিত্র। চৈতন্য যখন দলবল নিয়ে কাজীর বাড়ি আক্রমণ করেন তখন নবাব হুসেন শাহ বাঙলায় ছিলেন না। তিনি ওড়িশায় যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। নবাব সে সময় বাঙলাদেশে থাকলে চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দ প্রভৃতির জীবন কাহিনী সম্ভবত অন্যরকম হত। এই চাঁদকাজীর স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে নদীয়ার মায়াপুরের নিকট বামনপুকুর নামক স্থানে সমাধি আজও বিদ্যমান আছে।

কীতনীয়া ভক্তদের বেদম করে পিটিয়ে, মৃদঙ্গ ভেঙেও কিন্তু খান্ত হলেন না কাজী। এরপর বৈষ্ণব ভক্তদের তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন,

'কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।।
আর যদি কীর্তন করিতে লাগি পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।।"

['চৈতন্য চরিতামৃত'/আদি/সপ্তদশ পরিচ্ছেদ]

অতঃপর চৈতন্যের শিষ্য-প্রশিষ্যরা কাঁদতে কাঁদতে চৈতন্য সমীপে হাজির হলেন, ইনিয়ে বিনিয়ে যবন কাজীর অত্যাচারের কথা বললেন। 'ভাইটাল ক্লু'হিসেবে ভাঙ্গ-মৃদঙ্গ দেখালেন, মারের দাগ দেখালেন। সব দেখে শুনে মুহূর্তে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন যুবক চৈতন্য। তখনই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে, দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যবন কাজীকে শায়েস্তা করার জন্য।

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলো। চৈতন্য বিরাট এক মিছিল নিয়ে খোল-কত্তাল বাজাতে বাজাতে দ্রুত এগিয়ে চললেন কাজীর বাড়ির দিকে। কাজীর ইনফরমাররা খবরটা আগে ভাগেই পৌছে দিলো। ভয় পেয়ে কাজী লুকিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। বাড়ির দরজা জানলা, ফটক সব বন্ধ করে দিলো।

একসময় মিছিল এসে পড়লো কাজীর বাড়ির সামনে । সম্ভবত এই মিছিলে নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের দুই কুখ্যাত গুণ্ডা জগাই মাধাইও ছিল। থাকাটাই সম্ভব। কেননা ইতিপূর্বে এই দুই গুণ্ডাকে চৈতন্য হাত করে নিয়েছিলেন।

কাজীর ঘর-দোর বন্ধ দেখে চৈতন্য আরও ক্ষেপে গে'লেন।

'ক্রোধে বোলে প্রভু "আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা।।'

['চৈতন্য ভাগবত'/২৩/২/৩৮৯]

তথাপি কাজীর ঘর খোলার নাম নেই। আরও ক্ষেপে গেলেন চৈতন্য। এবার হুকুম করলেন ভক্তদের কাজীর ঘরের বন্ধ দরজা ভেঙে ফেলার জন্য। ভক্তরাও এমনটি চাইছিলনে। দল নেতার হুকুমমাত্র তারা রে-রে করে ছুটে গেলেন বন্ধ দরজার দিকে। দমাদম লাথি পড়তে লাগলো দরজায়। ক্রুদ্ধ জনতার উপর্যুপরি পদাঘাতে দুদাঁড় ভেঙে পড়লো কাঠের দরজা। এদিকে মিছিলের আরেক দল ততোক্ষণে কাজীর সুন্দর করে সাজানো ফল ফুলের

বাগান তছনছ করতে শুরু করেছে। আম পনস (কাঁঠাল) প্রভৃতি ফলের গাছ মটামট ভেঙে ফেলছে। ভেঙে ফেলছে আর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে—'হরি বোল'। আরেক দল হামলা চালাচ্ছে ফুলের বাগানে। ফুল ভর্তি গাছ গুলো তারা শেকড় শুদ্ধো উপড়ে ফেলছে। সেই সঙ্গে ডাল-পালা, ফুল দু'হাতে ছিঁড়ছে। ফুলের বাগান, ফলের বাগান, ঘরের দরজা জানলা, বৈঠকখানা যখন তছনছ তখন চৈতন্য হুকুম দিলেন কাজীর ভেতরের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে।

'প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ 'বাড়িরভিতর।।
পুড়িয়ে মরুক সর্ব্ব-গণের সহিতে।
সর্ব্ব-বাড়ি বেড়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে।।'

[চৈঃ ভাগবত'/২৩/২/৩৯৯-৪০০]

অবস্থা বেগতিক দেখে অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীন ও বয়োরাজ্যেষ্ঠঃ এগিয়ে এলেন চৈতন্যের কাছে। তাঁরা চৈতন্যকে নিরস্ত হতে উপদেশ দিলেন। বললেন, দ্যাখো ঘরে আগুন-টাগুন দেওয়টা ঠিক হবে না। কাজীকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর নয় এবার বাড়ি চলো।

এসব হামলাবাজীতে চৈতন্যও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বেশ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীধর নামে এক গরীব ভক্তের বাড়িতে একটা লোহার ভাঙা কড়াই ছিল। তাতে বেশ খানিকটা বৃষ্টির জল জমেছিল। তৃষ্ণার্ত চৈতন্য ঢকঢক করে সেটাই খেয়ে ফেললেন।

দেখা যাচ্ছে, এই শাসক কাজীর ওপর চড়াও হওয়ার পর ধর্মীয় নেতা হবার ক্ষেত্রে চৈতন্যের পথটি বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ওদিকে চৈতন্য বিরোধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও বেশ ঘাবড়ে গেলেন। দমে গেল চৈতন্যের ঘোর বিরোধী বৌদ্ধ পাষণ্ডীরাও (চৈঃ ভাগবত ২৩/২/৪২২)। কাজীর বিরুদ্ধে, সমাজের কর্ণধার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে, বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে— এই ত্রৈয়ী কালাপাহাড় শক্তির বিরুদ্ধে চৈতন্যের জেহাদ ও অভূর্তপূর্ব জয় তৎকালীন সমাজ জীবনে গভীর ভাবে আলোড়ন তুলেছিল। স্বাভাবিক কারণেই চৈতন্য সম্পর্কে একটা চাপা কৌতূহলের উন্মেষ ঘটলো সাধারণ মানুষের মনে। কে এই সুঠাম অপূর্বকান্তি যুবক ? ঠিক এমন এক মাহেন্দ্রক্ষণে চৈতন্য ভক্তরা মানুষ চৈতন্যকে প্রায় বলপূর্বক বসিয়ে দিলেন দেবতার সিংহাসনে।

একদিন প্রবীন অদ্বৈত পণ্ডিত চৈতন্য ভক্তদের ডেকে বললেন,

'শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায়।।
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি
সর্ব্ব অবতার মম চৈতন্য গোসাঞি।।'

[ভাগবত/৩/১০/৫০৪- ০৭]

হৈচৈ শুনে ছুটে এলেন চৈতন্য। কি ব্যাপার, এতো হৈ-হট্টগোল কিসের ? তখন ভক্তরা বলে উঠলো, "প্রভু, তুমিই সাক্ষাৎ ভগবান। হাত দিয়ে সূর্য ঢাকতে যেও না প্রভু। আমরা সব জানতে পেরেছি। এই বলে ভক্তরা—'সাক্ষাতে গান সবে চৈতন্য বিজয়।'

ভক্তদের কান্ড দেখে চৈতন্য বেশ লজ্জায় পড়ে গেলেন। এ আবার কি রকম কথা, মানুষ কখনো ভগবান হয়। না না, আমার কীর্তন না করে তোমরা কৃষ্ণের নাম-কীর্তন কর, তিনিই সব, তিনিই 'মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা'—তোমরা সেই ভগবান কৃষের নাম গান করো।

কিন্তু ভক্তরা প্রভুর কোন কথা শুনতে রাজী নয়। তারা খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে তারস্বরে প্রভুর নাম গান করতে লাগলেন,

অয়ে আয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত উদার।
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার।।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে তা বুঝাহ এখন।।

[চৈঃ ভাগবত]

কিন্তু খোল করতাল মৃদঙ্গ খঞ্জনি আর উদ্দাম নৃত্যের মাঝে প্রভুর কথা কারু কানে গেলো না। ক্রমে ভক্তদের প্রচার ও জনসাধারণের বিশ্বাস — এই দুই টানাপোড়েনে এমনই এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, যাতে করে মানুষ চৈতন্যর 'ভগবান চৈতন্য' না হয়ে আর উপায় রইলো না। এমন কি জননী শচীদেবীও একদিন 'দুষ্টু নিমাঞি'-কে ভগবানের আসনে অভিসিক্ত করে বসলেন।

'তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে।।
পঞ্চদীপ জ্বালি তেহ আরত্রি করিল
নির্ম্মঞ্ছন করি শিরে ধানদূর্ব্বা দিল।।'

[পাদকল্পতরু'/১৫৩৮ সংখ্যা পদ]

ঠিক এসময় অদ্বৈত আচার্য একটা চমকপ্রদ কর্ম করে বসলেন। তিনি ঝটিতি তুলসী পত্রে খানিকটা চন্দন মাখিয়ে বসে পড়লেন

কনিষ্ঠ নিমাঞির পদতলে। তারপর—

'সচন্দন তুলসীপত্র গোরার চরণে দিয়া
আচার্য কৃষ্ণায় নমঃ বলে।।'

['গৌরপদ তরঙ্গিনী'/২য় সং/পৃ-১৫০]

এরপর চৈতন্যর আর ভগবান না হয়ে কোন গত্যন্তর রইলো না। (এখনো, এই আলট্রামডার্ন বিংশ শতাব্দীর অন্তিম পাদেও কোন গাছের নীচে নুড়ি বসিয়ে দিলে মানুষ মাথা নোয়ায়। আর আজ থেকে ৫০০ বছর আগে, এক চরম ধর্মান্ধতার যুগে, কোন মানুষের পায়ে চন্দন তুলসী দিয়ে পূজো করলে—সে চৈতন্য না হয়ে জগাই মাধাই-এর মতো মদ্যপ হলেও তার ভগবান প্রাপ্তি ঘটতো)।

কিন্তু ভুল করলেন মা শচীদেবী। একান্ত আপন স্নেহের পুত্তলি নিমাঞিকে তিনি সার্বজনীন অবতারের আসনে বসিয়ে সন্তানের প্রতি মায়ের ন্যূনতম অধিকারটুকু অজান্তেই হারিয়ে ফেললেন। এরপর ভগবান চৈতন্যের গৃহত্যাগ কালে মানুষ চৈতন্যকে মাতার বাধা দেবার তার কোন পথ রহিল না। ক্রমে এইভাবে আপন গৃহে গৃহীর পরিবেশটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল চৈতন্যের জীবনে। ঘরে বাইরে সর্বত্র হয়ে উঠলেন ঈশ্বরের অবতার। মানুষের জীবনে এ এক নির্মম ট্রাজেডি। অন্তত স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াও যদি মানুষ চৈতন্যকে প্রেম দিয়ে, অনুরাগ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন তাহলে ভগবান চৈতন্যের সাধ্য ছিল না অতো সহজে পথে নামার। তা হয় নি। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্মৃতি বিক্ষত বুকের জ্বালা নিয়ে যখনই বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে গেছেন তখন স্ত্রীর কাছে প্রেমের পরিবর্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি পেয়েছেন চৈতন্য। এ ফুলে হয়তো ভগবান তুষ্ট হয় সত্য, কিন্তু মানুষ তুষ্ট হতে পারে না। মানুষ চৈতন্যের ভগবান চৈতন্যে রূপান্তরিত হবার ক্ষেত্রে এটাই সম্ভবত প্রশস্ত পরিশেষ।

[চার]

চৈতন্য কেন ভগবান /৩

বাঙালী—বাঙলা তথা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর কাছে অবতারের স্বীকৃতি পেয়েছেন চৈতন্য। জনমনে কোথাও তিনি ঈশ্বর সাদৃশ্য, আবার কোথাও স্বয়ং ঈশ্বর। জন্মগ্রহণের পাঁচ শতাধিক বছর

পরেও লোকায়ত জনজীবনে তিনি একই আসনে আসীন। তাঁর জীবন-চরিতে যা কিছু অলৌকিক, আধি-দৈবিক সবই আজ লৌকিক বলে স্বীকৃত। কিন্তু কেন ? কোন ক্ষমতা বলে চৈতন্য জনমানসে এমন দীর্ঘাতিদীর্ঘ প্রভাব রেখেছেন ?

এর উত্তর : একটি বাড়ির বুনিয়াদ (ভিত) যদি পাকাপোক্ত হয়, শক্ত হয় তাহলে তার দীর্ঘ স্থায়ীত্বে কোন অন্তরায় থাকে না। তখন প্রাকৃতিক ঝড় ঝাপটাও সে সহ্য করবার ক্ষমতা ধরে। মানুষের জীবনেও এই নিয়ম। মানুষ চৈতন্য অকস্মাৎ একদিনে ঈশ্বর চৈতন্যে রূপান্তরিত হন নি। তাঁর প্রাক-জন্ম মুহূর্ত থেকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির ভিত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল।

প্রখ্যাত চৈতন্য চরিত গবেষক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এ প্রসঙ্গে তাঁর 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, ঐতিহাসিকদের নিকট বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্যের অবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নহে। শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব প্রেমোম্মাদ আস্বাদনের জন্য বাঙ্গলা দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল।' ডঃ মজুমদার আরও লিখেছেন, 'দামোদরপুরের চতুর্থ লিপি হইতে জানা যায় যে ৪৪৭-৪৮ খ্রীঃ অব্দে গোবিন্দ স্বামীর মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমি দান করা হইয়াছিল (Ep. India. , Vol. XV, P. 133 ; Vol. XVII, PP. 193—345)। পাহাড়পুরের খননকালে যে যুগল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে (R.D. Banerjee, The Age of the Imperial Guptas, P-121)।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ও সেই একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে গৌড়দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মে নবশক্তি উন্মেষের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলী সমূহ ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে তাহার আভাস পাওয়া যায়।' (বাঙ্গালার ইতিহাস /২য় খণ্ড/পৃ-২৪৬)। তিনি আরও বলেছেন, 'Throughout the length of the dominions of the palasd, i.e, throughout the modern provinces of Bengal and Bihar and part of the U.P. , images of the various forms of Vishnu have been found in very large numbers. In fact, they out number any other class of images that have been found.' (Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture/P. 101)।

চৈতন্যের জন্ম চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১৪৮৬)। কিন্তু এর

শতাধিক বছর আগেই (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) বৈষ্ণব ধর্মের একটা আবহাওয়া ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছিল গৌড় বাংলার মাটিতে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ও প্রসার মূলত রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক। আর এই রাধাকৃষ্ণের বড়ো রকমের প্রচার শুরু হয়েছিল গৌড়পতি লক্ষণ সেনের (১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) সময়। যদিও লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) ও তস্য পিতা বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ) ছিলেন শৈব উপাসক। কিন্তু লক্ষণ সেন ছিলেন ঘোরতর বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবিয়া কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর প্রভৃতিরা ছিলেন লক্ষণ সেনের সভাকবি। জয়দেবের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 'গীত গোবিন্দ' রচনাকালে ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর ছাড়াও গোবর্দ্ধনাচার্য ও স্বয়ং রাজা লক্ষণ সেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে অনেক ভক্তিমূলক শ্লোক রচনা করেছিলেন ('সদুক্তিকর্ণামৃত' ১।৫৪।৫, ১।৫৫।২, ১।৬৫।২ দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্যের জন্মের আগে বাংলাদেশে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্ষীণ ভাবে বিদ্যমান ছিল তাকে বলা হতো 'ভাগবত সম্প্রদায়'। ক্ষীণ ভাবে বলছি এজন্য যে, এসময় তান্ত্রিক ও পরকীয়াবাদীদের দাপটে নিষ্কাম ও অধ্যাত্মিক ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছিল। সহজিয়া পরকীয়াবাদ মূলত দেহকেন্দ্রিক কামনা-বাসনাজনিত একপ্রকার ধর্মাচার। পরকীয়া অর্থাৎ পরনারী বা পরস্ত্রীর সাথে প্রবৃত্তিগত সম্পর্ক (license) বোঝায়। বিস্ময়কর হলেও খুবই সত্য, এই পরকীয়া প্রেম স্বকীয়া প্রেম অর্থাৎ নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে প্রেম (সহবাস) অপেক্ষা অধ্যাত্মিকতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলে তদানীন্তন সহজিয়া ধর্মীরা মনে করতেন। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই ছিল এই সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য আর সে প্রেম ছিল নর নারীর দেহজ প্রেম (Sex Relation)। কিন্তু সেই নারী অবশ্যই আপন স্ত্রী নয়। তাকে পর নারী, পরস্ত্রী হতে হবে। এ ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি হলো, নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীর প্রতি আসক্তির মাত্রা বেশি প্রবল সুতরাং এটাই ধর্মাচারের প্রথম সোপান। এবং এই স্থূল দেহজাত প্রেমই মানুষকে ভগবৎ প্রেমে অনুসন্ধিৎসু করে। কেননা ষষ্ঠ রিপুর মধ্যে কামই মানুষের প্রবৃত্তিকে বেশি চঞ্চল করে। কিন্তু সেটা চরিতার্থ হলে মন শান্তিভাব অবলম্বন করে। এবং তাতে ঈশ্বরকে পাওয়া সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

সহজিয়ারা মূলত তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতে পরকীয়াবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তান্ত্রিক সাধনা প্রণালী একটি বহু প্রাচীন প্রথা।

এবং এর ধর্মসাধনার ধারাও স্বতন্ত্র। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 'বজ্রযান' 'কালচক্রযান' প্রভৃতি প্রথা থেকেই সহজিয়া পরকীয়াবাদের উৎপত্তি (বৌদ্ধগান ও দোঁহা/পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য

বেদোত্তর যুগে রচিত বিভিন্ন সংহিতা, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যেও পরকীয়াবাদের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগ মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ - ১০০০ সময়কে ধরা হয়

উইনটারনীজ মতে খ্রীঃ পূঃ ২০০০ - ৫০০০)। সংহিতা ও উপনিষদ সমূহ এরই দু'একশো বছর পরে লেখা। ব্রাহ্মণ উপনিষদ লেখা হয়েছে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ সনে (কীথ মতে)। এমনই একটি বৈদিক সাহিত্য 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'। এই ছান্দোগ্য উপনিষদে সহজিয়া বা পরকীয়াবাদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'স য এবমেতদ্ বামদেবং মিথুনে প্রোতম্ বেদ, মিথুনীভবতি, মিথুনাম্মিথুনাং প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ; ন কাঞ্চন পরিহরেৎ ; তদব্রতম্।' অর্থাৎ 'যিনি এই প্রকার পুরুষ মিথুনে বামদেব্য সামকে নিহিত অবগত হইয়া আরাধনা করেন, তিনি নিয়ন্ত মিথুন ভাবে বিদ্যমান থাকেন। কখনো তাঁহার ঐ ভাবের বিচ্ছেদ ঘটে না এবং তাঁহার এ মিথুনভাব হইতেই প্রজাসঞ্জাত হইয়া থাকে। তিনি পূর্ণ আয়ুঃ সম্পন্ন হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকেন ; তাঁহার জীবন নিরন্তর সমুদ্ভাসিত থাকে ; প্রজাপালন কীর্ত্তি দ্বারা তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি পায় ; তিনি সমাজে মহান বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন। সমগমাথিনী কোন নারী শয্যায় উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ করে না।'('ছান্দোগ্য উপনিষদ'/দ্বিতীয়

বেশ কিছু মহিলা ঋষি বেদের অনেকগুলি সূক্তের জন্ম দিয়েছেন। কোন কোন বৈদিক যুগের মহিলা ঋষি স্ব-নামে সংহিতাও লিখেছেন। যেমন 'অত্রি সংহিতা।' অত্রি তাঁর সংহিতার এক জায়গায় লিখেছেন, 'ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেন।' অর্থাৎ জার বা উপপতির দ্বারা যৌন সম্পর্ক ঘটালেও স্ত্রী দুষিত হয় না। অত্রি আরও লিখেছেন, 'ন ত্যাজ্যা দুষিতা নারী.........পুষ্পকালেন শুদ্ধ্যতি।' অর্থাৎ নারী কোন পরপুরুষের শয্যা সঙ্গিনী হলেও তার শুচিতা নষ্ট হয় না। একটি ঋতুর পর সে শুদ্ধ হয়ে যায়। অতএব উক্ত নারী স্বামী কতৃর্ক পরিত্যাজ্য নয় (অত্রি সংহিতা ১৯৪ শ্লোক)। এছাড়াও ঋগ্বেদ ৬।৫৫।৫ অংশে জার এবং ১০।৩৪।৫ অংশে জারিনী অর্থাৎ মেয়ে বহু পুরুষগামীর (Prostitution) উল্লেখ আছে। এবং অথর্ববেদ ২০।১৩৬।৯ অংশে বেশ্যাসক্ত নারীর কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও মহাভারত ১।১১১।১৯-২৩ অংশে কুমারী

কন্যার গর্ভসঞ্চার, মনুসংহিতা ৯।৫১·৫৩ অংশে, অর্থশাস্ত্র ৩।৭।২·৩ অংশে পরস্ত্রী গমন, মনুসংহিতা ১১।৬৪ অংশে আপন স্ত্রীকে বেশ্যাকর্মে নিয়োগ, মহাভারত ১।১০৬ ও ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮, অথর্ববেদ ১৪।২।১৮ অংশে ভ্রাতৃবধূ গমন, এছাড়া কামসূত্র ৩।৩।২১ অংশে বালিকাগমন, কামসূত্র ৩।৫।২৫ অংশে যুবতী গমন প্রভৃতি অবৈধ প্রথার উল্লেখ আছে। এছাড়াও ঋগ্বেদ ১৪২।১৮ অংশে, মনুসংহিতা ৯।৫৯।৬২ অংশে দেবর ভ্রাতৃবধূর বিবাহ বিহীন যৌন সম্পর্কের উল্লেখ আছে। মহাভারতের অর্জুন, যুধিষ্ঠীর, কর্ণ, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-সকলেই তো অবৈধ সন্তান। এমন কি অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার বৈদিক সাহিত্যে কন্যা সঙ্গমের, ভাইবোনের সংসর্গের মতো অনাচারের—অতিচারের (transgression) কথা বলা হয়েছে।

নৃ-বিজ্ঞানী মর্গানের সূত্র থেকে জানা যায়, আমাদের মানব সমাজের অতীতটা ছিল সম্পূর্ণরূপে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্কের (Promiseuity) পর্যায়ভুক্ত। এমন একটা সময় ছিল ভাইবোনের যৌন সম্পর্ক (brother-sister incest), বহুপতি বিবাহ (polyandry), বহু স্ত্রী বিবাহ (polygymy), প্রাক-বিবাহ স্বেচ্ছাচার (premarital license), বিবাহোত্তর ব্যভিচার (extramarital sex relation), অতিথিকে পত্নী দ্বারা আপ্যায়ন (lending of wife to entertain a guest), উৎসবকালীন স্বেচ্ছাচার (ceremonial license) পত্নী বিনিময় (exchange of wife), দেবদাসী প্রথা (tample prostitution) প্রভৃতি যৌন সম্পর্কিত অতিচার সমাজে সমর্থিত হতো।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে (Lower Palacolihic) বা প্রাক্ আর্য যুগে (Pre-aryan civilisation) এবং পরবর্তী আর্য সভ্যতার যুগের প্রথম দিকেও সমাজে নারী পুরুষের অবাধ যৌনতা (promiscuity) প্রচলিত ছিল। এসময় নারীর কৌমার্য বা সতীত্ব (chastity) বলতে যা বোঝায় তার সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ছিল না। ভারতবর্ষে প্রথম বিবাহ প্রথা চালু করেন মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু। তার আগে স্বামী স্ত্রীর সংজ্ঞা বলতে যা বোঝায় তা ছিল মূলত যৌন সঙ্গী (Spouses বা mates)। আবার এক পুরুষের যৌনসঙ্গী নারীর একাধিক পুরুষেরও যৌনসঙ্গী হতে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

এ প্রসঙ্গে (মহাভারত ১২।৩৪।২২) অংশে একটি আখ্যায়িকা আছে —একদিন পুত্র শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের কাছে বসে ধর্মোপদেশ শুনছিলেন। এমন সময় একজন অপরিচিত পুরুষ শ্বেতকেতুর মায়ের

কাছে এসে বললো, 'চলো, আমরা যাই।' এই বলে সেই অপরিচিত পুরুষটি শ্বেতকেতুর যুবতী মাকে নিয়ে বিজন অঞ্চলে গমন করলো। শ্বেতকেতু বুঝলেন ব্যাপারটা। তখন তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে পিতা উদ্দালককে প্রশ্ন করলেন, 'পিতা, আপনি আমার মায়ের ভর্তা, স্বামী, কিন্তু স্বামী ব্যাতিত আমার মা অপর পুরুষের দেহজ সঙ্গী হবেন কেন ? তখন মহর্ষি উদ্দালক শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বৎস, ক্ষুব্ধ হয়ো না। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণও বহু ভোগ্যা, গাভীগণ বহু ভোগ্যা হয়েও যেমন অশুচি নয়, স্ত্রীগণও তদ্রুপ বহু পুরুষে গামিণী হলেও শুচিতা হারায় না।' কিন্তু পিতার এ হেন উপদেশ পুত্র শ্বেতকেতুর মনঃপুত হয় না। এবং পরবর্তী কালে এই শ্বেতকেতুই বিবাহ প্রথা প্রবর্তন করেন বৈদিক ভারতে।

কিন্তু বিবাহ অর্থাৎ নির্দিষ্ট যৌন সঙ্গী নির্বাচন প্রথা সমাজে চালু হলেও অবৈধ উপগমনের ঘটনা ঘটতে থাকে। এরকম অবৈধ নরনারীর দেহজ সম্পর্ক বৈদিক যুগেও ঘটেছে, মহাকাব্যের যুগে ঘটেছে, মধ্যযুগে ঘটেছে, জেন্টুদের যুগে ঘটেছে, বর্তমান যুগে ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। সুতরাং এ অপ্রতিরোধ্য ঘটনা যুগে যুগে সমাজপতিদের ভাবিত করেছে। আইনে যেমন অপরাধ ঘৃণ্য বলে বিবেচিত, এবং অপরাধীর শাস্তির বিধান আছে, আবার অপরাধী কর্তৃক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানোরও ফাঁক ফোঁকর আছে, তদ্রুপ, অবৈধ যৌন ঘটিত ঘটনা সমাজ ধর্মে ব্যভিচাররূপে গণ্য হলেও অনুরূপ ব্যভিচার সংগঠিত হবার কিছু বিধি-ব্যবস্থাও যুগ-কাল অনুযায়ী সৃষ্টি হতে থাকে। যেমন বৈদিক যুগে, মহাকাব্যের যুগে কুমারী কন্যার গর্ভ সঞ্চার জনিত অনাচার আকচার ঘটতো বলেই সে সব যুগে কুমারী কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে 'জারজ' না বলে 'কানীন' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সে যুগে কুমারী কন্যা গমন প্রত্যক্ষ ভাবে অতিচার বিবেচিত হলেও পরোক্ষ ভাবে তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। যুগে যুগে ধর্মগুরুরা সমাজ এমন কি সমাজপতি— দেশের রাজার মাথার ওপরেও ছড়ি ঘুরিয়েছে, সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য (দেবতাদের হেতু করে) দেবদাসী, সেবাদাসী প্রাথার উদ্ভব হলো। এই ভারতবর্ষেই এমন দিন ছিল যখন দেশের যাবৎ বেশ্যারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে বিবেচিতা হতো (অর্থশাস্ত্র/কৌটিল্য/২৷২৭৷১-২) তারা দেশের রাজার কাছে নিয়মিত ভাতা পেতো এবং সমাজে বহু সম্মানিতা বলে গণ্য হতো।

এই চাঁদে পাড়ি দেওয়ার যুগেও ব্যাভিচার ও ব্যভিচারীকে স্বীকৃতি দেওয়ার সংস্থান আছে। যেমন কোন কোন সমাজে বেশ্যা বৃত্তি সরকার স্বীকৃত। কিন্তু বেশ্যাগমন অপরাধ। যেমন কুমারী গমন ক্রাইম, আবার চাকুরিরতা কুমারী মাতার 'মেটারনিটি লিভ' এর সংস্থানও আছে। বস্তুত নরনারীর এই দেহজ ও দেহকেন্দ্রিক বৈধ অবৈধের ব্যাপারটি এমনি জটপাকানো, জটিল, যার সঠিক-বেঠিক মূল্যায়নে আসা দুরূহ। বিশ্বামিত্র মুনি থেকে প্রেসিডেন্ট কেনেডি যুগে যুগে মহাজনেরা এহেন পথে গমন করেছেন। এমন কি এ প্রবন্ধের শিরোনাম মহাপ্রভু চৈতন্যকেও. এক ওড়িয়া যুবতীর প্রতি সতর্ক হবার জন্য স্বরূপ দামোদরকে সাবধান বাণী বলতে শোনা যাচ্ছে (চৈ. চ./অন্ত্য দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিবাহ এ সমস্যার এক মাত্র সমাধান করে না। তাই যুগে যুগে সমাজ বিজ্ঞানীরা প্রাক্ বিবাহ ও বিবাহোত্তর যৌন উপভোগের বেশ কিছু ফাঁক-ফোঁকর রেখে দিয়েছেন। আর এ হেন ফাঁক-ফোঁকরগুলি অধিকাংশই ধর্মকেন্দ্রিক। কারণ, নিমিত্তরূপী দেবতা থাকলে মুখ্য জিনিষ গৌন প্রর্যায়ভুক্ত করতে সুবিধে হয়। এ ভাবে কার্য্য ও কারণ দুটি দিকই সমাজে প্রচ্ছন্ন রাখা যায়।

সহজিয়াবাদ বা পরকীয়াবাদ যৌন উপগমনের এমনই একটি প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় দিক। তার বেশি কিছু নয়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ('বাংলাদেশের ইতিহাস' [মধ্যযুগ] পৃঃ-২৬৭) গ্রন্থে লিখেছেন, 'বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে।' কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ কথা সর্বাংশে ঠিক নয়। কারণ আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করে দেখলাম, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের আগেও অর্থাৎ 'কালচক্রযান' 'বজ্রযান' প্রভৃতি প্রথার আগেও এ দেশে সহজিয়াবাদীদের বা পরকীয়াবাদীদের অস্তিত্ব ছিল। সেক্ষেত্রে শুধু প্রয়োগের রকমফের ঘটেছে, প্রথার নয়। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা বহুদিন দাপটের সঙ্গে পরকীয়াবাদের ধ্বজা উড়িয়েছেন এদেশে। তারপর সেন রাজাদের আমলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিতে বড়ো রকমের ফাটল ধরলে বৈষ্ণব সহজিয়াদের অভ্যুদয় ঘটে। সেজন্য বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের কিছু প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই বৈষ্ণব

সহজিয়াদের ওপর পড়েছে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে বৈষ্ণব সহজিয়ারা অতোটা উৎকট ধরণের স্বেচ্ছাচারী বা বামাচারী ছিলেন না। * পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের 'জিস্ট' থেকেও বৈষ্ণব সহজিয়ারা প্রভাবান্বিত হয়।

এসব সহজিয়ারা ভিন্ন ভিন্ন ও বিচিত্র নামে অনেকগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন, আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়ানেড়ি, কর্তাভজা, সখীভজা (বা সখীভাবক) কিশোরীভজা, রামবল্লভি, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গৌড়বাদী, গোবরাই প্রভৃতি। তা এইসব বিভিন্ন শাখার সহজিয়াদের মত পথের অনেক গরমিল থাকলেও, তাদের সব শাখারই স্ত্রী পুরুষের অবাধ শরীরী মিলন ও পরকীয়া প্রেমের ব্যাপারে কোন দ্বি-মত ছিল না।

চৈতন্যের জন্মের বহু আগে থেকে এরকম পরকীয়াবাদী বৈষ্ণব ধর্ম চালু ছিল বাঙলাদেশে। তখন বৈষ্ণবদের আরেকটি সম্প্রদায় ছিল রামভক্ত। তবে রামভক্তদের সংখ্যা গৌড়বঙ্গের অপেক্ষা উত্তর পূর্ব বঙ্গে ও আসামে বেশি ছিল। সেই সঙ্গে ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও নীতি ন্যায়শাস্ত্রীবাদী ব্রাহ্মণরা। মধ্যযুগে বিশেষত প্রাক-চৈতন্য যুগে বাহ্মণ পণ্ডিতদের দাপট ছিল অভাবনীয়। কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মূর্খ। তারা মানে এই না যে সেসময় সাত্ত্বিক ও বিদ্যান ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বেদ, আগম, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্গার প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মনও ছিলেন। কিন্তু মূর্খের সংখ্যাই বেশি ছিল। এসব ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীতে লিখেছেন—

'মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে   নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে   দেব পূজা ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টানা।।'*৬

এসব ব্রাহ্মণেরা কথায় কথায় নিম্নশ্রেণীর লোকেদের শাপ-শাপন্ত করতেন, খড়মপেটা করতেন। সেই সঙ্গে ছিল বৈষ্ণব সাহজিয়া ও

• বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা নীতি ও ধর্মবিধ্বংসী। এই সমস্ত ভৈরবীচক্র প্রভৃতির দ্বারা পুরুষ ও রমনীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপ স্খলিত হইয়াছিল। অপরপক্ষে তান্ত্রিকগণের খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল না। তাহারা গলিত শবের মাংস, মলমূত্রাদি পর্যন্ত কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ভক্ষণ করিত (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য/পৃঃ-২১৬)।

বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধর্মকেন্দ্রিক ব্যাভিচার। বৈষ্ণব সহজিয়াদের কথা পূবেই বলা হয়েছে। এখন তান্ত্রিকদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

'কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় যে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে গুরু ও শিষ্য আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী ও তাঁতির কন্যা, গনিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কন্যা, ব্রাহ্মণী, একজন ভূস্বামীর কন্যা ও গোয়ালিনী) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একজন স্ত্রীলোক বসে। গুরু তখন শিষ্যকে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দেন। 'আজি হইতে লজ্জা, ঘৃণা, শুচি-অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। মদ্য, মাংস, স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা দেবতা শিবকে স্মরণ করিবে এবং মদ্য মাংস প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হইবার উপাদান স্বরূপ মনে করিবে।' ইহার পর নানা প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ করে—গোমাংসও বাদ যায় না। (বাংলাদেশের ইতিহাস/ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার/পৃঃ-২৬৬-৭) এবং সেই সঙ্গে ছিল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ—' ও চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক দুই প্রায় পর্ণোগ্রাফি (Pornography)* কাব্যের প্রচার (ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য / ডঃ বিমানবিহারী

মূলত রঘুনন্দন শূলপানি প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতেরা তাঁদের স্মৃতি

• চৈতন্য ৫০০ বছর আগে জন্মেছিলেন। ৫০০ বছর আগে সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার মান কতোখানি নিম্নমুখী ছিল তা এক দেড়শো বছর আগের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করলে স্পষ্টত জানা যাবে। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মকথা' নামক গ্রন্থে লিখছেন, '১৮০০ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ একটি স্বতন্ত্র জিলায় পরিণত হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হ্যামিল্টন ইহার প্রজাসংখ্যা ৯২৬৭২৩ বলিয়া গণনা করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটিও পাঠশালা দেখিতে পান নাই।' শাস্ত্রী মশাই অন্যত্র লিখেছেন, 'দেশের অপরাপর কোন কোনও স্থানে সংস্কৃত চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পর্যবসিত হইত। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় মনকে সমুন্নত হয়, জগৎ ও মানবকে বুঝিবার সহায়তা হয়, এমন কোন জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসকল পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞাত ছিল।'

শাস্ত্রে যে সকল সামাজিক আদর্শের কথা বলেছিলেন ধম্যযুগে ধর্মকেন্দ্রিক সমাজে সে আদর্শকে সঠিক অনুসরণ করা হয় নি। অন্যদিকে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্মও লোপ পেয়েছিল। সেসময় ধর্মের নামে যা প্রচলিত ছিল তা তান্ত্র সাধনা এবং বাশুলী, বিশহরি, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজা। মদ্য মাংস সহযোগে কোথাও কোথাও যক্ষ পূজাও হতো। বৃন্দাবন দাস তাঁর ভাগবতে লিখেছেন,

'রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।।
ভোক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।।'

(চৈতন্য ভাগবত)

বস্তুত মধ্যযুগে ধর্মানুষ্ঠানে যে সকল যৌনমূলক অশ্লীল আচার আচরণ জড়িত ছিল এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল নরনারীর দেহ সম্ভোগ ও শৃঙ্গার রসের উৎকট বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে মধ্য যুগের সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতিত অবস্থাকেই সূচিত করে।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা বিশেষত বাঙালী জাতির নীতি ও চরিত্র প্রসঙ্গে কয়েকজন বৈদেশী ভ্রমণকারী বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন। চৈতন্যের তিরোভাবের পর, ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্যটক জোয়ানেস্ ডি লায়েট (Joannes De Leat) বাংলাদেশে এসেছিলেন। লায়েট সেসময়কার বাঙালী জাতির চরিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তাহারা খুব চালাক চতুর কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুবই খারাপ ; পুরুষেরা চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা ও অসতী।' সপ্তদশ শতকের বাংলাদেশ পর্যটক শুটেন (Gautier Sehauten) বলেছেন, 'এসময় লাম্পট্য ও দুর্নীতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলাদেশে বেশি ছিল।' এবং ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের বাংলাদেশ ভ্রমণকারী মানরিক্যু (Sabastiao Manrique) বলেছেন, 'বাঙালীরা ভীরু ও উদ্যমহীন, পরের পা চাটায় তারা অভ্যস্ত ছিল।'

এর সঙ্গে ছিল হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় সহবস্থানের সঙ্কট। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের (পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত) হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের দুর্ব্যবহারের বর্ণনা পাওয়া যায়,

'যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ।।

বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল।।'

(মনসামঙ্গল)

অন্যত্র আছে—
'ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ে ফেলে থুতু দেয় মুখে।।'

এছাড়াও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ এজ'গ্রন্থে দেখা যায়, ফতে শাহ এবং হোসেন শাহ চৈতন্য সমসাময়িক এই দুই মুসলমান শাসক হিন্দু ব্রাহ্মণদের উপবীত ধারণ ও বৈষ্ণবদের গঙ্গাস্নান এবং গলায় তুলসীর মালা পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন।

এমনই এক যুগ সঙ্কট মুহূর্তে ১৪০৭ শকাব্দ (ইংরাজী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী) বাঙলার ২৩শে ফাল্গুন, শুক্রবার (মতান্তরে শনিবার) এক পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্লাবিত সন্ধ্যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। মাতা শচীদেবী। পিতার নাম জগন্নাথ বা পুরন্দর মিশ্র। দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (তবে চৈতন্য বাঙলাদেশে জন্ম গ্রহণ করলেও জাতিগত পৈতৃক পিতামহ সূত্রে কিন্তু ওড়িয়া ছিলেন। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি)।

তা এই চৈতন্যের জন্মের বেশ কয়েক বছর আগেই নবদ্বীপ অঞ্চলে একটা গুজব রটে গেল। গুজবটা হলো 'দেশে ব্রাহ্মণ রাজার আবির্ভাব'। নদীয়া-নবদ্বীপবাসী সকলের মুখে মুখে তখন এক কথা, অচিরাৎ দেশে ব্রাহ্মণ রাজার আবির্ভাব হচ্ছে। কিন্তু কে সেই ভাবী রাজা তখনো কেউ জানে না। আর নবদ্বীপবাসীরা ঘরে ঘরে এ হেন গুজবটি ছড়িয়েছিলেন চৈতন্যের গুরুর গুরু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদি প্রচারক মাধবেন্দ্র পুরী। মাধবেন্দ্র পুরী ঠিক কোন দেশীয় লোক ছিলেন জানা যায় না। তবে গোপালের সেবার জন্য চন্দন কাঠ আনতে দু'চার বছর অন্তর অন্তর তিনি দ্রাবিড় দেশে (দক্ষিণ ভারত) যেতেন (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন / পৃঃ -১২৪)।

এই মাধবেন্দ্র পুরী চৈতন্যের জন্মের আগে একবার নবদ্বীপে এসেছিলেন এবং জগন্নাথ মিশ্রর ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।*

'শ্রীমাধব পুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গ পুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিল নদীয়া নগরী।।

জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘন্ট তাঁহাতে খাইল।।'

সম্ভবত এই সময় মাধবেন্দ্র পুরী এই দৈববানী ছড়িয়া দিয়েছিলেন নবদ্বীপে। পরবর্তীকালে মাধবেন্দ্র পুরীর এই দৈববাণীর প্রভাব পড়েছিল জ্যোতিষী নিলাম্বর চক্রবর্তীর গননায়। তিনি চৈতন্যর কোষ্ঠী বিচার করে বলেছিলেন, 'এই জাতকের দেহে দেখছি রাজা লক্ষণ'। তবে 'এই শিশুই দৈবজ্ঞ কথিত নবদ্বীপের ভাবী রাজা কিনা তা অপেক্ষা করে দেখতে হবে'। ('বাঙলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য / গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী /পৃঃ-৪)

অতঃপর নিলাম্বর চক্রবর্তীর ভবিষ্যতবাণীর সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপবাসীর আর জানতে বাকী রইলো না যে সেই অবিসম্বাদিত 'গৌড়ের ব্রাহ্মণ রাজা'-টি কে। সমগ্র নবদ্বীপ এ ব্যাপারে কানাকানি পড়ে গেল।

সমাজ বিজ্ঞানী মার্কসের (Karl Marx) যেমন এঙ্গেলস ছিল, অথবা বলা যেতে পারে যীশুখ্রীষ্টের ছিল যেমন ব্যাপটিস্ট জন,তেমনি চৈতন্যের ছিল অদ্বৈত আচার্য্য। বয়সে চৈতন্যের চেয়ে ৫২ বছরের বড় ছিলেন। বিশ্বম্ভর অার্থাৎ চৈতন্যের বয়স যখন পাঁচ ছ' বছর অদ্বৈত তখন নবদ্বীপের বিখ্যাত অধ্যাপক। তো এ হেন অদ্বৈত পণ্ডিত গোড়া থেকেই, প্রায় চৈতন্যের জন্ম লগ্ন থেকেই চৈতন্যকে বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর ছিলেন। বিশ্বম্ভর নিমাঞি ওরফে চৈতন্যের জন্মের বহু আগেই অদ্বৈত পণ্ডিতের (এঁর আসল নাম কমলাক্ষ ভট্টাচার্য) নেতৃত্বে নবদ্বীপ অঞ্চলে একটি ছোট বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির নেতৃত্বভার অদ্বৈত চৈতন্যের উপর তুলে দেন।

অদ্বৈত কর্তৃক চৈতন্যকে বৈষ্ণব শিবিরে টেনে আনার একটা অনিবার্য কারণ ছিল। আমরা জানি, চৈতন্য প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। বরং বৈষ্ণব বিদ্বেষীই ছিলেন। কিন্তু সুপণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, অদ্বৈত পণ্ডিত তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি ও ধী শক্তির জোরে চৈতন্যকে টেনে এনেছিলেন বৈষ্ণব শিবিরে। কিন্তু কেন চৈতন্যের

• মানবেন্দ্র পুরী যখন নবদ্বীপে এসেছিলেন তখন চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতে ওই সময় চৈতন্যের জন্ম হয় নি। কিন্তু চূড়ামণি দাসের মতে 'মাধবেন্দ্র পুরীর উপস্থিতিতে চৈতন্যের চূড়াকরণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সূত্র চৈতন্যাবদান/সুকুমার সেন/পৃঃ ৩৪-৩৫)।

প্রতি অদ্বৈত পণ্ডিতের এ হেন তৎপরতা ? 'চৈতন্যের দেহে রাজলক্ষণ আছে' জ্যোতিষী নিলাম্বর চক্রবর্তীর এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনেই কি অদ্বৈত চৈতন্যের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন ? হ্যাঁ এটা একটা কারণ। কিন্তু গৌণ। মুখ্য কারণটা ছিল অন্য। সেটা কি ?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য বা অদ্বৈত আচার্য্য ছিলেন নৃসিংহ বা নরসিংহ নড়িয়ালের বংশধর। আর এই নরসিংহ নড়িয়াল ছিলেন রাজা গনেশের প্রধান উজির। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ'এর উল্লেখ আছে—

'সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ।।
যাহারা মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ে হৈল রাজা।।'

অদ্বৈত প্রকাশ)

আমরা অবগত আছি যে, গৌড় দেশে মুসলমান রাজত্ব চলেছিল প্রায় দু'শো বছর। শুরু হয়েছিল সেই ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর লক্ষণাবতী বা গৌড় আক্রমণের মাধ্যমে। এরপর ৮১৭ হিজরায় (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) শেষ দিকে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত (সম্ভাবত নিহত) করে রাজা গণেশ বাঙলাদেশে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করেন।

এই রাজা গনেশের প্রাধান উজীর ছিলেন নরসিংহ নড়িয়াল। আর এই নরসিংহের বংশধর হচ্ছেন কমলাক্ষ ভট্টাচার্য বা অদ্বৈত আচার্য্য।* রাজা গণেশ ও পূর্বপুরুষ নরসিংহ নড়িয়াল কর্তৃক মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ ও বাংলাদেশে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোচিত কাহিণী অদ্বৈত পূর্বেই শুনেছিলেন। এ কাহিনী তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং তিনিও স্বপ্ন দেখতেন গৌড় বাংলায় সুলতানী রাজত্বের উচ্ছেদ করে এমনিই এক হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার। তারপর

* অদ্বৈতাচার্য নরসিংহ নড়িয়ালের কতো পুরুষ অধস্তন ছিলেন এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানান মত দেখা যায়। বাল্যলীলা সূত্র ও উত্থলীর গোস্বামীদের তালিকা মতে নরসিংহের এক পুরুষ অধস্তন। যথা নরসিংহ, কুবের, অদ্বৈত। 'প্রেমবিলাস' ও নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ড' (যথাক্রমে পৃঃ ২৫৮ ও ২৭৫-৭৯) মতে নরসিংহ, বিদ্যাধর, ছকরি, কুবের, তারপর অদ্বৈত। শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশীয়দের তালিকা অনুসারে—নরসিংহ, কুবের তারপর অদ্বৈত। এবং ('History of Bengali Literature' P.-446) মনে নরসিংহ, তারপর কুবের এবং কুবেরের পর অদ্বৈত।

মাধবেন্দ্র পুরী যখন দৈববাণী প্রচার করলেন যে অচিরাৎ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজার আবির্ভাব হচ্ছে, এবং তারপরই নিলাম্বর চক্রবর্তী যখন গনণা করে বললেন, চৈতন্যই সেই ভাবী ব্রাহ্মণ রাজা তখন ধর্মপ্রাণ অদ্বৈত পণ্ডিত ধরেই নিলেন যে তাঁর স্বপ্ন এবার সার্থক হতে চলেছে। এবং সেজন্যই তিনি চৈতন্যকে প্রতিশ্ঠা করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। এমন কি চৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষার ভারও তিনি নিজের ওপর নিয়ে ছিলেন (অদ্বৈত প্রকাশ /১২ অধ্যায় /পৃঃ- ৪৬)।

চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করলে লক্ষ্য করা যায়, কৈশোরের শেষ এবং যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই চৈতন্যের জীবনে পর পর কতোগুলো দুঃসহ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। চৈতন্যের জীবনে প্রথম আঘাত সম্ভবত বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ। চৈতন্যের বড়ো দাদা বিশ্বরূপ। তিনি বাড়ি থেকে ফেরার হয়ে কোথায় যে চলে গেলেন আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। এই ঘটনায় চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের দেহ-মন ভেঙে পড়লো। তিনি মারা গেলেন। পিতার মৃত্যু চৈতন্যের জীবনে দ্বিতীয় আঘাত। সমস্ত সাংসারিক ভার পড়লো চৈতন্যের ওপর। খুবই টালমাটাল অবস্থা নিমায়ের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ধনী ছিলেন না। বলা যেতে পারে সাধারণ মধ্যবিত্ত। তাই পিতার মৃত্যুর পর জমিদার হিরণ্য মজুমদারের বৃত্তি ও অদ্বৈত আচার্য্যের দেও সাহায্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হতো চৈতন্যকে। তাছাড়া অভিভাবক নিলাম্বর চক্রবর্তীও ছিলেন ।

এই অবস্থায় পূর্ব প্রণয়ের সূত্র ধরে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষী বা লক্ষীপ্রিয়াকে বিয়ে করে বসলেন চৈতন্য। শচীদেবীর এ বিয়েতে মত ছিল না । কিন্তু পুত্রের মনোভাব দেখে রাজী হতে বাধ্য হলেন। এসময় চৈতন্যের বয়স ১৬/১৭ মতো। বিয়ের কিছুদিন পর চৈতন্য জলপথে পূর্ববঙ্গে গেলেন। পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্রের নিকটবর্তী বড়গঙ্গা (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে জয়পুর) গ্রামে চৈতন্যের বেশ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। সেই সম্পত্তি বিলি ব্যবস্থা করে কিছু টাকাকড়ি সংগ্রহের জন্য চৈতন্য পূর্ববঙ্গে গেছলেন।

এরপর বাড়ি ফিরতেই শুনলেন মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। প্রিয়তমা স্ত্রী লক্ষীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ মৃত্যুর কারণ রহস্যাবৃত। তবে সর্প দংশনে মৃত্যু হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। স্বভাবতই পত্নী বিয়োগে দারুণভাবে ভেঙে পড়লেন চৈতন্য। সময় কাটে না। টোলে যেতে মন বসে না। এরপর ১৫০৮ সালে গয়া গেলেন পিতৃ-পিণ্ড দান করতে। তারপর গয়া থেকে ফিরেই কেমন পাগলের মত হয়ে গেলেন। ঘনঘন

মূর্ছা যেতে লাগলেন (এ প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে, চৈতন্য মৃগী রোগী ছিলেন। পরে এর আলোচনা করবো)। কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। কখনো স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া, মা শচীদেবীকে মারধোর করতে যান (চৈঃ ভাগবত ২।২।৮৭)।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর অভিমতে বলেছেন, 'আমি অনুমান করি পত্নীবিরহভাবনা সূত্রেই বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণবিরহ ভাবনার উৎপত্তি ('চৈতন্যাবদান'/পৃঃ ৩৬)। ডঃ সেনের এ ধারণা আবশ্যিক গ্রহণীয়। সময় কাটানো এবং মনকে প্রবোধ দেবার জন্য চৈতন্য কীর্তনের আখড়া খুললেন বাড়িতে। বন্ধুবান্ধবরা জুটতে লাগলো। অনেকটা এ যুগের সখের থিয়েটারের মতো। কিন্তু রাজনীতির পটভূমিকায় বিচার করলে এর আরেকটা ভিন্নরকম মানে হয়। যেমন অদ্বৈত। শ্রীবাস, নিত্যানন্দ আরও কেউ কেউ ছিল। জনসাধারণেরও সমর্থন ছিল। অবশ্য সাধারণ মানুষের সমর্থন এসেছিল কিছু পরে।

আপাত দৃষ্টিতে বিচার করলেও এরকম ধারণা কল্পনা প্রসূত মনে হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের সত্যাসত্য নিয়ে কল্পনা বা গালগল্প করার অবকাশ থাকে না। চৈতন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সুতরাং ইতিহাস দিয়েই তাঁর ইতিবৃত্তকে বিচার করতে হবে। মাটি চাপা প্রচ্ছন্ন অতীতকে বর্তমান আলোয় তুলে এনে বিচার করা মানুষের ধর্ম। অন্যতম অধিকারও বটে। এর জন্য অনেক সক্রেটিসকে বিষের পেয়ালা তুলে নিতে হয়। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন গ্যালেলিওরা, কিন্তু মহাকাল কোন ধর্মান্ধবাদীদের পরোয়া করে না। এবং এভাবে, যে বিশ্বাসে সূর্য একদিন পৃথিবী পরিক্রমা করতো সেই বিশ্বাসেই পৃথিবী একদিন সূর্যকে পরিক্রমা করে।

এবার বলছি, চৈতন্য অদ্বৈত প্রভৃতির কীর্তনের আখড়ায় ধর্মের চেয়ে রাজনীতি অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল—এরকম একটা ধারণা কেন হলো। আমরা অবগত আছি, চৈতন্য পিতৃ-পিণ্ড দান নিমিত্তে গয়া যাত্রা করেন ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন চৈতন্যের বয়স তেইশ বছর। এবং গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ১৪৩০ শকের পৌষ মাসের শেষ দিকে। এরপর কীর্তনের আখড়া করেন মাঘ মাসে (মহাকাব্য /৪ /৭৬)। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পিতার মৃত্যুর অন্তত ৭/৮ বছর পর হঠাৎ পিতৃ পিণ্ড দান করতে গয়া গেলেন কেন ? পিতার মৃত্যুর এতোগুলো বছর পর পিতৃ-পিণ্ডদানে চৈতন্য উৎসুক হলেন কেন ? কেনই বা দলবল নিয়ে তিনি গয়া গমন করলেন ? তিনি তো পিতৃ কৃত্য করতে একাই যেতে পারতেন। অবশেষে গঙ্গাতীর ধরে কহলগাঁ ভাগলপুর দিয়ে

মন্দার, সেখান মিলিত থেকে বৈদ্যনাথধাম হয়ে গয়ায় পৌঁছলেন। গয়ায় গিয়ে হলেন মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে। কে এই ঈশ্বর পুরী ? না যিনি বেশ কিছুদিন আগে ছদ্মবেশে নবদ্বীপে এসেছিলেন ও অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে মিলিতহয়েছিলেন।

'হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর পুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি।। ['চৈতন্য ভাগবত' আদি /৭/১৯৯]

তারপর ?

'তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে।। [ভাগবত আদি /৭/২০১]

প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর পুরী তো একজন সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ। তো তিনি ছদ্মবেশে নবদ্বীপে এলেন কেন ? এতো লোক থাকতে তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের ঘরেই বা হাজির হলেন কেন ?

এ হেন রহস্যজনক সাধু ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে গয়াতে মিলিত হলেন চৈতন্য। তাঁর কাছে এসময় দীক্ষা নেওয়ার কাজটাও সেরে ফেললেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বর পুরী ছিলেন চৈতন্যের পূর্ব পরিচিত। অর্থাৎ তান বেশে (ছদ্মবেশে) নবদ্বীপে অবস্থান কালে শুধু অদ্বৈত আচার্য্য নয়, চৈতন্যের সাথেও ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

'এইমত ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ পুরে।
অলক্ষিত বুলেন, চিনিতে কেন নারে।।
দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।
পঢ়াইয়া আসিলেন আপনার ঘর।।
পথে দেখা হইল ঈশ্বর পুরী সনে।।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে।।'
[চৈতন্য ভাগবত/আদি/৭।২১৩-২১৪-২১৫]

এরপর দেখা যাচ্ছে, গয়াতে ঈশ্বর পুরীর কাছে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন চৈতন্য। এসেই কীর্তনের আখড়া ফেঁদে বসলেন। প্রথমে এ আখড়া তৈরি হলো বাড়িতেই। কিন্তু প্রতিবেশীদের ও বিশেষত শচীদেবীর বিরোধীতার জন্য এক মাসের মাথায় আখড়া স্থানান্তরিত হলো। এই একমাস রাত্রে ঘুমোতেন না চৈতন্য। যুবতী স্ত্রীর কাছেও যেতেন না। রাত্রে চৈতন্যকে পাহারা দিতেন গদাধর।

অবশেষে কীর্তনের আখড়া স্থানান্তরিত হলো অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাসের বাড়িতে। কচ্চিৎ চন্দ্রশেখর নামক পার্ষদের বাড়িতেও হতো। কিন্তু হেড কোয়ার্টার ছিল শ্রীবাসের বাড়িতে। দরজা বন্ধ করে গভীর রাত্রি পর্যন্ত (কোন দিন সারারাত্রি) কীর্তন চলতো। দরজা বন্ধ করে কীর্তন হতো কেন ?

এমন এক সময় নিত্যানন্দের আগমন ঘটলো নবদ্বীপে। নিত্যানন্দের আগমন বার্তা চৈতন্য আগেই পেয়েছিলেন। অর্থাৎ নিত্যানন্দ আসার আগেই চৈতন্যের সাথে একটা পরামর্শ করেছিলেন। তারপর নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পদার্পণ করতেই শ্রীবাসের ভাই শ্রীরামকে দিয়ে চুপি চুপি শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্য্যকে ডেকে পাঠালেন নবদ্বীপে। চুপি চুপি কেন ? যাই হোক, অদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে হাজির হলেন। সেই সঙ্গে প্রচুর উপহার।

কথা ছিল, শ্রীবাসের বাড়িতে ব্যাসপূজা হবে। সে জন্যই শান্তিপুর থেকে অদ্বৈতাচার্য্যকে ডেকে আনা। ব্যাসপূজার পুরোহিত নিত্যানন্দ। শান্তিপুর-নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তরাও শ্রীবাসের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। মুহূর্তে নিত্যানন্দ একটা অত্যাদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। ব্যাসপূজার পরিবর্তে তিনি শুরু করলেন বিশ্বম্ভরের অর্থাৎ চৈতন্যের পূজা। শ্রীবাসের বাড়িতে ভগবান বিষ্ণুর একটা কাঠের সিংহাসন ছিল। দেখতে দেখতে সকলকে অবাক করে চৈতন্য উঠে বসলেন সেই সিংহাসনে। ভগবানের হিংহাসনে মানুষকে বসতে দেখে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু ভক্তরা সানন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। নিত্যানন্দের পূজা শেষ হতেই চৈতন্যের পূজা করতে এলেন অদ্বৈত আচার্য্য। অদ্বৈত দূর থেকে দণ্ডী কেটে প্রণাম করতে করতে চৈতন্যের কাছে এলেন।। আর তখন চৈতন্য ৫২ বছরের বয়োঃজ্যেষ্ঠ অদ্বৈত আচার্য্যের মাথায় তাঁর চরণ যুগল তুলে দিলেন। বৈষ্ণব ভক্তরা আবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। এবং সবশেষে অদ্বৈত আচার্য্য এই বলে বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করলেন—

'নমো ব্রহ্মাণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।'

শ্রীবাসের বাড়িতে এইভাবে মানুষ থেকে ঈশ্বররূপে অভিসিক্ত হলেন চৈতন্য। এ প্রসঙ্গে মুরারী গুপ্ত তাঁর কড়চায় লিখেছেন, 'শ্রীবাস দেবালয় মধ্যগো হরি' (২।৯।১৮)। কবি কর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যে

লিখেছেন,'বরাসনস্থ ঃ সহসা ররাজ।' (মহাকাব্য/৭।৩০)। অন্যত্র লোচন দাস লিখেছেন,

'শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু।
দেবতার ঘর মধ্যে বসি হাতে লহু।।
দিব্য বীরাসনে প্রভু বসিয়াছে সুখে।'

['শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' /মধ্য খণ্ড/পৃঃ-
২১]

চৈতন্য ভাগবতেও সেই একই কথা লিখিত হয়েছে—

'হুংকার করেন প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়।।'

[চৈতন্য ভাগবত/২।৬।১৯৩]

দেখতে দেখতে সমগ্র নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো ঘটনাটা। বিশেষত তৎকালীন সর্বগণ্য পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য কর্তৃক চৈতন্যের পূজাজনিত ঘটনা নবদ্বীপের সাধারণ মানুষের মনে দারুণ ভাবে রেখাপাত করলো। সকলে ভেবেই নিল, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যখন চৈতন্যের পূজা করছেন, ঈশ্বর বলছেন, তখন নিশ্চয়ই চৈতন্যের মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে।

অন্যদিকে চলছিল বৈষ্ণব ভক্তদের পাবলিসিটি। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চৈতন্যের ঈশ্বর-সাদৃশ্য দিব্যকান্তি চেহারা। কাঁচা হলুদের মতো ফর্সা রঙ। লম্বা-চওড়া নাদুস-নুদুস চেহারা। আজানুলম্বিত বাহু। ঢলোঢলো টানাটানা চোখ। সব মিলিয়ে রমণীমোহন পৌরুষ।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, চৈতন্যকে ঈশ্বর বানানোর পিছনে একটা সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা ছিল। এবং সেটাই মুখ্য। অর্থাৎ চৈতন্যের অবতারত্ব বা ঈশ্বরত্ব যতখানি সত্য ততোধিক সত্য পরিকল্পনা মাফিক চৈতন্যকে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করা। এবং এটাও সত্য যে অদ্বৈত - মাধব পুরী পরবর্তী ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি সৃষ্ট বৈষ্ণব দল তৎকালে যতোখানি ধর্মীয় ভাবাপন্ন ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলন রাজনীতি ভাবাপন্ন। রাজবিরোধী চক্রান্ত অর্থাৎ গৌড় বঙ্গ থেকে তুর্কী শাসক ও শাসনের উচ্ছেদ করাই ছিল তাঁদের মূল ব্রত। এর জন্য জগাই মাধায়ের মতো খুনী, মদ্যপ গুণ্ডাদেরও দলে আনা হয়েছিল। এছাড়াও দলের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আনা হয়েছিল অসংখ্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের। বস্তুত হরিনাম, খোল, কত্তাল, নাচন-কোদন—ধর্মীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করতে যা কিছু

প্রয়োজনীয়, এর মাধ্যমে দেশের মুসলমান রাজার কোপ দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাজবিরোধী চক্রান্ত একটা চলছিল। কারণ তাই যদি না হতো তাহলে শ্রীবাসের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে (গভীর রাত্রি কালে) কীর্তনের প্রয়োজন ছিল না। সেটা প্রত্যক্ষ দিবালোকে বা সর্বসমক্ষো করা যেতো।

সম্ভবত এ চক্রান্তের কথা গৌড়ের মুসলমান রাজা হোসেন শাহের কানেও গেছলো। কেননা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

'আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজ ভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।।'

['চৈতন্যমঙ্গল'/নদীয়াকান্ড/পৃঃ ২১]

গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত মুসলমান রাজার এ হেন ব্রাহ্মণ বিরোধীতার একাধিক কারণ ছিল।

প্রথম কারণ ঃ হিন্দুর সংখ্যাধিক্য। চৈতন্যের সময় মুসলমানেরা এমনই সংখ্যালঘু ছিল যে, রাজ্য রক্ষা করার জন্য বহির্ভারত থেকে তাদের হাবশী খোজা ও ক্রীতদাস আমদানী করতে হতো। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন, এই বহিরাগত হাবশীদের জন্যই বাঙলার ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পতন ঘটেছিল (বাঙ্গালার ইতিহাস/২খণ্ড/রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়/পৃঃ ১৮০ ৮১ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় কারণ ঃ মাধবেন্দ্র পুরীর দৈববাণী। 'নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হবে।' পুরীর এরকম একটা গুজব নবদ্বীপ-শান্তিপুরের হিন্দুদের মনে এমনই বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে তারা মনে মনে ভেবেই নিয়েছিল, গৌড়ে মুসলমানের পতন ও হিন্দু শাসনের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। তারপর চৈতন্যের জন্মের পর জ্যোতিষী নিলাম্বর চক্রবর্তী যখন চৈতন্যের কোষ্ঠী বিচার করে ভবিষ্যতবাণী করলেন,

'বিপ্র রাজা হইবেক' হেন আছে।'

তখন সংখ্যাধিক্য হিন্দুদের মনে 'সুনির্দিষ্ট শিশুর আবির্ভাবে' এই 'নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হবে' ধারণা আরও ঘণীভূত আরও বদ্ধমূল হলো। এবং এ ধারণা হিন্দুদের মনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রাজা গণেশ, যিনি সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গৌড় বাঙলায় স্বল্প কালের জন্য হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। এবং এটা ঘটেছিল চৈতন্যের জন্মের আগে ১৩৮৫-১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং হিন্দুরা

চাইছিল আরেকজন গণেশের আবির্ভাব, গৌড়ের মুসলমান রাজা গেণেশের কাহিনী নিশ্চয়ই শুনেছিলেন, এবং সেটাই স্বাভাবিক, তাই হিন্দুদের বিশেষত হিন্দুশ্রেণীর মাথা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার নেমে আসা সঙ্গত কারণেই স্বাভাবিক ছিল।

এবং তৃতীয় মুখ্য কারণ সংখ্যাধিক্য হিন্দুদের সামরিক দক্ষতা। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'Chaitanya and his age' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি স্বরূপ হিন্দুরা লাঠি খেলা, তীর চালনা প্রভৃতির মহড়া শুরু করে দিয়েছিল (পৃঃ ৫৩-৫৫ দ্রষ্টব্য)। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল'ও বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'-ও এই সামরিক প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। মুসলমান রাজার এটা'ও একটা অতীব ভীতির কারণ ছিল।

সুতরাং উদ্ধত হিন্দু প্রজাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য দেশের মুসলমান রাজার দমন নীতি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এখানে একটা কথা আবশ্যক, তা হলো, চৈতন্যের সময় নবদ্বীপের অদূরে পিরুল্যা নামে একটা গ্রাম ছিল। এই গ্রামের অধিকাংশ হিন্দু পরিবার কনভার্টেড অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে এই পিরুল্যাগ্রামবাসী মুসলমানরা অত্যন্ত হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। বাদশাহের ইনফরমার হয়ে কাজ করতো এরা। এবং বাদশাহের আদেশে হিন্দুদের ওপর এরাই অত্যাচার চালাতো।

'নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তারে জাতি নাশ করে।।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লোহ পাশে বান্ধে।।
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী।।
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত।।
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ।।'

[পরিষদ গ্রন্থাবলী/সপ্তম/পৃঃ-১১]

এর ওপর ছিল কাজীর অত্যাচার। নবদ্বীপে কাজীর আদেশে কীর্তন করা বন্ধ হয়েছিল। কারো বাড়িতে খোল করতালের বাদ্যি শুনলে কুপিত কাজী তার দলবল নিয়ে সেই বাড়িতে অকথ্য হামলা

করতো।

'যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কেল দ্বারে।।
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।'

['চৈতন্য ভাগবত'/মধ্য/২৩ অধ্যায়]

তারও পর —

'যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাৎ।।'

['মনসামঙ্গল'/বিজয়গুপ্ত (পঞ্চদশ শতাব্দী)]

এর ওপর আরেকটি আকস্মিক বিপদ ঘটলো। মুসলমান সৈন্যের হাতে নিহত হলেন চৈতন্যের এক শিষ্য বৈদ্য চন্দ্রশেখর (চৈতন্য যাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে কীর্তন করতেন ইনিই কি সেই চন্দ্রশেখর ?)। একদিন বাদশাহের সৈন্যরা চড়াও হলো বৈদ্য চন্দ্রশেখরের ঘরে। তখন চন্দ্রশেখর তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তিকে বুকে চেপে ধরলেন। বাদশাহের সৈন্যরা মূর্তিটা সোনার ভেবে কেড়ে নিতে এলো। কিন্তু চন্দ্রশেখর সে মূর্তি হাত দিয়ে বুকে আগলে রাখলেন। অতঃপর বাদশাহী সৈন্যের নির্মম অস্ত্র এসে পড়লো চন্দ্রশেখরের শরীরে।

'বক্ষে রাখি ঠাকুর তবু না ছাড়িল।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিল।।'

এছাড়াও ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন।' (বৃহৎবঙ্গ/পৃঃ-৬৫৩)। এবং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দীনেশবাবুর অভিমত স্বীকার করে লিখেছেন, 'পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে এই প্রকার বল- পূর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে।' (বাংলাদেশের ইতিহাস/২য় খণ্ড/পৃঃ-৩২৩)।

সুতরাং ঘরে বাইরে রাজ শক্তির দিক থেকে নানান বিপদের আশঙ্কায় সুপরিকল্পিত ভাবে মানুষ থেকে ঈশ্বরে উত্তরিত করা হলো চৈতন্যকে। চৈতন্য এবং চৈতন্যমাতা উভয়েরই বেশ আপত্তি ছিল এতে। কিন্তু সে আপত্তি খুব জোরালো ছিল না। যদিও চৈতন্যকে এসব

ব্যাপারে জড়ানোর জন্য চৈতন্যমাতা শচীদেবী অদ্বৈতকেই দায়ী করেছিলেন। এবং সেই কারণে তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে ভালো চোখে কোনদিনই দেখতেন না। অদ্বৈতাচার্য্য সেটা বুঝতেন। এবং এই মনোমালিন্যের জন্য একবার অদ্বৈতকে নবদ্বীপও ছাড়তে হয়েছিল। পরে চৈতন্য সেটা টের পান ও অদ্বৈতাচার্য্যের কাছে মা শচীদেবীকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে (চৈতন্যাবদান /পৃঃ ৪৭ দ্রষ্টব্য)।

বস্তুত মানুষ চৈতন্যকে ঈশ্বর বা ভগবানে উত্তবণ ঘটিয়ে খুব বড়ো রকমের একটা সুবিধা হয়েছিল, সেটা এই যে, এতে প্রচুর সাধারণ জনগণকে বৈষ্ণব শিবিরে আনা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে রাজশক্তির সন্দিগ্ধ দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। অবশ্য তৎকালীন ধর্মান্ধ ধম্যযুগীয় সমাজে চিন্তাবিমুখ মানুষের অজ্ঞতা ও অন্ধ ভক্তি চৈতন্যকে ভগবান বানানোর ক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। এছাড়াও চৈতন্যকে ঈশ্বর বা অবতার বানানোর ক্ষেত্রে আরেকটা সুবিধা ছিল, বাল্যকাল থেকেই চৈতন্য ছিলেন মৃগী রোগী। মনীষী রোমা র‍্যোলাঁ তাঁর 'রামকৃষ্ণ' নাকম গ্রন্থে চৈতন্যের এপিলেপসি (Epilepsy) মৃগী রোগের উল্লেখ করেছেন। মালীবুড়োও (যুধিষ্টির জানা) তাঁর চৈতন্য বিষয়ক গ্রন্থে জনৈক প্রভুজীর সাক্ষাৎকার অধ্যায়ে এ কথা লিখেছেন (চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান/পৃঃ-২১১)। তবে চৈতন্য জীবনী পাঠ করলে একথাই মনে হবে, তিনি (চৈতন্য) ছিলেন সাময়িক উন্মাদ রোগী (Insanity)। এবং রায়ুঘটিত কারণে এটা হয়েছিল। তবে হিস্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা রোগের লক্ষণ তাঁর ছোট বেলা থেকে দেখা গিয়েছিল। এবং স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি নিদ্রাহীনতা রোগেও ভুগতেন। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে এসব আছে। চৈতন্য প্রায়শ যে শুধু মূর্চ্ছা যেতেন তাই নয়, তিনি যখন তখন লম্ফ-ঝম্প দিতেন, মাটিতে অযথা গড়াগড়ি খেতেন, হো-হো করে হাসতেন, ঘরের জিনিষপত্র ভাঙচুর করতেন। কখনো বা একটানা কেঁদেই যেতেন। অদ্ভুত অদ্ভুত হুংকার দিতেন। গর্জন করতেন। সমানে যাকে পেতেন মারতে যেতেন। মারতেন। এমনকি মাকে, স্ত্রীকেও। (চৈতন্য ভাগবত(১।৮।৬৭), (১।৮।৬৮-৬৯-৭০-৭১

তো চৈতন্যের এ ধরনের উন্মাদগ্রস্থ অবস্থা হলেই শচীদেবী প্রায়ই প্রতিবেশী বুদ্ধিমন্ত খান, মুকুন্দ, সঞ্জয়কে বাড়িতে ডেকে আনতেন। এবং এ হেন উন্মাদ রোগের প্রাতিকার স্বরূপ চৈতন্যের মাথায় বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি বায়ুনাশক তেল মালিশ করা হতো (চৈঃ ভাগবত ১।৮।৭১, ৭২)। তবে শেষ দিকে চৈতন্য ওড়িশায়

কাশী মিশ্রের বাড়িতে (গম্ভীরার) দেওয়ালে যে ভাবে মুখ ঘষতেন ও তাঁর কপাল ঠোঁট কেটে যে ভাবে রক্ত বেরোতো—এসব লক্ষণ দেখে ধারণা করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে চৈতন্য মৃগী অর্থাৎ এপিলেপসি (Epilepsy) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

'বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্তে মুখ ঘষিতে লাগিলা।
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাববেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্ত ধার।।
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখসঙ্ঘর্ষণ।
গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন।।'

'চৈতন্যচরিতামৃত'/অন্ত্যলীলা/ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ]

মূলত পূর্ববঙ্গ সফর শেষে বাড়ি ফিরে প্রথমা স্ত্রী বা ভালোবেসে বিয়ে করা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর থেকেই চৈতন্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয়া সুন্দরী স্ত্রী সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবং এই একমাত্র কারণে গৃহী চৈতন্য গৃহকন্দর ছেড়ে নিঃশব্দে নেমে এলেন পথের ধূলায়। সংসারের প্রতি অনীহা এলো। এসময় কিছু একটা নিয়ে দুঃখজাত স্মৃতির তাড়না থেকে নিজেকে আড়াল দিতে চাইলেন। আর অদ্বৈত্য চৈতন্যের এ হেন দুঃখাতিদুঃখ সময়কে কাজে লাগালেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে। বড় ভায়ের গৃহত্যাগ, পিতার মৃত্যু, প্রিয়তমা পত্নীর অপঘাতজনিত মৃত্যু—তিলে তিলে শোক ও দুঃখের আগুনে পোড়া চৈতন্য মানুষ থেকে কেন ও কিভাবে অবতারে রূপান্তরিত হলেন সে কথা সুস্থ ভাবে ভাববার সময় তিনি পাননি। তারপর তিনি যখন মহামানব হয়ে গেলেন, অবতার হয়ে গেলেন, তখন সেখান থেকে ঘরে ফেরার পথ আর রইলো না। এমন এক সময় চৈতন্যকে বলতে শোনা গেল, 'মা, তুমি যদি চাও আমি সন্ন্যাস ত্যাগ করে সংসারে ফিরে আসি। কিন্তু ততোদিনে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যাতে করে শচীদেবী প্রিয়তম পুত্রকে সংসারে আনতে পারলেন না। বরং মা হয়ে তিনিই বললেন, এদেশ এ গৌড় বাংলা, এ নবদ্বীপ ছেড়ে তুমি নীলাচলে চলে যাও। কারণ কাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য রাজশক্তির চরম বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। সেসময় পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছিল, সুলতানী সেনার হাতে গ্রেপ্তার এমন কি জীবনহানীর আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল চৈতন্যের জীবনে।

ট্রেনড দেওয়া হয়েছিল।

তো জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্যকে ভগবত্তা ঘোষণায় যাঁরা প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের নাম মুরারি গুপ্তের 'কড়চা'য় ও বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এ পাওয়া যাচ্ছে। তালিকাটি দীর্ঘ না বলে দীর্ঘাতিদীর্ঘ বলা যায়। এবং এটা সম্পূর্ণ প্রকাশ করবার প্রয়োজন থাকে এ জন্য যে, শুধুমাত্র ঈশ্বর পুরী বা অদ্বৈত মা, অনেক যুগন্ধর মানুষের মস্তিষ্ক রাজবিরোধী ভূমিকায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। যথা —(১) অদ্বৈত, (২-৫) শ্রীবাস পণ্ডিতের চার ভাই, যথাক্রমে শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীকান্ত ('প্রেমবিলাস/পৃঃ ২২১ ২২),* (৬) চন্দ্রশেখর, (৭) পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, (৮) গঙ্গাধর পণ্ডিত, (৯) বক্রেশ্বর, (১০) প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, (১১) হরিদাস ঠাকুর, (১২) দ্বিজ হরিদাস, (১৩) বাসুদেব দত্ত, (১৪) মুকুন্দ দত্ত, (১৫) শিবানন্দ সেন, (১৬) গোবিন্দ ঘোষ, (১৭) বিজয় লেখক, (১৮) সদাশিব পণ্ডিত, (১৯) পুরুষোত্তম সঞ্জয়, (২০) শ্রীমান পণ্ডিত, (২১) নন্দন আচার্য, (২২) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, (২৩) শ্রীধর, (২৪) গোপীনাথ পণ্ডিত, (২৫) শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, (২৬) বনমালী পণ্ডিত, (২৭) জগদীশ, (২৮) হিরণ্য, (২৯) বুদ্বিমন্ত খান, (৩০) পুরন্দর আচার্য, (৩১) রাঘব পণ্ডিত, (৩২) মুরারি গুপ্ত (কড়চা লেখক), (৩৩) গোপীনাথ সিংহ, (৩৪) গরুর পণ্ডিত (৩৫) নারায়ণ পণ্ডিত, (৩৬) দামোদর পণ্ডিত, (৩৭) রঘুনন্দন, (৩৮) মুকুন্দ, (৩৯) নরহরি, (৪০) চিরঞ্জীব, (৪১) সুলোচন, (৪২) রামানন্দ বসু, (৪৩) সত্যরাজ খান, (৪৪) নিত্যানন্দ, (৪৫) গদাধর প্রমুখ (মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' ৪।১৭ ও 'চৈতন্য ভাগবত' ৩।৯ অংশ দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত তালিকাটি মূলত গৌড়ীয় ভক্তদের। কিন্তু এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষভাবে ওড়িশার নীলাচলেও প্রচুর ভক্ত ছিলেন যাঁরা চৈতন্যকে অবতার জ্ঞানে পূজা করতেন। এবং এ কথাও বিস্ময়কর সত্য যে, চৈতন্যের জীবিত কালেই চৈতন্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়ে গেছলো। এবং এটা প্রথম পত্তন করেন চৈতন্য জায়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (কড়চা/৪।১৮।৮)। এরপর গৌরাঙ্গের অর্থাৎ চৈতন্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন গৌরীদাস পণ্ডিত (কড়চা/৪।১৪।১২ ১৪)।

* 'প্রেমবিলাস'-এর ত্রয়োবিংশ বিলাসে শ্রীবাস পণ্ডিতের আরেক ভায়ের নাম পাওয়া যায় 'নলিনপণ্ডিত'। (পৃঃ-২২১-২২)।

ক্রমে যা একদিন রাজবিরোধী কূটনীতির প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে তা-ই ধর্মীয় কিংবদন্তী হয়ে, আখ্যায়িকা হয়ে সংক্রামিত হলো মানুষের মনে। আর ধর্মীয় কিংবদন্তী এমনই জিনিষ যেখানে গল্পের গরু গাছেই বিচরণ করে, কিন্তু এতে গল্পের বাস্তবতা হ্রাস পাবার সম্ভবনা থাকে না।

[পাঁচ]

।। চৈতন্যের প্রেম ও বিবাহ ।।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জননীশ্বরে,
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি। "
['শিক্ষাষ্টকম্']

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি চৈতন্যের স্ব-লেখনী থেকে চয়ন করা হলো। যার অর্থগত দিকটি হলো এরকম : হে ভগবান, আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী ভার্যা বা কবিশক্তি এসব কোন কিছুই আমার কাম্য নয়। শুধু জন্মে-জন্মে আমার যেন ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কারণ ভক্তি হয়।

বলা বাহুল্য, চৈতন্য এহেন স্বরচিত কবিতাটি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের পরবর্তী কোন এক সময় লিখেছিলেন। আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি, চৈতন্য গৃহী ছিলেন। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ যে ভাবে বিয়ে-থা করে, সংসার পাতে। চৈতন্য সেভাবেই ঘরসংসার পেতে সাংসারিক হতে চেয়েছিলেন। কোনকালে সন্ন্যাসী-টন্যাসী হবো এমন ইচ্ছে তাঁর কদাপি ছিল না। বরং বলা যেতে পারে চৈতন্য একটু বেশি মাত্রায় সংসারী ছিলেন।

বিয়ের নাম শুনে চৈতন্যের বড়ো দাদা বিশ্বরূপ যখন ঘর থেকে ফেরার হলেন, তখন, শোকার্ত মা বাবাকে চৈতন্যের এই বলে 'আশ্বাসন' দিতে দেখা যায়—

'আমি ত' করিব তোমা দুঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল মাতাপিতার মন।।'
[চৈঃ চরিতামৃত/আদি/চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ]



এর কয়েকদিন পর, তাম্বুল (পান) খেয়ে চৈতন্য একদিন মাথা-টাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি মা শচীদেবী ও বাবা জগন্নাথ মিশ্র ছুটে এলেন। ছেলের মুখে জলের ঝাপ্টা দিলেন। খানিক পর জ্ঞান ফিরে এলো চৈতন্যের। চোখ মেলে তাকালেন। তারপর মা বাবার সামনে বর্ণনা করলেন এক 'অদ্ভুত কাহিনী'। কাহিনীটি এরকম : অজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে চৈতন্য দাদা

বিশ্বরূপকে দেখতে পেলেন। বিশ্বরূপ বললেন, নিমাই (চৈতন্যের আদি নাম) তুইও আমার মতো সন্ন্যাসী হয়ে যা। তখন বিশ্বম্ভর (চৈতন্য) বললেন, সেকি দাদা, এ তুমি কি বলছো ? আমি সন্ন্যাসী হলে মা বাবা অনাথ হয়ে যাবে। তাঁদের দেখবে কে ? তাছাড়া আমি বালক, সন্ন্যাস-টন্ন্যাসের কি বুঝি আমি ? না না দাদা, আমি সন্ন্যাসী হতে চাই না। আমি গৃহস্থ হয়ে বাবা মার সেবা করতে চাই। (চৈঃ চরিতামৃত/আদি/১৪ পরিচ্ছেদ)।

এতে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়, দাদা বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর চৈতন্য সদা সর্ব্বদা সংসার ও মা বাবার কথা ভাবতেন। উপরোক্ত কাহিনীটি অবচেতন মনে চেতন মনের ভাবনার প্রভাব মাত্র। অর্থাৎ চৈতন্য মা বাবা, ঘর সংসার নিয়ে এতো বেশি ভাবতেন যে অবচেতন মনেও তার প্রভাব পড়তো।•বিশেষত বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ও তার অব্যবহিত পর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের অকাল মৃত্যু এই দুই কারণ চৈতন্যকে অধিকতর গৃহমুখী করেছিল। তাই পিতৃবিয়োগের পর শোকার্ত মাকে চৈতন্যের এই বলে সান্ত্বনা দিতে শোনা গেল,

'শুন মাতা। মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি,
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি।।'

[চৈঃ ভাগবত ১।৬।১১৪]

এরপর দুঃখিনী মাকে প্রবোধ দিতে চৈতন্য বললেন, 'মা তুমি দুঃখ পেয়ো না। দাদা গেছে, বাবা গেছে ঠিক কথা। কিন্তু আমি তো আছে। আমি তোমার জন্য সবকিছু করব। যদি প্রয়োজন হয় স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকেও তোমার কাছে এনে দেব (চৈঃ ভাগবত ১।৬।১১৫)।'

পরবর্তীকালে, সন্ন্যাস ধর্ম নেওয়ার পরও চৈতন্য মা শচীদেবীকে বলেছিলেন, 'মা, তুমি যদি বলো আমি আবার সংসার ধর্মে ফিরে আসতে পারি।' শচীদেবী তা অবশ্য বলতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, চৈতন্য যখন ঘোরতর সন্ন্যাসী তখন একদিন তাঁর মুখ দিয়ে বলতে শোনা গেল, 'ধর্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম নাশ।'

তাহলে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকর্ষিত হয়ে, সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যই চৈতন্য সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন একথা ঠিক নয়। চৈতন্য নিজেই সন্ন্যাসকে 'বাতুলের ধর্ম' বলে অবিহিত করেছেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, সন্ন্যাস ধর্মের চিরাচরিত যেসব নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মতো চৈতন্য তা অনুসরণ করেন নি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে, হাসি কান্না রাগ অভিমানের মধ্যে জড়িয়ে তিনি সন্ন্যাসী বৃত্তি অপেক্ষা সাধারণ মানুষী বৃত্তিতে প্রত্যক্ষ হয়েছেন বেশি।



প্রশ্ন হলো, তাহলে চৈতন্য সন্ন্যাসী হলেন কেন ?

এর সদুত্তর খুঁজতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে জানতে হবে গৃহী চৈতন্যকে। কেননা একজন গৃহীর গৃহত্যাগের মধ্যে জড়িয়ে থাকে

গৃহত্যাগ জনিত কারণ। সঠিক গৃহীর ক্ষেত্রে সঠিক গৃহত্যাগী হওয়া যায় কিনা সেটাও বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু তারও আগে চৈতন্য কিরকম গৃহী ছিলেন, সংসারী ছিলেন আমাদের জানা দরকার।

পিতৃবিয়োগের কিছুদিন পর (কতদিন বলা কঠিন, তবে এক বছরের মধ্যেই বলে মনে হয়) চৈতন্য মনস্থ করলেন বিবাহ করবেন। বিয়ে থা না করলে সংসার ধর্ম ঠিক মানায় না, এমন একটা ধারণা চৈতন্যের মনে উদয় হলো। এবং তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে বিয়ে করবেন।

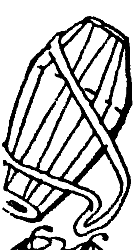
'পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিলা।।
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম।।
গৃহিনী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন।।'

[চৈ. চরিতামৃত/আদি/পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]

একটা কথা খুবই সুবিদিত, এবং বৈজ্ঞানিক সম্মতও বটে, তা হলো, কোন কিছু চিন্তা করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেই চিন্তা বা সিদ্ধান্তের একটা সূত্র থাকে। যেমন ধরা যাক সেই আপেল পড়ার ঘটনাটি। গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়লো। নিতান্ত একটি তুচ্ছ ঘটনা। অথচ সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অভিকর্ষ বা মহাকর্ষীয় সূত্র (Gravity & Gravitation Laws) আবিষ্কৃত হলো পৃথিবীতে।

আসল কথা হলো, কোন কারণ ব্যতীত পৃথিবীতে কোন কাজ হয় না। তা সেই কারণ যতোই তুচ্ছাতিতুচ্ছ হোক।

তাহলে চৈতন্য যে বিবাহে মনঃস্থির করলেন তার পশ্চাতে কি কারণ ছিল ? কি কারণ থাকা সম্ভব ? চৈতন্য নিজেই বলেছেন, 'গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।' দেবনাগরী স্মৃতিবচনেও এমন কথা বলা হয়েছে, 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগৃহিনী গৃহমুচ্যতে।' কিন্তু সদ্য পিতৃহারা, কর্মহীন চৈতন্যের একটি গৃহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হলো কি ভাবে। এর পিছনে তিনটি কারণ অবশ্যই থাকতে পারে। প্রথম কারণটি হলো, প্রাকৃতিক। চৈতন্যের মনে যখন বিবাহ চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল তখন তিনি রীতিমতো তরুণ, ষোলো সতেরো বছর বয়স। এমন একটা বয়সে কোন পুরুষ বা নারীর মনে সঙ্গলিপ্সার উন্মেষ হওয়া কোন বিচিত্র ঘটনা নয়; বরং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এটাই স্বাভাবিক ছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো, কোন বন্ধুবান্ধবের দাম্পত্য জীবন দেখেও চৈতন্য বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন। কারণ সে যুগে (১৫০২ খ্রীঃ) প্রায় পাঁচ শো বছর আগে ১৬/১৭ বছরের ছেলেরা বিয়ে থা করে বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে ঘর সংসার পাততো। এবং তিন নম্বর সম্ভাব্য কারণটি হলো (যা এ যুগেও ঘটে) বৃদ্ধা মায়ের কষ্ট দেখে চৈতন্য বিবাহের সিদ্ধান্ত নিলেও নিতে পারেন।



কিন্তু বিভিন্ন চৈতন্য চরিত পাঠ করলে, বিশেষত চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত পাঠ করলে শেষের দুটি কারণ সঙ্গত ভাবেই নিষ্প্রোয়জন হয়ে পড়ে। কারণ চৈতন্য চরিতে চৈতন্যের বন্ধুবান্ধবের উল্লেখ থাকলেও (যেমন মুরারি গুপ্ত) তাঁদের বিবাহের কোন উল্লেখ নেই। অন্তত চৈতন্যের বিবাহের আগে তাঁর কোন বন্ধুবান্ধবের বিবাহ হয়েছে এমন কথা ভাগবত বা চরিতামৃতে নেই। স্বয়ং মুরারিও তাঁর 'কড়চা'তে এমন কথা লেখেন নি। এরপর আসছি চৈতন্যের মাতৃদেবীর কথায়। আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি যে, জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী বিবাহত্তোর কালে পর পর অনেকগুলি সন্তান শচীদেবীর গর্ভে আসে। কিন্তু ভূমিষ্ট হবার অব্যবহিত পর সকলে মারা যায়। এই মৃত সন্তানগুলি পুত্র না কন্যা সন্তান ছিল বলা মুশকিল। এ প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত আছে।' যেমন কবিরাজ গোস্বামীর কথা প্রথমে ধরা যায়। চরিতামৃত রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন যে, আট আটটি কন্যা সন্তানের মৃত্যুর পর চৈতন্যের বড়ো দাদা বিশ্বরূপের জন্ম হয়।

'জগন্নাথমিশ্রপত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে।।
অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ।।
তবে পুত্র জন্মিলা বিশ্বরূপ নাম।'
[চৈ. চরিতামৃত/আদি/ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ]

চৈতন্যের আদি জীবনীকার মুরারি গুপ্তও সেই একই কথা বলেছেন (কড়চা ১।২।৫-১১)। চৈতন্য ভাগবতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ

'বহুকন্যা-পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ।।'
[চৈ. ভাগবত ১।২।১৩৬]

অন্যত্র 'অদ্বৈত মঙ্গলে' বলা হয়েছে, জগন্নাথ শচীদেবীর ছয়টি পুত্রের মৃত্যুর পর শচীদেবীর সপ্তম গর্ভে বিশ্বম্ভর ও অষ্টম গর্ভে বিশ্বরূপ (চৈতন্যের) জন্ম হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মুরারি ও কবিরাজ গোস্বামীর বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ডঃ সেনের মতে, 'বড় ছেলে বিশ্বরূপ। তাহার পর কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস/প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ/পৃঃ-২৭৮)। এরকম একটি তথ্য শ্রী সেন কোথায় পেলেন বলা দুষ্কর। তবে যেখানেই পান আদি জীবনীকার মুরারির বক্তব্যের চেয়ে তা সত্য হতে পারে না।

বিবাহকালে চৈতন্যমাতা শচীদেবীর ঠিক কতো বয়স ছিল জানা যায় না। তবে বয়স যাই হোক তদানীন্তন বিবাহ সময়সীমা অনুমানে খুব অল্প বয়সে যে তাঁর বিবাহ হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।



বিবাহের পর আটটি সন্তানের মৃত্যু। ও তারপর নবম গর্ভে বিশ্বরূপ ও দশম গর্ভে বিশ্বম্ভর (চৈতন্যের) জন্ম হয়। বিশ্বরূপ চৈতন্যের চেয়ে ৭/৮ বছরের বড়ো ছিলেন। সুতরাং একটা আনুমানিক হিসেব করলে দেখা যাবে, চৈতন্যের প্রথম বিবাহকালে শচীদেবী খুব একটা বৃদ্ধা ছিলেন না। সে কারণে, কর্মক্ষমহীন বৃদ্ধা মায়ের সহায়তার জন্য চৈতন্য বিবাহে মনঃস্থির করেছিলেন এমন কথা বলা যায় না। আর তাই যদি হতো, চৈতন্যের প্রথম বিবাহকালে শচীদেবী কর্মক্ষমহীন বৃদ্ধা হতেন, তাহলে, চৈতন্যের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যে বনমালী ঘটক এসেছিল তাঁকে শচীদেবী 'পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পড়ুক আগে, তবে কার্য্য আর।।' বলে বিদেয় করে দিতেন না। অন্তত নিজের বয়সের কথা ভেবে বনমালী ঘটকের এ'হেন প্রস্তাবে তিনি সাড়া দিতেন। তা দেননি।

তো বনমালী ঘটক শচীদেবীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেশ দুঃখ মনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর 'মিশন' সফল হলো না।

'আইর কথায় বিপ্র রস না পাইয়া
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া।।'
[ভাগবত/১।৭।৫৮]

এমন সময় পথে চৈতন্যের সাথে দেখা। বনমালীকে দেখে চৈতন্য দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। শুধালেন, কোথায় গেছলে, কার বাড়িতে ? বনমালী ঘটক বললেন, গেছলাম তোমাদেরই বাড়িতে, তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তোমার মায়ের কাছে। কিন্তু তোমার মা কিছুতেই রাজী হলেন না। সব শুনে চৈতন্য খানিক গুম হয়ে রইলেন। পরক্ষণে হেসে উঠলেন। বনমালী ঘটককে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। বাড়িতে ঢুকে চৈতন্য মা শচীদেবীকে হাসতে হাসতে বললেন, 'মা, বনমালী ঘটককে ওইসব বলে না বিদায় করলেই পারতে।' পুত্রের কথার ইঙ্গিত মা শচীদেবী বুঝতে পারলেন। সুতরাং পরের দিনই বনমালী ঘটককে ডেকে পাঠালেন তিনি। বনমালী আসতেই শচীদেবী বললেন, 'ঘটক ঠাকুর, কাল তুমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলে আমি তাতে রাজী হতে পারিনি। কিন্তু আজ আমি রাজী। তুমি সত্বর নিমায়ের জন্য একটি পাত্রী দেখো।' বনমালী ঘটক এই শুনে সোজা চলে এলেন বল্লভাচার্যের বাড়িতে। এসেই বল্লভ আচার্যকে বললেন, 'শোনো, আমার হাতে একটি পাত্র আছে, পুরন্দর মিশ্রের পুত্র নিমাই। ভালো নাম বিশ্বম্ভর। চমৎকার ছেলে। লেখাপড়ায় বেশ পণ্ডিত। যদি চাও তোমার মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে পারো।' শুনে বল্লভ আচার্য সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন নিমায়ের সাথে যদি বিবাহ হয় এতো আমার মেয়ের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমি বড়ই গরীব। পঞ্চ হরিতকী ব্যতীত কন্যার বিবাহে আমি কিছুই আর দিতে পারবো না। অবশেষে পাঁচটি হরতকীর বিনিময়ে শচীদেবী পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী হয়ে গেলেন।

অবশ্য মুখে 'পঞ্চ হরিতকী' বললেও বল্লভ আচায পাঁচটি হরতকী দিয়ে কন্যার বিবাহ সারেন নি। তিনি কন্যাকে সালাঙ্কাবে ভূষিতা করেই শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া নিমায়ের বিয়েতে যে অনেক বরযাত্রী গেছলো চৈতন্য চরিতে তারও উল্লেখ আছে। এতে প্রমাণিত হয়, বল্লভ আচার্য খুব একটা নির্ধন ছিলেন না। তবু তিনি কেন 'পঞ্চ হরিতকী'র কথা বলেছেন বলা মুশকিল। হয়তো কন্যার বিয়েতে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার এটাই বিনয়। আবার অন্য কারণও থাকতে পারে।

কিন্তু এ পর্যন্ত আলোচনার পরও একটা ধন্দ থেকে গেল। সেটা কি ? বিপ্র বনমালী ঘটক যে কন্যাটির সম্বন্ধের ব্যাপারে নিমায়ের মার কাছে এসেছিলেন নিমাই কি সেই কন্যাটিকে চিনতেন ? সেই কন্যার সাথে কি নিমাই ওরফে চৈতন্যের পূর্ব পরিচয় ছিল ? এবং বনমালী ঘটক যে সুনির্দিষ্ট কন্যার সম্বন্ধ নিয়ে শচীদেবীর কাছে এসেছিলেন এটাও কি চৈতন্য পূর্বার্ধে জানতেন ? তা না হলে, একজন বিবাহ ইচ্ছুক তরুণ ঘটক বনমালীর কাছে কন্যাটির বিষয়ে কিছুই জানতে চাইলেন না কেন ? যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই এ কৌতূহল স্বাভাবিক ছিল। তারপর বনমালী যখন শচীদেবী কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের কথা বললেন তখন চৈতন্যকে বেশ চিন্তিত হতে দেখা গেল। অনেকক্ষণ মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। 'শুনি তান বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।' এরপর বনমালিকে আশ্বাসন, প্রবোধ বা সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন চৈতন্য। এসে হাসতে হাসতে মাকে বললেন, মা বনমালী ঘটককে ওইরকম ভাবে না ফিরিয়ে দিলেই পারতে। 'আচায্যের সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে ?' এই 'কেনে' শব্দটির পর একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে। এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন চৈতন্য চরিতামৃত বা চৈতন্য ভাগবতে গড় একশো পয়ারেও একটা মিলবে না। সুতরাং মা শচীদেবীর প্রতি চৈতন্যের এ' জিজ্ঞাসা খুবই অর্থবহ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এবং এতে করে এই প্রত্যয়ই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বনমালী ঘটকের হয়ে কথা বলা চৈতন্যের শুধু বিবাহ ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র নয়, বিবাহ ইচ্ছুক কন্যাটির প্রতিও আনুগত্যের প্রকাশ।



আসলে এই কন্যাটিকে চৈতন্য পূর্বার্ধেই চিনতেন। বেশ ভালোরকমই পরিচয় ছিল। মেয়েটির নাম লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীপ্রিয়া। ওই বল্লভ আচার্যেরই মেয়ে। লক্ষ্মীর সাথে চৈতন্যের পরিচয় ও পরিচিতি ছিল অনেক দিন আগে থেকেই। বলতে গেলে সেই ছেলেবেলা কিশোর বয়স থেকেই। উভয়ের প্রথম পরিচয়টা হয়েছিল বেশ 'রোম্যান্টিক' ভাবে। নির্জন গঙ্গার ঘাটে প্রথম উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলো। লক্ষ্মী সিনান-টিনান করে দেবতার পূজা দিতে এসেছিলেন। বোধহয় শিব পূজা দিতে এসেছিলেন। কুমারী মেয়ের ক্ষেত্রে বুড়ো শিবের পূজা দিতে আসাই সম্ভব। লক্ষ্মীর হাতে ফুলের সাজি ও নৈবেদ্যের থালা ছিল। তাতে ছিল পুষ্প, চন্দন ও একখানা মল্লিকার মালা। এমন সময় নিমাইএর সঙ্গে দেখা।

কিশোর চৈতন্য দলবল বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রায়শ গঙ্গার ঘাটে আসতেন। বিশেষত স্নানের সময়। এসময় নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা গঙ্গাস্নান করতে আসতেন। চৈতন্য এসব টিকিঅলা বামুন ঠাকুরদের ওপর দারুণ উপদ্রপ চালাতেন। কারু গায়ে জল ছিটিয়ে দিতেন, কারো গায়ে কুলকুচা ছুঁড়ে দিতেন। ডুব সাঁতার দিয়ে কারু ঠ্যাং ধরে গভীর জলে টেনে নিয়ে যেতেন, কারু কানে জল ঢুকিযে দিয়ে কাঁদাতেন, লম্ফদিয়ে কারু পিঠে, কাঁধে চড়ে বসতেন। এই ভাবে ব্রাহ্মণদের শিবলিঙ্গ চুরি, পুজোর নৈবেদ্য চুরি, পুঁথি চুরি থেকে শুরু করে তাঁদেব পরণের উত্তরী ধুতি পর্যন্ত টেনে খুলে দিতেন চৈতন্য।

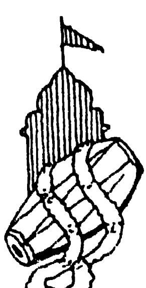
শুধু ব্রাহ্মণদেরই নয়, নবদ্বীপেব কুমারী মেয়েদেরও কম জ্বালাতেন না চৈতন্য। কৃষ্ণেব মতো তাদের বসন চুরি করতেন। কারু গায়ে 'বালুকা' মাখিয়ে দিতেন। কারু মুখে কুলকুচার জল ছুঁড়ে দিতেন। কাক চুলে 'ওকড়ার' ফল ঢুকিয়ে দিতেন। কারু বা পূজার জন্য আনা ফলমূল নৈবেদ্য জোর করে কেড়ে খেয়ে ফেলতেন।

এই নিয়ে শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্রের কাছে ভুরি ভুরি নিমায়ের নামে নালিশ আসতো। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা করতো। পাড়া প্রতিবেশী কুমারী মেয়েরা আসতো। শচীদেবী তাদের এই বলে আশ্বাস দিতেন যে নিমাই এলেই তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবো। 'নিমাঞি আইলে আজি এড়িমু বান্ধিয়া।' মিশ্র পুরন্দর তর্জন গর্জন করে চৈতন্যের খোঁজে গঙ্গার ঘাটে যেতেন। কিন্তু চৈতন্য ততোক্ষণে হাওয়া। কোন ফল হতো না।

এহেন দুষ্টু নিমাঞির সাথে লক্ষ্মীপ্রিয়ার দেখা হয়ে গেল গঙ্গার ঘাটে। লক্ষ্মী একাকী এসেছিলেন পুজো দিতে। হাতে পুজোর থালা। ফুল চন্দন। সদ্যস্নাতা পূজারিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া নিমাইকে দেখলেন। নিমাই অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়ার দিকে। নিমায়ের অপূর্বকান্তি চেহারা দেখে লক্ষ্মীরও চোখের পলক পড়ছিল না। উভয়ে উভয়ের দিকে পরমতম বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন।

'একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান।।
তারে দেখি প্রভুব হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মীর চিত্তে প্রীতি পাইল প্রভুর দরশন।।
সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তনু হইল নিশ্চল।।'

[চৈ. চরিতামৃত/আদি/চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ]



বলা যেতে পারে এ এক অত্যুৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা। দুই কিশোর কিশোরী 'সাহজিক প্রীতি'-তে উভয়ে উভয়ের কাছে বাঁধা পড়লেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া এসেছিলেন শিব পূজোর ডালি সাজিয়ে। কিন্তু নিমেষে সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল। কুমারী তনু-মন উচ্ছলিত, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো অন্য এক ইপ্সিত শিবের জন্য। দেবপূজা আর হলো না। সুচারু

রূপে গাঁথা মল্লিকার মালাখানি লক্ষ্মীপ্রিয়া পরম প্রীতিভরে তুলে দিলেন নিমায়ের গলদেশে। পূজার জন্য আনা সচন্দন ফুলগুলি ছড়িয়ে দিলেন নিমায়ের সর্বাঙ্গে। এভাবে দেবপূজার পরিবর্তে এক মানুষের পূজা করে সানন্দে বাড়ি ফিরে গেলেন কুমারী লক্ষ্মীপ্রিয়া।

তারপর বেশ কিছুদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হলো না। না হবার কারণ ছিল। এসময় চৈতন্যের মনের ওপর বেশ বড়ো রকমের দুটো ঝড় বয়ে গেল। প্রথম আঘাত পেলেন বড়ো ভাই বিশ্বরূপের গৃহত্যাগজনিত কারণে। বিয়ের নাম শুনে বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে পালালেন বিশ্বরূপ। তারপরেই এলো আরেক আঘাত। মোক্ষম আঘাত। বাবা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু। সম্ভবত বড়ো ছেলে বিশ্বরূপের গৃহত্যাগজনিত শোকেই তাঁর মৃত্যু হলো। বড়ো ছেলে বিবাগী, স্বামীর অকাল মৃত্যু এসব ব্যাপারে শচীদেবীও বেশ ভেঙে পড়লেন।

এসব পারিবারিক বিপদ আপদ কাটিয়ে উঠতে চৈতন্যের বেশ কিছুদিন কেটে গেল। আবার পড়াশোনায় মন দিলেন। টোলে যেতে লাগলেন। এই টোলে যাবার পথে লক্ষ্মীর সাথে হঠাৎই একদিন দেখা হয়ে গেল চৈতন্যের। লক্ষ্মী সম্ভবত গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। কারণ গঙ্গায় যাবার পথেই দেখা হলো। অবশ্য চৈতন্য ভাগবতে গঙ্গাস্নানের কথাই লেখা আছে। এখানে পড়তে যাওয়ার কথা নেই। ভাগবত লিখছে, 'দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেল গঙ্গাস্নানে। /গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইখানে।।' অর্থাৎ লক্ষ্মীর স্নানের সময় চৈতন্যও গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হলেন বা উপস্থিত ছিলেন। তারপর উভয়েই উভয়কে দেখে চিনে ফেললেন মুহূর্তে। ফেলে আসা পূর্ব স্মৃতি উভয়ের মনে উদিত হলো। সেই শিব পূজা করতে আসা, চৈতন্যের গলায় মাল্যদান, সব কিছু মনে পড়ে গেল। এখানে ভাগবতে আছে, 'নিজ লক্ষ্মী চিনিলেন হাসিলা গৌরচন্দ্র।' আর চরিতামৃতে রয়েছে, 'পূর্বে সিদ্ধভাব দুঁহার উদয় করিল।' দুই গ্রন্থকারের দুটি বক্তব্যই পূর্ব স্মৃতি রোমন্থনের পরিপূরক। বলা বাহুল্য, এ স্মৃতি দুঃখ জাত নয়, বরং বলা যায়, এক কিশোর কিশোরীর স্বভাব বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য্য চিত্ররূপ। তারপর দীর্ঘকাল অদর্শনের পর উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু কোন বাক্যালাপ হলো না। এমন তো হবার নয়। যে লক্ষ্মী চৈতন্যের গলায় মল্লিকার মালা তুলে দেন প্রণয় চিহ্নরূপে, সেই চিহ্নিত স্মৃতির সমুজ্জ্বল অভিজ্ঞতা তো কোন মানুষকে নীরব থাকতে দেয় না। তাই লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে নিমায়ের নিশ্চয়ই বাক্যালাপ কিছু হয়েছিল। এক্ষেত্রে চৈতন্যভক্ত চরিতকারগণ ভগবান চৈতন্যকে নিছক মানুষের মতো চিরাচরিত প্রেমাস্পদরূপে চিহ্নিত করতে চাননি। তবে একথাও সত্য, তাঁদের বর্ণিতব্য আখ্যায়িকার মধ্যে লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রেমিক চৈতন্যকে খুঁজে পেতে খুব বেশি আমাদের ভাবিত করে না।



তারপর ঠিক এই দিনই বনমালী ঘটক এসে হাজির হলেন চৈতন্য জননী শচীদেবীর কাছে। শচীদেবী গররাজী হয়ে ঘটককে ভাগিয়ে দিলেন। ঘটক ঠাকুরের সাথে রাস্তায় চৈতন্যের দেখা হলো।

অনুপূর্বক সব শুনে মা'র সাথে কথা বললেন চৈতন্য। একই দিনে পর পর এতোগুলো ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনার আদ্যপান্ত বিবরণ দেখে বেশ গোলমাল ঠেকছে। তবে কি চৈতন্যই বনমালী ঘটককে মা শচীদেবীর কাছে পাঠিয়েছিলেন? জানি না। পাঁচশো বছর পরে জানার উপায়ও নেই। তবে তা যদি সত্য হয়, তবে সে সত্যের কাছে ভালোবাসা স্থগিত থাকবে।

অতঃপর পুত্রের মনোভাব দেখে শচীদেবী রাজী হয়ে গেলেন এ বিয়েতে। কন্যার পিতা বল্লভাচার্যের কথামতো 'পঞ্চ হরিতকী'র বদলে পুত্রবধূকে তিনি ঘরে আনতে রাজী হয়ে গেলেন। মধ্য যুগে একজন পাত্রের মায়ের দিক থেকে এ ধরণের সিদ্ধান্ত খুবই বিস্ময়কর। কারণ সেটা ছিল সোনারূপার ওজনে পুত্রবধূ ঘরে আনার যুগ। অর্থাৎ ঘোরতর পণপ্রথার যুগ। তবু শচীদেবী সম্ভবত পুত্রের মুখ চেয়ে এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

অবশেষে স্বনির্বাচিত পাত্রীর সাথে চৈতন্যের বিবাহ স্থির হলো। কোন চৈতন্য চরিতে বিবাহের দিনক্ষণ বা মাসের উল্লেখ নেই। তবে শুভদিনে বিবাহের 'অধিবাস' হয়েছিল বলে জানা যায়। অধিবাসের দিন বেশ কিছু ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শচীদেবী। চৈতন্যের শ্বশুর মশাই বল্লভ আচার্য বা বল্লভ মিশ্র (চৈ ভা ১।৭।৭৬) যথাবিধি জামাতার বাড়িতে এসে অধিবাস অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। পরদিন প্রভাতে ঘুম ভেঙে গেল চৈতন্যের। প্রথম স্নান ও পিতৃগণের তর্পন সমাপন করলেন। বাড়িতে ততোক্ষণে পুরোমাত্রায় বিবাহ উৎসব শুরু হয়ে গেছে। নাচ গান সেই সঙ্গে বিয়ের বাজনা। তৎকালীন বিবাহ বা ওই জাতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সম্ভবত নাচ গানের আসর বসতো। আরও জানা যাচ্ছে, চৈতন্যের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক জনের সমাগম হয়েছিল। অনেক ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় স্বজনেরা এসে ছিলেন। অনেক প্রতিবেশী এয়োতি মেয়েরাও এসেছিলেন। এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে তাদের খই, কলা, সিন্দুর, তাম্বুল, তৈল প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়েছিল।

সন্ধ্যা নাগাদ বরবেশী চৈতন্য এসে পৌঁছালেন পাত্রীপক্ষের বাড়িতে। সঙ্গে বরযাত্রীদল। বল্লভাচার্য জামাতাকে বরণ করলেন। এরপর পাত্রী সালঙ্কারা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে আনা হলো ছাতনাতলায়। সাত বার প্রদক্ষিণ করে জোড় হাতে চৈতন্যের সামনে এসে দাঁড়ালেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। মাল্যদান হলো। বর কনে দু'জনার চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস। শেষে একটি মালা চৈতন্যের পায়ের ওপর নামিয়ে প্রণাম করলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। বরের পায়ে মালা দিয়ে প্রণাম করা দেখে সবাই 'হরিবোল হরিবোল' বলে চিৎকার করে উঠলো। এরপর শুরু হলো কন্যা সম্প্রদানের অনুষ্ঠান। চৈতন্যের বাম পাশে বসলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। বল্লভ আচার্য যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করলেন। এসময় বেশ হর্ষোৎফুল্ল দেখাচ্ছিল বল্লভাচার্যকে। এরপর কিছু মেয়েলি অনুষ্ঠান হলো। অবশেষে বাসরঘর। আর বাসরঘর মানেই মেয়েদের আখড়া।



সম্ভবত বাসরঘরে চাঁদ সদাগর পুত্র লখীন্দরের অকালমৃত্যুজনিত আখ্যায়িকা থেকেই 'বাসর জাগা' প্রথা চালু হয়। এর মূল উদ্দেশ্য কোনক্রমে নব বরবধূকে ঘুমোতে না দেওয়া। আর এ বাসর জাগার ভার থাকে পাড়া প্রতিবেশী কিছু যুবতী মেয়ে ও নববধূর বান্ধবীদের ওপর। চৈতন্যের সময় এ নিয়ম ছিল। এখনও আছে। তবে চৈতন্যের বিয়ের বাসরে নববধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার কোন বান্ধবী অংশ নিয়েছিলেন কি না জানা যায় না। তবে লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, চৈতন্যের বিয়ের সময়, বাসরঘরে বেশ কিছু যুবতী বধূ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং উক্ত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে বরবেশী বিশ্বম্ভরকে জড়িয়ে ওইসব কুলবধূদের বেশ কিছু আপত্তিকর, পীড়াদায়ক ইংগিত পাওয়া যায় যথা—,

'বসন বচন সব স্খলিত হইল।
নয়ন অলসযুত কাহারো হইল।।
কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ—রসভরে।
ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বম্ভর কোলে।'

['চৈতন্যমঙ্গল'/আদি/পৃঃ-৩৮]

এমন কি চৈতন্যের বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান 'জল সাওযা'-এর সময়ও বিশ্বম্ভর ও নদীয়া নাগরীদের জড়িয়ে এরকম কিছু দেহ তাত্ত্বিক পদের উল্লেখ করেছেন লেখন। যথা—

গৌরাঙ্গের নয়ন সন্ধান শরাঘাতে।
মানিনীর মান মৃগ পলায় বিপথে।।
অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মাতঙ্গ ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন।

['চৈতন্যমঙ্গল'/আদি/পৃঃ-৩৪]

সন্দেহ নেই, খুবই সাংঘাতিক ইংগিত। তবে এই মুহূর্তে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ আলোচনায় না গিয়ে আমরা বরং বিশ্বম্ভর অর্থাৎ চৈতন্যের বিয়ের পরবর্তী আখ্যায়িকায় ফিরে যাই।

এক রাত শ্বশুর বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন নববধূকে নিয়ে বিশ্বম্ভর দোলা (পাল্কী) যোগে বাড়ি ফিরে এলেন।

"সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর দিনে।
নিজগৃহে আইলা মহাপ্রভু লক্ষ্মী-সনে।।"



নববধূ সহ বিশ্বম্ভর যখন বাড়ির দরজায় এসে থামলেন ততোক্ষণে নবদ্বীপের আকাশে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাড়া প্রতিবেশীরা নিমাঞির বউ দেখতে ছুটে এলো। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো নববধূ সাজে সজ্জিতা লাজনয়না লক্ষ্মীপ্রিয়াকে দেখে।

"কেহো বোলে 'ইন্দ্র শচী, রতি বা মদন।'
কোন নারী বোলে "এই লক্ষ্মী নারায়ণ।।"
কোন নারী বোলে "যেন সীতারাম।"
দোলায় শোভিয়া আছে অতি অনুপাম।।"

এবপব শচীদেবী অন্যান্য বিপ্রপত্নীদের উলুধ্বনি দিয়ে বধূমাতাকে ববণ কবলেন। সেই সঙ্গে বিপ্র ও বাজনিঞাদেব্র টাকাকড়ি ও বস্ত্রাদি দিয়ে তুষ্ট করলেন।

পরদিন নব বরবধূর ফুলশয্যা।

ওড়িশী ভাষায় চৈতন্যের অন্যতম জীবনীকার ঈশ্বরদাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' নামক গ্রন্থে চৈতন্যের ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার ফুলশয্যার রাতটি অতি মনোরমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। (লক্ষ্মীপ্রিযার নাম এখানে সত্যবতী)।

ফুলশয্যায় চৈতন্য ও সত্যবতী (লক্ষ্মীপ্রিয়া) পাশাপাশি শুয়ে আছেন। চৈতন্য একবার ঈশ্বরকে স্মরণ নিলেন। তারপর ডান হাতখানা বাড়িয়ে আলতো করে সত্যবতীর গায়ে রাখলেন।

"ভো বিহি বিধাতা সুমরি। দক্ষিণ ভুজ তোলি করি।
সতী পবে দেলে নেই। সন্তোষ দেবী বইদেহী।"

নববধূ চৈতন্যেব পিছন ফিবে শুযেছিলেন। স্বামীর ডান হাতখানা গায়ে এসে লাগতে মনে মনে বেশ আনন্দিত হলেন।

যদিও মুখে কিছু বললেন না, হাতখানা গায়ের ওপর রাখতে নববধূ যে খুশী হযেছে চৈতন্য সেটা বুঝতে পেরে নববধূব সাথে আবেকটু ঘনিষ্ঠ হলেন। দু হাতে নববধূব মুখখানা কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন কবলেন।

"ভবসা পাইলে গোসাঁই। .
বদন লেউটাই কোল। হৃদে লাগান্তি আদিমূল।
চুম্বিলে মধুর বদন। শ্রীচৈতন্য শচীনন্দন।"

[৩৯ অধ্যায়]

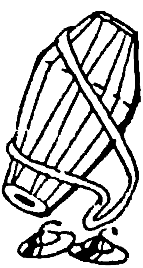
এরপর নববধূর লজ্জা কিছুটা কাটলো। শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। একপাত্র গঙ্গাজল নিয়ে এলেন। তারপর স্বামী চৈতন্যের হাতে সেই গঙ্গাজল দিযে বললেন, 'শপথ করো, বলো, আমাকে সতীন নিয়ে যেন কোনদিন ঘর করতে না হয়।'

"মোরে তজিন অন্য স্তিরী। কিভা নোহিব কম্বুধারী।
আম যুবতী সঙ্গে সঙ্গ। ন পুন করা শিরিরঙ্গ।
মোরে হোইব সপতনী। ন পুন করা কম্বুপানি।"

তখন চৈতন্য বললেন,

".. . বোইলে সত্য থিবা করি।
সত্য বোইলে দেব হেউ।"

[চৈতন্য ভাগবত/৩৯ অধ্যায়]•



দেখা যাচ্ছে, বিবাহের আগে চৈতন্যের আর্থিক অবস্থা বড়ো একটা ভালো ছিল না। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'- এর 'পূর্ব্বপ্রায় দরিদ্রতা– দুঃখ এবে নাঞি' (১৷৭৷১২৫) পয়ারটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তাই-ই সূচিত করে। তবে লক্ষ্মীপ্রিয়া বধূ হয়ে আসার পর বাড়ির অবস্থার যে বেশ উন্নতি হয়েছিল তাও জানা যায়। যথা—

"এই লক্ষ্মী বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে।"

[চৈ. ভাগবত/১।৭।১২৬]

এতে বোঝা যাচ্ছে, আমরা যাকে 'পয়মন্ত' বলি লক্ষ্মীপ্রিয়া তেমনই এক পয়মন্ত বধূ হয়ে চৈতন্যের ঘরে এসেছিলেন। সুন্দরীও ছিলেন অসাধারণ। সুদর্শন বিশ্বম্ভরের পাশে অনিন্দ্যসুন্দর লক্ষ্মীপ্রিয়া তাই পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে "ইন্দ্র শচী, রতি বা মদন" হয়ে উঠেছিলেন।

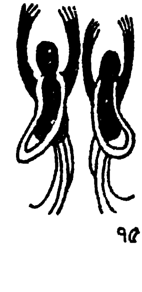
চৈতন্য চরিত পাঠক মাত্রই জানেন, শিশুকাল থেকেই চৈতন্য কি রকম এক অসুস্থ প্রকৃতির ছিলেন। হঠাৎ হঠাৎ মুর্চ্ছা যেতেন। একে ওকে তেড়ে মারতে যেতেন। ঘরের• জিনিষপত্র ভাঙচুর করতেন। চৈতন্যচরিতকাররা একে বায়ু- দেহ মান্দ্য— অর্থাৎ বায়ুরোগের প্রভাবে দেহের মান্দ্য (মন্দতা, অসুস্থতা) বলেছেন। তো লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করার পর এ ধরনের বায়ু রোগ বা রোগের বিকার মাঝে মাঝে দেখা যেত চৈতন্যের মধ্যে। এসময় চৈতন্য আপন মনে কাঁদতেন, কখনো বা হাসতেন হা হা করে একটানা, কখনো বা ধেইধেই করে নাচতেন অথবা গান গাইতেন। কখনো বা বিকট বিকট হুংকার দিতেন, লম্ফঝম্ফ দিতেন, সামনে যাকে পেতেন তাকেই মারতে যেতেন। এবং সেই সঙ্গে ঘনঘন মুর্চ্ছা। তখন শচীদেবী পাড়া প্রতিবেশী বিশেষ করে মুকুন্দ-সঞ্জয় (এঁর চণ্ডী মণ্ডপে চৈতন্য টোল খুলেছিলেন) এবং বুদ্ধিমন্তখান (ইনি নবদ্বীপের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন) প্রভৃতিকে বাড়িতে ডাকতেন। এসময় চৈতন্যের মাথায় বায়ুরোগের ওষুধ হিসেবে বিষ্ণুতেল, নারায়ণ তেল প্রভৃতি মালিশ করা হতো।

এদিকে চৈতন্যের লম্ফঝম্ফ, হুংকার, চিৎকার, চ্যাঁচামেচি শুনে ততোক্ষণে পাড়ার অন্যান্য প্রতিবেশীরাও এসে হাজির হতো। এবং চৈতন্যের পাগলপ্রায় অবস্থা দেখে তারা বলাবলি করতো,

কেহো বোলে "হইল দানব-অধিষ্ঠান।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি ডাকিনীর কাম।।"
কেহো বোলে "সদাই করেন বাক্য-ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু, জানিহ নিশ্চয়।।"

[চৈ. ভাগবত/১।৮।৭৯ ৮০]

• উক্ত ওড়িয়া কবি ঈশ্বরদাস প্রসঙ্গে চৈতন্য গবেষক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, 'চৈতন্য ভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৫০/১৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত হয় মনে করা যাইতে পারে। (চৈতন্য চরিতের উপাদান/পৃঃ ৪৯৬)। অন্যত্র গবেষক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'A History of the Modieval Vaishnavism in Orissa' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Thus Iswara Das lived possible in the first half of the 17th century.' PP-88.



তবে বায়ুর আধিক্যজনিত রোগে চৈতন্য সর্বক্ষণ অসুস্থ থাকতেন তা নয়। মাঝে মাঝে এ ধরনের অসুস্থতা বেড়ে যেত। এবং যখন বাড়তো তখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করতো। তখন পাড়া প্রতিবেশী তো বটেই স্বয়ং শচীদেবী (পরবর্তী কালে বিষ্ণুপ্রিয়াও) ভয় পেতেন চৈতন্যকে দেখে।

"সর্ব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুংকার শুনিয়া ভয় পায় সর্ব্বজন।।"

[চৈ ভা. ১।৮।৭৫]

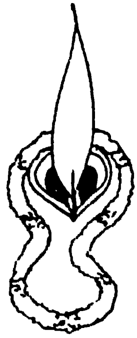
"হেন মূর্চ্ছা হয়, লোকে দেখি ভয় পায়।।"

[ঐ ১।৮।৭০]

আবার যখন সুস্থ থাকতেন তখন বেশ ভালোই থাকতেন। তখন চৈতন্যকে মনে হতো একেবারে পাকাপোক্ত সংসারী। মা, স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সুখী করতে, সংসারে অর্থাগমের নিমিত্তে, চৈতন্য মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলেছিলেন। এখানে মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র ছাড়াও নবদ্বীপের আরও বেশ কিছু ছাত্র অধ্যায়ন করতে আসতো। এতে কিছু অর্থাগমও হতো। ছাত্রদের সঙ্গে চৈতন্যের বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। দেখা যাচ্ছে, নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদের সাথে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন। গুরু শিষ্যরা এক সাথে সাঁতার কাটতেন। গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি ফিরে বিষ্ণুপূজা করতেন চৈতন্য। তারপর তুলসী গাছে জল দিয়ে ভোজনে বসতেন। পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীর জন্য অন্ন ব্যাঞ্জনের থালা সাজিয়ে দিতেন। চৈতন্যের আহারের সময় পাশে বসে থাকতেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। আহারান্তে চৈতন্য পান খেতেন। তারপর শয়ন। এসময় বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়া চৈতন্যের পদসেবা করতেন—অর্থাৎ পা টা টিপে দিতেন। মনে হয় স্বামীকে ঘুম না পাড়িয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া ভোজনে বসতেন না। এসব সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে স্বামী চৈতন্যের বেশ সদ্ভাব ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার জন্য ধার করে শাড়ি, শাঁখা, প্রভৃতি কিনতে দেখা যাচ্ছে চৈতন্যকে।

লক্ষ্মীপ্রিয়া কিশোরী বয়সে চৈতন্যের সংসারে এসেছিলেন এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু স্বল্প বয়স্কা কিশোরী হলেও তিনি গৃহকর্মে বেশ নিপুণা ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতের (১।১০।৩৯) পয়ারে বলা হয়েছে,

"উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম।
আপনে করেন সব, সেই তার ধর্ম্ম।।"



দেখা যাচ্ছে, হঠাৎই দশ-বিশজন সন্ন্যাসী ফকিরকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসতেন চৈতন্য। মা-কে খবর পাঠালেন রান্না-বান্না করতে। অথচ ঘরে কিছুই নেই। "ঘরে কিছু নাহি আই চিন্তে মনে মনে।/কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইব কেমনে ?" পুত্রের কাণ্ড দেখে শচীদেবী চিন্তিত। অতঃপর রান্নার উপকরনাদি চাল ডাল কোন প্রকারে (কিভাবে জানা যায় না) যোগাড় হয়। কিন্তু দশ-বিশজন মানুষের রান্না করবে কে ? সে ভার কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়া হাসিমুখে নিজের হাতে

তুলে নেন। কিশোরী পুত্রবধূর কাজকর্মে আচার ব্যবহারে শাশুড়ী ঠাকরুণ শচীদেবীও বেশ খুশী হয়েছিলেন।

"লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাড়ে অতি।।"

আর লক্ষ্মীপ্রিয়া যে রীতিমতো স্বামী সোহাগিনী ছিলেন তা বৃন্দাবন দাসের এই পয়ারটি পড়লেই বেশ অনুমান কর যায়।

"লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর।।"

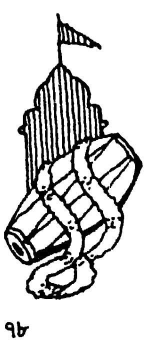
এরপর একটি দুরুহ কাজ সমাধা করে পূর্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করলেন চৈতন্য। দুরুহ কাজটি হলো, সে যুগের দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্য যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। এই দ্বিগ্বিজয়ী দিগ্‌গজ পণ্ডিতটির কি নাম ছিল তা কোন চৈতন্য চরিতে এমন কি কোন প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থেও উল্লেখ নেই। তবে 'ভক্তিরত্নাকর'-এর মতে (এর লেখক নরহরি চক্রবর্তী নামান্তর ঘনশ্যাম) এই পণ্ডিতের নাম কেশব ভট্ট বা কেশব কাশ্মিরী। বহু হাতী, ঘোড়া, পাল্কী-বেহারা নিয়ে হৈ চৈ করে কেশব কাশ্মিরী নবদ্বীপে এসেছিলেন পণ্ডিত্যের বড়াই করতে। কিন্তু 'গঙ্গা' নদী প্রাসঙ্গিক বিতর্কে চৈতন্যের কাছে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন তিনি। মনে হয়, নবদ্বীপ অঞ্চলে এটাই প্রথম চৈতন্যের বড়ো মাপের বিজয়। এতে করে শান্তিপুর নবদ্বীপ অঞ্চলে চৈতন্যের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দুটোই বেড়ে গেছলো। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্কযুদ্ধ বলে যা বোঝায় কেশব কাশ্মিরীর সাথে চৈতন্যের সেরকম কিছু হয় নি। গঙ্গা প্রসঙ্গে কাশ্মিরী নিজেই কিছু শব্দ অলঙ্কারগত ভুল বলেছিলেন। চৈতন্য সেটা পরোক্ষ ভাবে ধরিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র।*

এরপর চৈতন্য জল পথে পূর্ববঙ্গ যাত্রা করলেন। সম্ভবত প্রাক সন্ন্যাস জীবনে চৈতন্যের এটাই প্রথম কোন দূর দেশে ভ্রমণ। যাবার আগে মায়ের অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি। প্রথমে পাননি। পরে পুত্রের নির্বন্ধে অর্থাৎ পীড়াপীড়িতে মা শচীদেবী রাজী হলেন। এরপর পত্নী

*দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী গঙ্গা প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি শ্লোক বলেছিলেন। তার মধ্যে একটি শ্লোকের ভুল ধরেছিলেন চৈতন্য। শ্লোকটি হলো, "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরনকমলোৎ পত্তিসুভগা। / দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা ভবানী-ভর্তুর্ষা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।।" চৈতন্য এর উত্তরে বলেছিলেন, "পঞ্চদোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার / ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার।।" (চৈ. চরিতামৃত ১।১৬।৪২-৫১)। এর এই শ্লোকটির মাধ্যমে তিনি কেশব কাশ্মিরীর 'পঞ্চদোষ' ব্যাখ্যা করেছিলেন, "অনুবাদমনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ / ন হলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি।।" অতঃপর কাশ্মিরী নিজের ভুল বুঝে চৈতন্যের কাছে নিজের হার স্বীকার করলেন।



লক্ষ্মীপ্রিয়ার কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললেন, "লক্ষ্মী-প্রতি বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর/আইর সেবন করিবারে নিরন্তর।" স্বামীকে দূরদেশ ভ্রমণে ছেড়ে দিতে লক্ষ্মীপ্রিয়ারও ইচ্ছা ছিল না। কোন নববধূর এমন বাসনা থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু তরুণ চৈতন্য কিশোরী বধূকে নিঃসঙ্গ করে পূর্ববঙ্গে পড়ি দিলেন। কেন ? তিনি কি ধর্মপ্রচারার্থে পূর্ববঙ্গে গেছলেন ? নাকি পাণ্ডিত্য প্রচার করাবর জন্য ? মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় পাণ্ডিত্য প্রচার একটা রেওয়াজ ছিল। সেসময় অনেক বাঘা বাঘা পণ্ডিত বিভিন্ন প্রদেশে যেতেন (পরবর্তীকালে) রাজদরবারে অমন্ত্রিত হতেন। সেখানে পণ্ডিতে পণ্ডিতে ডিবেটিং হতো। ভারতবর্ষে আর্যাবর্তে এরকম ঘটনা তো কালিদাসের কাল থেকে এসে যাচ্ছে। 'এপিক' পিরিয়ডেও ছিল। যেমন বকরূপী ধর্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাস্যের ঘটনা। শঙ্করাচার্যের জীবন-আখ্যানেও এরকম ঘটনার উল্লেখ আছে। যার জন্য নাকি তাঁকে মৃত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করতে হয়েছিল। চৈতন্য চরিতগ্রন্থে তেমনই এক নাম কেশব কাশ্মিরী। তরুণ পণ্ডিত চৈতন্য পাণ্ডিত্যাভিমানে পূর্ববঙ্গে যেতে পারেন। সেটা সম্ভব। কিন্তু সম্ভব হলেও তাঁর এ হেন উদ্দেশ্য গৌন ছিল। মুখ্যত তিনি (চৈতন্য) অর্থোপার্জনের নিমিত্তেই পূর্ববঙ্গে গেছলেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/ডঃ সুকুমার সেন/প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ/পৃঃ ২৭৯-৮০ দ্রষ্টব্য)। তবে অদ্বৈতাচার্যের কোন বিশেষ বার্তা নিয়েও তিনি পূর্ববঙ্গে যেতে পারেন। বিশেষ বার্তা বলতে রাজবিরোধী রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে। অদ্বৈত আচার্য রাজবিরোধী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন এমন সন্দেহ পূর্বেই করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তরুণ চৈতন্যকে তিনি দলে টেনেছেন। সেক্ষেত্রে অদ্বৈতের কোন বিশেষ 'বার্তা' নিয়েও পূর্ববঙ্গে পাড়ি দেওয়া চৈতন্যের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। গোপনে রাজবিরোধী সংগঠন কাজে তিনি চৈতন্যকে পূর্ববঙ্গে পাঠাতে পারেন। কারণ চৈতন্য যখন পূর্ববঙ্গে যাত্রা করেন তখন তাঁর বেশ কিছু বিশ্বস্ত ছাত্র ছাড়াও অদ্বৈতাচার্যের লোকজন চৈতন্যের সঙ্গে ছিল। তবে পূর্ববঙ্গে তিনি সঠিক কোথায় গেছলেন বা কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এমন বিবরণ কোন চৈতন্যচরিতে পাওয়া যায় না। শুধু একজনের নাম ছাড়া—তিনি তপন মিশ্র। পরবর্তী কালে যিনি চৈতন্যের ঘনিষ্টতম পার্ষদ হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়াও প্রদ্যুম্ন মিশ্র রচিত চৈতন্যচরিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী' গ্রন্থে আরেকটি বিবরণ আছে, উক্ত গ্রন্থের (৩।২০-২১) অংশে একটি আখ্যায়িকায় দেখা যাচ্ছে যে, শান্তিপুরে থাকাকালীন শচীদেবী একদিন পুত্র চৈতন্যকে বললেন, 'তোর জন্মের আগে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ আমাকে (স্বপ্নে ?) বলেছিলেন, তোমার গর্ভে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবে তাকে শীঘ্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, তাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে।' এবং সেজন্যই চৈতন্য—প্রপিতামহের বাস্তুভিটা পূর্ববঙ্গে গেছলেন বলে গ্রন্থের (৩।২৩) অংশে



উল্লেখ আছে।

এরপর প্রচুর জিনিষপত্র, দানসামগ্রী (এরমধ্যে সোনাদানাও ছিল) নিয়ে চৈতন্য নৌকা যোগে নবদ্বীপে ফিরে এলেন (চৈ ভাঃ- ১।১০।১০৮-১১১)। সেই সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের বেশ কিছু পড়ুয়া ছাত্রও চৈতন্যের সঙ্গে নবদ্বীপে চলে এলো বিদ্যাভ্যাসের জন্য। সন্ধ্যা নাগাদ বাড়িতে ফিরে এলেন চৈতন্য। যে সকল ব্যবহারিক দানসামগ্রী ও 'অর্থবিত্ত' এনেছিলেন সবকিছু মা শচীদেবীর হাতে তুলে দিলেন। (চৈ. ভাগবত ১।১০।১৫১-৫২)। এরপর পড়ুয়া শিষ্যদের নিয়ে চলে গেলেন গঙ্গাস্নানে। কিছুক্ষণ জলে সাঁতার-টাতার কাটলেন। তারপর বাড়ি ফিরে এসে আহারে বসলেন। সংসারে যে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে, মর্মান্তিক ঘটনা—চৈতন্য তখনো তার বিন্দুবিসর্গ শোনেন নি। বেশ তৃপ্তি সহকারে ভোজন সমাধা করে নিকটবর্তী বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে বসলেন। সেই সঙ্গে কিছু বন্ধু বান্ধব 'আপ্তবর্গ' এসে জুটলো। চৈতন্য সবার সঙ্গে খুব হাসি খুশি ভাবে কথা বলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ঠাট্টা মস্করাও চলছিল। চৈতন্য সদ্য পূর্ব্বঙ্গ থেকে প্রত্যাগমন করেছিলেন সুতরাং পূর্ব্বঙ্গের 'বাঙাল' ভাষা বলে বন্ধু বান্ধবদের হাসাতে লাগলেন। কিন্তু বন্ধুবান্ধব আপ্তবর্গ কিরকম নিরানন্দভাবে বসে রইলো। সবারই চোখমুখে কেমন যেন অখুশি আর অসুখী ভাব।। খানিক পরে বন্ধুবান্ধবদের বিদায় দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন চৈতন্য। মনের মধ্যে কোন সংশয় বা সন্দেহ তখনো দানা বাঁধেনি। কিন্তু বাড়ি ফিরে মা শচীদেবীর হাবভাব লক্ষ্য করে চৈতন্যের মনে প্রথম সন্দেহের বীজ রোপিত হলো। চৈতন্য গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেন মা শচীদেবী পূর্ব্বঙ্গ থেকে প্রত্যাগমনের পর থেকেই তার কাছে বড়ো একটা আসছেন না। নয়নের মণি নিমাক্রি তাঁর এতোকাল পর বিদেশ বিভুঁই থেকে ফিরলো অথচ স্নেহময়ী মা তার কোন ভালোমন্দ খাবরাখবর নিলেন না। নিমাই মনে মনে বিস্মিত হলেন, ভাবিত হলেন স্নেহময়ী জননীর এহেন পূর্বাপর ব্যবহার দেখে। অতঃপর অভিমানী নিমাই ধীরে ধীরে মা-র মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন।

"আপনি চলিলা প্রভু জননী সম্মুখে।
দুঃখিত বদন প্রভু জননীরে দেখে।"

তারপর জননীর দুঃখ-কাতর মুখের পানে তাকিয়ে নিমাই অভিমানী সুরে বলে উঠলেন,

"দুঃখিতা তোমারে মাতা। দেখি কি কারণ।।
কুশলে আইলু আমি দূর দেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল মতে।।



* জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' অনুসারে বঙ্গদেশের শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রামে চৈতন্যের পিতৃভূমি ছিল (চৈ. মঙ্গল পৃ-১৬)।

আরে তোমা' দেখি' অতি দুঃখিত বদন
সত্য কহ দেখি মাতা ! ইহার কারণ।।"

[চৈ. ভাগবত /১।১০।১৬৭-৬৯]

কিন্তু এতো সত্ত্বেও শচীদেবী নয়ণের মণি নিমাইয়ের প্রশ্নের কোনরকম প্রতি উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু দু'চোখ দিয়ে তাঁর অবিরত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মা-র চোখে জল দেখে নিজের অজান্তে কেমন চমকে উঠলেন চৈতন্য। কিসের একটা অশুভ ইংগিত যেন তাঁর বুকের মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠলো। বিমর্ষ গলায় শুধালেন, 'তোমার বধূর কিছু শুনি অমঙ্গল?' মা, তোমার পুত্রবধূর (লক্ষ্মীপ্রিয়া) কি কিছু অমঙ্গল ঘটেছে ? ততোক্ষণে জ্ঞাতি পাড়াপড়শীরা এসে ভীড় করেছেন চৈতন্যের ঘরে। (সম্ভবত শচীদেবীর কান্নার শব্দে তারা এসেছিলেন)। তাদের মুখেই চৈতন্য শুনলেন সেই অবিশ্বাস্য, অসহনীয় মর্মন্তুদ কাহিনী। প্রিযতমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ। শুনে চৈতন্য যেন বোবা, পাষাণ হয়ে গেলেন। বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিঃসাড় অনড়। নয়ানজুলির কালো জলে ফোটা পদ্মকলির মতো টানা দীঘল চক্ষুদ্বয় ক্রমশ মাটির দিকে নেমে আসতে লাগলো। মানুষ চৈতন্যের দু'চোখ জুড়ে এই প্রথম নেমে এলো বিরহ-অশ্রু। বড়ো ভাই বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের সময় এমনই কেঁদেছিলেন। কেঁদেছিলেন পিতার অকালমৃত্যুর মর্মন্তুদ সময়ে। কিন্তু এরকম কান্নার রূপ রঙ ছিল সম্পূর্ণ সতন্ত্র। লতা-বৃক্ষ কি কাঁদে ? জানিনা। কিন্তু যে বৃক্ষকে জড়িয়ে বনলতা আকাশ ছোঁয়ার নিয়ত স্বপ্ন দেখে, যে বৃক্ষকে অবলম্বন করে তার বাঁচার মতো বেঁচে থাকা,সেই বৃক্ষটি কোন নির্মম কাঠুরিয়া কেটে ফেললে ওই বৃক্ষ-জড়িত বনলতার যা অবস্থা হয়, (যা অবস্থা হওয়া সঙ্গত) স্বনির্বাচিত বধূ লক্ষ্মীর করুণ মৃত্যু সংবাদ প্রেমিক চৈতন্যকে, মানুষ চৈতন্যকে, সংসারী চৈতন্যকে ওই সহায় অবলম্বনহীন বনলতার পর্যায়ে ঠেলে দিলো। এ পর্যন্ত ঘোরতর সংসারী চৈতন্যের অতঃপর সাংসারিক মানসিকতায় দ্রুততর বিপর্যয় নেমে আসার এটাই অন্যতম প্রধান লক্ষণ। কারণও বটে। অর্থাৎ প্রিয়তমা ও পৃথিবীর অন্যতম, অনন্যতম সাংসারিক আকর্ষণ লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল বিয়োগের সাথে সাথে সংসারী চৈতন্যের মনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য দেখা দিলো। অনীহা দেখা দিলো। এবং এই একমাত্র অদেখার নিরন্তর বেদনায় ও বেদনাকরুণ অপ্রতিহত স্মৃতির অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বৈধতা সংসার মুখী চৈতন্যকে কিরকম বিবাগী-বাউণ্ডুলে, সংসার-নিস্পৃহ, অতৃপ্ত, অশান্ত করে দিলো। ছকে বাঁধা রুটিন মাফিক সংসারের চিরাচরিত চৌকাঠ ভেঙে পথে বেরিয়ে এলেন চৈতন্য। নিরালায়, কোন অপরিমিত নির্জন বিশুদ্ধ শান্তির খোঁজে, এই পলায়নী মানসিকতা সৃষ্টি হলো চৈতন্যের অন্তরাত্মায় অর্থাৎ সংসার মানেই তো লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্মৃতি। আর লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্মৃতি মানেই তো অন্তহীন শূন্যতা। সুতরাং এই অন্তহীন শূন্যতার ফেনায়িত



পৌনঃপুনিকতা থেকে মুক্তি চাইলেন চৈতন্য, নিস্তার চাইলেন, ঘর ছেড়ে পথকে অবলম্বন করে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক। মহাকবি তিনি। মানসিকতায় তিনিও ছিলেন ঘোর সংসারী। যে অর্থে রুশ লেখক ডস্টয়েভ্স্কি বা গোর্কির জীবন, বা নরওয়েজিয়ান লেখক হামসুন কিংবা আইরিশ কবি ডেভিসকে ধরা যাবে, রবীন্দ্রনাথ তেমন কোন ছা-পোষা কপর্দকশূন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জমিদারপুত্র রূপে জমিদারী মানসিকতায়। তবু তিনি কেন প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে কর্কশ রাঢ় ভূমির দেশে নির্জন শাল পিয়ালের বনে বিশ্বস্থ আশ্রয় খুঁজলেন ? বিশ্বভারতীর মানসিকতায়, না পত্নী বিরহ তাঁকে বিশ্বভারতীর মানসিকতায় পৌঁছে দিলো, বলা দুষ্কর।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু মানুষ চৈতন্যের মানসিকতা কতোখানি বিপর্যস্ত করেছিল সে কথা চৈতন্য চরিতে বলা নেই। বিশদভাবে বলা নেই। কেননা চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি চরিত গ্রন্থের চৈতন্য প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সাদৃশ্য। সাধারণ আর পাঁচটা মানুষের মতো পত্নী বিরহে চৈতন্য শোকাতুর হোন, দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হো এটা মুরারি বলুন, কর্ণপুর বলুন বা বাংলাচরিত লেখক কৃষ্ণদাস অথবা বৃন্দাবন কারুরই মনঃপূত ছিল না। এখানে মানুষ চৈতন্য যেহেতু ঈশ্বর সাদৃশ্য সেহেতু মানুষী চিত্ত-সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। ভক্তের তুলিতে আঁকা ভগবানের ছবি যেমনটি হয় এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ছিল না।

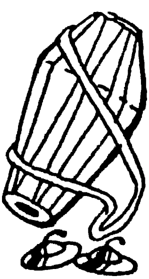
কিন্তু চৈতন্য যেহেতু ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তারও চেয়ে বড়ো কথা, যেহেতু তিনি আমাদের মতোই এই ধূলো মাটির সংসারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আবক্ষ নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন এই শ্যামলী বাংলার বাতাস, শৈশব কৈশোরে আমাদের মতোই যিনি দুরন্তপনা করেছেন মা-র সঙ্গে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে, আমাদেরই কারু মতো যিনি যৌবন প্রারম্ভে ভালোবেসে এক কুমারী কন্যার পানিগ্রহণ করেছেন,—তিনি, সেই চৈতন্য আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণ ভাবুক হতে পারেন, পণ্ডিত হতে পারেন, ঈশ্বরবেত্তা হতে পারেন, কিন্তু প্রিয়তম, অন্তরতম স্বজন বিরহে আমাদের মতো ক্ষুদ্রমতি মনুষ্যের মতো তিনি ব্যাকুল হবেন না, শোকার্ত হবেন না, অশ্রুভারাক্রান্ত হবেন না একথা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বসে কল্পনা করা সঙ্গত কারণেই কঠিন। অর্থাৎ যে লক্ষ্মী নাম্নী কুমারীকে চৈতন্য মায়ের অমত সত্ত্বেও (পুত্রের মনোভাবে পরে মত দিয়েছিলেন) ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সেই প্রিয়তমা লক্ষ্মীর মৃত্যু চরিতামৃতের 'প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল / বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল।। / অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী /দেশেতে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি।।' অথবা ভাগবতের 'পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। /ক্ষণেক



রহিলা কিছু হেট মাথা করি।। /প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার। /তূষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ব বেদ-সার।।' —এই মাত্র শেষ কথা হতে পারে না। আরও থাকে। আরও বিহ্বলতা, বিমূঢ়তা, নিঃসহায়তার নিঃসঙ্গতা। সব মিলিয়ে দুঃসহ শূন্যতা। এমত অবস্থায় মানুষ চৈতন্যের চোখের জল কি খুব অসম্ভব ছিল ? তা নেই। থাকলে, যেন মনে হতো আমাদের কতো চেনাজানা। কতো কাছাকাছি। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেমনটি ভূমিকম্পে, পর্ণকুটীরের দুঃখিনী বধূ এবং মনিমুক্তাখচিত রাজপ্রাসাদের অসূর্যংম্পর্শ্যা রাজনন্দিনী যেমন দু'চোখে সমপরিমাণ ত্রাস নিয়ে একই রাজ পথে নেমে আসে, এক্ষেত্রেও তদ্রুপ, স্বজন বিরহে আর পাঁচজন মানুষের মানসিকতা ও চৈতন্যের মানসিকতা একাকার। ঠিক তা-ও না, বরং বলা যেতে পারে আর পাঁচজন মানুষের স্ত্রী বিয়োগের দুঃখ অপেক্ষা লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিয়োগ চৈতন্যের মনে আরও গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল। কেননা চৈতন্য অভূতপূর্ব ভাবুক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, এমন মানুষের মনে বিরহ স্মৃতির জ্বালা শুধু মাত্র কাঁটা হয়ে আসে না, ফুল হয়েও আসে।—অর্থাৎ কেবল হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ নয়, নিঃস্বতা নয়, হারিয়ে না হারানোর অনুভূতি আরও প্রাণঘাতী, আরও দুঃসহ, দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। চৈতন্যের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। শুধু হয়েছিল মাত্র নয়, অবিসম্বাদিত ভাবে হয়েছিল।

এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বেশ সম্যকদর্শী কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন, তাঁকে ভালো বাসতেন। সেই ভালোবাসার এই আকস্মিক পরিণতি, তার মনকে সংসার সম্বন্ধে উদাস করে দিলো। তাঁর জীবন বৈরাগ্যের এই প্রথম ধাক্কা।। বিশ্বম্ভর পূর্ব্ববৎ টোলে পড়াতে আরম্ভ করলেন। তবে অতঃপর পাণ্ডিত্য প্রকাশ খর্ব হয়ে গেল আর ভক্তির ব্যাখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগলো' (চৈতন্যবাদন/পৃঃ ৩৫)। তিনি আরও বলেছেন, 'আমি মনে করি পত্নী বিরহ সূত্রেই বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণ বিরহ ভাবনার উৎপত্তি' (ঐ পৃ-৩৬)।

সততই প্রশ্ন উঠতে পাবে, পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিয়োগে কতোখানি বেদনা অনুভব করেছিলেন চৈতন্য ? সন্দেহ নেই খুবই কূট প্রশ্ন। সুতরাং এর সদুত্তর কোথায় ? সকল পত্নী বিয়োগে সকল স্বামীর ব্যথা বেদনা একরকম হবে এমন না। এর রকমফের থাকে। রকমফের কেন? না একটি মানুষের ব্যথা বেদনা, অনুরাগ অভিমান—অর্থাৎ তার যা কিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি অনুভূত বা প্রকাশিত হয় তার একান্ত ভাবলুতার ওপর। এবং এরকম ভাবালুতার তারতম্য ঘটে একাধিক কারণে। প্রথমত, যে যার প্রসঙ্গে ভাবিত হয় সেই ভাবনার বস্তু বা ব্যক্তির স্মৃতি কতোখানি হৃদয়ের কাছাকাছি ছুঁয়ে গেছলো জানা দরকার। ধরা যাক, একই স্বামী স্ত্রীর একই পোষাকে একই বয়সে তোলা দুটি ছবি। একটি বিয়ের সময় তোলা। অন্যটি বিয়ের পর। তো দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি ছবিই হারিয়ে গেল। অতঃপর খোয়া যাওয়া দুটি



ছবির জন্য কি একই রকম কষ্ট হবে ? তা তো নয়। মনে হবে অন্যটি গেলে ক্ষতি ছিল না যদি বিয়েরটি থাকতো। এই হলো স্মৃতি। আর এই স্মৃতির গভীরতার মধ্যেই ভাবনার তারতম্য নিহিত থাকে। বিয়ের সময় তোলা ছবিটির স্মৃতি বেশি গভীর তাই হারানোর ব্যথাও সেখানে গভীরতর। আরেকটি অনুরূপ ছবিও সেই স্মৃতির ছবির পরিপূরক হয় না। হতেও পারে না। এ পরিপূরণের প্রচেষ্টা আমাদের চিরায়ত অন্তরের প্রবৃত্তিগত সংঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব-ই শুধু দীর্ঘায়ত করে তাই না, যুগপৎ দুর্ভাগ্যজনিত নিজের প্রতি অনাস্থাবোধকে আরও বাড়িয়ে দেয়, বহু বিস্তারি করে, সেই সঙ্গে হারানোর বেদনাকেও। চৈতন্যেব জীবনে এর ব্যতিক্রম ছিল না। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর চৈতন্যের জীবনে বিষ্ণুপ্রিয়া এলেন। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের রূপবতী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। চৈতন্যের জীবনে দ্বিতীয়া স্ত্রী। কিন্তু প্রয়াতা লক্ষ্মীর স্মৃতি বিষ্ণুপ্রিয়ায়-বিস্মৃত হলেন না চৈতন্য; বরঞ্চ স্মৃতির দংশন আরও বাড়িয়ে দিলো। চৈতন্যচরিত পাঠ করলে তাই মনে হবে। সঙ্গত কারণেও তা-ই মনে হবে। বস্তুত 'কিছু ছিল' শূন্যতার চেয়ে 'কিছু থাকা'র মধ্যে অধিক অনুভূত হয়। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়ার একদা উপস্থিতিকে চৈতন্যের মনে বেশি প্রচারিত ও প্ররোচিত করেছিলেন বলে মনে হয়। এবং সংসারী চৈতন্যের সংসারের প্রতি নিস্পৃহতা, অনীহার এ' একটা একমাত্র বড়ো কারণ। অন্য কারণও থাকতে পারে। ছিলও। কিন্তু সেগুলো তৎভব শব্দের মতো, এই একমাত্র কারণ থেকেই সৃষ্ট, উদ্ভূত।

বাস্তবিক কি হয়েছিল লক্ষ্মীপ্রিয়ার ? আজ থেকে সমধিক পাঁচশো বছর আগে কি ভাবে চৈতন্য পত্নী তরুণী লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যু ঘটেছিল বলা দুষ্কর। তবে অপঘাতজনিত মৃত্যু বলেই মনে হয়। গঙ্গাতীরে কোন বিষাক্ত সর্প দংশনে তাঁর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। সম্ভবত স্নান করতে গেছলেন। জল আনতে যাওয়াও হতে পারে। তবে কতিপয় চৈতন্যচরিতামৃত সমূহে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পাঘাতে মৃত্যু একটু অন্যভাবে লেখা আছে। একটু অন্যরকম ভাবে। অর্থাৎ লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পাঘাতে মৃত্যুই, কিন্তু ঠিক বাস্তব সর্পাঘাতে না।

যেমন কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' -তে লিখেছেন,

প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল।।

[চৈ চরিতামৃত ১।১৬।১৮]

অর্থাৎ প্রকৃত সর্পাঘাতে নয়, প্রভুর 'বিরহ-সর্পাঘাতে' লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকালমৃত্যু ঘটেছিল। লক্ষ্মীপ্রিয়ার তিরোধান বর্ণনা করতে গিয়ে আরেক চৈতন্যচরিতকার ঈশান নাগর তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,

'হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ-দর্শনে
নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী হৈলা অন্তর্দ্ধানে।।'

(অদ্বৈত প্রকাশ)



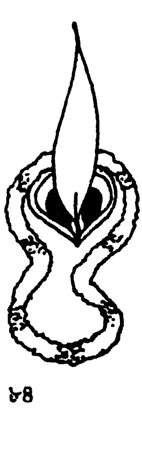
অতীব লক্ষ্যনীয়, এখানে প্রভুর 'বিরহ-সর্পাঘাতে' বা সর্পাঘাতে মৃত্যু নেই। এখানে শুধুমাত্র 'শ্রীগৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ-দর্শনে' লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়েছিল।

অতঃপর অন্য একটি চরিত গ্রন্থের প্রসঙ্গে আসা যাক। এর ভাষাও স্বতন্ত্র, হিন্দী। লেখক যজ্ঞদত্ত শর্মা। গ্রন্থের শিরোনাম 'শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত মানস' অনেকটা 'রামচরিত মানস' এর ধাচে লেখা। ১৯৭৩ সংবত অর্থাৎ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ডটি রচিত হয়। এই গ্রন্থেও লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর কারণ ওই 'বিরহ সর্পদংশনে' বলা হয়েছে। যথা,

'স্বামীবিরহ কমলা ভই কমলা।
রোম রোম চঢ়ি গইসো অমলা।।
রুচৈ অন্ন নিঁদ নিশি নাহী।
পতি পদ ধ্যান নয়ন জল জাহী।।
দিন দিন বিরহ বঢ়ত গই ভারী।
সর্প রূপ আএ বনি কারী।।
লক্ষ্মীপাদদংশিত করি ভাগা।
শুনি শচীমন দুঃখিত বহু লাগা।।'

('শ্রীচৈতন্যচরিতমানস')

বলা বাহুল্য, চৈতন্য চরিত সংক্রান্ত প্রায় সব প্রাচীন গ্রন্থগুলি মূলত কাব্যিক ছন্দে কবিতায় লেখা। সুতরাং কাব্য বা কবি মানসের ক্ষেত্রে বিরহ সর্পরূপ ধরে আসা বিচিত্র না। বস্তুত চৈতন্যের পূর্ববঙ্গে দীর্ঘ সফরকালীন বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়া চৈতন্য অদর্শনজনিত বিরহ মানসিকতায় ভুগতেন এমন কথা অবিশ্বাস্য নয়। চৈতন্য লক্ষ্মীকে ভালোবেসে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের আগে অর্থাৎ প্রাক্ বিবাহ কালীন লক্ষ্মীও চৈতন্যকে চিনতেন, ভালো বেসেছিলেন। অতঃপর দুটি প্রাণ যখন এক সূত্রে গ্রথিত হোল, তখন, চৈতন্য ও লক্ষ্মীর সম্পর্ক সকল পতি-পত্নীর মতো শুধু মাত্র পতি-পত্নীর সম্পর্কে স্থায়িত্ব হলো না,তারও চেয়ে বড়ো, গভীর নিবিড়, কিছু গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ প্রাক্ বিবাহ প্রণয়ে একে অন্যের অদর্শনজনিত যে বেদনা, পেয়ে হারানোর ভয় ভীতি, যে সুখস্মৃতিজনিত তন্ময়তা—এর সব কিছুই চৈতন্য লক্ষ্মীর বিবাহোত্তর জীবনেও প্রকট ভাবে স্থায়ী ছিল। অন্তত এ সংশয়, লক্ষ্মীর মনকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। এর অর্থ এই নয় যে চৈতন্য লক্ষ্মীর জন্য ভাবিত ছিলেন না। ছিলেন। লক্ষ্মীর মৃত্যোত্তর বিবাগী নিমাঞি বা বিশ্বম্ভরের ক্রম চৈতন্যরূপ তার প্রতীক। তবে স্বামী চৈতন্যের জন্য প্রেমিক চৈতন্যের জন্য লক্ষ্মীর সংশয়ান্বিত হবার কারণ ছিল আরও অধিক। এবং এর কারণ ছিল একাধিক। প্রথমত চৈতন্যের মানসিক উপসর্গ। যখন তখন উন্মাদের মতো হয়ে যেতেন। তখন এমন অবস্থা হতো যে শচীদেবী ভয় পেয়ে পাড়া প্রতিবেশী (বুদ্ধিমন্ত খান মুকুন্দ সঞ্জয়) প্রভৃতিকে ডেকে আনতেন। তারা এসে চৈতন্যের মাথায় বায়ুনাষক ওষুধ বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি দিয়ে শান্ত করতেন। স্বামীর এরকম একটা ব্যাধি স্বাভাবিক কারণে লক্ষীর মানসিকতাকে



সংশয়ান্বিত করেছিল। দ্বিতীয় কারণ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ। বিশ্বরূপের পলায়নী মনোবৃত্তি মাতা পিতা শচী জগন্নাথের মনকে বিপর্যস্ত করেছিল। হতাশ করেছিল। অসহায় নিঃস্ব করেছিল। জগন্নাথ মিশ্রের অকাল মৃত্যুও এই একটা কারণ। অতঃপর শচীদেবীর শেষ অবলম্বন রইলেন নিমাই অর্থাৎ চৈতন্য। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর এই চৈতন্য একদিন অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলেন, ঘুমের ঘোরে দেখা নয়, মূর্ছার ঘোরে দেখা স্বপ্ন (চৈ. চরিতামৃত ১।১৪।১০৪ ৮)। তো এই স্বপ্নে গৃহত্যাগী বিশ্বরূপ ছোট ভাই চৈতন্যকে 'সন্ন্যাস করহ তুমি' বলে উদ্বুদ্ধ করছেন। চৈতন্য এতে রাজী নন। তখন তাঁর বক্তব্য ছিল 'গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন।' মূর্ছা ভঙ্গের পর মা শচীদেবীকে স্বপ্নের কথা বললেন চৈতন্য। বললেন সন্ন্যাসী হবার জন্য চৈতন্যের কাছে বিশ্বরূপের নির্বন্ধের কথা। শুনে শচীদেবী চিন্তান্বিত হলেন। মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা থাকে যার অনুভূতি প্রতিনিয়ত কাঁটার মতো অনুভূত হয়। এ স্বপ্নের কথা মা শচীদেবীর মনে তেমনই প্রচ্ছন্ন ছিল। পুত্রের বিবাহের পর শচীদেবী পুত্রবধূ লক্ষ্মীপ্রিয়াকে নিমায়ের এই স্বপ্নের কথা বলে থাকতে পারেন। পুত্রকে সংসারে বেঁধে রাখার স্বার্থে বলতে পারেন। যাতে পুত্রবধূ অগ্রণী হোন। আবার এমনও হতে পারে, সেটা হলো, চৈতন্য যখন এ স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার আগেই লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে তার গঙ্গাতীরে ভালোবাসার সূত্রপাত হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন প্রসঙ্গে তিনি নিজেও প্রণয়ী লক্ষ্মীকে স্বপ্নের কথা বলে থাকতে পারেন। তবে শচীদেবীর পক্ষে বলাটাই বেশি স্বাভাবিক ছিল। মোদ্দা কথা, যে ভাবে হোক এই স্বপ্নের কথা লক্ষ্মীপ্রিয়া সম্ভবত শুনেছিলেন। চৈতন্যের দীর্ঘ পূর্ববঙ্গ সফরকালীন স্বামীর অদর্শনজনিত বেদনা এই ভীতিকর স্মৃতি-স্বপ্নের সাথে একত্রিত হয়ে 'বিরহ-সর্প' রূপ ধারণ করাটা অস্বাভাবিক ছিল না।

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক আবহাওয়া কোনদিনই সুখকর নয়।*

বরং বিপদসঙ্কুল বলা যায়। বিশেষত বর্ষাকালে। নদী ও সমুদ্র বেষ্টিত পূর্ববঙ্গের মাটি যেমন শস্যশালিনী ও রক্তাভা, প্রাকৃতিক দৃশ্যও তেমনই সন্দেহাতীত মনোরম। অন্যত্র সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভয়াবহ বন্যা, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘূর্ণিঝড় এগুলিও পূর্ববঙ্গের প্রকৃতিগত। এই মাত্র সেদিন ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছিল এই জনপদে। তারপরেও এ ধরনের বিপর্যয় এসেছে। আগেও এসেছিল কিন্তু কথা হচ্ছিলো

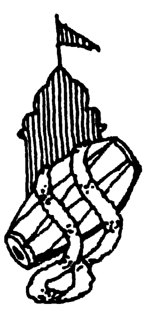


* বাঙলার পূর্ব অংশ অর্থাৎ বর্তমান বাঙলা দেশ-এর অধিকাংশ ভূ-ভাগ ২২ ডিগ্রি থেকে ২৬ ডিগ্রি উত্তর সমাকরেখায় ও ৮৮ ডিগ্রি থেকে ৯২ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। ফলে এ অঞ্চলে বৃষ্টির প্রকোপ বেশি। পরিমান ১৮৮০-২২৬০ মি. মি. (বার্ষিক)। এবং এর ফলে এ অঞ্চলের নদীগুলিতে বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে।

মধ্যযুগের। এখন তো বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে তথাকথিত ধ্বংসাত্মক নদ নদীকে মানুষ বশ মানিয়েছে। নদীর সে আদিম, ভয়াল-কুটিল রূপ আজ নেই। লাগাম ছাড়া পাগলা ঘোড়ার মতো অবাধ্য নদীর বুকে বাঁধ বেঁধে তাকে বাধ্য করেছে মানুষ। কিন্তু আজ থেকে পাঁচশো বছরের মতো আগে চৈতন্য যখন পূর্ববঙ্গ সফরে গেছলেন তখন নদীকেন্দ্রিক এতো বাঁধ, স্লুইস গেট বা ফীডার খালের প্রকোপ ছিল না। তখন নদী ছিল বাধা বন্ধনহীন। অর্থাৎ ভয়ালতায়, কুটিলতায় নদী ছিল নদীর মতোই আদিম। তো এমন এক বিপদ সঙ্কুল পথে, প্রমত্তা পদ্মার (পদ্মাবতী) বুকে নাও ভাসিয়ে, পূর্ববঙ্গে গেছলেন চৈতন্য।

শিষ্য সপার্ষদ চৈতন্য ঠিক কোন সময়ে পূর্ববঙ্গ সংগরে বেরিয়ে ছিলেন সঠিক বলা সম্ভব না। তবে যে সময়ই যান, শীত বা বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাব তখন ছিল না। কারণ অন্যতম চৈতন্য জীবন চরিত লেখক বৃন্দাবন দাসের কলমে যে রকম পদ্মাবতী নদীতে শিষ্যসহ চৈতন্যের জলক্রীড়ার বিবরণ (১৷১০৷৬১-৬৪) আছে তাতে করে এ ধারনাই সূচিত করে। তবে পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা প্রভৃতিরা তো সামবাৎসরিক প্রমত্তা। তার ওপর আছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের ঝড়। শ্রাবণ থেকে আশ্বিন মাস এ ঝড়ের প্রকোপ আরও নির্মম, দুঃসহ হয়ে ওঠে। এছাড়া রাস্তাঘাট তখন খুবই দুর্গম ছিল। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে সুন্দরবনের ভৌগলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এই নিবিড়, গহীন জঙ্গলের তটরেখা ধরে চৈতন্যকে পৌঁছতে হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। চৈতন্যের সময় বনে জঙ্গলে—জঙ্গলপথে যে শুধু হিংস্র জন্তু জানোয়ার ছিল তাই নয়, নরাঘাতী তস্কর ডাকাতেরাও বিচরণ করতো। জলপথও খুব নিরাপদ ছিল না। যদিও ডাচ ওলন্দাজ প্রভৃতি জলদস্যুদের আবির্ভাব তখনো প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটেনি।

এহেন জলা-জঙ্গলের দেশে (পূর্ববঙ্গ) চৈতন্যের সফর কালে সবচেয়ে বেশি চিন্তান্বিত ছিলেন শচীদেবী। কারণ, তিনিই একমাত্র ওই দেশের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কথা জানতেন। জানত দেখেও থাকবেন। দেখে থাকাটা স্বাভাবিক। কেননা এই পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট (সিলেট) অঞ্চলে শচীদেবীর জন্ম। এবং এখান থেকেই তিনি স্বামী পুরন্দর মিশ্র ও পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে নবদ্বীপে চলে আসেন। যদিও পুরন্দর বা জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর বিবাহ সিলেটে না নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট 'টাগ অব ওয়ার' চলেছে। কিন্তু এসব কূট-কচালির মধ্যে না গিয়েও আমরা যথেষ্ট অবহিত হতে পারি যে শচীদেবী নদী-নালার দেশ পূর্ববঙ্গের আবহাওয়ার কথা জানতেন। পদ্মা মেঘনার উথালি-পাথালির সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ ছিল। অন্যত্র চৈতন্য জীবন চরিত রচয়িতা জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দৈববিপাক ও রাষ্ট্রবিপ্লব দুই মিলিয়া শ্রীহট্ট উচ্ছন্ন করিলে শচীদেবী পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী সপরিবার-পরিজনে নবদ্বীপে চলিয়া আসেন।' দৈববিপাক অর্থে



জয়ানন্দ কি বলতে চেয়েছেন বলা দুষ্কর। পারিবারিক কোন অঘটন হতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, তা ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এসবও হতে পারে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, এই যে জন্মভূমি ভিটেমাটি সিলেট ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে (নবদ্বীপে) চলে আসা, এই আসার পেছনে কি জগন্নাথ মিশ্র, কি নীলাম্বর চক্রবর্তী, কি শচীদেবী সকলের একটা রূঢ় অভিজ্ঞতা ছিল। কোনক্রমেই এ অভিজ্ঞতাকে সুখকর বলা যাবে না। বরং ভিটেমাটি চাটি হওয়া মানুষের দুঃখজাত অভিজ্ঞতা বলা চলে।

তো পরবর্তীকালে চৈতন্য যখন সেই নদী-নালা ঝড় তুফানের দেশে যাবার জন্য মায়ের কাছে অনুমতি চাইলেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই শচীদেবীর মনে ফেলে আসা জন্মভূমি শ্রীহট্টের (শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রাম) কথা উদয় হয়েছিল। সেই শ্রীহট্ট, যেখান থেকে একরাশ অসহায়তা (হয়তো বা নিঃস্বতার বেদনা নিয়ে) তাঁরা 'রিফিউজি' হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন নবদ্বীপে। তাই সর্বাগ্রে অনুমতির বদলে পুত্রকে তিনি পূর্ববঙ্গে যেতে নিষেধ করলেন। পরে অনুমতি দিলেন পুত্রের নির্বন্ধে।

তারপর চৈতন্য যখন পূর্ববঙ্গে গমন করলেন, এবং 'বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি' তখন স্বাভাবিক ভাবেই একমাত্র অবলম্বন প্রাণের নিমাঞি'র জন্য মা শচীদেবীর মনে চিন্তার উন্মেষ ঘটলো। মাসাধিক কাল অতিক্রান্ত, নিমাঞির অদর্শনে শচীদেবী অধীর হয়ে পড়লেন। আর কিশোরী বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়াকে তখন প্রবোধ দেবার কেউ রইলো না। তখন প্রমত্তা পদ্মার বুকে চৈতন্যের টলটলায়মান নৌকাখানা শুধুমাত্র মা শচীদেবীর চোখে নয়, স্বামী-বিরহিনী লক্ষ্মীর চোখেও ভাসতে লাগলো। তার ওপর চৈতন্যের ছিল বায়ুর আধিক্য। যখন তখন অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

বস্তুত এরকম এক 'কি হয় কি হয়' মুহূর্তে কিশোরী বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার হৃদয়জনিত উদ্বেগ চৈতন্যের বাড়ি ফেরার সমগ্র যুক্তিযুক্ততাকে যুগপৎ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নস্যাৎ করে দিলো। লক্ষ্মীপ্রিয়ার এরকম এক দ্বিধাপীড়িত মানসিকতা কোন দৈবাৎ বা আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। দীর্ঘকালীন পুঞ্জিভূত অনুরাগ ও অভিমানের ফলস্বরূপ এটা হয়েছিল। কিন্তু এটা খুব অসাধারণ ঘটনা বলে ধরে নেবার কারণ নেই। কোন অসহায়া কিশোরী পল্লীবধূর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা সংঘটিত হতে পারে। মাটির কাছাকাছি থাকার এ এক অন্যতম, অনন্যতম চারিত্রিক উন্মেষ।

এরপর আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, চৈতন্য-অদর্শনজনিত বেদনা ক্রমে সহিষ্ণুতার সীমানা অতিক্রম করে, ভয় বিহ্বলতা নিঃস্বতা শূন্যতার মধ্য দিয়ে গাঢ় ভরাট এক হতাশার মধ্যে এসে পৌছালো। যেখানে পৌছে যায় মানুষ তার শেষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আশাটুকুও বিসজ্জর্ন



দিয়ে। এবং এরই অবিসংবাদিত ফলস্বরূপ—

'গোরা গেল পূর্ব্বদেশে নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলপয়ে কত পরকার
কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার।।'

['পাদকল্পতরু'/১৫৯৭ সংখ্যা পদ]

'পাদকল্পতরু' গ্রন্থের লেখক গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যের পূর্ববঙ্গ গমনের সময় শুধুমাত্র চৈতন্যপত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিরহ বর্ণনা করেন নি। প্রাণপ্রিয় পুত্রের বিরহে মা শচীদেবীর বিরহব্যথাও তিনি সুষ্ঠভাবে বর্ণনা করেছেন।

'শচীর করুণা শুনি কান্দয়ে অখিল প্রাণী
মালিনী প্রবোধ করে তায়।*

[ঐ ১৫৯৭ পদ]

বস্তুত গোবিন্দ ঘোষ পদকর্তা হিসেবে চৈতন্যের সমসাময়িক শুধু নন, তিনি চৈতন্যের পূর্ববঙ্গ গমনের প্রত্যক্ষদর্শীও বটেন। সুতরাং তাঁর রচনার যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। চৈতন্যের পূর্ববঙ্গে স্থিতিকালীন চৈতন্যমাতা শচীদেবী ও পত্নী লক্ষ্মীর মানসিক পরিস্থিতি কিরকম নিদারুণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল এই দুটি নাতিদীর্ঘ পদ থেকে তা স্পষ্টত অনুমেয়।

চৈতন্য পূর্ববঙ্গে গমনের আগে, কিন্তু গমনের সম সম মুহূর্তে একবার প্রিয়তমা লক্ষ্মীর কাছে বিদায় নিতে এসেছিলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়ার দু'চোখে জল। কে চায় প্রিয়তর মানুষকে বিদেশ বিভুঁইতে পাঠাতে। এদিকে যাত্রা সমাসন্ন। বিশ্বম্ভর প্রিয় বধূর চিবুক দুহাতে স্পর্শ করে বললেন, 'আইর সেবন করিবারে নিরন্তর।' আর মা শচীদেবীকে বললেন, 'কতোদিন প্রবাস করিব মাতা ! আমি !' কিন্তু পারতপক্ষে চৈতন্য তাঁর কথা রাখলেন না। পূর্ববঙ্গে পৌঁছে—

'মহাবিদ্যা গোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে।।'

তারপরঃ

'সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথায়।
হেন নাহি জানে, কে পঢ়য়ে কোন্ ঠাঁই।।
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি-পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া।।
হেন কৃপাদৃষ্টে্য প্রভু করেন ব্যাখ্যান,
দুই-মাসে সভেই হইলা বিদ্যাবান।।'



তারও পর ঃ

'এইমতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি।।'

* মালিনী চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাস আচার্যের পত্নী।

অর্থাৎ শত শত ছাত্র সেই সঙ্গে পদ্মাবতীকে পেয়ে মা ও স্ত্রীর কথা বেমালুম ভুলে গেলেন চৈতন্য। বিস্মরণ হলেন সেই পরোক্ষ আশ্বাসবাণীর কথাটি, 'কতদিন প্রবাস করিব মাতা ! আমি !'

বস্তুত এই কথা না রাখার কথার ফল স্বরূপ চৈতন্য বিরহিনী লক্ষ্মীর যতো পতি অনুরাগ ক্রমান্বয়ে অভিমান হয়ে উঠলো।

'এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে।।
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন।।
নামেতে সে অন্ন-মাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বরবিচ্ছেদে বড় দুঃখিত অন্তরে।।
একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ।।'

['চৈতন্যভাগবত' ১।১০।৯৮-১০১]

অনাহার, অনিদ্রা, যার ফলে 'চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ।' এমতো এক অবস্থায় কিশোরী বধূ লক্ষ্মীর যুগপৎ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়তে লাগলো। বস্তুত শারীরিক দুর্বলতার বীজ নিহিত থাকে মানসিক স্থিরতা—অস্থিরতার ওপর। মন ও দেহের সম্পর্ক এখানে। মানসিক ও শারীরিক বৈকল্য থেকেই হতাশার উৎপত্তি। আর এ হতাশা অনেক সময় (ক্ষেত্র বিশেষে) মৃত্যুর মতো শাশ্বত কিন্তু ভয়ংকর কিছু বয়ে আনে আমাদের চিরায়ত বেঁচে থাকার অনুভূতিতে।*

'অহন্যাহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম।।'

বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠীরের বক্তব্য (মহাভারত)।

ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,

'প্রভুপাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়।।'

অন্যত্র, অন্যতম রচয়িতা কৃষ্ণদাস লিখছেন,

'প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল।।'

মুরারি গুপ্ত (১।১১।২১-২৩), ঈশান নাগর (অদ্বৈত প্রকাশ) প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রত্যয় ছিল লক্ষ্মীপ্রিয়া চৈতন্য-বিরহ-সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এরকম ধারণা আপাত অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক মনে হতে পারে, এবং সেটাই সতত স্বাভাবিক। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, এই 'বিরহ সর্প' বাস্তবের বাস্তবিক সর্প অপেক্ষা কোন অংশে নির্বিষ ছিল না।



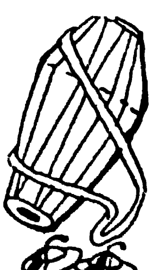
*কোন মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে না, তারও একদিন মৃত্যু হবে।

[ছয়]

চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহ

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান পুরুষার্থান
সমশ্নুতে।।
'গৃহিনী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তা বিবাহ করিতে হৈল মন।।
[চৈ. চরিতামৃত/আদি/পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

মহাকবি বলিয়াছেন, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই।' কিন্তু কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে চাওয়ার মধ্যে তরুণ বিশ্বম্ভরের কিছু ভুল ছিল বলে মনে হয় না। শুধু নারী হিসেবে নয়, শুধু মাত্র প্রেমিকা বা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর কোন অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত, মায়াময় মনমোহিনী বস্তু হিসেবেও না, তারও চেয়ে বড়ো, মহৎ, উদার প্রেরণার মধ্যে লক্ষ্মীকে আবিষ্কার করেছিলেন বিশ্বম্ভররূপী চৈতন্য। আর তরুণ বিশ্বম্ভরের মনে এ' প্রেরণা জুগিয়েছিলেন আচার্যকন্যা লক্ষ্মী স্বয়ং। যখন দুরন্তমতি নিমাঞির অত্যাচারে প্রতিবেশী কুমারী কন্যারা ক্ষিপ্ত, তিতিবিরক্ত। (আশ্চর্য), ঠিক তখন, সমস্ত ক্ষুব্ধতা, অসহিষ্ণুতা ভুলে ('কুমারীর শ্রেষ্ঠ আরাধ্য দেবতা) শিবের জন্য আনীত মল্লিকার মালাখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে লক্ষ্মী তুলে দেন বিশ্বম্ভরের গলায়। সম্ভবত আর পাঁচটা কুমারী মেয়ের মতো লক্ষ্মীর কাছে এসেছিলেন চৈতন্য, লক্ষ্মীর আনা নৈবেদ্য ফল-মূল কেড়ে নেবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু সমস্ত কিছু কেমন যেন গোলমাল করে দিলেন লক্ষ্মী। গোলমাল করে দিলেন দুষ্টু নিমাঞির গলায় অভাবনীয় ভাবে মল্লিকার মালা পরিয়ে। তো এমন এক সময় নারীর অন্তরালস্থিত সহজাত মহিমা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই সে প্রকাশিত করে কোন পুরুষের অন্তর নিহিত মানুষী প্রবৃত্তিকে। অর্থাৎ আকাশ দেখলে যেমন মেঘের কথা মনে পড়ে, আকাশ মনে করিয়ে দেয় এমন কথা, তার দিগন্তবিস্তারী নীলিমার মধ্যে দিয়ে, সীমাহীন বিশালতার মধ্য দিয়ে, তদ্রুপ ভাবে, কুমারী লক্ষ্মী চৈতন্যের হৃদয়ে লক্ষ্মী জাত বীজ বপন করলেন লক্ষ্মীজনিত পরিবেশ সৃষ্টি করে।



নারীর ভালোবাসা এবং নারী পুরুষের যুগ্ম ভালোবাসা বোধ হয় এরকম।

কিন্তু মহাকবির সেই বহু বিখ্যাত কবিতার দ্বিতীয় লাইনটি প্রায় নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী ভাবে মিলে গেছলো চৈতন্যের জীবনে।—'যাহা পাই তাহা চাই না।' লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু এমনই এক না চাওয়া-পাওয়ার গহন-গভীর বেদনা। স্বনির্বাচিত বধূ লক্ষ্মীকে নিয়ে সংসারী হতে চেয়ে ছিলেন চৈতন্য, সুখী হতে চেয়েছিলেন। সে সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল মাঝপথে। সুখ নামক প্রস্ফুটিত ফুল সর্বনাশা ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছলো। আর এ সবই ঘটেছিল প্রিয়তমা বধূ লক্ষ্মীর

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। মানুষের ভালোবাসার এহেন মর্মান্তিক পরিণতিকে মানুষ হিসেবে, মানুষী সত্ত্বা দিয়ে অনুভব করেছিলেন চৈতন্য। কোন মানব জীবনে এ এক চরম বিপন্ন অভিজ্ঞতা। আরেক অসামান্য পুরুষ মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এমনই এক রূঢ় অভিজ্ঞতায় অনুভূত ছিলেন। বৌ ঠাকুরাণীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী কালে আরও ঘনিষ্ঠ, আরও আত্মিক আপনজনের মৃত্যু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু বৌঠান কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু কবির অনুভূতিকে স্পর্শ করেছিল অনন্য রূপে। সেই অজ্ঞেয় অজ্ঞাত মৃত্যুর স্বরূপকে তিনি খুঁজেছেন কবিতায়, কাব্যিক অনুভূতি দিয়ে। কিংবা এমনও হতে পারে, যা সম্ভব ছিল, বিষাদময় স্মৃতির মাঝে কবিতার দেওয়াল তুলে নিজেকে আড়াল দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই দেওয়াল আড়াল দেওযার পরিবর্তে দুঃসহ স্মৃতির এক অখণ্ডিত অংশ হয়ে উঠেছিল কবির কবিতায়। মানুষের জীবনে এ এক অমোঘ নিয়তি।

চৈতন্যের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ধনী গৃহস্থ সনাতন পণ্ডিতের রূপসী কন্যার সাথে চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহ হলো। এ বিয়েতে চৈতন্যের মত ছিল না। নিতান্ত মায়ের নির্বন্ধে রাজী হতে হয়েছিল। পাত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া আর বিষ্ণুপ্রিয়া। যেন নবাগতা বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম মনে আসতেই প্রয়াতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার নামটি মনে এসে যায়। এমন এক একাত্ম, একই সূতোয় গ্রথিত ফুলের মতো নাম। একটিতে টান দিতেই অন্যটি এগিয়ে আসে অনায়াসে। ঠিক ফুল আর প্রজাপতির মতো। অনেক সময় প্রজাপতিকে ফুল বলে ভ্রম হয়। আবার ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। সুতরাং প্রজাপতির কথা মনে আসতেই ফুলের কথা মনে পড়ে যায়। অথচ ফুল মানে প্রজাপতি বা প্রজাপতি মানে ফুল না। দুটিই পৃথক, স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা। বস্তুত বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া না হতে পারার এটাই ছিল বড়ো অন্তরায়।

লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন চৈতন্যের স্বনির্বাচিত বধূ। তদ্রুপ বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের সংসারে এসেছিলেন চৈতন্যজননী শচীদেবীর স্বনির্বাচিত বধূমাতা রূপে। আবার এ কথাও অনস্বীকার্য, বিষ্ণুপ্রিয়া যতোখানি বধূ রূপে এসেছিলেন, তারও চেয়ে বেশি এসেছিলেন, সদ্য প্রয়াতা বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার পরিপূরক রূপে। লক্ষ্মীপ্রিয়া চৈতন্যের পত্নী ছিলেন, সেক্ষেত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়ার পরিপূরক হয়ে আসা অর্থে চৈতন্যের পত্নী হয়ে আসাকেই সূচিত করে। অন্যার্থে, লক্ষ্মীপ্রিয়া—শূন্য স্থান ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার শূন্য স্থান পূর্ণ করতে বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমন। যদি লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রকট থাকতেন, জীবিত থাকতেন তাহলে চৈতন্যের সংসারে বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমণ নির্গমনের কারণ থাকতো না। কিন্তু লক্ষ্মীপ্রিয়া কারু শূন্যস্থানে পূর্ণাধিকার নিয়ে আসেন নি। যা শূন্য ছিল সে চৈতন্যের হৃদয়। কিন্তু বধূর জন্য নয়, তা কোন নারীর জন্য নয়, তারও চেয়ে বড়ো, তারও চেয়ে গভীর-নিবিড়, বিস্ময়োদ্দীপ্ত—সে একমাত্র লক্ষ্মী, মল্লিকার মালাদাত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া।



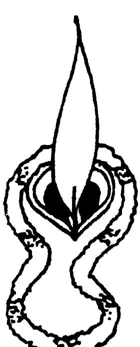
আটচল্লিশ বছর আগে পরে লেখা পৃথক দুই 'চৈতন্যাবদান'-এর লেখক ডঃ সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে লিখছেন, 'উদাসীন পুত্রের মনকে

সংসারের দিকে টেনে আনবার জন্য শচীদেবী নিজে সম্বন্ধ করে পুত্রের বিবাহ দিলেন। বড়োলোক সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া সুন্দরী। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হলো। প্রথমে বিশ্বম্ভরের মত ছিল না। পরে মাতার নির্বন্ধে রাজী হন। ধুমধাম করে বিয়ে হলো। বরপক্ষের হয়ে প্রচুর খরচ করলেন বিশ্বম্ভরের এক সম্ভ্রান্ত ধনী প্রতিবেশী (?) বুদ্ধিমন্ত খাঁ। কন্যাপক্ষও খুব ধুমধাম করলেন ও প্রচুর দান দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করে চৈতন্য ঘরে নিয়ে এলেন কিন্তু লক্ষ্মীপ্রিয়ার মতো তাকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারলেন না।' (চৈতন্যাবদান/পৃ-৩৫)

বস্তুত চৈতন্যচরিত গ্রন্থ সমূহ পাঠ করলে এরকম একটা ধারণা সততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর চৈতন্যের মানসিক অবস্থা খুবই জটিল, অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে সমাজ সংসারের প্রতি একটা আনুগত্যহীনতা, নিস্পৃহতা। সব মিলিয়ে যুবা চৈতন্যকে সেদিন কেমন নিরানন্দ উদাসীন করে তুলেছিল। সংসার, সাংসারিক কর্তব্য, সাংসারিক হয়ে বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাস, এক সংসারী মানুষের যাবৎ সাংসারিক বন্ধনের সূতো ক্রমান্বয়ে পলকা, অশক্ত হয়ে আসছিল। নিমাঞি ওরফে বিশ্বম্ভরের চৈতন্য বীজের এখানেই অঙ্কুরোদ্গম।

ঠিক এমন এক বিপজ্জনক মুহূর্তে চৈতন্যজননী শচীদেবী সর্বাঙ্গ-সুন্দরী বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংসারে এনে উদাসীন পুত্রকে ঘরমুখী করতে চাইলেন।

যদিও চৈতন্য চরিত গ্রন্থের অন্যতম পদকর্তা জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর কথা লিখেছেন। আর তা যদি বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নিতেই হয়, তাহলে, চৈতন্যের পূর্বপ্রণয়, স্বনির্বাচিত বধূর প্রতি আনুগত্য, বিপত্নীক হওয়ার বেদনা সব কিছুকে বেমালুম অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু চৈতন্যকে যে ধরনের গৃহী সাংসারিক মানুষ হিসেবে এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি, অর্থাৎ পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, স্ত্রীর প্রতি প্রেম ও আনুগত্য, এবং তদোপরি পূর্বপ্রণয় এসবের পরও, প্রিয়তমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া বিয়োগের মর্মান্তিক সংবাদ শুনে তিনি কেমন করে প্রেমানন্দে নাচতে পারেন একথা সততই বিচার্য। বিশ্বম্ভর কেন, তিনি তো বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন, এটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের ক্ষেত্রেও অপবাদ বিশেষ। যদিচ চৈতন্য এর মধ্যে জড়িত না থাকতেন তবে তা কলঙ্ক বিশেষ বললেও বোধ অত্যুক্তি হতো না। তবু বিশিষ্ট পদকর্তা জয়ানন্দ (মিশ্র)* চৈতন্য প্রসঙ্গে কেন এহেন উক্তি আমাদের জন্য পরিবেশন করলেন বলা মুশকিল। এবং এ-ও লক্ষনীয় যে, জয়ানন্দ একমাত্র জীবনচরিত রচয়িতা যিনি পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর মৃত্যু সংবাদ শুনে স্বামী চৈতন্যের 'প্রেমানন্দে কীর্তনে' নাচার খবরটি ভাবী প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।



*জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। ইনি গদাধর গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, চৈতন্য নীলাচল থেকে মথুরা যাবার পথে কোন কারণ বশত একবার গৌড়ে আসেন, তখন তিনি বর্ধমানের অন্তর্গত আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। (সূত্র-চৈতন্যমঙ্গল)

জয়ানন্দ লিখেছেন,

'লক্ষ্মীর বিয়োগ-কথা লোক-মুখে শুনি।
প্রেমানন্দে কীর্ত্তনে নাচেন দ্বিজমণি।।'

['চৈতন্যমঙ্গল/নদীয়াখণ্ড/পৃ ৫০]

'পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি।।
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তূষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ববেদ সার।।

[চৈতন্য ভাগবত ১।১০।১৭৩ ৭৪]

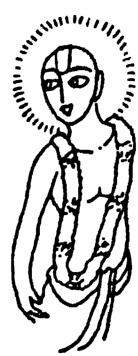
এ প্রসঙ্গে আরেক অন্যতম চৈতন্য জীবনচরিত রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী (কৃষ্ণদাস কবিরাজ) বলেছেন,

'প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ সর্প-বিষে তার পরলোক হৈল।।
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইল্যা প্রভু শচী-দুঃখ জানি।।
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন।
তত্ত্ব কহি কৈলা শচীর দুঃখ-বিমোচন।।

[চৈঃ চরিমামৃত-১।১৬।১৯-২১]

চৈতন্য পূর্ববঙ্গ থেকে প্রত্যাবর্তন করে, ঘরে ফিরে সেই অতীব মর্মান্তিক সংবাদটি শুনলেন। লক্ষ্মীর অকালমৃত্যু। মা শচীদেবী পুত্রবধূর বিরহে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এমত অবস্থায় নিজের বুকের ব্যথা চেপে দুঃখিনী মাকে সান্ত্বনা দিতে দেখা গেল চৈতন্যকে। এবং সেটাই স্বাভাবিক ছিল। বড়ো ছেলে গৃহত্যাগী, স্বামীর মৃত্যু, তারওপর আদরিনী বধূমাতার এই আকস্মিক চলে যাওয়া—এতোগুলো শোক যার বুকের ওপর দিয়ে অতিবাহিত তাঁকে সান্ত্বনা না দিয়ে উপায় নিক। কিন্তু কি বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। পত্নী বিরহে চৈতন্য নিজেই তখন বাক্যহারা। না, দুঃখিনী মাকে প্রবোধ দেবার মতো কোন শব্দ নিজের দিক থেকে খুঁজে পেলেন না তিনি। অগত্যা শাস্ত্রের তত্ত্ব কথা বলতে লাগলেন। বললেন,

'মা দুঃখ করছো কেন। যার যা ভবিতব্য তা কেমন করে খণ্ডাবে। মাগো, এই কালের নিয়ম, পৃথিবীতে কেউ কারু নয়। বেদ-এ আছে সবই অনিত্য। এই যে তুমি আমি, এই সমাজ সংসার সব কিছুই ঈশ্বরের অধীনস্থ। কে কখন আসবে, কে কখন চলে যাবে কেউ বলতে পারে না। এই যে তোমার বৌমা চলে গেল, এ-ও এক ঈশ্বরের ইচ্ছা। সুতরাং অযথা দুঃখ করে কি হবে। মা, স্বামীর আগে তোমার বৌমার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে, তার চেয়ে বড়ো ভাগ্যবতী আর কে আছে। (চৈ. ভাগবত/১।১০।১৭৬-৮০)।



কিন্তু মা-কে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে সান্ত্বনা দিলেও নিজের কাছে নিজে সান্ত্বনা পেলেন না চৈতন্য। যে সান্ত্বনা মনকে সঞ্জীবিত করবে, উজ্জীবিত করবে, চলার পথে নতুন প্রাণশক্তি দেবে। বাস্তবিক এই সময় থেকে সাংসারিক চৈতন্যের একটা মানসিক উদাসীনতা, সংসার নিস্পৃহতা বেড়ে যেতে লাগলো। তেমন ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগলো

ভক্তিবাদ, দেবদেবী ও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য। বিশেষত গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ও তস্য লীলাসঙ্গিনী শ্রীরাধার প্রতি। দেখা যাচ্ছে, আরও পরবর্তীকালে চৈতন্য নিজেই নিজেকে কখনো শ্রীরাধা, কখনো বা শ্রীকৃষ্ণ মনে করতেন। এবং তা স্বকল্পিত হলেও একথা তিনি পার্ষদ ও শিষ্যদের কাছে সবিস্তারে প্রচার করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন,

'গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত।।'

[চৈঃ চরিতামৃত-১।১৭।২৭০]

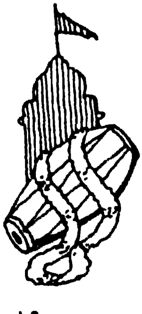
অন্যত্র রাধা ভাব প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয 'রাধা' জ্ঞান।।'

[ঐ ৩।১৫।১৩]

কিন্তু আমাদের তাৎক্ষণিক আলোচ্য ছিল চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাক্‌বিবাহ বিষয়ক। অর্থাৎ লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু ও চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহের মধ্যবর্তী পর্ব। তো এ পর্যন্ত আলোচনা ভিত্তিক লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর কিছু কারণ আমরা জানতে পারলাম। এসব কারণসমূহ আংশিক হতে পারে, খণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু চৈতন্য বিষয়ক গ্রন্থে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু মোটামুটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

বস্তুত লক্ষ্মীপ্রিযার অপঘাজনিত অকালমৃত্যু চৈতন্যকে যে মানসিক আঘাত সংঘাতের সম্মুখীন করেছিল ব্যক্তিজীবনে সে সংঘাত আবর্ত থেকে কোনদিনই তিনি নিস্কৃতি পান নি। গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস, সংসার, নিস্পৃহতা এ সকল পারিপার্শ্বিক অন্তর্বিরোধের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি এক ধরনের দুঃখবাদী জীবনবোধ, ঠিক এইখানে. মানুষ হিসেবে চৈতন্য মানুষের মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন তাঁর মিস্টিক বা অতীন্দ্রিয় তুরীয় মানবিকতাকে। তবে একথাও ঠিক, চৈতন্যকে প্রকৃত খুঁজতে হলে, চিনতে হলে, জানতে হলে, বুঝে উঠতে হলে, তাঁর কোন এক সময়ের চিন্তা কাজ বা দৃষ্টিকে, কোন একটা পর্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে, তাঁকে খণ্ডে খণ্ডে, টুকরো টুকরো করে না দেখে, না বুঝে. তাঁকে সামগ্রিক ভাবে, তাঁর চরিত্র বিকাশ ও প্রতিভার চলমান ধারাবাহিকতা গতিশীল বৈশিষ্ট্যকে মনে রেখে, তাঁর পরিণামী চিন্তা ও কর্মের লক্ষ্যকে আমাদের খুঁজতে হবে। তবেই পাওয়া যাবে অতিকথিত (Exaggerated) চৈতন্যকে।



যদিচও 'ভাগ্যবানের বউ মরে' জাতীয় কিছু আবাচীন প্রবচন বাঙলাদেশে চল আছে। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগ, বিশেষত স্ত্রীর অকাল বিয়োগ যে কোন স্বামীর ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরান, উপনিষদ আমাদের সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই স্বল্প বিস্তর স্বামী বিরহিনী, স্ত্রী বিরহীর কথা লেখা আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এমন কি আমাদের এ ঘোরকলি যুগেও এ কথা প্রযোজ্য। সুতরাং চৈতন্যের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে কেন !

অতঃপর স্বভাবত এক দুঃস্মৃতির বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সংসারে রয়ে গেলেন চৈতন্য। আগের মতোই সংসারে রয়েছেন, এক সাংসারিক ব্যক্তির যা কিছু কর্তব্য, যা কিছু করনীয় তাই করেছেন

(যেমন টোলে শিক্ষকতা শুরু করেছেন) কিন্তু ততোদিন সব কিছুর মধ্যে বিশেষত সাংসারিক কর্মের মধ্যে একটা প্রাণহীনতার প্রভাব বোধ করতে লাগলেন তিনি। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটা তখন দাঁড়ালো একটা তেতো, বিস্বাদ ওষুধের মতো। ওষুধ না খেলেই নয়, কিন্তু এমন ওষুধ না খেলে ভালো হতো, এমন এক হাবভাব।

পৃথিবীর যাবৎ কোন একটা কিছুর ওপর মানুষের বিতৃষ্ণা জন্মালে সেই জিনিষের ওপর পূর্বনির্দিষ্ট অন্তরাত্মার টান ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসে, এবং ক্রমান্বয়ে তা লয়প্রাপ্ত ঘটে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর শূন্যাতিশূন্য সংসারের দিকে তাকিয়ে চৈতন্যের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। তো মানুষের এই নিরানন্দময় ক্ষয়িষ্ণু সময়টিকে আমরা বাতাস বা বায়ুর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যেমন বাতাসের কোন গন্ধ নেই, বর্ণ নেই, আকার বা অনুভূতি নেই, শুধু আমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুভব বলে দেয় বাতাস আসছে, বাতাস বইছে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সেই বাতাস আসার সংকেত। কিন্তু প্রকৃতিগত বাতাস আর মনোগত বাতাস এক জিনিষ না। যেমন প্রকৃতিগত বাতাস বইলে আকবর বাদশা থেকে হরিপদ কেরানী সবাই অনুভব করবে। কিন্তু কার মনে কখন দুঃসহ দুঃখের বাতাস বইছে, ব্যথার নীলাম্বরি মেঘ জমছে অনুভব করা সহজ না। হাসছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ, অথচ তার বুকের ভেতর কি নিদারুণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমরা কেউ তা অনুমান করতে পারছি না, উপলব্ধি করতে পারছি না। তবে এ কথাও ঠিক, তোমার বুকের ব্যথা যদি চালাক চোর হয়, আর বাকী আমাদের উপলব্ধি যদি হয় সবাই পুলিশ, তবে, আমাদের সবাইকে তুমি ফাঁকি দিলেও একজনকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। সে তোমার মা। জননী, জন্মদাত্রী। এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। পৃথিবীতে মা হলো মেটাল ডিটেকটর, তোমার বুকে কোথায় লুকানো ব্যথার লোহ পাথর আছে এক পলক দৃষ্টি ছুঁইয়ে ঠিক বলে দেবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে — রাজর্ষি জনক একদিন ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে শুধালেন—মানুষের জ্যোতি কি ? অর্থাৎ তাদের বেঁচে থাকা, কাজকর্ম করা কিসের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, সূর্য।

জনক—সূর্য অস্ত গেলে ?

যাজ্ঞবল্ক্য— চন্দ্রমা।

জনক—সূর্য চন্দ্র উভয়েই অস্তমিত হলে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—অগ্নি।

জনক—সূর্যচন্দ্র অস্তমিত, অগ্নি নির্বাপিত তখন কোন জ্যোতি পুরুষের সহায়ক হয় ?

যাজ্ঞবল্ক্য—ধ্বনি।

এইজন্য আমরা যখন নিজের হাতের পাতা পর্যন্ত ভালো রকম দেখতে পাইনা তখন যেখানে শব্দ হয় মানুষ সেখানে পৌঁছাতে পারে।

শেষে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, শব্দ যদি নিরুদ্ধ হয় তখন আত্মাই তখন জ্যোতি, আত্মজ্যোতির সাহায্যে তখন সে স্বীয় কার্য্য সমাধান করে।'

মানুষের মা এমনই এক আত্মার অন্তরাত্মা। চৈতন্য জননী সেই



মাতৃ-অন্তর্দৃষ্টিতে প্রাণপ্রিয় পুত্রের আনুপূর্বিক ব্যথা বেদনা উপলব্ধি করেছিলেন। অতঃপর আর পাঁচটা মা যা করতেন, যা করা সঙ্গত ছিল, শংকিত শচীদেবী খাঁ খাঁ শূন্য সংসারে পুত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাই করলেন।

এ প্রসঙ্গে ডঃ সেন লিখেছেন, 'বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন, তাঁকে ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার এই আকস্মিক পরিণতি তার মনকে সংসার সম্বন্ধে উদাস করে দিলে। তাঁর জীবন বৈরাগ্যের এই প্রথম ধাক্কা। বিশ্বম্ভর পূর্ববৎ টোলে পড়ানো আরম্ভ করলেন। তবে অতঃপর পাণ্ডিত্য প্রকাশ খর্ব হয়ে গেল আর ভক্তির ব্যাখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগলো।' (চৈতন্যাবদান/পৃ-৩৫)।

অতঃপর—'উদাসীন পুত্রের মনকে সংসারের দিকে টেনে আনবার জন্য শচীদেবী নিজে সম্বন্ধ করে পুত্রের বিবাহ দিলেন। বড়োলোক সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া সুন্দরী। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হলো।' (ঐ-৩৫)।

এরকম পরিস্থিতির বিয়ে-শাদী প্রধানত তাড়াহুড়োর মধ্যে হয়ে থাকে। যদিও 'হাজার কথায় বিয়ে' নামক একটা প্রবাদ আছে, তবু, শচীদেবী প্রায় এক কথায় সনাতন পণ্ডিতের* মেয়ের সাথে চৈতন্যের বিবাহ পাকা করে ফেললেন।

শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রথম দেখলেন পুন্যতোয়া গঙ্গার ঘাটে। বিষ্ণুপ্রিয়া স্নান কবতে এসেছিলেন। ভিজে চুল, সদ্যস্নাতা অসামান্যা সুন্দরী কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে মন ভরে গেল শচীদেবীর। এবং তৎক্ষনাৎ তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, 'গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।/"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।।" (চৈঃ ভাগবত/ ১।১০।২২৯)।

অতঃপর শচীদেবী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘটক কাশীপণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন নিজের বাড়িতে। লক্ষ্মীপ্রিয়া চৈতন্যের বিবাহের মধ্যস্থতা করেছিলেন বনমালী ঘটক। এবার এলেন ঘটক কাশীপণ্ডিত। শচীদেবী কাশীনাথ ঘটককে বললেন, "বাপ ! শুন এক বাণী।।/রাজপণ্ডিতেরে কহ, ইচ্ছা থাকে তান। / আমার পুত্রেরে তবে করু কন্যা দান।" রাজ-পণ্ডিতকে গিয়ে বলো, তার যদি ইচ্ছা থাকে, আমার পুত্রের সাথে তার কন্যার বিবাহ দিতে পারে, এ প্রস্তাব আমি দিচ্ছি।

এর পর দেখা গেল, ঘটক কাশীনাথ 'দুর্গা দুর্গা' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলতে বলতে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। রাজ-পণ্ডিত ঘটক কাশীনাথকে সসম্ভ্রমে আসন পেতে দিলেন বসবার জন্য। তারপর শুধালেন, 'কি কার্য্যে আইলা ?' তখন ঘটক কাশীনাথ বললেন,

'আছয়ে এক কথা।



*বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন পণ্ডিতের পদবী মিশ্র। কিন্তু 'পদবী 'রাজপণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত।' (চৈঃ ভাঃ ১।১০।২২২)। অর্থাৎ রাজপণ্ডিত ছিল তাঁর কোন রাজদত্ত জাতীয় পদবী। যদিও তিনি কোন রাজার গুরু বা সভাপণ্ডিত গোছের কিছু ছিলেন না। কবি কর্ণপূর তাঁর 'গৌরগনোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে বলেছেন, সনাতন মিশ্র দ্বাপর লীলায় ছিলেন সত্যভামার পিতা রাজা সত্রাজিৎ।

দিয়ে লয় যদি তবে কবহ সম্বন্ধ।
বিশ্বভর পণ্ডিতের তোমার দুহিতা।
দান কর —এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা।।

দেখা যাচ্ছে, এ হেন প্রস্তাবে রাজপণ্ডিত সনাতন সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের সাথে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের ব্যাপারে রাজী হতে পারলেন না। বোধহয় নিমাইয়েরা তাঁদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত গরীব ছিলেন বলেই এ প্রস্তাব মাত্র তিনি রাজী হতে পারেন নি। কিন্তু নিমাই রূপবান, তার ওপর সুপণ্ডিত। অবশেষে রাজপণ্ডিত নিজের স্ত্রী ও আত্মবর্গের সঙ্গে এক বৈঠকে বসলেন। তিনি অনেক যুক্তি দিয়ে কার কি মতামত জানতে চাইলেন। তখন সকলেই এক বাক্যে বললেন, 'সর্ব্বথা এ কর্ম হবে করহ সত্বরে। তখন সনাতন মিশ্র ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডেকে বললেন, আমি এ প্রস্তাবে সানন্দে রাজী। তুমি নিমাইয়ের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে আমার অভিমত জানিয়ে দাও। আমি পুনঃ দৃঢ়ভাবে বলছি সর্ব্বথা। হ্যাঁ, আমি দৃঢ় ভাবেই বলছি, আমার এ বার কোন অন্যথা হবে না। এ কথা নিশ্চিত জেনে তুমি তাঁদের কাছে আমার বিয়ের কথা বলো।

ঘটক হাসি মুখে ফিরে এলো। কার্যসিদ্ধি হয়েছে দেখে শচীদেবীও খুশী। অতঃপর বিয়ের তোড়জোড়।

নিমাই সব শুনলেন। দেখলেন। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করলেন না। শুধু মা কে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে দিলেন। মা আমি আবারো দার পরিগ্রহ করতে রাজী নই। এ আমার সইবে না মা। মা শচীদেবী শুনলেন না উদাসী বাউণ্ডুলে ছেলের কোন যুক্তি। সুন্দরী পুত্রবধূ এনে গুণবতী নারীর মোহ শিকল দিয়ে তিনি সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চান প্রাণের নিমাইকে। তাই হলো। মায়ের নির্বন্ধে ধরা দিলেন চৈতন্য, রাজী হলেন।

অতঃপর বিবাহের উদযোগ।

প্রভুর বিবাহ শুনি সব্ব শিষ্যগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দ মন।

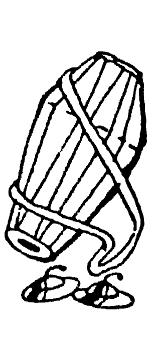
বস্তুত নিমাই পণ্ডিত বিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করুন এটা তাঁর কোন আপনজন বন্ধু বান্ধব, শিষ্য, আত্মবর্গেরাও চায় নি। স্বভাবতই চৈতন্যের বিবাহের কথা শুনে তারা খুশী হলেন। তেমনই খুশী হলেন চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদদ্বয় মুকুন্দ সঞ্জয় ও বুদ্ধিমন্ত খান। বুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন তৎকালীন নবদ্বীপ অঞ্চলের অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি। খান উপাধি থাকলেও ইনি বেনে বা মুসলিম নন। খাঁটি ব্রাহ্মণ। অন্যতম চৈতন্য ভক্ত মুকুন্দ সঞ্জয়ও বেশ বড়োলোক ছিলেন। (আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি যে, এই বুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুন্দ সঞ্জয়কে চৈতন্যমাতা শচীদেবী প্রায়শ বাড়িতে ডেকে আনতেন। কখন ডেকে আনতেন, না যখন চৈতন্যের বায়ুরোগের আধিক্য বেড়ে যেত— চিৎকার করতেন, লম্ফঝম্প দিতেন, ঘরের জিনিষপত্র ভাঙচুর করতেন, একে ওকে এমন কি মা কে, স্ত্রীকে তেড় মারতে যেতেন। তখন বুদ্ধিমন্ত ও মুকুন্দ সঞ্জয়রা দলবল সহ এসে মাথায় নারায়ণ তৈল মহাবিষ্ণু তৈল প্রভৃতি বায়ুনাশক তেল মালিশ করে চৈতন্যকে আপাতত ঠাণ্ডা করতেন)। তো বিপত্নীক চৈতন্যের পুনর্বিবাহ শুনে চৈতন্যের



বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করবার মনস্থ করলেন বুদ্ধিমন্ত খান। বললেন, 'মোর ভার এ বিবাহে লাগে ব্যয়।' ওদিকে মুকুন্দ সঞ্জয়ও চৈতন্যের খরচাপাতি করতে চান। পাশাপাশি দু'জন ধনাবান থাকলে যা হয়। কিন্তু বুদ্ধিমন্ত দ্বিতীয় কারুকে দলে টানতে রাজী নন। অগত্যা ঠিক হলো বুদ্ধিমন্ত খান-ই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন। এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিমন্ত ঘোষনা করে দিলেন যে, নিমাঞির এ বিয়ে 'বামনিঞা মত' হবে না। বামনিঞা কথার অর্থ হলো দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পরে দেখা যাচ্ছে, তিনি (বুদ্ধিমন্ত) যথার্থ কথা রেখেছিলেন। চৈতন্যের বিবাহ হলো রাজকীয় ভাবে। এ বিয়েতে নবদ্বীপের সমস্ত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রিত করা হয়েছিল। এ ছাড়াও তৎকালীন নদীয়া অঞ্চলের আরও অনেক বিপ্র (ব্রাহ্মণ) এসেছিলেন। অনেকে বোধহয় অনাহুত ভাবে এসেছিলেন। এখানে বৃন্দবন দাস লোভী বামুনদের নিয়ে বেশ মস্করা করেছেন দেখা যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন, 'তথী-মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে। /একবার লৈয়া পুন আর কাচ কাচে।।' অর্থাৎ একবার খেয়ে দেয়ে, ছাঁদা দক্ষিণা কোচড়ে বেঁধে চলে যাবার পর তারা 'কাচ কাচে ' (অন্যরকম পোষাক পরে) ছাঁদা দক্ষিণার লোভে আবার আসছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'লোভী বামুন' কথাটা শুধুমাত্র নিছক প্রবাদ বাক্যি নয়, এর ভেতর ঐতিহাসিক সত্যও আছে।

চৈতন্যের এই দ্বিতীয় বিবাহে খরচ খরচা বোধহয় তদানীন্তন রাজা জমিদারদের মতোই হয়েছিল। বারো পনেরো রকম শুধু বাদ্যি ও 'বাজানিঞা'দের নাম পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বিয়ের প্রসেশনে ছিল প্রচুর অস্ত্রধারী সৈন্য-সামন্ত। যাদের সেসময় বলা হতো 'পটোয়ার'। এছাড়াও এ বিয়েতে ভাড়া করে আনা হয়েছিল নানা সম্প্রদায়ের নর্তকদের। (নর্তকীর কথা অবিশ্যি লেখা নেই, তবে নর্তক বলতে নর্তক-নর্তকী উভয়ের কথাই বলা হযেছে বলেই মনে হয়)। এবং সেই সঙ্গে আনা হয়েছিল মনোরঞ্জনের জন্য বেশ কিছু বিদূষকদের। অপরদিকে চৈতন্যের শ্বশুরমশাই রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রও যৎপরনাস্তি খরচা করেছিলেন মেয়ের বিয়েতে। তিনি প্রচুর দান সামগ্রী দিয়েছিলেন জামাতাকে। এর মধ্যে ধেনু অর্থাৎ গরু, বেশ কিছু জমিজমা, খাট-পালঙ্গ, বিছানা, সেই সঙ্গে বেশ কিছু দাস-দাসীও। এতে মনে হয়, সে যুগের বিয়েতে বোধহয় জামাইপক্ষকে অন্যান্য দান সামগ্রীর সাথে সাথে দাস-দাসী যৌতুক দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল (চৈঃ ভঃ ১।১০। ৩৬৯)।

চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার এই বিবাহ উপলক্ষে নদীয়ার লোভী ব্রাহ্মণদের কথা সবিস্তারে লিখেছেন। তেমনই বিশিষ্ট ও বিতর্কিত চৈতন্যচরিত চরয়িতা লোচন দাস এ বিবাহ উপলক্ষে বাসরঘরে কুলবধূদের প্রসঙ্গে লিখেছেন কিছু আপত্তিকর কথা।



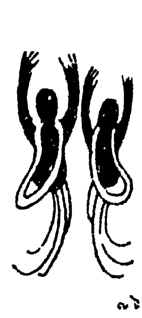
'বসন বচন সব স্খলিত হইল।
নয়ান অলসযুত কাহারো হইল।।
কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ-রঙ্গভরে।
ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বম্ভরে-কোলে।'
[আদিখণ্ড/পৃ-৩৮]

লোচন তাঁর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে অন্যত্র লিখেছেন,

পরম সুন্দরী মত সবে হৈল উনমত
বেকত মনের নাহি কথা।
রসে বসে আবেশে লোলিপরে গোরা পাশে
গরগর কামে উনমতা।।

(ঐ/আদি/পৃ ৫৮)

দুটি পদই চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহ সময়কার ঘটনা। বলা বাহুল্য, শিল্পী হিসেবে ও শিল্পকুশলতায় লোচন দাস অনন্য। তাঁর মতো নিপুণ কবি শক্তি আর কোন চৈতন্য জীবনী রচয়িতাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থের সূত্রখণ্ডে লিখেছেন, আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে পারি। কিন্তু এরকম বিনয়সূচক ভণিতা মধ্যযুগের সমস্ত কবিদের কবিতায় পাওয়া যাবে, কথা হচ্ছে, কবি হিসেবে নয়, লোচনের কবিতার বক্তব্য কতোখানি বাস্তবের কাছাকাছি। বস্তুত, চৈতন্যকে নিয়ে প্রায় সকল চৈতন্যচরিতকারেরই অল্প বিস্তর বাড়াবাড়ি করেছেন। সেই মতো লোচন দাসও করেছেন। কিন্তু অন্যদের সাথে লোচনের পার্থক্য প্রায় উত্তর দক্ষিণ মেরুর মতো। অন্যরা তাঁদের কাব্যের নায়ককে মানুষ থেকে ঈশ্বরে উন্নীত করার জন্য মূলত বাচন নির্ভর অতি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু লোচন দাস মানুষ থেকে এক সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করেছেন তাঁর নায়ককে। এবং এটা করেছেন সেই সেই স্থানে যেখানে নারী ও তার দেহজ লিপ্সা এবং প্রসঙ্গ চৈতন্যের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এখানে চৈতন্য চরিত্র যতখানি না অপবাদী ততোধিক অপবাদী কলঙ্কিত হয়েছেন তদানীন্তন নবদ্বীপের পুরনারী কুলবধূরা। অবশ্য এর সঙ্গে তিনি নদীয়া নারীদের সাথে চৈতন্যের নাগর ভাবের কথাও প্রকাশ করেছেন। শুধু এ হেন নদীয়া নাগরী ও নাগর চৈতন্যের কথা উল্লেখ করেছেন আরও অনেক পদকর্তা। যেমন বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার, শেখর প্রমুখদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব দেহতত্ত্বমূলক পদসমূহ সঙ্কলিত হয়েছে গৌরপদতরঙ্গিনী নামক গ্রন্থে। শুধু মাত্র এই গৌরপদতরঙ্গিনীতে নদীয়া নাগরীদের ও চৈতন্যকে নিয়ে সব সাকুল্যে ৩৮টি পদ প্রকাশিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এই নাগরী ভাবের প্রবর্তক হলেন নরহরি সরকার। নরহরির সঙ্গে চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সমসাময়িক রচয়িতাদের পদে এরকম উল্লেখ আছে। মুরারির কড়চায় একেবারে শেষের দিকে (৪।১।১৫ ও ৪।১৭।১৩) শ্লোকে ও কবি কর্ণপুরের মহাকাব্যে ১৩।১৪৮ অংশে ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ।১ অংশে নরহরি নাম উল্লেখ আছে। সেই এই নরহরি সরকারের অন্যতম শিষ্য ছিলেন লোচন দাস। এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'নাগরী ভাবের উপাসনা নরহরি প্রবর্তন করিয়াছেন , লোচনদাস তাহা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান/প ৩৬২)।



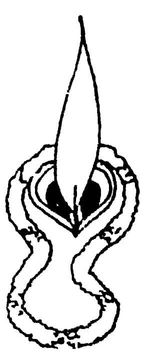
(সপ্তম)

[চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহ]

চৈতন্য প্রায় [illegible] ভাবে, [illegible] বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে এলেন। এই দেখে নবদ্বীপবাসী [illegible] বলতে লাগল, [illegible] বড় বড় বিত্ত [illegible] [illegible]। এমত সম্বন্ধ নাকি দেখা [illegible] যায়নি। পূর্বেই বলেছি, বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন অতীব সুন্দরী, সুদর্শনা। আর চৈতন্য ছিলেন সুন্দরের প্রতীক স্বরূপ। বহু বাদী চাঁদ [illegible] হেরে মুরছাইন। (পদকল্পতরু [illegible]) অতএব চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মিলনে দৈহিক সৌন্দর্যের দিক থেকে [illegible] ছিলনা। চৈতন্য যখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করে দোলায় চড়ে বাড়ি ফিরে [illegible] তখন [illegible] নব দম্পতীকে দেখে নবদ্বীপের মেয়েদের বলতে শোনা গেল

> কারো বোলে এই যেন [illegible] হর গৌরী
> কেহ বোলে যেন কৃষ্ণ কমলা মিলন
> কেহ বোলে এই দুই কামদেব রতি

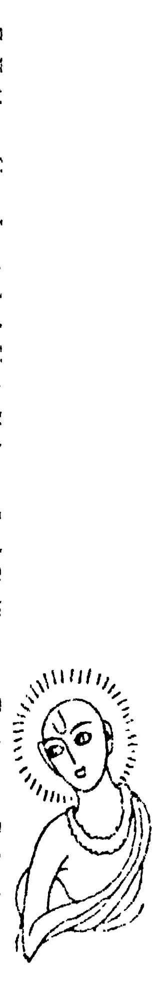
সুতরাং প্রস্ফুটিত কুন্দদল যেমন, শিশুর অনাবিল হাসি এবং চন্দ্রমা ও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক সেই রকম সৌন্দর্যের অন্যতম [illegible] রূপ নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া এসেছিলেন চৈতন্যের সংসারে। তবু, এক নারীর সে সম্মোহনী রূপ পুরুষ চৈতন্যকে বেশ গার্হস্থ্যে বেঁধে রাখতে অসমর্থ হলো, বাধ্য হলো এমনই অনেককাল, রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে গোপা (যশোধরা) বেঁধে রাখতে পারেন নি কামিনী সৌন্দর্যের মোহজালে। কাঞ্চনও সেখানে গৌণ হয়ে গেছলো। অতঃপর সিদ্ধার্থ পরম বৌদ্ধ রূপান্তরিত হয়ে, ক্ষণবাদী বুদ্ধ বললেন. পরিজিন্নমিদং রূপং রোগনিড্ডং পভঙ্গুরং / ভিজ্জতি পূতিসন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং।। (ধম্মপদ/জরাবগ্গ একাদশ অধ্যায়/১৪৮ অংশ)। অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোন কিছুই স্থিত নয়। প্রতি নিয়ত গড়া ভাঙা খেলায় এই আমাদের দেহও একদা জরা গ্রস্থ হয়ে ক্ষয় ও লয়প্রাপ্ত ঘটবে। গোপা সিদ্ধার্থের জীবনে তবু রাহুল এসেছিল। গোপার সান্ত্বনা ছিল। চৈতন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনন্ত অন্তহীন নিঃসঙ্গ করে। দু'জনেরই গৃহত্যাগের কারণ ছিল মৃত্যু। মৃত্যুশীল পৃথিবী বুদ্ধের মনে সংসারের প্রতি অসারতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। চৈতন্যের মনে ঘর সংসারের প্রতি অনাস্থার বীজ বপন করেছিল স্বনির্বাচিত বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু।



লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহের পরবর্তী চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহে যে সকল পদ গ্রন্থিত হয়েছে, তা পাঠ করলে সততই মনে হবে, চৈতন্যের জীবন যেন লক্ষ্মীপ্রিয়াময় হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যের স্বল্পায়ু জীবনে এই এক গভীর সুখের সময়। লক্ষ্মীপ্রিয়া জীবিত থাকলে বিশ্বম্ভর মিশ্র মস্তক মুণ্ডন করে, গেরুয়া সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করতেন এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এই মৃত্যু এসেছিল যন্ত্রণাদায়ক গভীর ক্ষতের মতো। তারপর ক্ষত যখন একটু একটু করে শুকিয়ে এলো, তখন যন্ত্রণার

স্বরূপ থেকে গেল কাঁটা দাগখানা। মানুষের জীবনে বেদনার চেয়েও স্মৃতি আরও মর্মান্তিক। ব্যথা বেদনা নিয়ে তবু মানুষ কাঁদে, চোখের জল ফেলে বুকের ব্যথা হাল্কা করে, অপরের প্রবোধ সান্ত্বনা পায়। কিন্তু ব্যথার স্মৃতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যে পুড়েছিল একদিন, মর্মন্তুদ জ্বালায় জ্বলেছিল, সে কারো মৃত্যু বা মৃত্যুর মতো বেদনায়—সেই একদা ব্যথার স্মৃতি নিয়ে সে একাকি গুমরে মরে এমন সহানুভূতিশূন্য পৃথিবীতে। মানুষের এই অন্তরের অন্তঃস্থলের বেদনা কেউ কেউ টের পায়। যেমন জগদ্ধাত্রী মা। শচীমাতা পুত্রের সেই মর্মবেদনা বুঝেছিলেন। যেমনটি বুঝেছিলেন লক্ষ্মী চৈতন্যের নিমাইয়ের প্রথম মুহূর্তে। সদ্য পিতৃহীন 'বালকের' সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। সেই মতো যাচক বনমালীকে অসন্তুষ্ট মনে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ক্ষণে, সেই দিনই ; প্রতিবেশী মেয়ে লক্ষ্মীর প্রতি নিমাইয়ের মনঃস্পৃষ্ট মনোভাব বুঝতে পেরে বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই প্রেমিকা বধূর অকালে মৃত্যুর পর নিমাইয়ের সঠিক মনোভাব তিনি বুঝতে পারেন নি। যদিও শোকার্ত পুত্রের মনোভাব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মনে মনে। এবং নিমাইয়ের এ [illegible], সংসারী [illegible] স্ত্রীকে চিন্তিত করেছিল, ভাবিত করেছিল। এবং [illegible] ভাবে— জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ তাঁকে উদ্বিগ্ন অশান্ত [illegible] করে তুলেছিল। [illegible] ছিল, সংশয় ছিল, [illegible] মতো [illegible] না তাঁকে নিঃসঙ্গ করে গৃহত্যাগী হন। তাই [illegible], [illegible] নিঃসহায় পুত্রের সহায় স্বরূপ, সান্ত্বনা [illegible] সিদ্ধান্তে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি ঘরে এনে দিলেন। কিন্তু [illegible] লক্ষ্মীপ্রিয়ায় বাঁধা, লক্ষ্মীপ্রিয়াময়, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে [illegible] করবেন কেমন করে। আর এই বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া [illegible] চৈতন্যকে [illegible], আরও বেশি [illegible] করে তুলেছিল [illegible] মানুষের [illegible] মতো। [illegible] দুই [illegible] [illegible], না।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবন [illegible] সুখের হয় নি। দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি বলতে যা বোঝায়, চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া কেউই তার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেন নি। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর প্রেরণায়, সাহচর্যে যে কুসুমাস্তীর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় সে প্রেরণা সে সাহচর্য চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বা বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের কাছে পায় নি। যদিও কোন কোন চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠতর ভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহোত্তর জীবনের ঘটনা প্রবাহ দেখে এ কথা প্রত্যয় হয় না। 'চৈতন্যভাগবত' নামক একটি ওড়িয়া গ্রন্থে (লেখক ঈশ্বরদাস) বলা হয়েছে, নবদম্পতির প্রথম মিলন রাত্রির দিন বাসর ঘরে প্রাথমিক ঘনিষ্ঠতার পর, বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যকে দিয়ে গঙ্গাজলে শপথ করিয়েছিলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়া বেঁচে থাকাকালীন চৈতন্য যেন আর দ্বিতীয় বিবাহ না করে। অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়াকে যেন সতীন কাঁটা নিয়ে স্বামীর ঘর করতে না হয়। ('চৈতন্যভাগবত' (ওড়িয়া) / ১৯ অধ্যায়)



অন্যত্র লোচনদাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে লিখেছেন,

চৈতন্যেব সন্ন্যাসী হওযাব পূর্বাভাসে পেয়ে 'বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুল হয়ে চৈতন্যকে বলেছেন, আমাব মাথায হাত দিয়ে বল' তুমি সন্ন্যাসী হযে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না। আমাব দেহ মন, এ নবযৌবন সবই তোমাব কাছে সমর্পিত, উৎসর্গীকৃত বলে, আমাব স্বামী তুমি নিবাশা কবে চলে যাবে না।

শুন শুন প্রাণনাথ মোব শিবে দেহ হাত
সন্যাস ক'বিবে নাকি তুমি।
বড় প্রীত আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পল
এ নবযৌবন দিবে হাত

[শ্রীচৈতন্যমঙ্গল/প্রাণ]

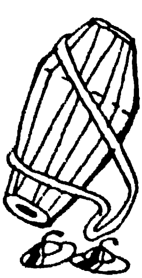
এবপব বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলতে শোনা গেল, তুমি যদি সন্যাস নাও তাহলে স্থিব জেনো, আমি বিষ খেযে প্রাণত্যাগ কববো। (ভাবতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য/নির্মলনাবাযণ গুপ্ত/পৃ ১০৭)।

চৈতন্য ভাগবতেব বচযিতা বৃন্দাবন দাস চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাসঙ্গিক আবেকটি কৌতুকবহ ঘটনা আমাদেব উপহাব দিয়েছেন বৃন্দাবন তাঁব বিশালাকাব চৈতন্য ভাগবতে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে খুব কম বলেছেন। এমন কি সহস্রাধিক পৃষ্ঠা বিশিষ্ট তাঁব বিশাল গ্রন্থে তিনি সাকুল্যে মাত্র এক বাব বিষ্ণুপ্রিয়াব নাম উল্লেখ কবেছেন ১/১০/১১১ সংখ্যক পদে। যথা

যেন কৃষ্ণ বাক্মীতে অন্যোন্য উচিত।
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত।

ব্যস, তাবপব বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাসঙ্গিক যে যৎসামান্য কথা লিখেছেন সেই সব স্থানে বিষ্ণুপ্রিযাকে তিনি লক্ষ্মী বলে উল্লেখ কবেছেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহাবী মজুমদাব তাঁব চৈতন্যচবিতেব উপাদান গ্রন্থে লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে একবাব মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়াব নাম কবা হইযাছে , অন্যান্য সকল স্থানে বিষ্ণুপ্রিযাকে তত্ত্ব হিসাবে লক্ষ্মী বলিযা উল্লেখ কবা হইযাছে। ইহা হইতে মনে কবা যাইতে পাবে যে, গ্রন্থ বচনাব সময বিষ্ণুপ্রিযা দেবী জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহাব প্রতি সম্ভ্রমবশতঃই কবি বাব বাব তাঁহাব নাম কবেন নাই। (পৃ ১৯৪)।*

তো এই চৈতন্যভাগবতেব মধ্যখণ্ডে চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কিত একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা আছে। ঘটনাটি আনুপূর্বিক এবকম : এটি ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দেব ঘটনা। নিত্যানন্দ তখন নবদ্বীপে। এমন একদিন



*চৈতন্যেব তিবোভাবেব আনুমানিক ১৫ বছব পব শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিত হযেছিল। চৈতন্যেব তিবোধান ১৫৩৩ খ্রীঃ অর্থাৎ ১৪৫৫ শকে। ১৪ শকে চৈতন্যেব গৃহত্যাগেব সময বিষ্ণুপ্রিযাব বযস ছিল ১৫/১৬ বছবেব মতো সে হিসেবে ভাগবত বচনাব সময বিষ্ণুপ্রিযাব বযস ৩৯/৪০ বছব চৈতন্যভাগবত রচনাব সময বিষ্ণুপ্রিযা যে বিলক্ষণ জীবিত ছিলেন তাব কাবণ ১৫১৪ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীবাস আচার্য নবদ্বীপ থেকে বৃন্দাবন গেছলেন এবং যাত্রাব পূর্বে তিনি বিষ্ণুপ্রিযাদেবীব অনুগ্রহ লাভ কবেছিলেন। ১৫১৪ শকে বৃন্দাবন পৌঁছালে ১৫১৩ শকে তিনি (শ্রীবাস আচায) বিষ্ণুপ্রিযাদেবীব অনুগ্রহ লাভ কবেছিলেন বলা যায। সে হিসেবে ১৫১৩ শকে ৯৭/৯০ বছব বযসে বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিত ছিলেন।

চৈতন্যজননী শচীদেবী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নের কথা তিনি পুত্র নিমাইকে আদ্যপান্ত বললেন। বললেন, দেখ বাবা, আজ রাত্রে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তুই আর নিত্যানন্দ যেন চার পাঁচ বছরের বালক হয়ে গেছিস। দু'জন মিলে মারামারি করছিস, হুটোপুটি করছিস। হঠাৎ তোরা দু'জন মিলে ঠাকুরঘরে ঢুকে গেলি। আর ঠিক সেই সময় কৃষ্ণ ও বলরাম দুজন বেরিয়ে এসে তোদের দু'জনের সঙ্গে মারপিট আরম্ভ করে দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তোদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে, ঠাকুরঘরে ঢুকেছো কেন ? এখানে যতো দুধ, দই সন্দেশ আছে সব আমাদের। একথা শুনে নিত্যানন্দ বললো, আরে তোমাদের যুগ আর এখন নাই। তোমাদের যুগটা ছিল গোয়ালার যুগ, তাই স্ফূর্তি করে দেদার দধি মাখন লুটেপুটে খেয়েছো। কিন্তু এটা হলো বামুনের যুগ। এখন দুধ দই আমরা খাবো। অতএব তোমরা ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়ো। নচেৎ পিটুনি খাবে। কৃষ্ণ ও বলরাম বললেন, বটে ! তবে তো তোরা দুজনাই আজ আমাদের হাতে বাঁধা পড়বি। তখন কিন্তু দোষ দিবিনা যেন। নিত্যানন্দ বলরামকে বললো, আরে তুমি কৃষ্ণের ভয় কি দেখাচ্ছো ? নিমাই আমার ঈশ্বর। এরকম ঝগড়াঝাঁটি করতে করতে চারজন মিলে ঠাকুর ঘরে দেবতার জন্য রাখা নৈবেদ্যগুলো খেতে লাগলি তোরা। ঠিক এমন সময় নিত্যানন্দের ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নিত্যানন্দ যেন বলছে, মা, বড়ো ক্ষিধে পেয়েছে আমার, ভাত দাও। শচীদেবী বললেন, স্বপ্নটা দেখেছিলাম ভোর রাতে। সেই জন্য বেশি চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু এরকম স্বপ্নের কি যে মানে আমি তো কিছুই মাথামুণ্ডু ভেবে পাচ্ছি না।

মায়ের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তখন নিমাই মৃদু হেসে বললেন,

'বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা।।
তোমার ঘরের মূর্তি পরতেখ কর।
মোর চিত্তে তোমার স্বপ্নতে হৈল দৃঢ়।
মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের কাজে।
আধাআধি থাকে, না কহি কারে লাজে।

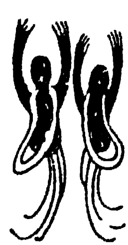
[২।৮।৪৬-৪৮]

অর্থাৎ মা, তুমি বেশ ভালোই স্বপ্ন দেখেছো। কিন্তু তোমার স্বপ্নের কথা যেন ভুলেও আর কারুকে বলো না। তোমার ঠাকুর ঘরের ঠাকুর খুবই জাগ্রত। আমিও ঠাকুর ঘরে ভোগ দিতে গিয়ে দেখি নৈবেদ্যর আধাআধি কোথায় হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এ কথা লজ্জায় আমি কারুকে বলি না।

এবং বৃন্দাবন দাস পরের পয়ারেই নিমায়ের না বলা লজ্জার কথাটি নিমায়ের মুখ দিয়ে ফাঁস করিয়ে দিলেন।

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল।

[২।৮।৪৯]



অর্থাৎ মা, তোমার স্বপ্নে দেখা ঠাকুর ঘর থেকে নৈবেদ্য উবে যাওয়ার ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, তোমার বাড়ির জাগ্রত দেবতাই

এগুলো সাবাড় কবে ফেলেন। আর সে দেবতা অন্য কেউ নয়, স্বং তোমার বধূমাতা—অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া—

'হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে।।'

ঘবেব ভেতবে বসে এতোক্ষণ মা ছেলেব কথা শুনছিলেন লক্ষ্মী অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু ঠাকুব ঘবে নৈবেদ্য চুবিব ব্যাপাবে যখন চৈতন্য তাঁকেই দাযী কবলেন, তখন সহজেই স্বামীর ঠাট্টাব কথাটি বুঝে নিযে হেসে ফেললেন বিষ্ণুপ্রিযা।

চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিযা বিষযক আবেকটি চমৎকাব গল্প আছে কবি কর্ণপূব বিবোচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয' নাটকেব দ্বিতীয অঙ্কে। কবি এখানে লিখেছেন, বিশ্বম্ভব অর্থাৎ চৈতন্য একদিন, শ্রীবাস অদ্বৈতাচায পবিবৃত হযে বসে আছেন। হঠাৎ চৈতন্য বলে উঠলেন, 'সপবিহাস মদ্বৈতং প্রতি', একথা বলেই পবক্ষণে তিনি বললেন, 'সীতাপতিজয়তি লোকমলঘ্নকীর্তিঃ।' অদ্বৈতাচার্যেব দুই স্ত্রী ছিলেন সীতা ও শ্রীদেবী। চৈতন্য যে সীতাকে কেন্দ্র কবে অদ্বৈতাচার্যকে বহস্য কবলেন সেটা অদ্বৈতাচার্য সহজেই বুঝতে পাবলেন। তখন অদ্বৈতাচায মৃদু হেসে বললেন, 'এখানে বঘুনাথ কোথায ? যদুপতি আপনিই তো উপস্থিত দেখছি।' অর্থাৎ অদ্বৈত এবাব বিষ্ণুপ্রিযাকে নিযে চৈতন্যকে উল্টো তামাসা কবলেন। বলতে চাইলেন, তোমাব স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিযা, অর্থাৎ তুমিই বিষ্ণু -যদুপতি। তখন শ্রীবাস আচায বলে উঠলেন, 'এখন দেখছি ভক্তি তিবোহিতা হযেছে।' চৈতন্য উত্তবে বললেন, তা কেন, আপনাদেব মতো সাধুদেব নিকট শ্রীবিষ্ণুভক্তি বযেছে। তখন চৈতন্যেব কথাব উত্তবে অদ্বৈত বলে উঠলেন, 'ইদানীং সেন বিষ্ণুপ্রিযা।' হ্যাঁ আমাদেব বিষ্ণুভক্তি ছিল বটে তবে ইদানীং বিষ্ণুপ্রিযাতে সেবা ভক্তি বেড়ে গেছে।

এসব হাসি তামাসাব কথা যখন চলছিল, এমন সময, শচীদেবী বলে পাঠালেন অদ্বৈত যেন আজ তাব গৃহে ভোজন ও বিশ্রাম কবেন। এই শুনে শ্রীবাস বলে উঠলেন, 'তা হলে আমাবও আজ ওখানে (চৈতন্যেব গৃহে) ভোজন হবে।' তখন শ্রীবাসেব কথা শুনে চৈতন্য বললেন, 'এতো লোকেব বান্না কবতে ওঁব (মাযেব) খুব পবিশ্রম হবে।' তখন অদ্বৈত তরুনী বিষ্ণুপ্রিযাকে লক্ষ্য কবে বলে উঠলেন, 'ওঁর কেন বলছেন তাঁর বলুন।'



বিষ্ণুপ্রিযাকেন্দ্রিক চৈতন্যের এ ধবনেব পরিহাসপ্রিযতা কতোদূব এত্য বলা দুষ্কব। তবে বিষ্ণুপ্রিযাকে বিবাহেব পব প্রথম দিকে চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিযাব সম্পর্ক বোধহয খুব খারাপ ছিল না। কেননা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ কবাব পবও চৈতন্যেব মনোভাব ছিল এরকম :

গৃহস্থ হইযা পঢাযেন বিপ্ররূপে।।
প্রেম ভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না কবেন, ইচ্ছা সে তাঁহাব।।'

[চৈঃ ভাগবত ১।১১।৫ ৬]

অর্থাৎ তখনো পযন্ত পাকা গেরস্থেব তিনি টোলে পণ্ডিতগিবি করে যাচ্ছেন। তখনো পযন্ত প্রেম ভক্তি প্রভৃতি প্রচারের ব্যাপারে তিনি

বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না।

এরপর অদ্বৈত শ্রীবাস নিত্যানন্দাদির সাথে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে ভক্তিভাব তৎসহ রাজনৈতিক রাজবিরোধী চেতনা। বিশেষত ফুলিয়া (শান্তিপুর) বাসী যবন হরি দাসের ওপর চাঁদকাজীর অমানুষিক 'বাইশ বাজারী অত্যাচার চৈতন্যকে আরও মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং এটা ঘটেছিল চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহের কিছুদিন পরেই। আর ভক্তিভাবের আধিক্য বাড়তে লাগলো গয়া প্রত্যাবর্তনের পর। অর্থাৎ গয়ায় ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর। গয়ায় ঈশ্বরপুরীর কাছে চৈতন্যের দীক্ষা নেওয়ার পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যজনক। গিয়েছিলেন গয়ায় পিতৃপিণ্ডদানের উদ্দেশে। দীক্ষা টিক্ষা নেবার কোন কথা ছিল না। হঠাৎই ঘটনাটা ঘটে গেল।

বস্তুত গয়া যাত্রার আগে পর্যন্ত চৈতন্যকে বিশেষভাবে নামসংকীর্তনের ব্যাপারে আগ্রহী হতে দেখা যায় না। যদিও জয়ানন্দ লিখেছেন যে বিশ্বম্ভর পড়ুয়া অবস্থাতেই কীর্তনে তন্ময় হয়ে ছিলেন (চৈতন্যমঙ্গল/আদি/পৃ ২৫)। কিন্তু অন্যান্য চৈতন্যচরিতকারদের গ্রন্থ পাঠ করলে জয়ানন্দের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য মনে হয় না, এ প্রসঙ্গে চৈতন্য বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "বস্তুত অন্যান্য চরিত— লেখকরাই বলেন যে কদাচিৎ ভাব প্রকাশ করিলেও গয়া হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য কীর্তনে বিশেষ রত ছিলেন না।" (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান/পৃ ২৩১)।

অতঃপর গয়ার দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী প্রসঙ্গে বলা যায়, ইনি ছিলেন তদানীন্তন অন্যতম ধর্মগুরু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরীর সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না জানা যায় না। তবে চৈতন্যের অন্যতম সহযোগী পার্ষদ নিত্যানন্দের সাথে মাধবেন্দ্রপুরীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত
সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত।।

[চৈঃ ভাগবত ১।৬।০ ১]

নিত্যানন্দের সাথে মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের কেরল রাজ্যে (তৎকালীন দাক্ষিণাত্যের মলয়বর (মালাবার) প্রদেশ ও ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের অধিকার ভুক্ত)। তবে মাধবেন্দ্রপুরী চৈতন্যের জন্মের কিছু আগে (মতান্তরে পরে চৈতন্যের চূড়াকরণের সময়) একবার নবদ্বীপে এসেছিলেন)। এবং জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্বে আসিয়াছিল নদীয়া নগরী।
জগন্নাথ মিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘন্ট তাঁহাতে খাইল।



উক্ত মাধবেন্দ্রপুরী প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্তের কড়চা ১।৪।৫, কবি কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ১৩।১১১, কবি কর্ণপূরের শ্রী চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১।৬, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল (মৃণালকান্তি দাস সম্পাদিত) দ্বিতীয় অধ্যায়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল দ্বিতীয়

অধ্যায় ও রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এর ১।৯।৮ ও ২।৯।২৬৭-৬৮ অংশে উল্লেখ আছে।

এই মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য ঈশ্বরপুরী।*

মাধবেন্দ্রপুরী সম্ভবত বাঙালি ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন। তবে মাধবেন্দ্র-শিষ্য ঈশ্বরপুরী পুরোদস্তুর বাঙালি ছিলেন। ঈশ্বরপুরী প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে কি নাম ছিল জানা যায় না। তবে ঈশ্বরপুরীর তদানীন্তন বাঙলাদেশের কুমারহট্টে (কুমারহট্টের বর্তমান নাম হালিশহর, ২৪ পরগনা জিলায় অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অধিকাংশ চৈতন্যচরিত রচয়িতা মত প্রকাশ করেছেন।

'প্রভু বোলে, "কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরী যে-গ্রামে অবতার।।'

[চৈঃ ভাগবত/১।১২।৯৮]

চৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর পিতার নাম ছিল শ্যামসুন্দর আচার্য। এবং ঈশ্বরপুরী যে বাঙলাদেশের তৎকালীন কুমারহট্টে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তার আরও প্রমাণ হলো, চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর একবার কুমারহট্টে গেছলেন দীক্ষাগুরুর পুণ্য জন্মস্থান দর্শন করতে। এবং ঈশ্বরপুরীর বাড়ির (ভিটা) একমুঠো মাটি তুলে তিনি তাঁর বহির্বাসে বেঁধেছিলেন। বর্তমান এই স্থানটি 'চৈতন্যডোবা' নামেপরিচিত। এ প্রসঙ্গে চৈতন্য বিশেষজ্ঞ রাধাগোবিন্দ নাথ মশাই লিখেছেন, 'তদবধি ৪০০ বৎসর ধরিয়া আগন্তুক যাত্রীমাত্রই ঐ স্থানের মৃত্তিকা ভক্তিভরে গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে উহা একটি ডোবায় পরিণত হয় (শ্রীচৈতন্য ভাগবত/আদি পৃ-৪৪৮)। এছাড়াও (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান/রাজ সং) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৮১ পৃষ্ঠায় এ' কাহিনীর উল্লেখ আছে।

তো এই ভাবী দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গয়ায়-সাক্ষাৎকারের আগেও চৈতন্যের নবদ্বীপে সাক্ষাৎ হয়েছিল। চৈতন্য বলা যায় তখন সদ্য বিবাহিত। বধূ লক্ষ্মী ও মা শচীদেবীকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সদানন্দ সংসার, এবং অধ্যায়ণ ও পড়ুয়াদের নিয়ে তাঁর দিন কাটে। চৈতন্য তখন পুরোদস্তুর বিশ্বম্ভর। এমন একদিন টোলে অধ্যাপনা সমাপ্ত করে গৃহে প্রত্যাবর্তন পথে ঈশ্বরপুরীর সাথে তাঁর হঠাৎ দেখা,

পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে।।

এবং এটিই চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর প্রথম সাক্ষাৎ। এর আগে একে অন্যের সাথে চাক্ষুস মিলন হয়নি। কেননা এ সাক্ষাৎ মুহূর্তে



---

*চৈতন্যচরিতামৃতে মাধবেন্দ্রপুরীর তেরোজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। যথা—ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহ তীর্থ, সুখানন্দপুরী, অদ্বৈত আচার্য, রঙ্গপুরী ও রামচন্দ্রপুরী (১।৯।৯-১২, ২।৪।১০৯-১০, ২।৯।২৫৮, ৩।৮।১৯)। এছাড়াও জয়ানন্দ আরও চারজন ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' এবং শ্রীজীব গোস্বামীর বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থে একজন করে—মোট ১৯ জন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়।

গোড়াতেই ঈশ্বরপুরী চৈতন্যের কাছে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করছেন, 'জিজ্ঞাসেন তোমার কি নাম বিপ্রবর।' প্রথম সাক্ষাৎকারে যেটা সচরাচর ঘটে থাকে। একে অপরের নাম ধাম জিজ্ঞাসা। কি করা হয়। সেই মতো ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি পুঁথি পড়াও পড়, কোন স্থানে ঘর ?' এবং চৈতন্যের মুখে এসব প্রশ্নের সদুত্তর পেয়েই তিনি বলে উঠলেন, "তুমি সে !" বলিযা বড় হৈল হরষিত।' অর্থাৎ এর আগে নিমাই পণ্ডিতের নাম তিনি কারু কাছে শুনেছিলেন। চাক্ষুস সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না। তাই সাক্ষাৎ হতেই 'তুমি সে ।' বলিয়া বড় হৈল হরষিত।' কিন্তু কার কাছে নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনেছিলেন ঈশ্বরপুরী ? সম্ভবত অদ্বৈতাচার্যের কাছে। তবে মুকুন্দের কাছেও শুনে থাকতে পারেন। কেননা নবদ্বীপে আগমনের পর এই দু'জনের সাথেই ঈশ্বরপুরীর প্রথম সাক্ষাৎ। অবশ্য অদ্বৈতাচার্য ও মুকুন্দের সাথে ঈশ্বরপুরীর পরিচয় আগে থেকেই ছিল। যদিও ছদ্মবেশে আসার জন্য প্রথমে তাঁরা চিনতে পারেন নি ঈশ্বরপুরীকে। বোধহয় ছদ্মবেশখানা পাকা হয়েছে কিনা জেনে নেবার জন্যই পুরী প্রথমে তাঁর পরিচয় দেন নি। পরে, দু চারটে কথা বার্তার পর, অতি পরিচিত মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন অদ্বৈত মুকুন্দেরা। সম্ভবত এসময় চৈতন্যের কথা ওঠে।

কিন্তু প্রশ্ন থাকে, একজন নিরাসক্ত সন্ন্যাসী—যাঁর কোন কামিনী কাঞ্চন বা বৈভবে আসক্তি নেই, তিনি কেন, কোন অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশ ধারণ করবেন ? অন্তত চৈতন্য জীবনচরিত গ্রন্থমালা কথিত ঈশ্বর পুরীর মতো একজন বড়ো মাপের গুরু স্থানীয় সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে একথা বলা যাবে। এবং এটাও বড়ো সত্য যে, ঈশ্বরপুরী যখন নবদ্বীপে এলেন তখন পাষণ্ডী অর্থাৎ বৌদ্ধদের সাথে অদ্বৈতপন্থীদের চলছিল তুমুল বিরোধ। চৈতন্যপন্থী না বলে অদ্বৈতপন্থী বলছি এ জন্য, কারণ গয়া প্রত্যাবর্তনের আগে পর্যন্ত কোন ধর্মীয় সংগঠনের সাথে চৈতন্য প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন না। তবে ঝুঁকেছিলেন। এবং সেটা প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ও স্ত্রীর মৃত্যুজনিত দুঃখের দিনে অদ্বৈতাচার্যের আকর্ষণে। অর্থাৎ চৈতন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলেন নি। সংগঠন ছিল অদ্বৈতাচার্যের। সেটা ক্ষুদ্র ছিল। বিচ্ছিন্ন ছিল। পরবর্তী কালে চৈতন্য বুদ্ধি বলে, প্রভাব বলে এই সংগঠনকে মজবুত করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। মানুষ চৈতন্যের আকর্ষণে সাড়া দেয়, বিশেষত নিম্নবর্ণের লোকেরা। 'আচণ্ডাল প্রেম' যা পণ্ডিত প্রাজ্ঞ অদ্বৈত আচার্যের মাথায়ও আসেনি। সম্ভবত এখানেই বিশ্বম্ভর মিশ্র চৈতন্য। চৈতন্য কোন নাম নয়, দেও উপাধি মাত্র নয়, মানুষ বিভেদহীন করণের লক্ষ্যে অর্জিত তপস্যার একটি ফলশ্রুতি মাত্র। ক্রমে নদী ও সাগরের মতো একদা যে ক্ষুদ্র অদ্বৈত পন্থী দলটি ছিল তা চৈতন্য সাগরে বিলীন হয়ে গেল একদিন।

চৈতন্যের মনে সন্ন্যাসের বীজ নিহিত ছিল। এবং সে বীজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বড়োদাদা বিশ্বরূপ। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সে বীজে অঙ্কুরোদ্গম ঘটালো সদ্য। অঙ্কুরোদ্গম চারা বৃক্ষটিকে তিল তিল করে লালন করলেন অদ্বৈতাচার্য। আরও কেউ কেউ ছিলেন, যেমন মুকুন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, নিত্যানন্দ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ছিলেন অদ্বৈতাচার্য। তবে



একথাও ঠিক, চাষী যতোই কুশলী হোক, তার মাঠে ছড়ানো সব বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। কিছু কিছু হয়। এবং এই হওয়া ও না হওয়া যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে। লক্ষ্মীদেবীর অকালমৃত্যু যে পলায়নী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল চৈতন্যের চোখের সামনে, চলার গতানুগতিক পথকে রুদ্ধ করেছিল। সেই আবহাওয়া একদা চৈতন্যের মনে নিহিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সন্ন্যাস বীজটির অঙ্কুরোদগম ঘটিয়েছিল, পত্রোদ্গম ঘটিয়েছিল। কিন্তু যদি লক্ষ্মীদেবী দীর্ঘায়ু হতেন, তবে কি চৈতন্যের জীবনে অদ্বৈতাচার্যের প্রয়োজন থাকতো। হয়তো থাকতো, সেটা গার্হস্থ্যের দিক, শিক্ষার দিক, ধর্মের দিক। কিন্তু লক্ষ্মীপ্রিয়ার বন্ধন থেকে গৃহী নিমাইকে সংসার সীমান্তের বাইরে টেনে আনা কোন অদ্বৈতাচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভালোবাসা এরকম। ভালোবাসা নিঃস্ব করে, ভালো না বেসেও নিঃস্ব করে। নিমায়ের সাংসারিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল সম্ভবত এই ভাবে।

তাহলে এ পর্যন্ত আলোচনা ভিত্তিক দুটো জিনিষ স্পষ্ট হয়, তা হলো, নবদ্বীপ আগমনের পূর্বে চৈতন্যের সাথে ঈশ্বরপুরীর যেমন কোন রকম পরিচয় ছিল না, তেমনই, অদ্বৈত আচার্য, মুকুন্দ, আরও কারো কারো অদ্বৈতপন্থীদের সাথে ঈশ্বরপুরীর পূর্ব সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এবং ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন ঘটেছিল সেইসময় যখন পাষণ্ডীদের সাথে অদ্বৈতপন্থী বৈষ্ণবদের বিবাদ এক চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। এবং ঠিক এসময় (বোধহয় ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসছেন বা এসে গেছেন জেনেই) পাষণ্ডীদের জ্বালায় নাস্তানাবুদ ভক্তদের কাছে অদ্বৈতাচার্যকে বলতে শোনা গেল

'শুনিঞা অদ্বৈত হয় ক্রোধ অবতার।
"সংহারিমু সব" বলি করয়ে হুংকার।।
আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিব কি হয় এই নদীয়া ভিতর।।'

[চৈতন্য ভাগবত/ ১।৭।১৯১-৯২]

এর অর্থ তাই নয় যে, অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরপুরীকে লক্ষ্য করে 'আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর' বলেছেন। তবে ঈশ্বরপুরীর আগমনে বা আগমন বার্তা সুনির্দিষ্ট জেনে "সংহারি সব" বলি করেন হুংকার' অদ্বৈতের ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল না। কেননা যদিও ঈশ্বরপুরী বয়সে অদ্বৈতাচার্যের অনুজ ছিলেন, কিন্তু সেসময় সংগঠক হিসেবে ঈশ্বরপুরী যে অদ্বৈত আচার্যের চেয়ে অগ্রজ ছিলেন তার অনেক প্রমাণ আছে। এছাড়া অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরপুরী পরস্পর সম্পর্কে ছিলেন গুরুভাই কেননা উভয়ে ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। এসব কারণে সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী ও গৃহী অদ্বৈত আচার্যের পথ অভিন্ন ছিল বলে মনে হয় না।



দেখা যাচ্ছে, এসময় --অর্থাৎ নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর প্রথম সাক্ষাৎকালে পুরী গোস্বামী বেশ কয়মাস ছদ্মবেশে নবদ্বীপে অবস্থান করেছিলেন। এসময় তিনি থাকতেন পরবর্তী চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে। 'মাস-কথো গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে। / রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ-পুরে।।' এবং এসময় গোস্বামীর সাথে রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল চৈতন্যের। চৈতন্য পুরী গোস্বামীকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সমাদর করলেন।

পরবর্তীকালে এই ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরেই গয়ায় (জয়ানন্দের মতে বক্রজগীরে) চৈতন্যের সাথে ঈশ্বরপুরীর পুনঃ সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এবং এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকালে চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এ দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব পরিকল্পিত ছিল কি না জানা যায় না। তবে এই দীক্ষান্তে চৈতন্যের মনে প্রথম এক পরিবর্তন এসেছিল, বৈরাগ্য স্পৃহা সঞ্জীবিত হয়েছিল যার প্রভাবে, সে দীক্ষামন্ত্রের না দীক্ষাগুরুর বলা দুষ্কর। তবে চৈতন্যের দীক্ষাগুরু হিসেবে ঈশ্বরপুরীরও কিছু প্রভাব থাকবে এ কথাও সত্য।

[আট]

[চৈতন্যের গয়া প্রত্যাবর্তন]

'গয়ায়া ইত্যেবং স্বগৃহমগমদ্ ভূরিকরুণ প্রভুঃ
পৌষস্যান্তে সকল তনুভৃত্তাপশমনঃ।
ততঃ মাঘস্যাদৌ নিরবধি নিজৈঃ কীর্তনরসৈঃ
প্রকাশং চাবেশং বিকিরতি স্মানুদিবসম্।।

['চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্' / কবি কর্ণপূর / ৪।৭৬]

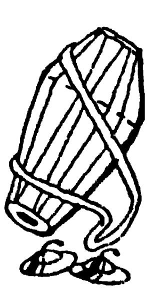
অর্থাৎ পরম করুণ এবং সর্বজীব-তাপহর প্রভু পৌষমাসের অন্তে (শেষভাগে) এভাবে গয়া হতে স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর মাঘমাসের আদি (প্রথম) থেকে আরম্ভ করে প্রভু নিজ কীর্তনরসের দ্বারা জগতে প্রকাশ ও আবেশ বিকীরণ করতে লাগলেন।

চৈতন্য গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের কতোদিন পর সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তা একমাত্র কবি কর্ণপূর ব্যাতীত আর কোন চৈতন্য জীবনীকার স্পষ্ট করে লেখেন নি। কর্ণপূরের (৫।১২৫ মহাকাব্য) থেকে জানা যায়, ১৪৩১ শকের (১৫১০ খ্রীঃ-এর ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহ) দশ মাসের ২৯ দিন (অর্থাৎ বৈশাখ থেকে বছর শুরু হলে দশ মাস অর্থে মাঘ মাসের ২৯ তারিখে) চৈতন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। ১৪৩০ শকের পৌষ মাসের অন্তে (শেষে) চৈতন্য গয়া থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাহলে হিসেব কষলে ১৪৩০ শকের পৌষান্ত থেকে ১৪৩১ শকের ২৯ এ মাঘ পর্যন্ত সময় দাঁড়াচ্ছে মোট ১৩ মাস। ভীষণ ভাবে মনে রাখতে হবে, চৈতন্যের ৪৭ বছর ৪ মাস দশ বা বারো দিনের স্বল্পায়ু জীবনে গয়া প্রত্যাবর্তন ও সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যবর্তী এই ১৩ মাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। ভগবান চৈতন্য বলুন, মহামানব বা মহাপুরুষ চৈতন্য বলুন—অর্থাৎ পরবর্তীকালে চৈতন্যকে যে বিরাট মাপের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার নেপথ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করেছে এই তেরো মাসের নানান বিক্ষিপ্ত কার্যাবলী। অর্থাৎ এই তেরো মাস চৈতন্য যা যা করেছেন তা না করলে চৈতন্যের জীবনের ইতিহাস হয়তো বা অন্যরকম হতো। হয়তো তিনি সংসারে থাকতে পারতেন না। সন্ন্যাসীই হতেন। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে পরবর্তী জীবনে রাজনীতির কুম্ভিপাকে জড়িয়ে পড়তে হতো না। এর অর্থ এই নয় যে, রাজ্য রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে চৈতন্য নিজের জীবনকে



তমসাচ্ছন্ন করেছিলেন। বরঞ্চ নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে, এই জড়িত রাজনীতি 'নিমাঞ্চি' ওরফে বিশ্বম্ভরের জীবনে চৈতন্য নামের এক অবিসংবাদিত সার্থকতা এনেছে। কিন্তু এসব বিষয়ে আলোচনা তো আরও পরে। তার আগে আমাদের জানা দরকার, গয়া প্রত্যাবর্তন ও সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যবর্তী এই নির্দিষ্ট তেরো মাস সংসারী চৈতন্য সংসারে থেকে কি কি করেছেন।

কিন্তু তারও আগে বিশ্বম্ভররূপী চৈতন্যকে আমরা আরেকবার গয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। ভক্তের তুলিতে আঁকা ভক্তের ভগবান চৈতন্যকে আমরা কোন পথে গয়াতে নিয়ে যাই ? দুটি পথ। মুরারি গুপ্ত বলেছেন, 'বিশ্বম্ভর নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া চোরান্ধয়ক নদে স্নান করেন ; তারপর মন্দারে (ভাগলপুর জেলা) মধুসূদন দর্শন করিয়া, নদী পার হইয়া রাজগীরে (রাজগৃহ) উপস্থিত হয়েন ; রাজগীর হইতে গয়ায় যান।' (১।১৫ অংশ দ্রষ্টব্য)। কবি কর্ণপূরও তাঁর মহাকাব্যে এরকম বিবরণ লিখেছেন। শুধু রকমফের ঘটেছে 'চোরান্ধয়ক' নদের জায়গায়। চোরান্ধয়ককে তিনি 'চীর' নদী বলেছেন। হয়তো তৎকালীন স্থানীয় ভাষায় চোরান্ধয়ক নদকে চীর নদী-ই বলা হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুরারি ও কর্ণপূরের বক্তব্য প্রায় একইরকম। কিন্তু অন্যতম ও বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবন দাস বলছেন একেবারে অন্যরকম কথা। তাঁর মতে 'বিশ্বম্ভর মন্দার দেখিয়া পুনপুন আসেন এবং পুনপুন হইতে গয়ায় গমণ করেন।' (১।১২।১৩২)। আমাদের মনে হয়, বৃন্দাবন দাসের বর্ণিত বিশ্বম্ভরের গয়া যাত্রার পথটাই সঠিক। অর্থাৎ বিশ্বম্ভর মন্দার (ভাগলপুর) হয়ে পুনপুনে আসেন এবং পুনপুন থেকে গয়াতে যান। বৃন্দাবন দাস বর্ণিত চৈতন্যের গয়া যাত্রার পথটা সঠিক বলছি এজন্য যে, রাজগীর থেকে গয়া যাবার যদিও একটা সোজা পথ তখন ছিল (এবং এখনো আছে), এবং পুনপুন জায়গাটা হলো পাটনার নিকটবর্তী, সে কারণে রাজগির থেকে পুনপুন হয়ে গয়া আসাটা খুবই কষ্টসাধ্য। বৃন্দাবন দাসকে এ বিষয়ে সমর্থন করার আরেকটা বড়ো কারণ হলো, গয়াযাত্রীদের মধ্যে পুনপুনে স্নান-তর্পণ সেরে গয়াতে যাবার একটা ধর্মীয় রেওয়াজ চালু আছে। পিণ্ডদান নিমিত্তার্থে গয়া যাবার আগে যাত্রীরা কেন পুনপুনে স্নান-তর্পণাদি করেন এর কারণ বলতে পারি না। তবে পুনপুন একটি তীর্থস্থান বিশেষ, এবং গয়াযাত্রীদের শুধু মাত্র এ' কারণে পুনপুণ হয়ে গয়া যাবার একটা রেওয়াজ আগে ছিল। এবং এখনো আছে। তাছাড়াও রাজগীর হয়ে গয়া যাবার যেমন সোজা রাস্তা আছে। তেমনই পুনপুন হয়েও সোজা রাস্তা আছে গয়া ও গয়া তীর্থে যাবার। সুতরাং বৃন্দাবন দাসের বর্ণিত পথটিই সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়।



কিন্তু বিশ্বম্ভর মিশ্র গয়াতে পিতৃপিণ্ডদান ও সেই সঙ্গে ঈশ্বর পুরীর নিকট (আকস্মিক দীক্ষাগ্রহণ) সেরে কোন পথে বাড়ি অর্থাৎ নদীয়া-নবদ্বীপে ফিরলেন সে কথা এক জয়ানন্দ ব্যতীত অন্য কোন পদকর্তা লিখে যান নি। জয়ানন্দের মতে, বিশ্বম্ভর গয়ায় পিতৃপিণ্ড দান ও দীক্ষাগ্রহণ সমাপন করে মন্দারে যান, এবং সেখান থেকে হরিড়া-জোড়ি, কংসনদ ও বৈদ্যনাথ দিয়ে গঙ্গাপার হয়ে নবদ্বীপে আসেন। ('চৈতন্যমঙ্গল' / নদীয়াখণ্ড / পৃ-৩৬)। চৈতন্য সমসাময়িক কালে অর্থাৎ

মধ্যযুগে গয়া থেকে গৌড়বঙ্গে আসার এটাই ছিল সহজ পথ।*

পিতৃপিণ্ডদান নিমিত্তার্থে গয়া গেছলেন চৈতন্য। কিন্তু পথে আকস্মিক তাঁর জীবনে দুটো উপসর্গ ঘটে গেল। প্রথমত জ্বর। এটা হয়েছিল ভাগলপুর জেলার মন্দারে। ভক্তরা ধরাধরি করে চৈতন্যকে মন্দার পর্বতের তলদেশে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে নিয়ে এলেন।

'শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে।।
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর হেন ইচ্ছা তাঁর।।

[চৈ. ভাগবত / ১।১২।১৮-১৯]

ওদিকে জ্বর সন্তপ্তদেহ চৈতন্য নিজেও বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন, 'গয়াসু মে পৈতৃকর্ম্ম বিঘ্নঃ শ্রেয়স্যভূদিত্যতি চিন্তয়াকুলঃ।' (কড়চা ১।১৫।৯)। হায়, কেমন করে আমি গয়া গিয়ে পিতৃকর্ম সমাধা করবো। তারপর অনেক ওষুধ পথ্যিতেও যখন জ্বর উপশম হলো না, তখন, চৈতন্য ব্রাহ্মণের চরণজল (পাদোদক) খাবার মনস্থ করলেন। 'ততোহপ্যুপায়ং পরিচিন্তয়ণ্ স্বয়ং জ্বরস্য শান্ত্যৈ দ্বিজপাদসেবনম।' (কড়চা ১।১৫।১১)।

তারপর—

'বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেই ক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর।।'

['চৈতন্য ভাগবত' / ১।১২।২২]

দেখা গেল, সে জ্বর ঔষুধ বদ্যিতে সারলো না। সেই জ্বর ব্রাহ্মণের চরণধোয়া জল খেতেই নিমেষে উধাও হয়ে গেল। যদিও এই জ্বর এবং ব্রাহ্মণের চরণজল খাওয়া দুটোকেই চৈতন্য চরিতকারদ্বয় মুরারি ও বৃন্দাবন লোকশিক্ষার ব্যাপার বলেছেন।

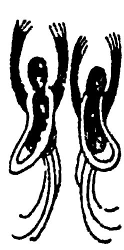
জ্বর থেকে সুস্থ হয়ে চৈতন্য পুনপুনে* এলেন। পুনপুন তীর্থে স্নান সেরে সপার্ষদ গয়াতে এসে পৌঁছালেন। গয়া পৌঁছে প্রথমে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলেন চৈতন্য। স্নান সেরে প্রথমে যথাবিধি পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। তারপর এলেন চক্রবেড়-এ। (চক্রবেড় একটি মন্দির বিশেষ। এই স্থানে বিষ্ণুপাদপদ্ম বিরাজিত)। এই বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে

---

* 'There had long been at least two routes across this hilly country (Jharkhand), one leading from Benares and Gaya to the Midnapore district through the Hazaribagh and Manbhum districts and the other through the Manghyr, Santal Parganas, Birbhum and Bankura districts via Deoghar, Baidyanath, Sarath and Vishnupur, followed by Hindu pilgrims to their sacred shrines at Benares, Gaya, Baidyanath and Jaggernath.' (oldham, 'Routes old & New' in Bengal past and present, July 1924 pp. 21-36) দ্রষ্টব্য।

---

* পুনপুন বা পুনপুনা নদী পাটনার নিকটে প্রবাহিত। পুনপুনা নামে দুটি নদী পূর্বে গঙ্গায় মিলিত হতো। বর্তমানে একটি আছে। যে নদীটি ফতেয়া শহরের নিকট গঙ্গায় পড়তো তার নাম ছিল ছোট পুনপুনা। বা আদি পুনপুনা অন্যটি পাটনায় আরও কিছুটা উত্তরে গঙ্গায় মিশতো—একে বলা হতো বড়ো পুনপুনা। বায়ুপুরাণ (১০৮ অংশ), ও পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড / ১১ অংশ) পুনপুনার কথা উল্লেখ আছে।



জীবনে বোধকরি প্রথম গভীর ভাবে আবিষ্ট হলেন শচীনন্দন চৈতন্য। সারা শরীর অসম্ভব ভাবে কাঁপতে লাগলো তাঁর। 'লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণদর্শনে।' সেই সঙ্গে দু'চোখ বেয়ে অবিরল পড়তে লাগলো অশ্রুধারা। 'অবিচ্ছিন্ন-গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।' চৈতন্যের এ ধরণের ভাবাবেগ এর আগে পরিলক্ষিত হয়নি। তাই—

'পরম অদ্ভুত বহি দেখে বিপ্রগণে।।' [১।১২।৪৪ চৈ. ভাঃ]

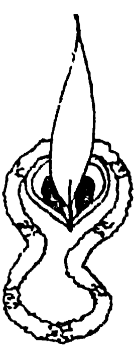
এর পরের ঘটনা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে চৈতন্য যখন কম্পিত, ভাবাবিষ্ট, ঠিক সেসময় অকস্মাৎ ঈশ্বর পুরীর আবির্ভাব। ঈশ্বরপুরী বললেন,

'যদবধি তোমা' দেখিযাছি নদীযায
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়।'

এর মধ্যে ফল্গুতীর্থে গিয়ে ধর্মীয় বিধি অনুসারে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বালির পিণ্ডদান করলেন চৈতন্য। তারপর গেলেন প্রেতগযায়। প্রেতগযায় শ্রাদ্ধাদি দিয়ে শ্রীরামগযা, যুধিষ্ঠির-গয়া, ভীম গযা, শির-গয়া, ষোড়শ গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে গিয়ে পিণ্ডদান করলেন। তারপর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে ও গয়াশিরে পিণ্ডদান করে আবার বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শন করলেন। তারপর বাসায় ফিরে এলেন। বাসায় পৌঁছে নিজের হাতে রাঁধতে বসলেন চৈতন্য। রান্না সমাপ্ত এমন সময় ঈশ্বরপুরীর আগমন। চৈতন্য নিজের জন্য রান্নাকরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ঈশ্বরপুরীর আহারের জন্য তুলে দিলেন। তারপর নিজের জন্য আবার রান্না করতে বসলেন।

এরপর দেখা গেল, একদিন চৈতন্য নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিতে চাইলেন। প্রথমে ঈশ্বরপুরী দীক্ষা দিতে ইতস্তত করলেন। পরে 'দশাক্ষর-মন্ত্রে' চৈতন্যকে মন্ত্র শিষ্য করতে রাজী হলেন তিনি। এই ঈশ্বরপুরীই চৈতন্যের প্রথম দীক্ষাগুরু। কিন্তু ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে, ঈশ্বরপুরীর আগেও চৈতন্যের আরেকজন দীক্ষাগুরু ছিলেন ('অদ্বৈত-প্রকাশ' ১৪ অধ্যায, পৃঃ ৪৫)।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, চৈতন্যের জীবনে ভক্তিবাদের প্রত্যক্ষ সূচনা হয়েছিল গযাতীর্থে। বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শন করে তিনি প্রথম ভাবাবিষ্ট হলেন। এবং অতঃপর ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর অভূতপূর্ব ভাবান্তর ঘটলো। যা অভাবনীয়ও ছিল। কেননা পূর্বাপর গৃহী চৈতন্য গয়াতীর্থে পিতৃপিণ্ডদান দিতে এসে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভক্তিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন এটা তাঁর নিকটতম পার্ষদ ও আপ্তবর্গরাও টের পাননি। দেখা যাচ্ছে, এরপর এমন পরিস্থিতি দাঁড়ালো, যখন চৈতন্য দিনমান নিরবধি অশ্রুপাত করতে লাগলেন। সোনার অঙ্গ ধূলিধূসর হয়ে উঠলো কোন এক অদৃশ্য সংকেতে। এই মাত্র কিছুদিন পূর্বে যিনি স্নেহময়ী জননীকে আশ্বাসন দিয়েছিলেন, 'মাগো, তুমি চিন্তিত হয়ো না। যতোক্ষণ আমি আছি তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।' (চৈ. ভা. ১৬।১১৪)। সেই পূর্ণগৃহী চৈতন্যের মুখে প্রতিক্ষণ, প্রতিনিয়ত 'কৃষ্ণ রো বাপ মে মোর ! পাইমু কোথায়।' উচ্চারিত হতে লাগলো।



অতঃপর নিমাই মনস্থির করে ফেললেন তিনি আর গৃহে ফিরবেন

না। গয়াতীর্থেই থাকবেন ? না, তিনি, প্রেমাভিমানী গোরা, কৃষ্ণান্বেষণে চলে যাবেন দূরে—কৃষ্ণকালো তমালের দেশ পূর্ণতোয়া যমুনা প্রবাহিনী মথুরা-বৃন্দাবনে।

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নোবনস্থো যতির্বা
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।'

'ওগো ! আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি কোন ক্ষত্রিয় রাজা নই, কোন বৈশ্য বা শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু নিত্য প্রকাশমান, পরমানন্দ, পূর্ণাতিপূর্ণ অমৃতসমুদ্র স্বরূপ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচরণের দাসানুদাস।

চৈতন্যের সহযাত্রী—যারা নবদ্বীপ থেকে এসেছিলেন (এর মধ্যে কিছু ভক্ত পড়ুয়া শিষ্য ও কথিপয় প্রতিবেশী আপ্তবর্গ ও অদ্বৈত নির্বাচিত লোক ছিলেন)। চৈতন্যের অকস্মাৎ অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে সকলেই বিস্মিত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অবশেষে—

'নানা-রূপে সর্ব্ব শিষ্যগণে প্রবোধিয়া।
স্থির করি রাখিলেন সভেই মিলিয়া।।'

এমন সময় দূর থেকে 'দিব্যবাণী' উঠলো,

'এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি।
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে।।'

অতঃপর :

'ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইযা বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।।'

['চৈ ভাগবত / ১।১২।১৬০]

চৈতন্যের গয়াতীর্থ যাত্রার কাহিনী এখানেই শেষ। কিন্তু সব কিছু শেষেরও একটা শেষ থাকে। আর সেই শেষাংশ-পরিশেষের মধ্যে নিহিত থাকে নতুন সূচনার অস্ফুট ইঙ্গিত। যেমন প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্যে সূচিত হয় নব আগমনীর প্রচ্ছন্ন সংকেত। তদ্রূপ চৈতন্যের চৈতন্য হওয়ার কাহিনীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজটি এই গয়াতীর্থের মধ্যে নিহিত।



পিতৃপিণ্ডদানের জন্য বিশ্বম্ভর গয়ায় এসেছিলেন। আর পাঁচজন হিন্দু সন্তান হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী যেমনটি গতায়ু পিতৃ-মাতৃ পিণ্ডদান নিমিত্তার্থে গয়াতে আসেন, বিশ্বম্ভরের গয়া আগমনের মধ্যেও ছিল সেই অভিপ্রায়। এরমধ্যে কোনরকম রকমফের ছিল না। দ্বিমত ছিল না। নিমাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, হর্ষোৎফুল্ল মনে জননীর অনুমতি নিয়েই গয়াতীর্থে এসেছিলেন পিতৃকর্ম করতে। এর ভেতর নিমায়ের কোন ধন্দ নেই, আমাদেরও কোন সন্দ থাকে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য থাকে একটা, প্রশ্ন থাকে—যা প্রশ্নাতীতও নয়। কি সেই প্রশ্ন ? না, নিমাই কেন এসেছিলেন গয়াতীর্থে? পিতৃপিণ্ডদান নিমিত্তার্থে ? ঠিক। কিন্তু সত্যিই তিনি—সত্যিই কি একমাত্র পিতৃপিণ্ডদান নিমিত্তে গয়ায় এসেছিলেন ? জানি, সুদীর্ঘ পাঁচশতাধিক বৎসর পর চৈতন্য গ্রন্থে

এর সদুত্তর পাওয়া দুরূহ। আবার দুরূহ নয়ও বলা যায়। দুরূহ বলছি এজন্য যে, এই সুদীর্ঘ পাঁচশো বছরে অতো বড়ে জননেতা চৈতন্যকে কেউ মানুষ হিসেবে ভাবলো না। সন্ন্যাসী হিসেবেও ভাবলো না (সন্ন্যাসীও তো মানুষ), ভাবলো ভগবান হিসেবে। যদুপতি কৃষ্ণ-বলরামের কল্পিত মূর্তিকে অনুকরণ করে গৌর-নিতায়ের বিগ্রহ সৃষ্টি হলো মঠে, মন্দিরে। কিন্তু কেন ? আমাদের এই ধূলোমাটির সংসারে, আমাদের এই চিরহরিৎ, শাপলা শালুকের দেশে, এই ধনধান্য-পুষ্পে ভরা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা বাঙলায়, স্বর্গের চেয়ে বড়ো--অতুল স্নেহশালিনী এক বাঙলার মা শচীদেবীর কোলে যার জন্ম, এবং তোমার আমার মতো এ' বাঙলার জল বাতাস শস্যক্ষেত্র ও তৃণভূমির সমন্বয়ে যিনি শৈশব কৈশোর লালিত হলেন—তিনি তোমার আমার চেয়ে সন্দেহাতীত বড়ো হতে পারেন, মহৎ হতে পারেন, মহান হতে পারেন, এবং সেকারণে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, আমাদের নিয়ত পথপ্রদর্শক হতে পারেন, কিন্তু আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের স্বপ্নিক ভগবান হতে পারেন না। দুরূহ বলছি এ'জন্য।

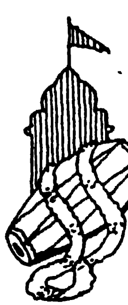
আবার যুগপৎ ঐতিহাসিক ও ভক্ত চৈতন্য জীবনী-চরিতকারদের সৃষ্ট ভগবান চৈতন্যের ভেতর থেকে মানুষ চৈতন্যকে খুঁজে আনা দুরূহ নয় বলছি এ'জন্য যে,

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।।'

['চার্বাক-দর্শন']

অর্থাৎ, কেবলমাত্র শাস্ত্র অবলম্বন করে তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত নয়। যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে।

তাহলে বিশ্বম্ভর মিশ্র কেন গয়াতীর্থে এসেছিলেন ? চৈতন্য জীবনীকাররা বলছেন, পিতৃপিণ্ডদানের উদ্দেশে মহাপ্রভু গয়াতে গেছলেন এটা একটা কারণ অবশ্যই। কিন্তু একমাত্র কারণ না। অন্য একটা কারণও ছিল। সেটা অস্ফুট হতে পারে, প্রচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু যুক্তির দিক থেকে বোধকরি সর্বৈব অযৌক্তিক হতে পারে না। যদি একমাত্র পিতৃকর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বম্ভর গয়াতে আসতেন, তাহলে, স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, প্রয়াত পিতা জগন্নাথ (পুরন্দর) মিশ্রের কৃত্য-কর্মাদি করার জন্য এতো কাল পরে তিনি গয়াতে এলেন কেন ? জগন্নাথ দেহত্যাগ করেছিলেন চৈতন্যের কৈশোর বয়সে (বোধহয় বয়স তখন ১৬।১৭ বছর হবে) এর কমও হতে পারে। তারপর লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে প্রেমমূলক বিবাহ (Love marriage)। বোধকরি একে গান্ধর্ব বিবাহও বলে। যদিও এ বিবাহে অনুষ্ঠান ছিল, বিবাহ আচারাদি (marriage mores) ছিল। এরপর বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পাঘাতে আকস্মিক মৃত্যু ও মাতার নিবর্ন্ধে নিমরাজী বিশ্বম্ভরের বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে পুনর্বিবাহ।—এই সুদীর্ঘ কাল প্রায় ৭।৮ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বিশ্বম্ভর পিতৃকার্যাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন কেন। তার আগেও তিনি গয়া আসতে পারতেন। আসলে তিনি গয়াতে এসেছিলেন সম্ভবত পিতৃপিণ্ডদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াতা পত্নী লক্ষ্মীর অশান্ত আত্মার একটা শান্তি কামনার উদ্দেশ্য নিয়ে। লক্ষ্মীপ্রিয়া অপঘাতে মারা গেছলেন। শোনা যায়, এমন আত্মা নাকি শান্তি পায় না। এই এক সন্দ



নিমায়ের মনে, বিশ্বম্ভরের মনে ক্রিয়া করতে পারে। লক্ষ্মী তো শুধুমাত্র চৈতন্যপ্রিয়া না, তারও চেয়ে বড়ো গহীন-গভীর এক সুশীতল প্রেমচ্ছায়া। যিনি নিয়ত বটবৃক্ষের মতো, ভালোবাসা সাহচার্যের সতত-সবুজ আচ্ছাদন দিয়ে ভ্রাতৃ শোক, পিতৃশোকাতুর ও সাংসারিক দৈন্যতা থেকে তাপিত চৈতন্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। সেই হরিণী স্নেহাতুর রাজা ভরতের আখ্যায়িকাটি স্মরণ করুন। স্মরণ করুন, মরমী কথা-সাহিত্যিকের 'চন্দ্রনাথ' উপাখ্যানের সেই অতিবৃদ্ধ স্নেহান্ধ মাতামহকে। সে হরিণ ছিল বন্য জীব, সে দৌহিত্রও ছিল অদূর সম্পর্কীয়। তবু ভালোবাসা এমন ক্ষুরধার-কঠিন, যা সতত ভালোবাসায় ও ভালোবাসিয়ে সবৈব কাঁদায়, সুখে কাঁদায়, দুঃখেও কাঁদায়।

ভালোবাসার স্মৃতির অস্তিত্ব দীর্ঘ। শিলাপটে খোদিত মূর্তির মতো, শরীরে কাটা দাগের মতো অম্লান। লক্ষ্মীপ্রিয়া মর্ত্যভূমি ছেড়ে ধরাছোঁয়ার বইরে চলে গেলেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের মন থেকে বাস্তবের লক্ষ্মী মুছে গেলেও স্মৃতির লক্ষ্মী মোছা গেল না। স্মৃতি তখন অনুস্মৃতি হয়ে নিয়ত অনুসরণ হতে লাগলো বিশ্বম্ভরের পথে পশ্চাতে। এবং এই এক অচরিতার্থ প্রেমের নিষ্ফল বেদনা বিশ্বম্ভরকে শান্তির খোঁজে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করতে লাগলো। অতঃপর বিশ্বম্ভর গয়াতীর্থে যাত্রা করলেন 'স্ব-জাত' শান্তির খোঁজে। যদি লক্ষ্মীর আত্মা শান্তি পেয়ে শান্তি আসে। কিন্তু কোনমাত্র শান্তি কি এসেছিল তাঁর জীবনে ? জানি না। এর সদুত্তর ভাবী প্রজন্মের হাতে রইলো। শুধু এটুকু কথা বলে এ' অধ্যায়ের পূর্ণচ্ছেদ টানছি, লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যুই বিশ্বম্ভর মিশ্রের সন্ন্যাসী চৈতন্য হওয়ার উপক্রমনিকা। এই এক সূত্র ধরেই নিমায়ের সন্ন্যাস জীবন সূচিত হয়েছিল। এক মিথুনরত ক্রৌঞ্চ নিষাদের শরাঘাতে নিহত হয়ে যেমনটি সূচনা করেছিল যুগান্তকারী মহাকাব্যের।*

| নয় |

[চৈতন্যের জীবনে সেই বিশেষ তেরো মাস]

বিশ্বম্ভর গয়ায় গেছলেন পত্নী বিরহ বুকে নিয়ে। প্রত্যাবর্তন করলেন কৃষ্ণ বিরহের আকুল আর্তি নিয়ে। নিরবধি মুখ দিয়ে উচ্চাবিত হতে লাগলো, 'কৃষ্ণ রে বাপ রে মোর ! পাইমু কোথায়।'



বিষ্ণুপ্রিযার কথা বলতে পারি না। কিন্তু শচীদেবী, নিমাই জননী শচীমাতা কি তাঁর প্রাণের নিমাক্রির এ' অভূতপূর্ব ভাবান্তর দেখে খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। বোধকরি না। নিমাই যে তাঁর অন্তঃশলিলা ফল্গুব

---

*'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম।।'

'রে নিষাদ, কামনায় মুগ্ধ মিথুনবদ্ধ ক্রৌঞ্চ দম্পতীর একটি তুমি হত্যা করেছো, ফলে কখনো তুমি আর প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি লাভ করতে পারবে না।'—এ কথা উচ্চারিত হবার পর ব্রহ্মার আদেশে মহর্ষি বাল্মীকি রামাযণ রচনায় ব্রতী হন।

মতো ভেতরে ভেতরে বিশ্বরূপের পথ অবলম্বন করতে চলেছে এটা তিনি মাতৃ-অনুভবে জানান পেয়েছিলেন, টের পেয়েছিলেন। আর তাই বোধকরি বিশ্বম্ভরের গয়া যাত্রার প্রক্কালে অশ্রুসিক্ত শচীমাতার মুখ দিয়ে সেই অতি সত্য, অমোঘ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, 'মোর নামে এক পিণ্ড দিসরে তথাই।' (চৈতন্যমঙ্গল / আদি । পৃ-৫৫)।

কোন মা জীবিত অবস্থায় ছেলের কাছে পিণ্ড চাইছেন। কেন ? এ কেমন করে সম্ভব ? সন্তান যদি শরীরিক অপটু হয়, অশক্ত জীবনম্মৃত হয়, মরণপীড়িত হয় তবুও অপত্য স্নেহে স্নেহান্ধ মা সন্তানের কাছে এমন কামনা করতে বিপন্ন বোধ করবেন। বস্তুত সেটা হয়ে ওঠে সন্তানের মৃত্যু কামনারই সামিল। স্বর্গাদপি গরিয়সী মায়েরও মৃত্যু। তবু, প্রাণের নিমাঞির গয়া যাত্রার প্রাক্-কালে কেন এমন আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হলো মা শচীদেবীর মুখে। আসলে এ সাধ স্নেহের নয়, স্নেহান্ধের। মায়ার না, চূড়ান্ত মমত্বের। আর এই স্নেহান্ধ মমত্ব থেকে ফলত সৃষ্টি হয়েছিল এক অনুচ্চারিত আর্তি—যা একমাত্র মা-কেই দগ্ধ করে। অতঃপর এই জ্বলুনির মধ্যে মা অনুভব করেন এক ধরণের স্বকল্পিত সংশয়, ভয়, সন্তানের জন্য চিরাভ্যস্থ ব্যাকুলতা। মা শচীদেবীর মুখে উচ্চারিত 'মোর নামে এক পিণ্ড দিসৃরে তথাই' সেই মাতৃ-ব্যাকুলতারই এক অমোঘ বহিঃপ্রকাশ। এ' প্রসঙ্গে চৈতন্য বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমানবিহারী লিখেছেন, 'ছেলে পরে সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, সেইজন্য গয়ায় তাঁহার (চৈতন্য জননী শচীদেবীর) পিণ্ড পড়িবে না—অতএব এখনই জীবিতকালে এক পিণ্ডের জন্য শচীদেবী ছেলেকে অনুরোধ করিলেন।' ('চৈতন্যচরিতের উপাদান । পৃ-২৬৬)।

তাহলে এ' পর্যন্ত আলোচনা ভিত্তিক একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা হলো, গয়া প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল যেমন সত্য, তেমনই সত্য, গয়া যাত্রার প্রাক্-মুহূর্তে চৈতন্যের গৃহী জীবনে এমন কিছু রকমফের ঘটেছিল যা সহনশীল, সর্বংসহা জননীর মনকেও সংশয়ান্বিত করে তোলে, এবং তার ফলেই শীচদেবীর মুখে সেই অতি-সম্ভাব্য উক্তিটি উচ্চারিত হলো, 'মোর নামে এক পিণ্ড দিসৃরে তথাই।' সুতরাং গয়া ফেরৎ চৈতন্যের আমূল পরিবর্তন দেখে মা শচীদেবী বিস্মিত হয়েছিলেন সত্য, দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে অনুভবও করেছিলেন এর পূর্বাপর অবিসংবাদিত পরিণতি।

চৈতন্য গয়াতে ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন ২৩ বছর বয়সে বাঙলার অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে, অর্থাৎ ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে। এরপর গয়া থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন ১৪৩০ শকের পৌষান্তে অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে। চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখ ইং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। এই ১৪৩০ শকের পৌষান্তে গয়া থেকে ফেরার পর সন্ন্যাস নেওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪৩০ শকের মাঘ মাসের আদি থেকে ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত চৈতন্য প্রত্যহ কীর্তন করেছেন। এর মধ্যে বেশির ভাগ সময় কীর্তন হয়েছে 'শ্রীবাস মন্দিরে' অর্থাৎ আচার্যের গৃহে। ক্কচিৎ কোনদিন



চন্দ্রশেখরের* (চৈতন্যের মেসো ?) গৃহে হয়েছে। ১৪৩০ শকের মাঘ মাসের আদি থেকে ১৪৩১ শকের মাঘের শেষদিক পর্যন্ত সময় দাঁড়ায় এক বছর ও কিঞ্চিন্যূন এক মাস। এই এক বছর ও কিঞ্চিন্যূন এক মাসের মধ্যে (গয়া প্রত্যাবর্তের প্রথম মাস) অর্থাৎ সম্ভবত পুরো মাঘমাস চৈতন্য ভক্ত ও পারিষদবর্গদের নিয়ে নিজের গৃহেই কীর্তন করেছেন। তারপর পাড়া প্রতিবেশীদের বিরোধিতায় কীর্তনের আখড়া স্থানান্তরিত হলো শ্রীবাস আচার্যের গৃহে। অবশ্য এই আখড়া স্থানান্তরের ব্যাপারে শচীদেবীর ভূমিকাও থাকতে পারে। গৃহে নবযৌবনা বধূমাতা থাকায় বন্ধু বান্ধব এনে খোল কর্তাল বাজিয়ে বিশ্বম্ভরের কীর্তন করায় তিনি হয়তো মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন। বয়স্ক শ্রীবাসের গৃহ সে হিসেবে নিরাপদই ছিল। প্রৌঢ়া স্ত্রী মালিনীকে নিয়ে তিনি থাকতেন। এবং এ কীর্তন হতো মূলত রাত্রে। দরজা কপাট বন্ধ করে। এই দরজা বন্ধ করে রাতের অন্ধকারে কীর্তন করার বেশ কিছু কারণও ছিল। এসব কারণগুলি চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহে সবিস্তারে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সেসব কারণাদি বর্ণনা করার আগে আমরা একবার বিশ্বম্ভরের দাম্পত্য জীবনের অন্তিম চিত্রটিতে আলোকপাত করতে চাই। সে কাহিনী বড়ো করুণ, বড়োই মর্মান্তিক, মা শচীদেবী ও বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকের দীর্ঘশ্বাস ও নিরন্তর অশ্রুজলে ভেজা। অবর্ণনীয়। মানুষ চৈতন্যের এ' কাহিনী পুনঃলিপিবদ্ধ করতে আমাদেরও চোখে জল আসে।

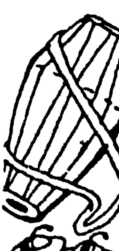
সাংসারিক বিশ্বম্ভর সংসারী মন থেকে অসংসারী চেতনার নৈকট্যকে মুক্ত করার বাসনা নিয়ে গযায় গেছলেন। ইতোপূর্বে প্রাণপ্রিয় পত্নী লক্ষ্মীর অকাল মৃত্যু ঘটে গেছলো। এই অকাল মৃত্যু অকাল বৃষ্টির মতো চৈতন্যের মনে সযত্নে লালিত বীজতলাটি ভাসিয়ে দিয়েছিল অকস্মাৎ। এই বীজতলা ছিল ফসল বোনার অমোঘ ও অনিবার্য প্রেরণা। চাষীর স্বপ্ন, বেঁচেবর্তে থাকার অবলম্বন বিশেষ। কিন্তু মৃত্যুর পদসঞ্চার মানুষের কোন আকুল আর্তি স্তব্ধ করতে পারে না। সে নিজের মতো নিজের খেয়ালে আসে, লখিন্দরের লৌহবাসরেও তার অবাধ আনাগোনা। জীবনের এই বড়ো সত্য সহস্র কোটি মানুষের মতো লক্ষ্মীর মধ্যেও প্রকাশমান হলো একদিন। কিন্তু অবেলায়। একটি পুষ্প কলি ফুল হয়ে স্ফুটমান মুহূর্তে ঝরে গেল। দুঃখ সেখানেই। এই মৃত্যু অসময়ে অকালবৃষ্টির মতো বিশ্বম্ভর নামক চাষীর লক্ষ্মীপ্রিয়া নামক স্বপ্নের বীজতলাটি ধুয়ে-মুছে ভাসিয়ে দিযে গেল। অতঃপর সোনালি ফসলের স্বপ্নময় অঞ্জনি পরা চাষীর দু'চোখে নেমে এলো বিষাদের অশ্রুধারা। একদিকে মা ও সংসার, অন্যদিকে লক্ষ্মীপ্রিয়ার ক্ষত-বিক্ষত করা কাঁটার মতো স্মৃতি। এরই মাঝে বিষ্ণুপ্রিয়া এলেন।



* চৈতন্যচরিত গ্রন্থে দু'জন চন্দ্রশেখরকে পাওয়া যাচ্ছে, একজন চন্দ্রশেখর আচার্য্য ; ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। মুরারির কড়চা ১।১।২১ ও চৈ. ভাগবত ১।২।১৬ অংশে এঁর উল্লেখ আছে। এবং দ্বিতীয়জন চন্দ্রশেখর হলেন চন্দ্রশেখর বৈদ্য। ইনিও শ্রীহট্টের লোক। মুরারির কচড়া ৪।১।১৮ ও ৮।২।১৯।২০২ অংশে এঁর উল্লেখ আছে। সম্ভবত বৈদ্য চন্দ্রশেখরই মোঘল সেনার হাতে নিহত হয়েছিলেন।

চৈতন্যের জীবনে শুরু হলো ত্রিমিতি সংঘাত। একদিকে মা-পিছটান, একদিকে কারাগারের বুদ্ধ দরজার মতো নবপরিণীতা বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার বন্ধন, অন্যদিকে বর্ষার নদীর মতো লক্ষ্মীময় স্মৃতির উপর্যুপরি চোরাগোপ্তা টান। এই ত্রয়ী সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত চৈতন্য তাঁর চিরাচরিত দাগ খাওয়া, টোল খাওযা, পোড় খাওয়া জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন একদিন। এ চাওয়া ছিল নবপরিণীতা বধূ ও বৃদ্ধা শোকাহত মায়ের মুখ চেয়ে। কিন্তু স্মৃতির আগুনে পোড়া চিরাচরিত জীবন থেকে অব্যাহতি চাইলেও, বেরিয়ে আসতে চাইলেও বেরিয়ে আসার কোন আসু পথ তাঁর জানা ছিল না। সুতরাং ত্রিমিতি সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত হলো আরেক দ্বন্দ্ব, মুক্তির সংঘাত। এখানে একটা কথা বলা দরকার, তা হলো, আজও এই স্টারওয়ার, চন্দ্রাভিযানের যুগেও আমাদের পুরাতন বিশ্বাসের ওপর কোন জং পড়েনি। বিশেষত ধর্ম বিশ্বাসের ওপর। এটা ভালো না মন্দ, শুভ না অশুভ সেটা সমাজ-পণ্ডিতদের বিতর্কের বিষয়বস্তু। শুধু এটুকু বলতে পারি, আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে, চৈতন্যের যুগে যে আশা যে বিশ্বাস নিয়ে মানুষ গয়াতীর্থে যেতেন, পাঁচশো পরে, আজও সে বিশ্বাস সে আশার কোন খামতি নেই। সুতরাং আজও যদি মানুষ বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা নিযে গয়ায় যান, তাহলে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে ঘোর ধর্মান্ধতার যুগে প্রয়াত পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনাই চৈতন্যের গযা যাত্রার একমাত্র কারণ হওয়া উচিত। কেননা আদি-অনাদি কাল ধরে এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিযে মানুষ গয়ায় যাচ্ছে—গয়াতীর্থে পিণ্ডদান করলে বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে এই বাসনা নিয়ে। হয়তো পাবে। কিন্তু শান্তি কি শুধু বিদেহী আত্মাই পাবে ? এ শান্তি কি নিজের জন্যও নয় ? আমাদের ধর্ম বিশ্বাস বলছে, বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে গয়াতীর্থে পিণ্ডমান করলে সে স্বর্গারোহণ করে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরও যে আমাদের কাছাকাছি ছিল গয়ায় পিণ্ড পাবার পর সে দূরে—স্বর্গালোকে চলে যায়। এই বিদেহী আত্মার দূরে চলে যাওয়াটাই আলস কথা। তার স্বর্গযাত্রা এখানে গৌণ। অর্থাৎ 'ছিল' এবং 'নেই' এই দুই ভাবনার মধ্যবর্তী যে 'ছিল' নামক স্মৃতির অবস্থান সেই দুঃসহ বেদনাময় স্মৃতির তাড়না থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটি ধর্মীয় উপায় হলো গয়াতীর্থে পিণ্ডদান। বোধহয় এই এক ও একমাত্র ভরসা নিয়ে চৈতন্য গয়ায় গেছলেন।

অতঃপর চৈতন্যের জীবনে পরপর প্রায় ঘণবদ্ধভাবে কতোগুলি ঘটনা ঘটে গেল। সবগুলি ঘটনাই গয়া যাত্রাকালীন পথে ও অকুস্থলে ঘটে গেল একে একে। অকুস্থল অর্থাৎ গয়ায়। পথ-চলতি প্রথম বিপত্তি ঘটলো মন্দারে। প্রবল জ্বর দেখা দিলো চৈতন্যের। সেই সঙ্গে সংশয়, বুঝি গয়া যাত্রা আর হয় না। অবশেষে দীর্ঘ ভোগান্তির পর জ্বর ছাড়লো। দুর্বল শরীরে পুনঃপুনঃ তীর্থে পুন্যস্নান করলেন চৈতন্য। সপার্ষদ চললেন গয়ার পথে। এই গয়াতীর্থে প্রথম বিষ্ণুপদ চিহ্ন দর্শন করে অদ্ভুত রকম পরিবর্তন ঘটে গেল চৈতন্যের মানসিকতায়। এর কয়দিন পরেই ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষিত হলেন। ঈশ্বরপুরী তখন প্রভাবান্বিত ধর্মগুরু। এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্ব্বে যে সকল ভক্ত কৃষ্ণকথা আলোচনায়



রত ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশের উপরই মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গেল।' ঈশ্বর পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। এবং এই ঈশ্বরপুরী সম্পর্কে ডঃ মজুমদার আরও লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গীয় ভক্তদের ওপর মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বরপুরীর প্রভাব সম্ভাবনামূলক হইলেও পূর্ববঙ্গের ভক্তদের ওপর ঐ প্রভাব স্পষ্ট। অদ্বৈত শ্রীহট্টের লোক এবং মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাসেরা চার ভাই এবং চন্দ্রশেখরও শ্রীহট্টিয়া। অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্য এবং নবদ্বীপে তাঁহারই সভায় বা বাড়ীতে উক্ত ভক্তগণ মিলিত হইয়া কীর্তন ও ভাগবত পাঠ করিতেন।' (চৈতন্যচরিতের উপাদান / পৃ ৫৪২-৫৪৩)। শ্রীজীব গোস্বামী তাই তাঁর আরোপিত বৈষ্ণব বন্দনা (শেষ পরিচ্ছেদের ২৩।২৪ লাইনে) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে 'মাধব সম্প্রদায়' বলে উল্লেখ করেছেন, 'এতৈবৈষ্ণব-বন্দনং সুখকরং সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদং। / শ্রীমাধব সম্প্রদায়-গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রদম্।' যদিও পরবর্তী সময়ে চৈতন্যের প্রবল প্রভাবে মাধবেন্দ্র ও তস্য শিষ্যবর্গ ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত বা কেশব ভারতী প্রভৃতি গণের পসার প্রতিপত্তি প্রায় চৈতন্যকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিশ্বম্ভর মিশ্র চৈতন্যে রূপান্তরিত হবার আগে, প্রকাশমান হবার আগে মূলতঃ এঁরাই ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধারক ও বাহক। সে হিসেবে তৎকালীন সনামধন্য ধর্মবেত্তা ঈশ্বরপুরীর ধর্মীয় প্রভাব চৈতন্যের ওপর পড়া খুব বিচিত্র নয়। বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শনের অনুভবজনিত প্রভাবও কিছু ছিল। এবং এই দ্বি প্রভাবে প্রভাবান্বিত বিশ্বম্ভর খুব তাড়াতাড়ি বদলে যেতে লাগলেন। ভাবান্বিত, ভাবাবিষ্ট হলেন ভক্তিবাদে। ভক্তিবাদের মধ্যে প্রবেশ করে পত্নী বিরহী অশান্ত বিশ্বম্ভর কি স্বস্তির আশ্রয় চাইলেন ? বলা দুষ্কর। তবে এ' ভক্তিবাদের সূচনা যে পত্নী বিরহের মধ্যে নিহিত ছিল এমন কথা বলা বোধ করি অত্যুক্তি হয় না।

অতঃপর নতুন ভাবনায় ভাবিত হয়ে, নতুন পথের পথিক ও পথিকৃত ভাবাবিষ্ট চৈতন্য সপরিষদ ফিরে এলেন নদীয়ায়। গয়াতীর্থে তিনি মনঃস্থির করেছিলেন, সংসার অরণ্যে আর ফিরবেন না। বড়ো জ্বালা, বড়ো মায়া, বড়োই পিছুটান সেখানে। সুতরাং সংসারমুখী না হলে চলে যাবেন সুদূর মথুরায় কৃষ্ণান্বেষণে, ননীচোরা কৃষ্ণের দেশে। সেই মতো পা-ও বাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু যাবার ছাড়পত্র মিললো না। দৈববাণী হলো, 'বাড়ি ফিরে যাও, গৃহত্যাগের সময় এখনো আসেনি।' বাড়ি ফিরে এলেন চৈতন্য। গৃহে এলেন কিন্তু গৃহত্যাগী হয়ে।

পথশ্রান্ত চৈতন্য গৃহে ফিরলেন কিন্তু আর টোলমুখী হলেন না। পড়ুয়া ছাত্ররা পুঁথি-পত্র নিয়ে টোলে আসে। নিমাই পণ্ডিতের অভাবে দুঃখিত মনে ফিরে যায় তারা। একদিন, দুদিন এমনিভাবে দশদিন কাটলো। এগারো দিনের দিন নিমাই পণ্ডিত টোলে এলেন। ততোদিনে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ তিনি। মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম। পরণের কাপড় আলুথালু। সোনার বরণ অঙ্গ ধূলিধূসরিত। ছাত্ররা স্তব্ধ-বিস্মিত হয়ে পণ্ডিতমশায়ের অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। কিন্তু মুখে তখনো কিছু বললো না।

ছাত্ররা ব্যাকরণ খুললো, অলঙ্কার, নীতিশাস্ত্রের পুঁথি খুললো।

ছাত্রদের পড়া শেষ। এবার নিমাই পণ্ডিত শিষ্য ছাত্রদের ব্যাকরণের সূত্রাদি ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। কিন্তু ব্যাকরণের সূত্রাদির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ কিসের ব্যাখ্যা করছেন নিমাই পণ্ডিত।

'আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম।।'

ছাত্ররা কিছু না বুঝতে পেরে 'হাঁ' করে তাকিয়ে রইলো গুরুর দিকে।

'প্রভু বোলে "সর্ব্ব কাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বোলয়ে আন।।'

[চৈ. ভাগবত ১।২।১৪৫]

ছাত্ররা বিস্মিত, হতচকিত। পণ্ডিতের রকম-সকম না বুঝতে পেরে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ পর ছাত্রদের অসহিষ্ণুতা টের পেলেন চৈতন্য। বুঝতে পারলেন, ব্যাকারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ছাত্রদের তিনি যা বলছেন, তা ব্যাকরণের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ উল্টো। নিমাই পণ্ডিত নিজের ভ্রান্তি বুঝে লজ্জিত হলেন মনে মনে।

'ক্ষণেকে ইহলা বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর।।
"আজি আমি কোন্ রূপ সূত্র বাখানিল ?"
পড়ুয়া-সকলে বোলে—কিছু না বুঝিল।।'

তখন লজ্জিত বিশ্বম্ভর বললেন,

'হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "শুন সব ভাই।
পুঁথি বান্ধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই।।'

[চৈ. ভাগবত ১।২।১৭২]

এদিনের মতো পড়াশোনা বন্ধ হলো। ছাত্ররা পুঁথিপত্র বেঁধে পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে পড়লো টোল থেকে। গুরুর সাথে চললো গঙ্গাস্নানে।

এরপর এলো সেই অবিস্মরণীয় দিন। গুরু শিষ্যের মুখোমুখী সংঘর্ষ। এবং এ' সংঘর্ষের খবরটি আমাদের জন্য পরিবেশন করেছেন, অন্যতম চৈতন্য চরিতকার কবিরাজ গোস্বামী, অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

ঘটনাটি এরকম : একদিন কৃষ্ণভাবান্বিত চৈতন্য গৃহে একাকী বসে আছেন। মুখে সদাই 'গোপী গোপী' নাম। এ হেন সময় এক পড়ুয়া ছাত্র নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো। চৈতন্যের মুখ দিয়ে তখন সদাই গোপীনাম উচ্চারিত হচ্ছে। গোপীভাবে ভাবাবিষ্ট চৈতন্য। এমন সময় সেই ঠ্যাটা ছাত্র বলে উঠলো,

'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিলা কহিতে।।
'কৃষ্ণনাম' না লও কেনে 'কৃষ্ণনাম' ধন্য।
'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য।।"

ছাত্রের মুখে এই কথা শুনে দুর্বিনিত ছাত্রকে শায়েস্তা করার জন্য মস্তো এক ঠেঙ্গা লাঠি নিয়ে তেড়ে মারতে গেলেন চৈতন্য। সেই দেখে ছাত্রের চোঁ-চোঁ ছুট। ছুট ছুট, আগে ছাত্র, পিছনে লাঠি হাতে চৈতন্য। কিন্তু ছাত্রের নাগাল পাবার আগেই কিছু ভক্ত চৈতন্যকে ধরে

ফেললেন ও শান্ত করে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।

আর ওদিকে—

'পড়ুয়া পালায়ে গেল পড়ুয়া সভারে।।
পড়ুয়া সহস্র যাহা পড়ে একঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যহি।।
শুনি ক্রোধে কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন।।'

[চৈ. চরিতামৃত / আদি / সপ্তদশ পরিচ্ছেদ]

পড়ুযা ছাত্রেরা এতোদিন যারা নিমাই পণ্ডিতকে গুরু বলে মান্য করে এসেছে তারাই আজ গুরুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। অগ্নিগর্ভ অবস্থা। এই বুঝি বারুদে আগুন পড়ে। ছাত্ররা একযোগে নিমাযের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তারা মন্তব্য করলো 'একলা নিমাঞি দেশটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দেবার মতলব ফাঁদছে।' 'সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।' (চৈ. চ./১৷১৭)। তারপর তারা যখন শুনলো, চৈতন্য তাঁর ব্রাহ্মণ ছাত্রকে লাঠি নিয়ে মারতে এসেছিল তখন রাগে একেবারে ফেটে পড়লো ছাত্ররা।

'পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন বা মানুষ হয় কি করিতে পারে।।'

[চৈ. চরিতামৃত / ১৷১৭ অংশ]

ছাত্ররা বললো, আবার যদি ওরকমভাবে নিমাঞি আমাদের আরও কারুকে মারতে আসে তাহলে আমরাও ছেড়ে দেবো না। মারের বদলে আমরাও তাকে (নিমাইকে) মারবো। তখন কে কি করতে পারে দেখা যাবে।

নিমাই বাড়িতে বসে উত্তেজিত ছাত্রদের কথাবার্তা সবকিছু শুনলেন। তার বিরুদ্ধে ছাত্রের দল মারমুখী হয়ে উঠেছে। বেশ চিন্তায় পড়লেন নিমাই। দুঃখিত হলেন। ঠিক এ'খানে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর শেষতম চৈতন্য গবেষণা গ্রন্থে লিখছেন, 'বিশ্বম্ভর পূর্ববৎ টোলে পড়ানো আরম্ভ করলেন। তবে অতঃপর পাণ্ডিত্য প্রকাশ খর্ব হয়ে গেল আর ভক্তি ব্যাখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগলো।' তিনি আরও লিখছেন, 'আমি অনুমান করি পত্নী বিরহ সূত্রেই বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণ বিরহ ভাবনার উৎপত্তি।' ('চৈতন্যাবদান' / পৃ ৩৫ ৩৬)।

ক্রমে বিশ্বম্ভরের মানসিক অবস্থা বিচিত্র এক পথগামী হয়ে উঠলো।

'পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষাকালে।
পড়িবার নিমিত্তে আসিয়া সভে মিলে।।
পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগত রায়।
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আসে জিহ্বায়।।
"সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায় ?" বোলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে "সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ।।"
শিষ্য বোলে "বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে।"
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত ! উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বোলে "সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর।।
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।



আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায়।।"

['চৈতন্য ভাগবত' / মধ্যখণ্ড / ১ম অধ্যায়]

অতঃপর নিমাই পণ্ডিতের মুখে ব্যাকরণ সূত্রের এ ধরণের ব্যাখ্যা শুনে ছাত্রের দল পণ্ডিতের সমখ্যে হাসাহাসি করতে লাগলো। কেউ কেউ বলাবলি করলো, পণ্ডিতের বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই জন্যই ব্যাকরণ সূত্রের এ ধরণের হাস্যোদ্দীপক ব্যাখা করছেন তিনি।

ছাত্ররা পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে পড়লো টোল থেকে। তারা দল বেঁধে সোজা হাজির হলো গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়িতে। কে এই গঙ্গাদাস পণ্ডিত ? না ইনিই সেই গঙ্গাদাস যিনি ছিলেন চৈতন্যের প্রথম শিক্ষাগুরু। নবদ্বীপের বিখ্যাত অধ্যাপক। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর আরোপিত বৈষ্ণব বন্দনায় এই গঙ্গাদাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নবদ্বীপকৃতাবাসং গঙ্গাদাসং গুরুং পরম্।' তো এই গুরুর গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সমীপে হাজির হলো চৈতন্যের ছাত্ররা। তাদের অভিযোগ নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে। গঙ্গাদাসের কাছে একযোগে অভিযোগ পেশ করলো তারা।

'গযা হৈতে যাবৎ আসিযাছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে।।

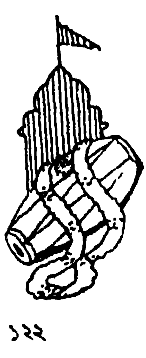
প্রতি শব্দে—ধাতু সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া।।'

অভিযোগ শেষ। অতঃপর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে অভিমত চাইলো বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা।

'এবে ভাল বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি সব বোলহ পণ্ডিত !'

নিমাই পণ্ডিতের খেয়াল খুশি আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাকরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ধাতু-সূত্রে সবকিছু একাকার করে বসছেন। ব্যাকরণের টীকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৃষ্ণকে টানছেন। এরকম চললে আমাদের পড়াশোনার কি গতি হবে। সুতরাং এখন আমরা কি করবো, কি করলে ভালো হয় আপনিই বলে দিন।

নিমাযের ছাত্রদের মুখে নিমায়ের ব্যাকরণের সূত্রাদির কৃষ্ণ তাৎপর্যময় ব্যাখ্যার কথা শুনে গঙ্গাদাসও হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না। তারপর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের সব অভিযোগ আমি শুনলাম। এখন তোমরা যে যার ঘরে যাও। আমি বিকালে বিশ্বম্ভরের কাছে নিজে যাবো। তাকে গিয়ে বলবো তোমাদের যেন ভালোভাবে লেখাপড়া শেখায়। 'ভালমত করি যেন পড়ায়েন পুঁথি।'



গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আশ্বাসবাণী শুনে অভিযোগকারী ছাত্ররা যে যার বাড়িমুখো হলো।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামলো ধীরে ধীরে।

উদ্বিগ্ন অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত এসে হাজির হলেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়ির দরজায়। ডাকলেন, বিশ্বম্ভর। নিমাই ছুটে এসে গুরুকে প্রণাম করলেন। গুরুর পদধূলি মাথায় ঠেকালেন। 'বিদ্যালাভ হউ' বলে প্রিয় শিষ্যকে আশীর্বাদ করলেন গুরু। তারপর শান্ত চিত্তে

বললেন, বাবা বিশ্বম্ভর, তোমার সাথে আমার গুটিকয়েক কথা ছিল। কথাগুলো অবশ্য এই পড়াশোনা-অধ্যয়ণ, অধ্যাপনা নিয়েই। বাবা, তুমি নীলাম্বর চক্রবর্তীর নাতি। তোমার বাবা পুরন্দর মিশ্র। তোমার পিতৃকুল মাতৃকুলে কেউ মূর্খ আছে বলে আমার জানা নেই। তুমি নিজেও সুপণ্ডিত, যোগ্য ব্যাখ্যাকার ও টীকাকার। কিন্তু তোমার নামে এসব কি শুনছি বাবা।

নিমাই নির্বাক।

গঙ্গাদাস বিষণ্ন গলায় বললেন, তুমি কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণের নাম গান করতে ভালোবাসো। উত্তম কথা। ঠাকুর দেবতার নামগান খারাপ না। এতে আমার আপত্তিও নেই। বরং সম্মতি রয়েছে। কিন্তু ছাত্রদের অধ্যয়ণ সময় তুমি কৃষ্ণনামগান করবে কেন। শুনলাম, ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাতে গিয়ে তুমি 'ব্যতিরিক্ত অর্থ' করছো, ধাতু সূত্রে সবকিছুর মধ্যে তুমি কৃষ্ণকে টানছো। না না বিশ্বম্ভর এটা ঠিক নয়। কৃষ্ণ এবং অধ্যাপনাকে এক করে দেখলে চলবে না। আমি তোমার গুরু, শিক্ষাগুরু হিসেবে আমি আমার মাথার দিব্যি দিয়ে তোমার কাছে অনুরোধ করছি, তুমি ওসব বন্ধ করো।

তখন বিশ্বম্ভর শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাসকে আশ্বাসন দিয়ে বললেন,

'আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে ইহা স্থাপিবেক কোন্ জন ?
নগরে বসিয়া এই পঢ়াইব গিয়া।
দেখি কার্ শক্তি আছে দুষুক্ আসিয়া ?'

অতঃপর 'হরিষ হইলা গুরু শুনিঞা বচন।' বিশ্বম্ভর আভূমি প্রণাম করলেন গুরুকে। প্রিয় শিষ্যের মুখে আশ্বাসন বাণী শুনে হরষিত হয়ে ফিরে গেলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত।

কিন্তু গুরুকে আশ্বাসন দিলেও কার্যত দেখা গেল, পড়ুয়া ছাত্রদের কাছে শিক্ষক চৈতন্যের পাঠ্য ব্যাখ্যার চেয়ে কৃষ্ণজনিত ধর্মীয় ব্যাখ্যাই পৌনঃপুনিক হারে বাড়তে লাগলো। এবং অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে, যে পড়ুয়ারা পাঠ্য পুস্তকের 'ব্যতিরিক্ত অর্থ' করার জন্য শিক্ষক চৈতন্যের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল, বিক্ষুব্ধ হয়ে ছিল, সেই বিরুদ্ধ বিক্ষুব্ধ ছাত্ররাই পরবর্তী সময়ে দেখা গেল ধর্মীয় ভাবাপন্ন হয়ে চৈতন্যের আনুগত্য স্বীকার করলো। অর্থাৎ পাঠের 'ব্যতিরিক্ত অর্থ' করে চৈতন্য যে পড়ুয়া ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বিরাগভাজন হয়েছিলেন অতঃপর তার অবসান ঘটলো। এবং এমনই একদিন স্বতঃস্ফূর্ত চৈতন্যকে ছাত্র সমীপে বলতে শোনা গেল,

'কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধর।
চরণে ধরিয়া বোলোঁ 'কৃষ্ণে দেহ' মন।।'



না, এরপর ১৪৩১ শকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত (অর্থাৎ চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের ৮ মাস পূর্ব পর্যন্ত) কোন ছাত্রের আর কোনরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি তাঁকে। চৈতন্য ১৪৩০ শকের পৌষ মাসের শেষ নাগাদ গয়া থেকে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। এরপর মাঘ মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত টোলে ছাত্র পড়ানো বন্ধ ছিল। মাঘের ১১ তারিখ থেকে ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস তিনি ছাত্রদের পড়িয়েছিলেন। এই কিঞ্চিন্ন্যূন পাঁচ মাসের ভেতর প্রথম দিক ছাড়া আর

কোন ছাত্র বিরোধিতার সম্মুখ হতে হয়নি চৈতন্যকে। দেখা যাচ্ছে, এই কিঞ্চিন্ন্যূন পাঁচ মাসে চৈতন্যের টোল বা পাঠশালা ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছিল ধর্মীয় উপাসনালয়ে। মাধ্যম হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণ। এবং শিক্ষাগুরু চৈতন্য পড়ুয়া ছাত্রদের কাছে ধীরে ধীরে ধর্মগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

গয়া প্রত্যাবর্তনের পর পাঁচ মাস এই ভাবে কাটলো। দিনে ছাত্রদের কাছে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা, রাত্রে শ্রীবাস আচার্যের ঘরে কীর্তন। মা শচীদেবী, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া, ঘর-সংসার সব কিছুর ওপর একটা প্রবল ঔদাসীন্য দেখা দিলো চৈতন্যের মনে। তৎসহ মানসিক অবস্থাও ক্রমান্বয়ে আশ্চর্যান্বিত ভাবে বদলে যেতে লাগলো। কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো মাটিতে লোটাগড়ি দেন। কিরকম এক ছন্দপতন, অস্থির পাগলপ্রায় অবস্থা। আমরা প্রায় কৈশোর বেলা থেকে চৈতন্যের মানসিক অবস্থা বার বার বিপর্যস্ত হতে দেখেছি। ঘনঘন মূর্ছা যাওয়ার ব্যাপারটা তার ছোটি বেলা থেকেই ছিল। যখন তখন উন্মাদের মতো হয়ে যেতেন। তখন চিৎকার চ্যাঁচামেচি, লম্পঝম্প, ধূলোয় গড়াগড়ি, ঘরের জিনিষ ভাঙচুর, একে ওকে তেড়ে মারতে যাওয়া কিছুই প্রায় বাকী থাকতো না। এবার যেন মাত্রায় সেসব আরও বেড়ে গেল, মাত্রারিক্ত হয়ে উঠলো। যার ফলে গয়া প্রত্যাবর্তনের পাঁচ মাসের মাথায় টোল বন্ধ হয়ে গেল। চিরচ্ছেদ পড়লো অধ্যাপনায়।

এরপরও আরও আট মাস চৈতন্য গৃহে ছিলেন। অর্থাৎ আষাঢ় থেকে মাঘের শেষ দিক পর্যন্ত। ১৪৩১ শকের মাঘের সংক্রান্তি দিনে (২৯শে মাঘ) চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গৃহত্যাগ করেন এরও তিনদিন আগে ২৬শে মাঘ বুধবার রাত্রে।

আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি, গয়া প্রত্যাবর্তনের পর সর্বসাকুল্য ১৩ মাস চৈতন্য গৃহে ছিলেন। এই ১৩ মাসের ভেতর মাত্র এক মাস স্ব-গৃহে রাত্রিবাস করেছেন। বাকী এক বছর রাত্রিযাপন করেছেন শ্রীবাস আচার্যের ঘরে। এই স্ব-গৃহে একমাস রাত্রিযাপন কালে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামী চৈতন্যের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন, শয্যাপার্শ্ববর্তিনী হয়েছেন এমন ইঙ্গিত কোন চৈতন্য জীবনীকার দেননি। শুধু একজন ব্যতিক্রম। লোচন। কিন্তু সে কাহিনী এখন নয়। লোচন দাসের সেই অত্যাশ্চর্য আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হবে আরও পরে। এখন আমাদের জানতে হবে এই তেরো মাসের ভেতর যে একমাস চৈতন্য স্বগৃহে রাত্রিবাস করেছেন এই রাত্রিবাসকালে চৈতন্যের পাশে কে শয়ন করতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া থাকতেন না। শচীদেবীও না। কিশোরী বধূমাতাকে একলা ফেলে তাঁর পক্ষেও থাকা অসম্ভব ছিল। অথচ তখন চৈতন্যের মানসিক অবস্থা এমনই এক আধ্যাত্মিক কৃচ্ছ্রতায় ক্লিষ্ট, বা দূরতর স্মৃতির বিষণ্ণতায় অথবা অতীতচারিতায় বিপর্যস্ত যখন কিনা বিশেষত রাত্রিকালে তাঁর পাশে একজন রক্ষক থাকা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু কে সেই রক্ষক। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ ও সহপাঠী মুরারি গুপ্ত লিখেছেন,



> 'গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনম্।
> কৃত্বা মাল্যাদি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা।।
> শয়নীয়ে গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখম্।

স্বপিতি শ্রদ্ধয়া যুক্তং শৃণু তস্যামৃতং বচঃ।।
যথা ক্বচিদ্ ব্রজে রত্নমন্দিরে কৃষ্ণসন্নিধৌ।
শয্যাং বিধায় শ্রীরাধা স্বপিতি প্রেমসংপ্লুতা।।'

[কড়চা—২/৩ / ১৫-১৬]

উপরোক্ত উক্তির ভাবার্থ হলো, 'গদাধর প্রতিদিনই প্রভুর অঙ্গে চন্দন লেপন করতেন, এবং মাল্যাদি দিতেন। এবং প্রভুর শয়ন-গৃহে শয্যা রচনা করে প্রভুর নিকট শয়ন করতেন। শয়ন করতেন—ব্রজে শ্রীরাধা যেমনটি কখনো কখনো রত্নমন্দিরে (শয়নমন্দিরে) শয্যা রচনা করে শ্রীকৃষ্ণের নিকট শয়ন করতেন, তদ্রূপ।'

কবি কর্ণপূরও তাঁর মহাকাব্যে এ' একই কথা উদ্ধৃত করেছেন,

'স তু গদাধরপণ্ডিতঃ সত্তমঃ সততমস্য সমীপসুসঙ্গতঃ।
অনুদিনং ভজুতে নিজজীবিত প্রিয়তমং তমভিস্পৃহা যুতঃ।।
নিশি তদীযসমীপগতঃ স্থির শযনমুৎসুক এব করোতি সঃ।
বিহরণামৃতস্য নিরন্তরং সদুপভুক্তমনেন নিরন্তরম্।।'

[মহাকাব্য– ৫/১২৮ ২৯]

তাহলে কর্ণপূরের এ' উক্তিটি থেকেও জানা গেল গদাধর পণ্ডিত সদা-সর্বদা চৈতন্যের নিকট থাকতেন এবং রাত্রিতেও চৈতন্যের কাছেই শয়ন করতেন।

অতঃপর সততই একটা প্রশ্ন থাকে, তা হলো, 'যথা ক্বচিদ্ ব্রজে রত্নমন্দিরে কৃষ্ণসান্নিধৌ। / শয্যাং বিধায় শ্রীরাধা স্বপিতি প্রেমসংপ্লুতা।।'

অর্থাৎ ব্রজে ক্বচিদ্ শ্রীরাধা যেমন শয়নমন্দিরে শয্যা রচনা করে প্রেমসংপ্লুতা হয়ে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের পাশে শয়ন করতেন, গদাধরও তদ্রূপ শয্যা রচনা করে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে চৈতন্যের নিকট শয়ন করতেন।—মুরারির এই উক্তির যথার্থতা স্বীকার করলে আমাদের মনে এ প্রশ্নই উদিত হয়, বিষ্ণুপ্রিয়া—চৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী, চৈতন্য চরিতকারগণ যাঁর পিতা সনাতন পণ্ডিতকে 'সত্রাজিৎ' এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'ভূস্বরূপিনী সত্যভামা' ও চৈতন্যকে 'কৃষ্ণ' ও চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'কৃষ্ণ-রুক্মিণী' বলেছেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (৪৭-৪৮) ও চৈ. ভাগবত ১।১০।২২৯ দ্রষ্টব্য) সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ চৈতন্যের শয্যাপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা মহিষী সত্যভামা অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরই শয়ন করার কথা। কিন্তু বাস্তবিক তা ঘটেনি। এখানে নিশাকালে চৈতন্যের শয্যাপাশে এক পুরুষকে দেখছি আমরা। যাঁর নাম গদাধর। এবং যিনি রাধা ভাবে কৃষ্ণ অর্থাৎ চৈতন্যের পার্শ্ববর্তী শয়ন করেছেন। কেন ? চৈতন্য বিবাহিত এবং যথার্থ পুরুষ। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁর পত্নী, প্রকৃতিস্বরূপা। এক্ষেত্রে শয়নমন্দিরে স্বামী স্ত্রীর সহবস্থানই স্বাভাবিক ছিল। যুগপৎ স্বামী স্ত্রী ও পুরুষ ও প্রকৃতি হিসেবে এটাই শাশ্বত। নৈতিক, সামাজিক, মানবিক, সাংসারিক, ব্যবহারিক ও প্রাকৃতিক সব দিক থেকে এ' রীতি আমাদের পরিচিত। কিন্তু এক বিবাহিত যুবা পুরুষের কাছে অন্য এক পুরুষ রাত্রিবাস করবে এটা আমাদের কাছে যেমন অপরিচিত, তেমনই অনভ্যস্থ ঘটনা। বিশেষত চৈতন্যের ক্ষেত্রে। কেননা, লক্ষ্মীপ্রিয়া বিরহী চৈতন্যের সংসার-ঔদাসীন্য মনকে সাংসাসীন করার মানসেই শচীদেবী সুন্দরী বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৃহে এনেছিলেন।

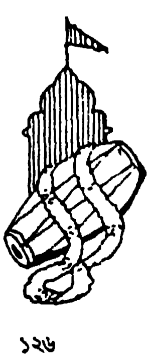


তাহলে চিরন্তন প্রথানুযায়ী চিরন্তনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেন আমরা চিরায়ত ভূমিকায় দেখতে পেলাম না। এর উত্তর খুব কঠিন না। আবার সহজ করেও বলার নয়। তাই এর সুস্পষ্ট ও যথার্থ শনাক্তিকরণে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা খেলতে হয়। কেননা, চৈতন্যচরিতকাররা দ্বাপর যুগের কৃষ্ণের সঙ্গে কলিযুগের বিশ্বম্ভর মিশ্রের এমনই-সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন যাতে করে মানুষ চৈতন্যকে মানুষ বলার অপরাধে ঈশ্বর বিদ্বেষী দোষে দুষ্ট হওয়ার ভারী সম্ভাবনা থাকে। ভক্ত (Devotee), ভগবান (almity.) এবং অনুসন্ধিৎসুদের এটাই চিরকালের ইতিহাস।

অতঃপর আমরা চৈতন্য-জীবনীর সর্বাপেক্ষা কঠিন-করুণ ও এক অভূতপূর্ব জটিল সময়ে এসে পৌঁছালাম। দেখা যাচ্ছে এ স্থানে পৌঁছে আমরা সর্বাগ্রে তিনটি নিশ্চয়তাত্মক বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। প্রথমত চৈতন্য বিরোধী পাষণ্ডীদের বিষয়, শাক্তাবলম্বী ও গোড়া নৈয়ায়িদের বিষয়। দ্বিতীয়ত, চৈতন্যের শারিরীক ও মানসিক বিষয়। এবং তৃতীয়ত, চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া ও চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া এবং সংশয়ান্বিত জননী শচীদেবীর বিষয় এবং সেই সঙ্গে এখানে একথাটিও আমাদের আবশ্যিক স্মরণ রাখতে হবে যে, যে তিনটি বিষয়ে আমরা আলোচনায় প্রয়াসী হতে চলেছি, চৈতন্যের গয়া প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী তেরোমাস সময়কালে এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল।

প্রথমত, চৈতন্য পাষণ্ডীদের ঘাত-সংঘাতের বিষয়টি ধরা যাক। সেন রাজাদের আমলে বিশেষত বৈষ্ণবিযা বল্লাল সেনের আমলে (১১৫৮ ১১৭৯ খ্রীঃ) ব্রাহ্মণ্য ও তৎসহ বৈষ্ণব ধর্মের অভূতপূর্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রচার ও প্রসার ক্রমান্বয়ে খর্ব হয়ে যায়। এসময় অনেক বৌদ্ধধর্মী সেম্ভবত রাজ নির্দেশে, রাজ বিরোধিতা বশত) সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হয়। এবং এই সমাজপতিত বৌদ্ধরাই পরবর্তীকালে 'পাষণ্ডী' নামে অভিহিত। সম্ভবত সেজন্য পাষণ্ডীরাও ঘোর বৈষ্ণব বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। তারা তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বৈষ্ণবধর্মীদের ওপর অনেক অত্যাচার অনাচারও করতো। উক্ত পাষণ্ডী ও বৈষ্ণবিযাদের বিরোধ ও সংঘাত কাহিনী নানা লেখকের চৈতন্যচরিত গ্রন্থের নানান স্থানে সবিস্তারে ও সবিশদভাবে উল্লেখ আছে।

কবি কর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের সপ্তম অঙ্কের একটি আখ্যায়িকায় পাষণ্ডীদের চৈতন্য তথা বৈষ্ণব ধর্ম বিরোধী একটি কাহিনী আছে, একদিন চৈতন্য কৃষ্ণনাম-কীর্তন করতে করতে, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি-ভূষিত দেহে, প্রেমাবেশে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হয়ে হেঁটে চলেছেন। এমন সময় পাষণ্ডীরা তাঁকে দেখে মনে মনে ভাবলো, এই তো সেই বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, সুতরাং এর সাথে মজা করা যাক। এই ভেবে তারা কুকুরের ভোজনযোগ্য কিছু অশুচিতর অন্ন একটা থালায় সাজিয়ে চৈতন্যের কাছে হাজির হলো। এবং থালার অন্নগুলি দেখিয়ে চৈতন্যকে বললো, মহাশয়, এগুলি ভগবৎ প্রসাদ, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন। ভগবৎ-প্রসাদ শুনে ভাবাবিষ্ট চৈতন্য সেই থালাখানি দু'হাতে তুলে উধর্ববাহু হয়ে হাঁটিতে লাগলেন। এমন সময় একটি 'পক্ষী' এসে চৈতন্যের হাত থেকে সেই কুক্কুর ভোজনযোগ্য অশুচি অন্ন সহ থালাখানা নিয়ে পালালো।



পাষণ্ডীদের বৈষ্ণব বিরোধিতার আরেকটি কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে। চৈতন্য তখন সপারিষদ শ্রীবাস আচার্যের গৃহে কীর্তনরত। রাত্রিবেলা। এমন একদিন গোপাল চাপাল নামে এক ব্রাহ্মণ (বিপ্র) শ্রীবাসের দরজায় একটি কলাপাতার ওপর কিছু ওড়ফুল, হলুদ (হেরিদ্রা), সিঁদুর, রক্তচন্দন, চাউল (তণ্ডুল), এবং তৎসহ একটি মদের বোতল (মেদ্যভাণ্ড) চুপিসারে রেখে বাড়ি চলে গেল। এই গোপাল চাপালকে চৈতন্য চরিতামৃতে 'পাষণ্ডী প্রধান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা পাষণ্ডী প্রধান গোপাল চাপালের শ্রীবাস আচার্যের বন্ধ দরজার সামনে এসব নামিয়ে যাওয়ার কারণ কি ছিল ? কারণ ছিল একটাই, আর তা হলো, সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিবেশীরা যখন শ্রীবাস আচার্যের দরজায় শাক্ত পূজার উপকরণাদি দেখবে তখন তারা চৈতন্য-শ্রীবাস-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত আদি বৈষ্ণবদের শাক্তাবলম্বী তান্ত্রিক ভাববে। এই শাক্তাবলম্বী তান্ত্রিকদের সাথে বৈষ্ণবদের ছিল ঘোর বিরোধ। বিরোধটা ছিল ধর্মের কিন্তু পরবর্তী কালে তা ব্যক্তিগত বিবাদ বিসম্বাদে পরিণত হয়েছিল। যাই হোক, সকালে দরজা খুলেই চৈতন্য শ্রীবাসাদি কলাপতার ওপর শাক্ত পূজার উপকরণ আদি দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। বুঝলেন এটা পাষণ্ডীদের কর্ম। এবং কে কর্মটি করেছে সেটাও অনুমান করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে বৈষ্ণবদল পাষণ্ডীদের সাথে প্রত্যক্ষ বিরোধে যেতে সাহস পেলেন না। কারণ শাক্ত তান্ত্রিকরা তখন সর্বাপেক্ষা দলভারী। শাক্তদের প্রচার ও প্রসার তখন তুঙ্গে বলা যায়। সমাজের রন্ধ্রে, বিশেষত সাধারণ মানুষের মধ্যে তখন শাক্তধর্মের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে গেছে। সুতরাং সেই মুহূর্তে গৃহকর্তা শ্রীবাস প্রতিবেশী লোকজনদের ডেকে পাষণ্ডীদের দৌরাত্ম্যের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করালেন, ও হাড়ি (এক শ্রেণীর নিম্ন জাতি) ডেকে শাক্ত পূজার উপকরণগুলি সরিয়ে সেই স্থানে গোবরজল ছিটিয়ে দিলেন। সবকিছুই নীরবে ঘটলো। কারণ, এর বেশি পাষণ্ডীদের বিরুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও বৈষ্ণবদের পক্ষে তখন সঙ্গত কারণে তা সম্ভব ছিল না। অবশ্য এ ঘটনার তিনদিন পর কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চরিতামৃতে এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, শ্রীবাস আচার্যের গৃহের দরজায় শাক্ত পূজার উপকরণাদি রেখে আসার তিন দিনের মধ্যে সেই পাষণ্ডী প্রধান গোপাল চাপাল মারাত্মক রকম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলো।

'তিনদিন রহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার।।
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীড়া কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর।।'

[চৈতন্য চরিতামৃত / আদি / ষোড়শ পরিচ্ছেদ]

এহেন কুষ্ঠরোগগ্রস্থ গোপাল চাপাল একদিন একাকি, নিঃসঙ্গ গঙ্গাপাড়ে এক বৃক্ষতলে বসে আছে। সম্ভবত চৈতন্যের সাথে দেখা করবার মানসে তার এই অবস্থান। চৈতন্যের সাথে দেখাও হলো গোপালের। তখন গোপাল বললো,



'গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
কুষ্ঠব্যাধিতে মুক্তি হৈঞাছো ব্যাকুল।।

'লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার।।'

কুষ্ঠরোগী গোপালের মুখে এ কথা শুনে চৈতন্য বিস্ময়কররকম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এবং তখন গোপালের আরোগ্য ভিক্ষার প্রত্যুত্তরে যুবক চৈতন্যকে প্রায় মারমুখী ভাষায় বলতে শোনা গেল,

'এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে করে তারে তর্জ্জন বচন।।
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু।।
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটি জন্ম হবে রৌরবে পতন।।'

এবং তারপরই সেই অতি প্রত্যাশিত অথচ বিস্ময়কর কথাটি বলতে শোনা গেল চৈতন্যের মুখ দিয়ে,

'পাষণ্ডী সংহারিতে মোব এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।।'

অতি প্রত্যাশিত বলা হলো এজন্য যে, এই 'সংহার' 'সংহারিমু' কথাগুলি চৈতন্য পাষণ্ডীদের বিরুদ্ধে অন্যত্র, বহুত্র বলেছে। যেমন গয়া প্রত্যাবর্তনের পর পাষণ্ডীদের ওপর সক্রোধ বশত চৈতন্য এক জায়গায় বলেছেন, আমিই সেই লোক যে পাষণ্ডীদের সংহার করবে। অন্যত্র বলেছেন 'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা।' উক্ত পয়ার দুটির পূর্ণাবয়ব এরকম,

'আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিঞা ঠাকুব।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর।।
"সংহারিব সব বলি" করযে হুংকার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বার বার।।'

* * *

'আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বোলে 'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা।।'

সত্যি কথা বলতে কি, পাষণ্ডী বা এক বিশেষ বিপক্ষ ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র চৈতন্যই যে বিদ্বেষী ভাবাপন্ন ছিলেন এমন না, পাষণ্ডীদের বিরুদ্ধে চৈতন্যের নিকটতম, প্রিয়তম পার্ষদগণও বেশ শক্ত, মারমুখী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এর মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস সকলকেই দেখা যাচ্ছে।

একদিন পাষণ্ডীদের বাক্যজ্বালায় অসহ্য হয়ে বৈষ্ণব ভক্তরা অদ্বৈতাচার্যের কাছে এসে দরবার করলেন। ঠাকুর, এর একটা বিহিত চাই। ভক্তদের সালিশী শুনে অদ্বৈত একেবারে অগ্নিশর্মা। মুহূর্তে সক্রোধে হুংকার দিয়ে উঠলেন অতি বৃদ্ধ, প্রাজ্ঞ এবং তদানীন্তন নবদ্বীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য।



শুনিঞা অদ্বৈত হয ক্রোধ-অবতার।
'সংহারিমু সব" বলি করয়ে হুংকার..

[চৈ. ভাগবত / ৭।২।১১]

অবশ্য পাষণ্ডীদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধান্ধ হতে দেখা যায় নিত্যানন্দকে। চৈতন্য সাহিত্যে যিনি সর্বাধিক বিতর্কিত পুরুষ।

'বিশেষত চৈতন্য ভাগবতে। ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের এই নিকটতম পার্ষদকে বিশিষ্ট অদ্বৈতাচার্যের মুখ দিয়ে মদ্যপ' বলিয়েছেন (২।১৯।২৪৫ দ্রষ্টব্য)। এবং সেই অর্থেই অদ্বৈতাচার্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে, যেন মাতা-হাথী।' (২।১৯। ২৪৭)। এবং তারও চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ভাগবত রচয়িতা তাঁর ১২, ২৬৩ পয়ার বিশিষ্ট সুবৃহৎ গ্রন্থের ২।১১।৭০ থেকে ২।১১।৭৯ অংশে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকার এ স্থলে নিত্যানন্দকে উলঙ্গ ('দিগম্বর') অবস্থায় দেখিয়েছেন স্বয়ং চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সামনে। খুবই অস্বস্তিকর ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথাই চৈতন্য ভাগবতে লেখা হয়েছে।

রাঢ়াঞ্চলের মানুষ নিত্যানন্দ কেমন মানুষ ছিলেন আজ পাঁচ শতাধিক বছর পরে এর যথাযথ মূল্যায়ণ করা দুষ্কর। তাঁর ছাপান্ন বছর অবধূত জীবন অতঃপর নিজ শিষ্য সূর্যদাস সরখেলের দু'কন্যা জাহ্নবী ও বসুধাকে বিবাহ অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবন—এই দীর্ঘাতিদীর্ঘ যৌথ জীবনে তার প্রসঙ্গে অসামান্য অভিযোগ এসে জমা হয়েছিল চৈতন্যের কাছে। এমন কি অদ্বৈতাচার্যও অভিযোগ এনেছিলেন নিত্যানন্দের বিপক্ষে। ডঃ মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখা যায় যে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধবাদিগণ অত্যন্ত প্রবল' (পৃ-১৯৩)। কিন্তু নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে শত অভিযোগ থাকলেও চৈতন্যের বড়ো প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁর এই বয়োঃজ্যেষ্ঠ শিষ্য। বোধহয় তাই তিনি অভিযোগকারীদের এই বলে উপদেশ দিয়েছেন,

'পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল।।'

সেই চৈতন্য আবার ১৪৪১ শকে নিত্যানন্দের উদ্দেশ্যে বললেন, নিত্যানন্দ তুমি আর এখানে (নীলাচলে) এসো না। 'নিত্যানন্দে কহেন তুমি না আইস বার বার। / তথায় আমার সঙ্গ হইব তোমার।।' (চৈ. চরিতামৃত / অন্ত্য)।

তো বিপক্ষ ধর্মাবলম্বী তান্ত্রিক ভাবাপন্ন পাষণ্ডীদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ক্রুদ্ধ ছিলেন সম্ভবত এই নিত্যানন্দ। তিনি রাঢ় অঞ্চলের মানুষ ছিলেন বলেই কি তার এই ক্ষুব্ধতা অধিকতর ? কেননা এ যুগের বিদগ্ধ লোকসাংস্কৃতিক পণ্ডিত বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে এই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'রাঢ়' শব্দ থেকেই নাকি 'রাঢ়' শব্দের উৎপত্তি। তিনি রাঢ়বাসীদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ এনেছেন, তারা নাকি জৈন গুরু মহাবীরের (Mahavira 600 B.C) রাঢ়দেশ সফর কালে তাঁর বিরুদ্ধে 'চু-চু' করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি)। শ্রী ঘোষ এই অভূতপূর্ব তথ্য কোথায় সংগ্রহ করেছেন তা অবিশ্যি লেখেননি। তবে সংগ্রহ তিনি নিশ্চয়ই কোথাও করেছেন। এবং তার খণ্ডাংশ সত্য হলেও রাঢ়ভূমির প্রকৃতি ও মানুষিক প্রবৃত্তি প্রসঙ্গে এ এক নবমূল্যায়ণ বলা যায়।



এখন দেখা যাক, এই রাঢ়বাসী নিত্যানন্দ বিপক্ষী পাষণ্ডীদের বিরুদ্ধে কতোখানি ক্ষুব্ধ ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান হিমাচল প্রদেশের 'গড়বাল' (গাড়োয়াল) জেলার বদরিনাথ বা বদরিকাশ্রমের নিকটবর্তী এক পল্লী অঞ্চলে। নিত্যানন্দ তখন ভ্রমণরত। মাদ্রাজ,

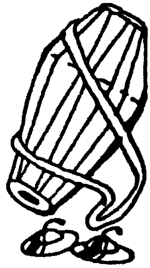
ত্রিচিনোপল্লি হয়ে দক্ষিণ মাদুরা, সেখান থেকে মালবার উপকূল হয়ে হিমাচল অঞ্চল আসেন। এখানে বদরিকাশ্রমের নিকটবর্তী এক বৌদ্ধ বিহার ভ্রমণকালে বেশ কিছু বৌদ্ধধর্মীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। (এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বৈষ্ণবরা 'পাষণ্ডী' বলে খ্যাপন করতেন। আবার বিপক্ষ ধর্মাবলম্বীদেরও এই নামে উল্লেখ করতে দেখা যায়। যেমন গোপাল চাপালের ক্ষেত্রে। গোপাল চাপাল বৌদ্ধ ছিল না, শাক্ত ভবানীপূজক ছিল)। তো এই বৌদ্ধদের দেখে অবধূত নিত্যানন্দ কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা অবশ্য স্পষ্ট করে বৃন্দাবন দাস লেখেননি। তবে সম্ভবত ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন জিজ্ঞাসা করে থাকবেন। কিন্তু নিত্যানন্দের কথার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর দিলেন না বৌদ্ধরা। পরন্তু তারা সর্বপরি নিরুত্তর রইলেন। তখন ক্ষুব্ধ নিত্যানন্দ তাঁদের মাথায় পদাঘাত (লাথি) মেরে বসলেন।

'তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবনে।
দেখিলেন প্রভু বসিযাছে বৌদ্ধগণ।।
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না কহে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে।।'

[চৈ. ভাগবত / ১।৬।৩৪৫-৩৪৬]

বস্তুত, ঈশ্বর কেন্দ্রিক বা অবতার কেন্দ্রিক ধর্ম মানুষকে যেমন সহজ সরল করে, মনের ক্রুরতা নিষ্ঠুরতা কাঠিন্যতা দূর করে উদারতা নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে, তেমনই আবার ধর্মকেন্দ্রিক একটা লড়াকু দিকও থাকে। একই অরণ্যে দুই সিংহের উপস্থিতি যেমন উভয়েরই অকাম্য, তদ্রূপ একই ধর্ম নিয়ে দু'পক্ষের বিরোধ, যেমন সিয়া সুন্নীর বিরোধ, ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্‌দের বিরোধ, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধ। শুধুমাত্র ভিন্ন মতাবলম্বী নয়, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধরে ঘটে আসছে পৃথিবীতে। বস্তুত ধর্ম যেমন মানুষকে মহান করেছে, মানবিক করেছে, উদারচেতা করেছে, তেমনি ধর্মের বিকৃতি কলুসতা ছড়িয়ে দিয়েছে মায়াময় ঈশ্বরের পৃথিবীতে। দুঃখ এই—এ' দ্বৈততা মহত্তর ধর্মকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ যা ভালো, যা কিছু ভলো, যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দরতর তাকে কেন্দ্র করে, তারই স্নিগ্ধ ছত্রছায়ায় অধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে।

চৈতন্যপন্থী ও শাক্ত-তান্ত্রিকদের লড়াইটা ছিল তেমনই এক ধর্মকেন্দ্রিক লড়াই। শাক্তাবলম্বী তান্ত্রিকরা ছিল অধিকতর শক্তিশালী। চৈতন্য-অদ্বৈত পন্থী বৈষ্ণব দল সে তুলনায় ক্ষীণজীবী ছিল। তাছাড়াও শাক্ত ও তান্ত্রিকী প্রথা বাঙলা দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের বহু বছর আগে শাক্ত ধর্মের 'তান্ত্রিকী পন্থার উদ্ভব হয় বাঙলা দেশে। এবং এ কথাও সত্য যে, এই আলোচ্য শাক্তধর্মের প্রসার প্রচার ও উদ্ভব হয়েছিল মূলত বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধদের থেকেই। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত 'শ্রী শ্রী চণ্ডী' (নবম সং / ভাদ্র ১৩৬৯) নামক একটি গ্রন্থে শাক্ত ও তন্ত্রের উদ্ভব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। মহারাজজী লিখেছেন, 'হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূল কল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র নামক দুইখানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে রচিত হয়।' তিনি আরও



লিখেছেন, 'বাঙলা দেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়।' (ভূমিকা / পৃ ১০)। মহারাজজী ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের 'Introduction to Buddhist Esotericism' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'হিন্দুতন্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্রের কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মহাবিদ্যার যে বর্ণনা আছে, তৎসমুদয় বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা' পরিশিষ্টে বুঝা যায়। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা—দেবীর এই অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত।' ('শ্রী শ্রী চণ্ডী' / পৃ ১০)।

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি ঘটে মূলতঃ সেন রাজাদের, বিশেষত বল্লাল সেনের সময় (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ)। অবশ্য এর বহু আগেই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ও অবলুপ্তির সূচনা হয়েছিল। বিকৃতি এসেছিল বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভারতের প্রথম আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'বুদ্ধের তিরোভাবের পর, বৌদ্ধদিগের মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।' তিনি আরও লিখেছেন, 'যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জনের প্রণালীই তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডির ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল।' ('বৌদ্ধ ধর্ম' / ২য় সং / পৃ-৭০)। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের নিভন্ত প্রায় প্রদীপ শেষবার বোধহয় জ্বলে উঠেছিল পাল যুগে (৭৫০-১০৩৮ খ্রীঃ)। এরপর বাংলাদেশে তামিলদের আক্রমণ (১০২১-২৩ খ্রীষ্টাব্দে তামিলরাজ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ) ও পরবর্তী দ্বিতীয় মহীপালের সময় (Mahipal-II) কৈবর্ত বিদ্রোহের মধ্যে সেন রাজ্যের অবলুপ্ত ঘটে। এরপর কিছুদিন ডামাডোলের রাজত্ব চলার পর বিজয় সেনের নেতৃত্বে (Vijay Sena 1095-1158) সেন রাজ্যের সূচনা হয় বাংলাদেশে। এই সেন বংশের অন্যতম রাজা বল্লাল সেনের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রাধান্য পায়। যদিও বল্লাল সেনের পূর্ববর্তী রাজারা যথা সামন্ত সেন, বিজয় সেন প্রভৃতিরা ছিলেন শৈব উপাসক। কিন্তু বল্লাল সেনের পরবর্তী সেন বংশের শেষ রাজা গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫) ছিলেন ঘোর বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসিদ্ধ বাঙালি বৈষ্ণবকবি কবি জয়দেব ও তৎকালীন আরও কতিপয় সনামধন্য বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি যথা—ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর প্রমুখেরা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। বস্তুত বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ভাবাপন্ন সহজিয়া বৌদ্ধরা শেষ আঘাত পায় বল্লাল সেনের সময়। এসময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় শক্ত ভাবে গড়ে ওঠে। তখন স্বভাবতই বৌদ্ধদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসে। এবং তার ক্ষীণ অবশিষ্ট টুকু পরবর্তী রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে প্রবল বৈষ্ণব হাওয়ায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায় বাংলাদেশ থেকে। কিন্তু মূলতঃ বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি ঘটলেও কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের ভেতর যে তান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুদের মধ্যে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কালী, তারা, সরস্বতী, ভদ্রকালী প্রভৃতিরা অবৈদিকী দেবতা,



বৌদ্ধতন্ত্র থেকে সৃষ্ট। অন্যত্র বাশুলী, ভবানী, বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী, মধুমতী তান্ত্রিকী দেবতাও বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উদ্ভূত। যেমন বাশুলী বা বাসুলী কথাটির উদ্ভব হয়েছে 'বজ্রলী' বা 'বাসলী' শব্দের অপভ্রংশ থেকে। বজ্রলি হচ্ছেন এক বৌদ্ধ দেবতা। নেপালে এর বিবরণ পাওয়া গেছে। (শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভূমিকা / রাধাগোবিন্দ নাথ / পৃ-২৫৪)। এছাড়াও প্রখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর সদাশিব, পরশিব, সাবিত্রী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ভুবনেশ্বরী, ডাকিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাকিনী প্রভৃতিরা শাক্ত তান্ত্রিকদের দেবতা ছিল, (তন্ত্রসার / পৃ-৯৮১ দ্রষ্টব্য)।

বৌদ্ধদের তান্ত্রিকতা শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এমন বলা যাবে না। পাষণ্ডী প্রধান গোপাল চাপাল ব্রাহ্মণ ছিলেন (চৈ. ভাগবত ১।১৭।৩৩)। এছাড়াও নিমায়ের জন্ম মুহূর্তের একটি ঘটনা থেকেও যথেষ্ট প্রমাণ হয় যে বেদানুগত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের মধ্যে শাক্ততন্ত্রের প্রভাব বেশ ভালো ভাবেই প্রসার লাভ করেছিল। কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত থেকে জানা যায়, শচীদেবীর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে শুনে অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবী বহু উপঢৌকনাদি নিয়ে নবদ্বীপে মিশ্রগৃহে উপনীত হলেন। অতঃপর শিশু চৈতন্যের (তখনো নামকরণ হয়নি) মাথায় ধান দুর্বা দিয়ে এই বলে আশীর্বাদ করলেন তিনি,

'দুবা ধান্য দিল শীর্ষে, কেল বহু আশীষে,
'দীর্ঘজীবী হও দুই ভাই।'
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিত্তে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'।।'

[চৈ. চরিতামৃত / ১।১৩।১১৪-১৬]

সীতাদেবী ডাকিনী শাকিনীকে অপদেবতা মনে করে এবং তাদের প্রভাবের কথা স্মরণ করে ভয় পেয়েছিলেন। এবং শিশু চৈতন্যের ওপর তাদের অপঃপ্রভাব যাতে না পড়ে সেজন্য তিনি বালকের নাম রেখেছিলেন 'নিমাই'। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, শচীনন্দন বালক চৈতন্যের নামকরণের সময় মিশ্রালয়ে উপস্থিত অন্যান্য পতিব্রতা রমণীরা বলেছিলেন, 'ইহার অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যাপুত্র নাঞি। শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি।।' (চৈ. ভাগবত ১।৩।৪৫)। সীতাদেবীর মতো তাঁরাও ভেবেছিলেন ডাকিনী শাকিনী কু-প্রভাবে শচীদেবীর আট আটটি সন্তান মারা গেছে, সুতরাং বালক চৈতন্যের ওপর সেই অপদেবতাদির প্রভাব যাতে না পড়ে তাই বালকের নামকরণ রাখা হয়, নিমাই বা নিমাঞি। 'নিমাঞি' অর্থাৎ যা কিনা নিমের মতো তিক্ত, সুতরাং বিস্বাদ তেতো জিনিষের ওপর অপদেবতার লোভ জন্মাবে না। শিশু চৈতন্যের জন্মের পর শুধু প্রতিবেশী রমণীরাই নয়, শিশুপুত্রটিকে আশীর্বাদ করতে নবদ্বীপ শান্তিপুরের অনেক ব্রাহ্মণরাও এসেছিলেন। তাঁরা শিশুকে আশীর্বাদ করে বললেন,

'এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে।।
জগত হইল সুস্থ ইহার জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে।।

অতএব ইহার 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান।।'

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা সীতাদেবী ও অন্যান্য রমণীদের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'নিমাঞি' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ। / সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্বজন।।' (চৈ. ভাগবত ১।৩।৪৭-৫০)। অর্থাৎ বিদ্যান ব্রাহ্মণ-গণও সীতাদেবী প্রমুখ পতিব্রতা রমণীগণের প্রস্তাবিত 'নিমাঞি' নামের অনুমোদন করলেন। এবং বললেন এই নিমাঞি নামেই সকলে বালককে ডাকবেন। এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, সীতাদেবী প্রভৃতি পতিব্রতাগণের মনে ডাকিনী শাকিনীজনিত যে অপদেবতার আশঙ্কা জেগেছিল অনুরূপ আশঙ্কা জেগেছিল বেদানুগত ব্রাহ্মণদের মনেও। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তন্ত্রসার মতে ডাকিনী শাকিনী হলো শাক্ত তান্ত্রিকদের দেবতা। এবং অবৈদিকী দেবতা। তবু শিশু চৈতন্যকে আশীর্বাদকালে বেদানুগত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের মনে অবৈদিকী দেবতা ডাকিনী শাকিনীর প্রভাবজনিত আশঙ্কা জাগলো কেন ? এতে কি এই প্রমাণ হয় না যে শাক্ত ও তন্ত্রের প্রভাব বেদানুরাগী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও প্রসার লাভ করেছিল।

উপরোক্ত শাক্ত ও তন্ত্রাদি বিষয়ক আলোচনার স্ফীত কলেবর দেখে সুধী পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন, এ যেন 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া' হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য সেখানে নয়। চৈতন্য সমকালীন তামাম বাঙলাদেশে বেদানুগামী ব্রাহ্মণ ও চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি বৈষ্ণবিয়াদের চেয়ে শাক্ত-তান্ত্রিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি জনমানসে অনেক বেশি প্রভাবমান ছিল, এবং সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষকে প্রভাবান্বিত করেছিল এটাই শুধুমাত্র বলার উদ্দেশ্য।

বৃন্দাবন দাস তার গ্রন্থে তৎকালীন ধর্মান্ধ সমাজের অবক্ষয়ী রূপটি আরও কঠিন ভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'রমাদৃষ্টিতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। / ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।। / কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার। / প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।। / ধর্ম-কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। / মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।। / দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে। / পুত্তলি করয়ে* কেহ দিয়া বহুধনে। / ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিহায়। / এই মত জগতের কাল ব্যর্থ যায়।।' (১।২।৫৮-৬২)। অর্থাৎ তখন জনসাধারণ ছিল দেহ-সুখ-সর্বস্ব, বিষয়-মদে-মত্ত। কৃষ্ণনাম অর্থাৎ কীর্তন-চিন্তন তখন সমাজে আদৌ পাত্তা পেতো না। জনসাধারণের তখন একমাত্র উপাস্য

* 'পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে।' এর অর্থ মাটির পুতুল বা পুত্তলি নয় সম্ভবত ধাতু নির্মিত বা কাষ্ঠ নির্মিত কোন মূর্ত্তির কথা বলা হয়েছে। কেননা চৈতন্যের নিকট সমসাময়িক মৃৎ-নির্মিত মূর্তি পূজার তখনো সূচনা হয়নি। সেসময় ধাতু নির্মিত 'যন্ত্র' বিগ্রহের (সম্ভবত অবৈদিকী দেবতার) পূজা প্রচলন ছিল। বর্তমানে শ্রীপাঠ খড়দহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহের পাশে যে তান্ত্রিকী দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরীর যন্ত্র বিদ্যমান, শোনা যায় এ যন্ত্রটি নিত্যানন্দের জটার ভেতর থাকতো এবং তিনি (নিত্যানন্দ) এটিকে নিয়মিত পূজা করতেন। বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম মাটির মূর্তি গড়ে পূজা প্রচলন করেন বাঁকুড়া জেলার 'ভুলুই' গ্রাম নিবাসী জগদ্রাম (জগৎরাম ?) রায়। তাঁর সৃষ্ট বিশাল অষ্টনায়িকা (দুর্গা) মূর্তি আজও ভুলুই গ্রামে বিদ্যমান।



দেবতা ছিল মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি তান্ত্রিকী দেবতা। কেউ কেউ বহু অর্থ ব্যয় করে মূর্তি গড়ে মূর্তিপূজাও করতো এবং পুত্র কন্যার বিয়েতে (বৃটিশ আমলের 'বাবু'-দের মতো) এন্তার টাকা ওড়াতো।

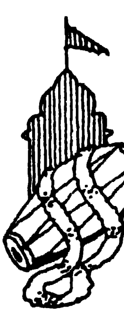
সেসময় বৈষ্ণবদের প্রতি শাক্ত-তান্ত্রিক ও তান্ত্রিক ভাবাপন্ন মানুষদের ধারণা ছিল প্রায় আদা-কাঁচকলার মতো। এর সঙ্গে বেদ-বেদান্ত অনুরাগী ব্রাহ্মণরাও যুক্ত ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য, নবদ্বীপের শ্রীবাস-পণ্ডিতের পরিবার, শুক্লাম্বর গোস্বামী, খোলাবেচা শ্রীধর, চৈতন্যের মেসো চন্দ্রশেখর—অর্থাৎ যাবৎ কীর্তনকারী বৈষ্ণবদের তখন সাধারণ মানুষও দেশের শত্রু মনে করতো। তখন সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, উচ্চকীর্তনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

'এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সভা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ

•   •   •

কেহ বোলে—'যদি ধান্যে কিছু মূল্য চঢ়ে।
তবে এগুলাকে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।'

বস্তুত চৈতন্যের পরবর্তী যুগ বিশেষত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় (অষ্টাদশ শতক) বাঙলাদেশে শাক্ত-তান্ত্রিকদের স্বর্ণযুগ বলা যায়। কারণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই ছিলেন ঘোর শাক্তপন্থী। তাঁরই প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় শাক্তাচার এসময় ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। এবং এই সময়ই তোতা রামদাস বাবাজির (ইনি নবদ্বীপের বৈষ্ণব-চূড়মণি নামে খ্যাত ছিলেন) গলায় জুতার মালা পরিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশ্রয়পুষ্ট তান্ত্রিকেরা। (শ্রীশ্রী গৌড়ীয়—বৈষ্ণবজীবন / দ্বিতীয় খণ্ড / পৃ ১৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ তো গেল চৈতন্যের তিরোধানের পরবর্তী ঘটনা। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে চৈতন্য অদ্বৈতাদি সৃষ্ট বৈষ্ণধর্মের যা কিছু প্রসার লাভ করেছিল পরবর্তী কালে তার দুর্বল হয়ে যাওয়ার, সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়ার কাহিনী। কিন্তু চৈতন্যের সমসাময়িক, চৈতন্য প্রভৃতির প্রকট কালেও বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম কি খুব বেশি প্রসার লাভ করতে পেরেছিল ? বোধহয় না। কারণ, সেসময় বৈষ্ণবিয়াদের কীর্তনরসে যদি সত্যি সত্যি 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়', তাহলে নবদ্বীপ শান্তিপুরের বুকে শাক্ত-তান্ত্রিকদের (পাষণ্ডী) প্রভাব কিছুটা ক্ষুন্ন হতো। তা হয়নি। বরং বলা যায় বৈষ্ণবদের চেয়ে জনসমাজে তাদেরই বেশি প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি দেশের মুলসমান শাসক 'কাজী'রও রক্তচক্ষুর আওতার বাইরে ছিল তারা এমন ধারণা বোধকরি ভুল হবে না। কেননা, তৎকালীন শাসক ব্রাহ্মণদের উপবীত ধারণ অর্থাৎ পৈতা পরার ওপর ফর্মান জারী করেছিল, গঙ্গাস্নান করার ওপর ফর্মান জারী করেছিল, এমন কি কপালে উর্ধ্বপুণ্ড্র (তিলক) কাটার ওপরও জারী হয়েছিল বিদেশী তুর্কী শাসকের ফর্মান। ফতেশাহের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ওপর। তিনি ব্রাহ্মণদের উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শাসক হুসেন শাহের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল চৈতন্য অনুগামী বৈষ্ণবরা। তিনি বৈষ্ণবদের কীর্তন, গলায় তুলসীর মালা ধারণ, এমন কি বাড়িতে তুলসী বৃক্ষ রোপনও নিষিদ্ধ



ঘোষণা করেছিলেন। এসব কথা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ' গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, বিভিন্ন চৈতন্যচরিত গ্রন্থে বিশেষত কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাসের কাব্যে ও কবি কর্ণপূরের মহাকাব্যে এবং এ যুগের দুই বিদগ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্রের বাংলার ইতিহাসে তদানীন্তন রাজশক্তির প্রভূত ধর্মীয় বিরোধিতার খবর পাওয়া যায়।

কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ওপর বিরোধিতা করলেও তৎকালীন শাসক সম্প্রদায় শাক্ত বা তান্ত্রিকদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরমক হস্তক্ষেপ করেননি। কেন করেননি বলা শক্ত। তবে শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের যে একটা প্রচ্ছন্ন বোঝাপড়া ছিল তা শাক্তাচারীদের কর্তৃক বৈষ্ণবদের 'রাজভয়' দেখানোর বহর দেখলেই বোঝা যায়। চৈতন্য ভাগবতের (২।২।২২৭-৩৬) অংশে শ্রীবাসকে 'রাজ নৌকা'র ভয় দেখাচ্ছে পাষণ্ডরী। শ্রীবাস আচার্যের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে কীর্তনের আসর বসতো বৈষ্ণবদের। সুতরাং শ্রীবাসকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য সেনা বোঝাই 'রাজার আজ্ঞায় দুই নাও অহিসে এথা' বলে ভয় দেখিয়েছিল তারা। এতে শ্রীবাস ও অন্যান্য বৈষ্ণবরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য ছিলেন নির্ভীক। বরং তিনিই প্রথম রাজনৌকা দেখার জন্য সেজেগুজে পান চিবোতে চিবোতে গঙ্গার ধারে এগিয়ে গেছলেন। এটি ছিল চৈতন্যের গয়া-প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরের ঘটনা। এরপর সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন আগে চৈতন্যকে 'রাজভয়' দেখালো পাষণ্ডীরা। 'পাষণ্ডী সকলে বোলে 'নিমাই পণ্ডিত। / তোমারে রাজ আজ্ঞা আইসে ত্বরিত।' কিন্তু নির্ভীক নিমাই তাদের কথায় পাত্তাই দিলেন না। বরং বললেন, রাজাকে বলো আমিই তাঁর দর্শনে ইচ্ছুক। কেউ আমার সাথে শাস্ত্র আলোচনা করতে আসেনা। আমি রাজার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে চাই। নিমায়ের প্রকৃতি দেখে পাষণ্ডীরা ঘাবড়ে গেল।

তো এযাবৎ আলোচনা-ভিত্তিক একটা জিনিষ আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল, তা হলো, মধ্যযুগে বিশেষত চৈতন্যের সমকালে শাক্তাচার, তান্ত্রিকতা প্রবেশ করেছিল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বৈষ্ণব হাওয়া সমাজ জীবন থেকে এই পুরাতন তান্ত্রিক মানসিকতা মুছে ফেলতে সমর্থ হয় নি। বরং পরবর্তী কালে কিছু শাক্তাচারী বৈষ্ণব দলে ভিড়ে গিয়ে চৈতন্য অনুগামীদের দুর্বল করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। ক্রমে মূল বৈষ্ণব থেকে বৈষ্ণব সহজিয়ারা বা তান্ত্রিক বৈষ্ণবরা হয়ে গিয়েছিল সংখ্যাধিক্য ও প্রবল। ('শাক্ত পদাবলী ও শক্তি-সাধনা' / জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী / দ্বিতীয় সং ১৩৬৭ / পৃ-২৮ দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, এই কালাপাহাড় সাদৃশ্য প্রভাবশালী ধর্মীয় সংগঠনের সাথে নিয়ত যুদ্ধে সংখ্যালঘু বৈষ্ণব দলকে সংখ্যাধিক্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছলেন চৈতন্য। এবং অদ্বৈত-চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব হাওয়ায় তদানীন্তন নদীয়া ('নদে') কতোখনি ডুবুডুবু হয়েছিল সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হলো, আমাদের দেখতে হবে, কার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্য, তারা কতোখনি শক্তিশালী ছিল। এবং কতোখানি শক্তিমান হলে, শক্তিমত্তা থাকলে তবেই সেই শক্তিশালীর



বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায় এটিও আমাদের ভাবতে হবে। এবং সর্বোপরি দেখতে হবে, চৈতন্য কিসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, কোন পরিস্থিতির মধ্যে। বস্তুত, এসবের মধ্যে নিহিত আছে চৈতন্যের চৈতন্য হওয়ার আসল রহস্য।

অতঃপর এ' অধ্যায়ের পরিশেষ আলোচ্য থাকে চৈতন্য সমকালীন ব্রাহ্মণ্য ও নৈয়ায়ি সমাজ। কেন ও কি কারণে অথবা কোন তত্ত্বোপলব্ধির সহায়তায় তদানীন্তন ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িরা বৈষ্ণব দল ও ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন— চৈতন্য-অনুসঙ্গী এই বিষয়টি আমাদের আবশ্যিক জেনে নেওয়া দরকার। এক মানুষ আরেক মানুষের বিরোধিতা করার সম্ভব দুটি প্রধান কারণ থাকে। তা হলো, (এক) বিরুদ্ধকারী কর্তৃক বিপক্ষের মন্দের দিকটি উপলব্ধি। এবং (দুই) বিরুদ্ধকারী কর্তৃক বিপক্ষের ভালোর দিকটি অনুভব করার অজ্ঞতা। এ অজ্ঞতা নৈতিক হতে পারে, আবার মানসিকও হতে পারে। অন্যত্র বিপক্ষের মানসিক দিকটি যদি ভাগবত (ideational) বাদী হয় তাহলে তার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উদ্ভাবনী দিকটি অনুভূত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা ও সময়ের প্রয়োজন থাকে। আবার এসবের বাইরেও একটি দিক আছে। যাকে বলে জেগে জেগে ঘুমানো। এই পন্থাকে অবার দু'লাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি আত্ম-উপলব্ধির দিক, অন্যটি আত্মহননের দিক। অবশ্য জেগে জেগে ঘুমোনোর 'নীট' ফল আত্মহননেরই সামিল। তো জেগে জেগে মানুষ ঘুমোয় কেন ? এর বোধহয় একটাই কারণ, তা হলো, বিপক্ষের ভালোর দিকটির কাছা-কাছি পৌঁছালে সপক্ষে মন্দের দিকটি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মন্দের দিকটি হলো স্বার্থের দিক। অর্থাৎ সূর্যালোকে যেমন অন্ধকার কেটে যায় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তু স্বচ্ছাতিস্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তেমনই ভালোর আলোকস্পর্শে মন্দের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠায় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে। ভালো ও মন্দের সংঘাত এখানেই।

আপনাদের ব্রুনোর গল্প মনে আছে। জিওর্দানো ব্রুনো। সাদামাটা সত্যাশ্রয়ী এক ইতালিয়ান যুবক। এই সত্যাশ্রয়ীতার জন্য তাঁকে অপঘাতে মরতে হয়েছিল মানুষের হাতে। ঠিক মানুষের হাতে না, স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে। তাঁর এই মাত্র অপরাধ ছিল, তিনি বলেছিলেন সূর্য নয়, পৃথিবীটা ঘুরছে। এই মাত্র গুরুতর অপরাধে



* 'তৎকালে এ প্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক শক্তি উপাসক ছিলেন। তন্মধ্যে অনেকে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় অনুষ্ঠানোপলক্ষে পানাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেন। * * * নবদ্বীপের রাজা বা পণ্ডিতগণ চৈতন্যকে অবতারের মধ্যে কখনো গণ্য করনে নাই। একারণ যদিও চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্মপ্রচারক অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ গোস্বামী, ও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ, এই রাজাদিগের অধিকারের চতুঃপার্শ্বে ভূরি ভূরি শিষ্য করিয়াছেন, তথাপি যে প্রদেশে তাহাদের বাস, সে প্রদেশে প্রথমে বহুতর শিষ্য করিতে পারে নাই।' ('ক্ষিতিশবংশাবলী চরিত ' / ১৯৩২ / পৃ-৫৬, ৬৪)। 'একথার সত্যতা আজও নদীয়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরলে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে যে নবজাগরণ এনেছিল, তা বাঙালী সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যেই প্রধানত সীমিত ছিল। জনজীবনে ও জনমানসে তার ব্যাপক ও গভীর ছায়াপাত সম্ভব হয়নি। কেন হয়নি তা অনুসন্ধান ও আলোচনা সাপেক্ষ।' (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি / অখণ্ড / বিনয় ঘোষ / পৃ- ৭৯৪)।

তাঁকে তৎকালীন 'প্রফেট'রা জিভ বেঁধে, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল।

জিভ বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা ব্রুনোর শাস্তির একটি খণ্ডাংশ মাত্র। তেমনি খণ্ডাংশ ব্রুনোর গল্পের পূর্ণাবয়ব। কেননা ব্রুনোর গল্পে যদি ব্রুনোর গল্প শেষ হয়ে যেতো তাহলে, সেটা ছিল আমাদের, আজকের মানুষের সুখের ইতিহাস। অমানুষতা থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের ইতিহাস। তা হয়নি। যুগে যুগে ব্রুনোকে আমরা শাস্তি দিয়েছি। আগামী কাল কোন ব্রুনো শাস্তি পাবে না এমন 'গ্যারান্টি' নেই। অথচ পৃথিবীটাই ঘুরছে। বোধহয় এই আমাদের মনুষ্যত্বের নিয়তি।

কথা হচ্ছিল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের সংঘাত, অথবা ব্রাহ্মণ নৈয়ায়ি ও বৈষ্ণবিয়াদের বিরোধ। কিন্তু বিরোধটা কিসের ছিল, মতের না পথের ? এর যথাযথ সদুত্তর সম্ভবত পাওয়া যাবে চৈতন্য সম সাময়িক কবি কর্ণপূরের রচনা থেকে। তৎকালীন সমাজ ও সমাজের সামজিক অবস্থা প্রসঙ্গে কর্ণপূর তার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে লিখেছেন, 'ন শৌচং নো সতং ন চ শমদমৌ নাপি নিযমো ন শান্তি'ন ক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া।' এর অর্থ কি, অর্থাৎ 'সেকালে শৌচ, সত্য, শম-দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি (অর্থাৎ ক্ষমা), মৈত্রী, দযা প্রভৃতি কিছুই ছিল না।' তো যাদের নিয়ে চৈতন্যের বা চৈতন্যকে নিয়ে যাদের সংঘাত সেই ব্রাহ্মণরা কেমন ছিলেন ? এ প্রসঙ্গে কর্ণপূর লিখছেন, 'ষষ্ঠে কমনি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্ন দ্বিজাঃ।'—অর্থ, 'দ্বিজ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ দ্বিজচিহ্ন অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র (পৈতা) ধারণ করে কেবল ষষ্ঠ কমটি অর্থাৎ শিষ্যদের কাছে দান প্রতিগ্রহে নিজেদের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেছিলেন।' বাকী অন্য তিন বর্ণ—যথাক্রমে ক্ষত্রিয, বৈশ্য ও শূদ্রগণ প্রসঙ্গে—অর্থাৎ তদানীন্তন সমাজের সামাজিক অবস্থার 'নীট' ফলাফল প্রসঙ্গে কবি কর্ণপূর লিখেছেন,, 'সংজ্ঞামাত্র বিশেষিতো ভুজভূবো বৈশাশ্চ বৌদ্ধা ইব। শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্মোপদেশোৎসুকা বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হা হন্ত সম্পাদিতা।।" যার অর্থ হলো, 'ক্ষত্রিয়গণ, প্রজাপালনে অসমর্থবশতঃ নাম মাত্রে রাজা ছিলেন, বৈশ্যগণ বৌদ্ধপ্রায় (অর্থাৎ তন্ত্রাচারী) হয়ে পড়েছিলেন, এবং শূদ্রগণ পণ্ডিতম্মন্য হয়ে—মস্তো পণ্ডিতের মতো ধর্মোপদেশ দানে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন।—কালির প্রভাবে চার বর্ণের এতাদৃশী অবস্থা হয়ে উঠেছিল।' ('শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' —১/১, ১/২)।

অন্যত্র চতুরাশ্রম অর্থাৎ—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস সম্পর্কে কর্ণপূর লিখেছেন, 'বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যাশ্রমযুজো গৃহস্থাঃ স্ত্রী-পুত্রোদর ভরণমাত্র ব্যসনিনঃ। / অহো বানপ্রস্থাঃ শ্রবণপথমাত্র প্রণয়িণঃ পরিব্রাজা বৈশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম'। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১/৩)। অর্থ হলো, 'বিবাহে অযোগ্যবশতঃ অর্থাৎ বিবাহ যাদের কপালে জুটতো না, তারাই কেউ কেউ নিজেদের ব্রহ্মচারী বলে পরিচিত করতেন, গৃহস্থগণ কেবল স্ত্রী-পুত্রের উদর ভরণেই আনন্দ অনুভব করতেন, 'বানপ্রস্থ' কথাটি কেবল শ্রবণপথগতই ছিল, অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন করে কেউই বনে যেতেন না, আর চতুর্থ বনাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাসের ব্যাপারটি ছিল এরকম—কেউ

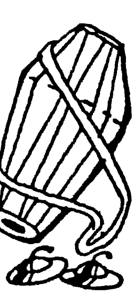


কেউ সন্ন্যাসের পোষকমাত্র ধারণ করে নিজেদের সন্ন্যাসী বলে পরিচিত করতেন, এবং পোষাকের বলেই অপরের নিকট হতে অর্থাদি সংগ্রহ করতেন।'

এবং তৎকালীন বিদ্যানদের অর্থাৎ পণ্ডিতদের শিক্ষাদীক্ষা প্রসঙ্গে কবি কর্ণপূর লিখেছেন, 'অভ্যাসাদ্ য উপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্ত্যাদি শব্দাবলের্জন্মারভ্য সুদূর দূর ভগবদবার্ত্তা প্রসঙ্গা অমী। / যে যাত্রাধিক-কল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ।।' (১।৪)। অর্থাৎ 'উপাধি, জাতি, অনুমিতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি ন্যায়-শাস্ত্রের শব্দসমূহের অভ্যাস—অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অনুশীলন বশত এই পণ্ডিতগণ ভগবদ্‌বার্তা-প্রসঙ্গ থেকে জন্মাবধি সদূর দূরে সরে পড়েছিলেন। / যে সকল তার্কিক যে স্থানে যতো বেশি কল্পনা কুশল সেই স্থানে তাঁরা ততো বেশি বিদ্বত্তম বলে পরিগণিত হতেন। অর্থাৎ তাঁদের কল্পনাকেই শাস্ত্র বলে ধরা হতো।' অন্যত্র বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,

'যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারা হো না জানযে গ্রন্থের অনুভব।।
* * *
গীতা-ভাগবত যে-যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।।'

এমনই এক দুঃসময়, ক্ষয়িষ্ণু পরিমণ্ডলের ভেতর চৈতন্য তথা বৈষ্ণব সমাজের উত্থান। কতোখানি অমিত-বিক্রমের অধিকারী হলে ছোট্ট এক বর্শা হাতে কোন যোদ্ধা বিপক্ষের বিশাল বাহিনীর দিকে ধাবিত হতে পারে, তেমনই এক ঋজু-প্রত্যয়ী মানসিকতা নিয়ে প্রায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি প্রদীপ হাতে সুবিশাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূ-খণ্ডের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন চৈতন্য। তিনি সেই অন্ধকারকে কতোখানি আলোকাকীর্ন করেছিলেন সেটা মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হলো, চৈতন্যের সমকালীন রাজা, বাদশাহ্, ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ্য সমাজ, শাক্তাচারী পাষণ্ডী, তন্ত্রচারী বৌদ্ধ, এমন কি 'তৃণাদপি সুনীচেন'* বৈষ্ণবদেরও আমরা ভুলে গেছি। রাজা বাদশাহ্‌রা আসেন ইতিহাসের প্রয়োজনে, খোল-করতালের শব্দে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবিয়ানার কথা মনে পড়ে, কিন্তু চৈতন্য আসেন নিত্য, নিরবধি। শত্রু-মিত্র, শিক্ষিত-



* 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। / অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।' অর্থাৎ 'তৃণাপেক্ষাও অতিশয় নীচ হয়ে, বৃক্ষের অপেক্ষাও সহিষ্ণু হয়ে, নিজে অমানী হয়ে, অপরকে মানদান পূর্বক নিরন্তর হরির নাম করা উচিত।' কথিত আছে, চৈতন্য আটটি শিক্ষা নিমিত্তে শ্লোক রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যার নামকরণ হয় 'শ্রীশিক্ষাষ্টকম'। চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদে এর বর্ণনা আছে। এ প্রসঙ্গে বিংশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস লিখেছেন, 'এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। / প্রলাপ করিয়া কিছু শ্লোক পড়িলা।। / পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিক্ষা দিল।' 'তৃণাদপি সুনীচেন——' শ্লোকটি চৈতন্য রচিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকম' এর অন্তর্গত একটি শ্লোক। এছাড়াও বরাহনগর পাঠবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'শ্রীনিতাই সুন্দর' পত্রিকার ১ম বর্ষ অষ্টম ও নবম সংখ্যায় যথাক্রমে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্' ও 'শ্রীশ্রীপ্রেমামৃতরসায়ণ স্তোত্রম' নামে চৈতন্যরচিত দু'খানি সংস্কৃত কবিতা উল্লেখিত হয়েছে।

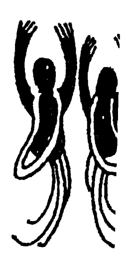
অশিক্ষিত, কবি-অকবি, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক, সাধু-অসাধু, কাপুরুষ-মহাপুরুষ, সুখী-দুঃখী, ধনী-নিধনী, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনে চৈতন্যের নিরন্তর বিচরণ। কিন্তু কেন ? উত্তর, বিশাল অন্ধকারে সেই একখণ্ড দুঃসাহসিক আলো। অর্থাৎ নিয়ত অন্ধকারে যখন আমরা নিয়ত আলোর প্রত্যাশী তখন তিনি জলদ মেঘের মতো প্রত্যাশিত বৃষ্টির সূচনা হয়ে আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত উপস্থিত।

[দশ]

[চৈতন্যের প্রাক্-গৃহত্যাগ]

ক্রমে উত্তোরত্তর চৈতন্যের মানসিক অবস্থা বহির্মুখী হয়ে উঠছিল। এমত অবস্থায় মাতা শচীদেবী, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া (বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এসময় সম্ভবত শ্বশুরবাড়ির চেয়ে পিত্রালয়েই বেশি থাকতেন), নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, অদ্বৈতাদি আপ্তবর্গ, এমন কি নিমাই নিজেও অনুভব করছিলেন সংসার হয়তো তাঁকে বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারবে না। কেননা, সকলের অগোচরে গৃহী চৈতন্যের গার্হস্থ্য বন্ধনের সূত্রটি ততোদিনে ক্রমান্বয়ে পলকা হয়ে আসছিল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, যা-সংসারী চৈতন্যকে সংসার বিমুখকতার সামিল করবে, এমন একটি দুর্বিসহ ধারণা ততোদিন মা শচীদেবীর মানসপটে ঘণীভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। বস্তুত এসময় সংসারে থেকেও ঘর-সংসার থেকে অস্বাভাবিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন চৈতন্য। হয়তো এটাই ছিল চৈতন্যের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। সেটি চৈতন্যের নিজস্ব দিক। কিন্তু সাধারণ মানসিকতা ও মানব প্রকৃতির দিক থেকে এমন কোন প্রেরণা ও প্রেয়য়িতা তখন ছিল না যা মা শচীদেবীর মনকে স্বাভাবিকী করণে প্ররোচিত করবে। এমনিতেই চৈতন্য বাড়ি থাকতেন না। নৈশযাপন করতেন শ্রীবাসের বাড়িতে। সম্ভবত শচীদেবীর আশঙ্কা ছিল সেখানে। স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন বিশ্বরূপ, কর্তব্যের শক্ত বন্ধনে তাঁকে বাঁধা যায়নি। নিমাই বাঁধা পড়েও মুক্ত হতে চলেছে।

অন্যত্র নিমায়ের মানসিক পটভূমিটি তখন সংশয়ান্বিত। ঘর ও বাইরের আকর্ষণে চলেছে নিরন্তর জোয়ার-ভাঁটা। দ্বিমুখী টানে কখনো চলেছেন সমুদ্রের দিক মুক্তির সন্ধানে। পরক্ষণে ভাঁটার টানে ফিরে আসছেন চিরাচরিত. নিজস্ব খাতে।



এর মধ্যে আরেকটি উপসর্গ দেখা দিলো চৈতন্যেব মধ্যে, সেটি শরীরী উপসর্গ। বায়ু রোগের প্রকোপে মাঝে মাঝেই তিনি অসুস্থ বোধ করতেন। এটি প্রায় কৈশোর কাল থেকেই তাঁকে আক্রান্ত করেছিল। লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে বিবাহের আগে, বিবাহোত্তর কালে, বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে পুনর্বিবাহ ও অতঃপর তিনি এ রোগের প্রাদুর্ভাব হতে মুক্ত হতে পারেন নি। কিন্তু গয়া প্রত্যাবর্তনের পর রোগের প্রকোপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি

পেয়ে গেল। এমতো অবস্থায়—

'ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়।।'*

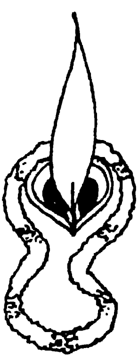
অন্যত্র—

'তাহারো কিরূপ মতি বুঝনে না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।।
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বোলে ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা।।
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে।।
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাটা মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে।।'

[চৈতন্য ভাগবত ২।২।৮৭, ৯১-৯৪]

এমতো অবস্থায় পাড়া-পড়শীরা শচীদেবীকে পরামর্শ দিলো, নিমায়ের দু'পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে। কেউ বললো, 'ডাবু-নারিকেলের জল' খাওয়াও যাবৎ উন্মাদ বায়ু কেটে যাবে। কেউ বললো , না না, ডাবু-নারকেলের জলে কিছু হবে না, 'ইথে অল্প ওষুধে কি করে', তার চেয়ে শিবাঘৃত তৈল মাখাও। কেউ বা পাকতৈলের (অগ্নিপক তেল) কথা বললো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শচীদেবী সন্তানের রোগ নিরাময়ের জন্য যে যা বলে তাই করতে লাগলেন। কখনো বা সন্তানের সুস্থতার জন্য দেবতার শরণাপন্ন হলেন 'গোবিন্দ শরণে গেলা কায়-বাক্য মনে।' অধিকাংশ চৈতন্য জীবনচরিতে এসব পরামর্শ-দাতাদের কোন নামোল্লেখ নেই। তবে এরা সকলেই যে পাড়াপ্রতিবেশী ছিল একথা বেশ বোঝা যায়। পাড়া-প্রতিবেশী যেমন পাড়া-প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে আসে এরা সেই ভাবেই, সেই মন নিয়ে এসেছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণব বিরোধী, চৈতন্য বিরোধী থাকতে পারে (থাকাটাই সম্ভব)। কিন্তু শুধু মাত্র বিরোধী ভূমিকা নিয়ে তারা শচীদেবীর বিপদে তামাসা দেখতে এসেছিল এমন কথা ভাবা যায় না। অনুরূপ এমনও ভাবা যায় না যে, আগত পড়শীরা সকলেই পাষণ্ডী, চৈতন্য বিরোধী ছিল।*

চৈতন্যের যখন এমতো অবস্থা, এমন একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত এলেন নিমাঞিকে দেখতে। চৈতন্য আগের তুলনায় সম্ভবত কিছুটা সুস্থ ছিলেন। শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পণ্ডিত, তোমার কি ধারণা, আমার সত্যি সত্যি বায়ুরোগ হয়েছে ? সবারই ধারণা, আমি নাকি বায়ু রোগে আক্রান্ত। কেউ কেউ আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে



* 'লক্ষ্মী দেখিয়া ক্ষণে.......' অর্থে লক্ষ্মীপ্রিয়া নয়, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

* শ্রীযজ্ঞদত্ত শর্মা প্রণীত 'শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস' (হিন্দী গ্রন্থ)-এর তৃতীয় সোপানের শেষাংশে লেখা হয়েছে, 'পাখণ্ডী পরচারত শচিকো। / বায়ু রোগে ভয় হৈঁ তব সুতকো।। অর্থাৎ 'পাখণ্ডী-পাষণ্ডীরা শচীদেবীর কাছে প্রচার করলো যে তোমার ছেলের ভয়জনক বায়ুরোগ হয়েছে।'—দ্রষ্টব্য।

বলছে। এখন তুমি কি বলো পণ্ডিত ?' প্রত্যুত্তরে শ্রীবাস বললেন,

'শ্রীবাস বোলেন—'যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি বাঞ্ছয়ে এ ভোগ।।'

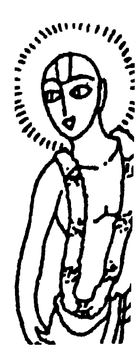
অতঃপর চিন্তান্বিতা শচীদেবীর উদ্দেশে শ্রীবাস বললেন,

'চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন।।
'বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি' বলিল তোমারে
ইহা কভু অন্য জন বুঝিবারে নারে।।'

শ্রীবাস পণ্ডিতের আশ্বাসন বাণী শুনে মা শচীদেবীর দুশ্চিন্তা কিছুটা প্রশমিত হলো সত্যি কিন্তু শ্রীবাসের ওই 'বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি' কথাটা তাঁর মাতৃ-হৃদয়কে দ্বিগুণ উদ্বেলিত করে তুললো। ভয় হলো, অপত্য স্নেহের অন্তর্দ্বন্দ্বে উৎপীড়িত শচীদেবীর মনে, সন্তানপালিনী, চির কল্যাণময়ী মাতৃহৃদয় জুড়ে তখন একমাত্র চিন্তা, ভক্তিবাদের তুমুল জোয়ারে বিশ্বরূপ ভেসে গেছে। সেঁই সংসার-বিমুখী সর্বনাশা জোয়ার এসেছে বিশ্বম্ভরের মনেও।

সংসার বৈরাগী নিমায়ের সংসার বিমুখতা থেকে মুক্ত করার তখন একটি মাত্র পথ খোলা ছিল মা শচীদেবীর সামনে। রূপসী বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া। নারীর বন্ধন যদি পুরুষ চৈতন্যকে সংসারমুখী করে এই এক মাত্র ভরসায় সান্ত্বনা চাইলেন মা শচীদেবী। কিন্তু এই একমাত্র জায়গায় বারংবার ভুল হতে লাগলো মা শচীদেবীর খড়ির লিখন। এ এক বিচিত্র লিখন ! চির বসন্তের প্রতীকী বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে এনে বসিয়ে দিলেন নিমায়ের পাশে। বারেকের জন্যও ফিরে তাকালেন না নিমাই। নিরন্তর এ ঘটনা ঘটতে লাগলো। হয়তো বিষ্ণুপ্রিয়া অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি রান্না করতেন, কিন্তু নিমায়ের আহারের থালা সাজিয়ে পাশে বসতেন মা শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়া দরজার আড়াল থেকে স্বামীর আহার লক্ষ্য করতেন। সম্ভবত এই সময়, এমন এক অলঙ্ঘনীয় মানসিকতায় এসে পৌঁছে গেছলেন চৈতন্য যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। এসময় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে মাঝে মধ্যে মারধোর করতেও উদ্যত হতেন বলে মনে হয়। (চৈ. ভাগবত ২।২।৮৭ দ্রষ্টব্য)। স্বাভাবিক কারণে বিষ্ণুপ্রিয়াও ভয় পেতেন নিমাইকে। এমন কি পুত্রের এ হেন ব্যবহারে মাতা শচীদেবীও ভীতিবোধ করতেন (চৈ. ভাগবত ২।১।১৩১-৩৭)।

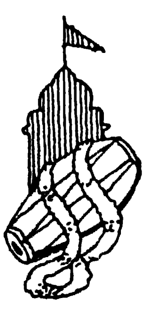
এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চৈতন্যজীবনী বিশেষজ্ঞ ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনন্য টীকাকার রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁর 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভূমিকা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, প্রভু নিজে তো বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট কখনো যাইতেন না, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া প্রভুর নিকট কখনো বসাইলেও প্রভু তাঁহার প্রতি কখনোও দৃষ্টিপাত করিতেন না।' (পৃ-১৭১)। নাথ মহাশয় অন্যত্র লিখছেন, সেই সময় হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী যে রাত্রিতে প্রভুর শয়ন গৃহে থাকিতেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহার পূর্বেও বিষ্ণুপ্রিয়া রাত্রিতে প্রভুর শয়ন-গৃহে থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য আর্তিতে প্রভু সারা নিশি জাগিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিতেন, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে



আনিয়া নিকটে বসাইলেও প্রভু তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না, কখনো বা তাঁহার প্রেম-হুংকারে বিষ্ণুপ্রিয়া ভয় পাইয়া পলায়ণ করিতেন, কখনো বা প্রভু তাঁহাকে মারিতে যাইতেন। প্রভুর এই· অবস্থার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া যে তাঁহার নিকট যাইতেন, তাহা মনে হয় না।' (পৃ-১৭৫)।

এসময় চৈতন্যের নিকট রাত্রিতে গদাধর শয়ন করতেন (মহাকাব্য ৫।১২৮ ২৯, ৬।১২ ও কড়চা ২।৩।১০-১১, ২।৩।১৫-১৭ এবং চৈ. ভাগবত ২।২।২০০-২০৯, ২।২৪।৩১ দ্রষ্টব্য) একথা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায়, শচীমাতার আদেশেই গদাধর রাত্রিতে চৈতন্যের নিকট শয়ন করতেন। এ ঘটনা ঘটেছিল চৈতন্যের গয়া প্রত্যাবর্তনের পর। গযা প্রত্যাবর্তনের পর, এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত, যে তেরো মাস চৈতন্য গৃহে ছিলেন সেই তেরো মাস সময় কালের প্রথম এক মাস গদাধর চৈতন্যের নিকট শয়ন করেছেন। বাকী এক বছর শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সারা রাত্রি কীর্তন করতেন। সেখানে অন্যান্য পার্ষদ সহ গদাধরও থাকতেন। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য পারিষদ সহ সারারাত্রি ব্যাপি কীর্তন চলতো, সেহেতু আলাদা ভাবে চৈতন্যের নিকট গদাধর পণ্ডিতের থাকার কোন প্রশ্ন থাকে না। তবে গয়া প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী একমাস সময়কাল রাত্রিতে গদাধর যে চৈতন্যের নিকট শয়ন করতেন এটা শচীদেবীর ইচ্ছানুসারেই হয়েছিল। হয়তো নিমাযের শারীরিক ও মানসিক কথা চিন্তা করেই জননী শচীদেবী এরকম একটা নির্দেশ বা অনুরোধ গদাধরকে করেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই এক মাসের পরবর্তী যে দীর্ঘ এক বৎসর সময়কাল চৈতন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে কেদাচিৎ চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে) সারারাত্রি ব্যাপি কীর্তন করে নিশিযাপন করেছেন, তখনো গদাধর চৈতন্যের সঙ্গে থাকতেন। শুধুমাত্র রাত্রিকালীন নয়, দিবাভাগেও ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। এটাও শচীদেবীর ইচ্ছানুসারে হয়েছিল। নিমায়ের সংসার নিস্পৃহতা দেখে, তাঁর পলায়ণী মানসিকতাটি সম্ভবত অনুভব করেই জননী শচীদেবী এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। চৈতন্য বিরোধীদের জন্যও এমন একটা ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা দরকার। যা আনুসঙ্গিকও বটে। এবং যা না বললে এ অংশ খণ্ডিত থেকে যায়, অপূর্ণ-অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিষয়টি হলো চৈতন্যের জননীর প্রতি আনুগত্য। মায়ের প্রতি সন্তানের আনুগত্য নতুন কোন কথা না। বরং এটিই শাশ্বত, পৃথিবীর চিরন্তন ঘটনা। কিন্তু চৈতন্যের জননী শচীদেবীর প্রতি আনুগত্য থাকার কিছু অধিক কারণও ছিল। অকালে স্বামী হারা হয়েছিলেন শচীদেবী। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ একপ্রকার পুত্র হারারই সামিল। চৈতন্য দুঃখীনী জননীর এই নিয়তবহমান যন্ত্রণা অনুভব করতেন। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাই মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারেন নি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ কালে। কিন্তু মাতৃআজ্ঞায় বিবাহ করলেও বিবাহোত্তর জীবনের সুখের চাবিকাঠিটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। এ চাবি আর কদাপি পাওয়া যাবে না একথাও তিনি বিলক্ষণ অনুভব করতেন। তবু মা-র মুখ চেয়ে সেই অভিপ্রেত সুখ নামক



চাবিকাঠিটির অনুসন্ধানও করেছেন তিনি।

চৈতন্যের গয়া প্রত্যাবর্তনের পর, ঘটনাপরম্পরা এমন কতোগুলি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে চৈতন্যজীবনচরিতে, যাতে করে সহজেই অনুমেয় হয়, চৈতন্যের মানসিকতা এসময় সর্বোপরি দাম্পত্য জীবনের প্রতিকুলে চলে গেছলো। কিন্তু তা সর্বৈব সত্য হতে পারে না। বায়ুর আধিক্য হেতু এসময় বিষ্ণুপ্রিয়া-কেন্দ্রিক কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও, মা শচীদেবীর প্রতি অবিচল আনুগত্য চৈতন্য কোনদিনই হারান নি। এমন কি সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও।

মা শচীদেবী চৈতন্যের পাশে স্বনির্বাচিত রূপসী বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসিয়ে দিতেন। আসলে পাশে নয়, বসিয়ে দিতেন চৈতন্যের বৈরাগী ধূলি মাখা গেরুয়া পথে। যে পথ দিয়ে বিশ্বরূপ চলে গেছেন ঘর-সংসারের মায়া-বন্ধন ছিন্ন করে। কিন্তু চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে ফিরেও তাকাতেন না। এটি চৈতন্যের নিজস্ব দিক। আবার একটি স্বতোবিরোধী দিকও ছিল। সেটি জননী শচীদেবীর প্রতি আনুগত্যের দিক। যেখানে, যে নিমাই পাশে বসিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও অনিন্দসুন্দরী স্ত্রীর পানে ফিরেও তাকান না, সেই নিমাইকে আবার দেখা যায় বিষ্ণপ্রিয়া (লক্ষ্মীর) পাশে। তখন বিষ্ণপ্রিয়া তাম্বুল সাজিয়ে দেন প্রিয়তম স্বামীকে। নিমাই তা পরমানন্দে ভক্ষণ করেন। কেন ? না—

'যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর।।
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গে প্রভু থাকেন বসিয়া।।'

এতে করে দুটি জিনিষ আমাদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, বায়ুর আধিক্য হেতু চৈতন্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসিকতার কোন বিপর্যয় ঘটেনি। এই উপসর্গ সাময়িক ভাবে তাঁর মানসিকতাকে বিঘ্নিত করতো সত্য, কিন্তু ফলশ্রুতি কোনও সুদূর প্রসারী ছিল না। এবং বায়ুর আধিক্য হেতু এই অত্যাশ্চর্য উপসর্গ সম্বন্ধে তিনি যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের সাথে তাঁর চিন্তাশীল কথোপকথনে তা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তো উপরোক্ত এই যুক্তির বিপক্ষে তার্কিকের তর্জনী উঠতে পারে। তর্জনী উঠতে পারে এই মাত্র কারণে যে, তা হলো, বায়ুর প্রকোপ-জনিত বিষয়টি তাঁরা আগাগোড়া ও সর্বোপরি 'কৃষ্ণের বিকার' বা কৃষ্ণভক্ত ভাবের আবেশ-জনিত বিকার, বা কৃষ্ণপ্রেমের বহির্বিকার বলে চিহ্নিত করতে চাইবেন। তাঁদের এই অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় যৌক্তিকতাকে পরাহত করার কোনরূপ বাসনা না নিয়ে শুধু সনির্বন্ধে একটি উদাহরণ তাঁদের সামনে উপস্থাপিত করতে চাই। এতে করে চৈতন্যের অন্তর্নিহিত-মৌলিক দিকটি যেমন সহজবোধ্য হয়ে ওঠে, তদ্রূপ প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে পরস্পর বিরোধীযুক্তির যৌক্তিক-দুরূহতা।



এক জায়গায় বৃন্দাবন দাস লিখছেন, শচীমাতার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত একদিন চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার (লক্ষ্মী) পাশে নিজ-গৃহে বসে আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর জন্য পান সাজতে ব্যস্ত। এমতো সময় সহসা সেই গৃহে অভাবিত ভাবে নিত্যানন্দ প্রবেশ করলেন। দিগম্বর অবস্থা।

চৈতন্য বললেন, নিত্যানন্দ ! তুমি উলঙ্গ কেন ?
উত্তরে নিত্যানন্দ বললেন, 'হয় হয়।'
চৈতন্য বললেন, নিত্যানন্দ ! বসন পরো।
প্রত্যুত্তরে নিত্যানন্দ বললেন, 'আজি আমার গমণ।'
চৈতন্য শুধালেন, নিত্যানন্দ ! 'আমি গেলুঁ দশ বার।'
এবার চৈতন্য ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, দ্যাখো নিত্যানন্দ ! আমার কিন্তু কোন দোষ নেই।
উত্তরে নিত্যানন্দ বললেন, 'প্রভু ! হেথা নাহি আর।'
চৈতন্য বললেন, নিত্যানন্দ কৃপা করে তুমি বসন পরো। কিন্তু নিত্যানন্দের বসন পরার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অতঃপর চৈতন্য নিজে উঠে নিত্যানন্দকে বসন পরিয়ে দিলেন। (চৈতন্য ভাগবত ২।১১।৭০-৭৫)।
উভয়েই কৃষ্ণ ভাবের কাণ্ডারী। তাহলে এক ভাবীর ভাব দেখে অন্য ও অন্যতম ভাবী 'ক্রুদ্ধ' হলেন কেন ?

[এগারো]

[চৈতন্যের প্রাক্ গৃহত্যাগ /২]

আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি. গয়া প্রত্যাবর্তনের পর একটি সদ্যজাত চারা গাছের মতো, একটু একটু করে সংসারী চৈতন্য কিভাবে ও কেন সংসার উদাসী, সংসার বৈরাগী হয়ে উঠলেন । এবং এ কথাও আমরা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জেনেছি যে, চৈতন্যের সংসার বৈরাগ্যের সৃষ্টিশীল বীজটি লক্ষ্মীপ্রিয়ার অভাবনীয় মৃত্যুর মধ্যে নিহিত ছিল । কিন্তু একটি বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম চারাগাছটি ক্রমে পত্রোদ্গম ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হয়ে কিভাবে মহীরুহ আকার ধারণ করলো সে কথার সদুত্তর শুধুমাত্র বীজ-কেন্দ্রিক প্রশ্নে পাওয়া যাবে না । মূলত, একটি চারাগাছের জন্ম দেওয়া বীজের দায়িত্ব ও দায়িত্বের শেষ কথা । কিন্তু একটি চারাগাছ জন্মানোর অর্থ সে ফলে ফুলে মহীরুহ আকার ধারণ করবে এমন কথা হলফ করে বলা যাবে না । একটি সদ্যজাত শিশুর মতো একটি সদ্য জাতক চারা শিশুকেও লালন করা, পরিচর্যা করার প্রশ্ন থাকে । তবেই একটি শিশু চারা ফলে ফুলে ভর-ভরান্ত হয়ে, শাখা-প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হয়ে মহরুহ হয়ে ওঠে । এখানে মানব শিশু ও বৃক্ষ শিশুর কোন বিভেদ থাকে না ।



সংসারী চৈতন্যের সংসারত্যাগী বৈরাগী হওয়ার নেপথ্যে, গৈরিক বসনধারী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার নেপথ্যে এমন কিছু মানুষের হাত ছিল যাঁদের লালন ও পরিচর্যা গৃহী চৈতন্যকে গৃহকন্দর ছেড়ে পথে নেমে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল । তার অর্থ এই না যে, চৈতন্য মাটি আঁকড়ে পূর্বাপর গৃহী থাকতে চেয়েছিলেন । লক্ষ্মীকে ভালোবেসে, ভালোবাসার চিরকালীন স্বীকৃতি দিয়ে চার দেয়ালের গণ্ডি-মধ্যে যে

স্বপ্নের স্বপ্নিক পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন চৈতন্য, সেই বর্ণাঢ্য, রম্য ও দুর্লভ স্বপ্ন যখন লক্ষ্মীর অকালমৃত্যু এসে তাসের ঘরের মতো চুরমার করে দিলো, অতঃপর পূর্ণ তথা পূর্ণাতিপূর্ণের এই ঝটিতি শূন্যতা রূপ চৈতন্যের সাংসারিক গৃহী মনকে অভাবনীয়ভাবে দুঃখবিলাসী করে তুললো। গৃহত্যাগ এই বেদনা সঞ্জাত আনন্দের একটি অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা মাত্র। আসলে মৃত্যু তো জীবনযাপনের একটা অবশ্যম্ভাবী অংশ, কিন্তু মৃত্যুর আকস্মিকতা মাঝে মাঝে মৃত্যুর চেয়েও নির্মম, তীব্র হয়ে আমাদের কাছে আসে। মৃত্যুর কোন সময় নেই, অসময়ও নেই, তবু এই অনাদি কালের প্রবহমান আদি সত্যটি আমরা জন্মের মতো প্রাকৃতিক স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে পারি না, ফলে এই অদৃশ্য নিয়তির প্রচ্ছায়া আমাদের উত্তরপর্ব মনকে সঙ্কটভার, বিপর্যস্ত করে তোলে। পুরাণ বর্ণিত জিতেন্দ্রিয় দেবতা, গন্ধর্ব, কিঙ্কর-কিঙ্করীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তাই বকরূপী ধর্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, হে ধর্মরাজ, তুমি বলো, পৃথিবীর আশ্চার্যান্বিত হবার মতো জিনিষটি কি ? ধর্মের সেই বিস্ময়োদ্দীপ্ত প্রশ্নের সদুত্তরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেদিন বলেছিলেন, 'অহন্যাহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।/ শেষাস্থির ষমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥' নিত্যদিন মানুষ জীবজন্তু সমূহ এতো মারা যাচ্ছে, তবু মানুষ মৃত্যুর বিষয়ে ভাবে না। তার ধারণা, তার কখনো মরণ হবে না। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি থাকতে পারে ?

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় চৈতন্যের গয়া প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নবদ্বীপে ফিরিয়াও তাঁহার প্রেমোন্মত্তার উপশম হইল না। তাঁহার পূর্বের সে রঙ্গ পরিহাস, বিদ্যার দম্ভ—এই সমস্তই তিরোহিত হইল, পরিপূর্ণ সংসার-বৈরাগ্য তাঁহাকে আশ্রয় করিল। ফলে টোল বন্ধ হইল। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাঁহাকে বৃথাই উপদেশ দেন—"ভালোমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও"।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/চৈতন্য যুগ/দ্বিতীয় খণ্ড/পৃঃ ১৯৮)।

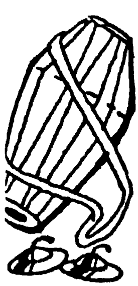
ডঃ বন্দোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, 'একদা চৈতন্যের দেহে বায়ু রোগ প্রকাশ পাইল, তিনি প্রায় উন্মত্তের মতো আচরণ করিতে লাগিলেন, কখনো বা আবেশের বশে বলিতে লাগিলেন, "মুই সেই, মোরে ত না চিনে কোনজন।" তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। বৈষ্ণব তাহাকে উপদেশ দিলেন "ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ"।' (ঐ পৃষ্ঠাঃ ১৯৭)।



এবং এ প্রাসঙ্গিকী সর্বশেষ শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় লিখছেন, 'নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবভক্তগণ, যাঁহারা এতদিন "পাষণ্ডী"-দের ভয়ে ততটা প্রকট হয় নাই এইবার তাঁহারা সকলে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হইয়া নামকীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন। অবৈষ্ণবগণের বাধাও প্রবলতর হইতে লাগিল। খুব সম্ভব শাক্ত ও

নৈয়ায়িগণ কাজীর নিকট নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কাজী কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিল। যদি কেহ কীর্তন করে তাহা হইলে "সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তারে জাতি যে লইমু"।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/দ্বিতীয় খণ্ড/চৈতন্য যুগ/পৃঃ ১৯৯)।

তাহলে সমগ্র ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো ? চৈতন্য গয়া থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এক অমোঘ অন্তর্বিরোধ নিয়ে। যে বিরোধের বীজটি চৈতন্যের মনের মাটিতে রোপন হয়েছিল লক্ষ্মীপ্রিয়ার আকস্মিক অন্তর্ধানে। অতঃপর এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার, তা হলো, এই মহান ভারতভূমির প্রকৃতি এমনই মহত্তর, উত্তুঙ্গ হিমালয়, সমুদ্র-সঙ্গম, চিরহরিৎ নিবিড় বনাঞ্চল ও পুণ্যতোয়া গঙ্গা যমুনাদি বিধৌত মাটির এমনই মহিমা যে, এই ভূখণ্ডের মানুষ অদ্যাবধি লালিত হয় এক নিখাদ ধর্মীয় আবহাওয়ার ভেতর। আসলে ভারতবর্ষের তপোবন সাদৃশ্য মহাপ্রকৃতিই তার মানুষজন্মকে জন্মাবধি ধর্মচেতা করে দিয়েছে। এক সমুদ্র তটবর্তী 'সাগর সন্তান' তার ভাবময় দুঃখ অথবা অভিপ্রেত সুখ যেমনটি সমুদ্রের নিকট আহরণ করে, তদ্রূপ, আমাদের এই ঘর-সংসার হেতু অন্তর্বিরোধ এসে সে বিরোধের সার্বিক মীমাংসার জন্য আমরা সর্বাগ্রে ও সর্বতোভাবে পথকে বেছে নিই। পথ এখানে প্রকৃতি। আর আসমুদ্র হিমাচলের রম্যাণী প্রকৃতিই তো ঈশ্বরের প্রতিভু। কিন্তু আমাদের সংসার বিমুখী মনই শুধুমাত্র সংসার ত্যাগের কারণ হতে পারে না। যদিও অন্তর্বিরোধী মানসিকতা এর একমাত্র কারণ। কিন্তু কারণ এক কার্য আরেক জিনিষ। এক গৃহীর গৃহজনিত পিছটান পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষ টানের মতো অলঙ্ঘনীয়। তবু মানুষ তাকে লঙ্ঘন করে। পথকে ঘর করে নেয় বহমান অন্তর্দ্বন্দ্বের আবহমান মুক্তির সন্ধানে। কিন্তু সে বড়োই কঠিন কাজ। ধরা যাক এক গর্জমান বহতা নদী। এক মানুষ পারাপারের মন নিয়ে তার পাড়ে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত মনই কি তার পারাপারের একমাত্র উপায় হবে ? তা তো না। মন পারাপারের উপায় চাইবে , খুঁজবে, অন্বেষণ করবে , এই মাত্র। এবং সে অন্বেষী মন তাকে কোন পারঘাটায় হয়তো নিশ্চিত পৌছে দেবে একদিন। বস্তুত এই মন আমাদের পারঘাটা অবধি পৌছে দেয়। সেখানে নাও নিয়ে এক 'নাইয়্যা' থাকে, সেই মাধ্যম হয়ে অলঙ্ঘনীয় বহতা নদীর ওপারে পৌছে দেয় আমাদের।



লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর আকস্মিকতা গৃহী চৈতন্যের মনে গৃহ বিমুখতার বীজ বপন করেছিল। ঘর এবং পথের অন্তর্বিরোধী মন চৈতন্যকে টেনে আনলো সেই নদীর সামনে, ঘর ও পথের মধ্যিখানে যে নিয়ত বহমান। অতঃপর সংসার নিস্পৃহ মন প্রত্যাশিত হলো এক কাঙ্ক্ষিত পারঘাটার। যেখানে সেতুবন্ধের মতো এক দাঁড়ি দাঁড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে পারাপারের উপায় হয়ে, মুসকিল-আসান হয়ে। তো ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ আদি ব্যক্তিদের চৈতন্যের গৃহী ও গৃহত্যাগীর

মধ্যবর্তী সেই অলঙ্ঘনীয় বহতা নদীর সুদক্ষ দাঁড়ি হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি। যার অমোঘ নিয়তি চৈতন্যকে গৌড় বাঙলা থেকে টেনে আনলো সুদূর উৎকল রাজ্যে। গজপতি প্রতাপ রুদ্রের বিশ্বস্ত আশ্রয়-স্থলে। কিন্তু সে কাহিনী আরও দূরে অপেক্ষমান। তারও আগে আমাদের দেখতে হবে এক সংসার নিস্পৃহ ঘর-সংসার বিমুখ মানুষ কিভাবে অলঙ্ঘনীয় সংসারের পিছুটান ছাড়িয়ে মহা সংসারের অসীম পথে এসে নামলেন।

মানসিক অন্তর্বিরোধ হতে মুক্তি পেতে ধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন চৈতন্য। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মনোরম ছত্রছায়ায় ভাবপ্রবণ-ভাবালু ভারতবাসীর যা একমাত্র নিয়তি।

ঠিক এই মাত্র সময়, এ ধর্মানুগত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক ব্যঞ্জনাময় দিক নির্দেশীর স্বয়ম্ভর বাহকরূপে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীরা উপনীত হলেন চৈতন্যের গন্তব্যাভিসারী পথের দারপ্রান্তে। তৃষ্ণার্তের সামনে জলভর্তি কলস কাঁখে কোন অচেনা অজানা অনামা এলেও সে যেমনটি তৃষিতের অজানার গণ্ডি লহমায় অতিক্রম করে, জানা হয়ে যায়, তদ্রুপ, অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবিয়াদের দেয় 'ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ' তৃষিতের তৃষ্ণার অঞ্জলিভরা জল হয়ে উদয় হলো সংসার স্পৃহা-অন্তগামী চৈতন্যের কাছে। সংসার ও সংসারত্যাগের দোটানার সমান্তরেখার চিহ্নিতকরণ সূচিত হলো এই ভাবে।

ঐতিহাসিক ডঃ বন্দোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ যাঁহারা এতদিন "পাষণ্ডী" দের ভয়ে ততটা প্রকট হয় নাই এইবার তাঁহারা সকলে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হইয়া নামকীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন।' (বাঃ সা ঃ ইঃ/পৃঃ ১৯৯)।

ডঃ বন্দোপাধ্যায়ের এই উক্তি থেকে খুব সহজভাবে যে কথা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, তা হলো, চৈতন্যের বৈষ্ণব দলে প্রবেশের আগে অদ্বৈত, নিত্যানন্দাদি পরিচালিত একটি বৈষ্ণবদল ছিল। কিন্তু 'পাষণ্ডী' অর্থাৎ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও শাক্তদের ভয়ে লোক সমক্ষে তাঁরা প্রকট হতে পারেন নি। কোন অনামা ক্ষীণকায়া নদীর মতো তাদের প্রবাহ ছিল লোক চক্ষু থেকে অনেক দূরে। তার অর্থ এই না যে, নিমাই পণ্ডিতের বৈষ্ণব শিবিরে প্রবেশের আগে অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতির কোন নামডাক ছিল না। অদ্বৈত আচার্য ছিলেন তৎকালের প্রতিথযশা পণ্ডিত। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, চন্দ্রশেখর আচার্য এমন কি চৈতন্যের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু মুরারি গুপ্ত সকলেরই নবদ্বীপ শান্তিপুর অঞ্চলে পাণ্ডিত্যে অল্পবিস্তর সুখ্যাতি ছিল। তবু অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতি সৃষ্ট বৈষ্ণবদল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল কেন? এবং একমাত্র নিমায়ের বৈষ্ণব শিবিরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের পাষণ্ডীদের ভয়কে অতিক্রম করে নামকীর্তনে মেতে ওঠা সম্ভবপর হয়ে উঠলো কিভাবে? একটি মানুষের আগমন কোন একটি ক্ষুদ্র সংস্থার



লোকবল বৃদ্ধি সূচিত করে না। অথচ দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের বৈষ্ণব শিবিরে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবদের মধ্যে নব উন্মাদনার উন্মেষ ঘটলো। অতঃপর সহজিয়া তান্ত্রিক ও শাক্তদের এযাবৎ অলঙ্ঘনীয় বাধাকে হেলায় অতিক্রম করে লোক সমক্ষে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বৈষ্ণব দলকে 'ফোর-ফ্রন্টে' আনার পিছনে চৈতন্যের যতোখানি আবদান চৈতন্যকে 'ফোর-ফ্রন্টে' আনার নেপথ্যে অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবদের ততোখানি অবদান ছিল না। চৈতন্য বৈষ্ণব শিবিরে এসেছিলেন নিজেই এক প্রাতিষ্ঠানিকতার রূপ নিয়ে। ইতিহাসের কিছু কিছু ক্ষুদ্র রাজ কর্মচারীকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিকতার জোরে রাজসিংহাসনে আসীন হতে দেখা যায়, তদ্রুপ ভাবে, চৈতন্য তাঁর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের গুনগত ও ব্রাত্য দিকটি অবিস্মরণীয় ভাবে তুলে ধরেছিলেন সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের 'আচণ্ডাল প্রেম'-এর স্বীকৃতি দিয়ে। এটা চৈতন্যের আগে কেউ ভাবেন নি। পিতৃ মাতৃহীন অবহেলিত স্নেহ-কাঙাল শিশুকে কেউ ভালোবেসে বুকে টেনে নিলে সেই শিশু যেমনটি তার আপনার চেয়েও আপনজনকে খুঁজে পায়, যুগ যুগান্ত ব্যাপি অবহেলিত লাঞ্ছিত উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর মানুষরা চৈতন্যের আজানুলম্বিত বাহুডোরে তেমনই ভাবে ধরা দিলো এক নিগূঢ় ভাবময়তায়, জীবন তৃষ্ণায় উদ্বেল হয়ে। জগাই মাধাই তৎকালীন নদীয়া নবদ্বীপের খুনী মদ্যপ, লাম্পট্য যাদের একমাত্র কর্ম তারাও আশ্রয় পেল চৈতন্যের আচণ্ডাল নীতিতে। যবন হরিদাস তিনিও।

ক্রমে ক্ষীণকায় নদীর বর্ষাকালীন দু'কুল ছাপানো বহতার মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈষ্ণবদল একটি বৃহৎ জন গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হলো। তখনো, শাক্তচারী ও তান্ত্রিকদের অপেক্ষা আয়তনে ও শক্তিতে বৈষ্ণবদল কমজোরী ছিল সন্দেহ নেই। তার ওপর ছিল নৈয়ায়িদের বিরোধিতা। কিন্তু এই ত্রি-শক্তির সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামার মতো ক্ষমতা ততোদিনে বৈষ্ণবরা অর্জন করে নিয়েছিল। এবং তার অবিসংবাদিত পরিণতি ব্যাপ্ত হতে দেখা গেল রাজ শক্তিধর চাঁদ কাজীর ভবন আক্রমণের মধ্য দিয়ে।



আমাদের একথা বিস্মরণ হলে চলবে না, চৈতন্য শুধুমাত্র বৈষ্ণব শিবিরের অবিসংবাদিত নেতারূপে আবির্ভূত হন নি। তাঁর মহান আবির্ভাব ঘটেছিল একটি যুগের, একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের, একটি ধর্মান্ধ জাতির জননেতা রূপে। তার হাতে ছিল সেই শাশ্বত আলোক বর্তিকা, যে আলোর দিশারী হয়ে পথহারা যাযাবর পাখিদের মতো মানুষও পথ খুঁজে পায় তার সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের। সেই গন্তব্যস্থলের, কবির ভাষায় 'যে সমুদ্র 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।' আজকের এই অত্যাধুনিক আলট্রামডার্ন যুগের বিংশ শতাব্দীর আশির দশকেও যে জাতপাতের জাত্যাভিমান আমাদের ঘাড়ে প্রায় জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে, আজ থেকে চার শতাধিক বছর আগে, এক জাতপাতজনিত ডামাডোলের যুগে, সেই জাতপাতের কঠিন

পাথরটা মানুষের, গোঁয়ার মানুষের মন থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন চৈতন্য। সেই তাঁর হৃদয়হীন সমাজের চলতি ব্যবস্থ—বন্দোবস্তাদি ভেঙে এক নতুন জীবন সংসার আবিষ্কারের দুর্মর ভুবনে পদযাত্রা শুরু। সুতরাং চৈতন্যের চেয়ে বড়ো, মহান মহৎ ধর্মপ্রচারক ভারতবর্ষে এর পূর্বে পরে আর কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? জলের ধর্ম যদি নিম্নাঞ্চলে গড়িয়ে যাওয়া হয়, আগুনের ধর্ম যদি সার্বিক দহন করা হয়, তবে মানুষের ধর্ম তো সর্বাগ্রে মানুষের মঙ্গল করা, মানুষকে দূষণমুক্ত করা। মহানুভব চৈতন্য তাই-ই করেছিলেন। চৈতন্যের চৈতন্য হওয়ার সত্য সেখানে।

পৃথিবীর ইতিবৃত্তে এমন অনেক রূপকার আছেন যাঁরা কক্ষচ্যুত উল্কার মতো চ্যুতকক্ষ হয়ে ভিন মাটিতে এসেছেন আকস্মিক ভাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাটের কথা ধরা যাক। তিনি ছিলেন মণিমুক্তা খচিত সিংহাসনের সম্রাট। হঠাৎই তাঁর জীবনে ঘনিয়ে এলো দুর্বিসহ নির্বাসন। আর এই নির্জন নির্বাসনের দিনগুলিতে সম্রাটের মধ্য থেকে উৎসারিত হলো আরেক অবিসংবাদিত মহান সম্রাট, যাঁর নাম শের-ই-'জাফর'। অর্থাৎ সম্রাটের মধ্যেই ছিল, নির্বাসন এসে তার প্রকাশ ঘটালো মাত্র। চণ্ডাশোক মহান অশোকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন এমনই আকস্মিক ভাবে। বাঁশিঅলা ভিখিরী গোল্ডস্মিথ বাঁশি বাজিয়ে ইউরোপের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতেন, তখন কে জানতো এই 'স্ট্রীট-বেগারের মধ্যে সুপ্ত আছে বিশ্বজয়ী কবির প্রতিভা।

চৈতন্যের মধ্যে অন্তর সলিলা ফল্গুর মতো সুপ্ত ছিল এমনই এক জন-নেতৃত্ব প্রতিভা। শৈশব কৈশোরে বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে দল পাকিয়ে গঙ্গা স্নানের মধ্য দিয়ে তা আমরা দেখেছি। তারও পর তরুণ বয়সে পড়ুয়া ছাত্ররা হয়ে উঠেছিল চৈতন্যের একান্ততম বন্ধু। পাড়া প্রতিবেশীদের দুর্বার আকর্ষণীয় ছিলেন সোনার বরণ নিমাই। আর সেই বিস্ময়োদ্দীপ্ত জন্ম নেতৃত্বের জোরেই ৫২ বছরের বয়োঃজ্যেষ্ঠ পিতৃপ্রতিম অদ্বৈত আচার্যের পুজো পেয়েছিলেন তিনি। পুজো পেয়েছিলেন বয়োঃজ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দের, আচার্য চন্দ্রশেখর, শ্রীবাসাদির। এ'পুজো ব্যক্তিপুজো ছিল না, ছিল অভিসিক্ত নেতার প্রতি অনিবার্য আনুগত্যের বাহিঃপ্রকাশ। জননী শচীমাতা ও মাতৃসমা মালিনীদেবী, সীতাদেবী এমন কি বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াও সেদিন চৈতন্যের অবিসংবাদিত নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে পারেন নি।



ক্রমে সমাজ ও সামাজিক ঐকীকরণের নেতা, সনাতন ঐতিহ্যবাদী চিন্তার নায়ক ও জীবনচেতনার উজ্জ্বলতম নিয়ামক মহামানব চৈতন্যের কাছে গৃহী ও গৃহত্যাগীর টানাপোড়েন জীবনের অবসান ঘটলো কাজীর ভবন আক্রমণের মধ্য দিয়ে। রাজ শক্তির চরম বিরোধিতার পর আর গৃহী হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না চৈতন্যের। আবার এ আক্রমণাত্মক পরিচালনার পর নির্বিবাদী সন্ন্যাসী হয়ে থাকাও

চৈতন্যের পক্ষে সমীচীন ছিল না। তবু তিনি সন্ন্যাস নিলেন। গৈরিক বসন ধারণ করে বেরিয়ে পড়লেন আর্যাবর্ত ভারতের পথে। প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। কিন্তু কেন ?

[বারো]
[চৈতন্যের গৃহত্যাগ]

১৪৩১ শকাব্দ ২৬ শে মাঘ। বুধবার।
১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ।
হাড় কাঁপানো শীতের রাত্রি।
সমগ্র নবদ্বীপ নগরী তখন অঘোর নিদ্রায় মগ্ন।
ঘুম নেই শুধু দুটি মানুষের চোখে।
দু'জনেই বেদনার্ত। অশ্রুভারাক্রান্ত।

একজনের দু'চোখের বর্ষার নদীর মতো দু'কুল ছাপানো টলটলায়মান অশ্রু, আর বুক কাঁপানো বোশেখের হাওয়ার মতো উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস যেন মনিহারা ফণীর করুন বিলাপ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে বাঙলার আকাশে বাতাসে।

পুত্রহারা মায়ের সে বিরামহীন হাহাকারে আকাশের চাঁদও বুঝি আজ শোকে দুঃখে মুখ ঢেকেছে মেঘের আড়ালে।

কে কাঁদে—

'বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও।
ছানা চিনি দিব তোরে, প্রাণ ভরে খেও।।'

[প্রচলিত]

কে কাঁদে—

' বাছা রে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই।।
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ।।'

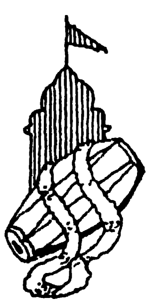
[চৈ. চরিতামৃত/মধ্য/দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

কে কাঁদে—

'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।।
০ ০ ০ ০ ০

কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।।'

পদকল্পতরু/১৬২২ অংশ



কে কাঁদে–

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার ।
"আই কেনে রহিয়াছে ‍~াহির দুয়ার ।।'
জড় প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর ।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর ।।'

[চৈ ভাগবত /২।২৬।১১৬ ১৭]

১৪৩১ শকাব্দের ২৭শে মাঘ ।

বৃহস্পতিবার । সকালবেলা ।

শীতের কুহেলিকা ছিন্ন করে এখনো সূর্য ওঠেনি আকাশে ।

এমন এক ব্রহ্ম মুহূর্তে শ্রীবাস আশ্চার্য এসে দাঁড়িয়েছেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়ির দরজায় । সঙ্গে অন্যান্য বৈষ্ণব মহান্তগণ ।•

শ্রীবাস পণ্ডিত মৃদু স্বরে ডেকে উঠলেন, নিমাক্রি নি-মা-ক্রি–

কোন প্রত্যুত্তর এলো না ।

নিজের অজান্তেই কেমন যেন চিন্তায় পড়ে গেলেন শ্রীবাস । খোলা দরজা দিয়ে দু'পা এগিয়ে গেলেন । পায়ে পায়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন । পিছনে মহান্তগণ ।

শ্রীবাস এবার উচ্চস্বরে ডেকে উঠলেন, নিমাক্রি–নিমাক্রি–

নিরুত্তর ।

শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, নাই–নাই–নাই–

হঠাৎ চৈতন্যের শয়ন কক্ষটির দিকে শ্রীবাসাচার্যের নজর পড়লো ।

চমকে উঠলেন বৈষ্ণব পণ্ডিত ।

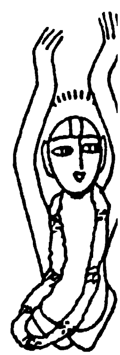
খোলা দরজার সামনে মৃতপ্রায় অবস্থায় বসে আছেন মা শচীদেবী । এলায়িত চুল । অবগুণ্ঠন খসে পড়েছে মস্তক থেকে । দু'চোখে গড়িয়ে পড়ছে অবিরত অশ্রুধারা ।

শ্রীবাস পায়ে পায়ে দাঁড়ালেন মা শচীদেবীর সামনে । অস্ফুটে ডাকলেন, জননী । আর্দ্র-স্বরে শুধালেন, 'তুমি কাঁদছো কেন মা-জননী ?'

নিরুত্তর ।

পাষাণ প্রতিমার দুটি চোখে শুধু নিরবিচ্ছিন্ন শ্রাবনের ধারা ঝরে চলেছে ।

শ্রীবাস অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শুধালেন,



• রাধাগোবিন্দ নাথ মশাই তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' (মধ্যখণ্ড/দ্বিতীয়ার্ধ/সম্পাদিত) পুস্তকে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর উদ্‌ধৃতি সহ দেখিয়েছেন যে, কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে না পাওয়া গেলেও কোন কোন মুদ্রিত গ্রন্থে এসব বৈষ্ণব মহাজনদের নামোল্লেখ আছে । যথা, 'প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁন্দে মুকুন্দমুরারি, শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস ।/শ্রীবাসের গণ যত, তারা কান্দে অবিরত, শ্রীআচার্য কান্দে হরিদাস ।।' (দ্রঃ কিন্তু বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়িতে অনুসন্ধান করে এরকম পয়ার লিখিত কোন 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের' হস্তলিখিত পুঁথি বা মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইনি । লেখক) ।

"আই কেনে রহিয়াছ বাহির দুয়ারে ।।"
জড় প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তরে ।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর ।।'

মা জননী, তুমি দরজার সামনে অমন জড়প্রায় হয়ে বসে আছো কেন ? তোমার দু'চোখে জলের ধারা । কণ্ঠ নিরুত্তর । বলো মা, কি হয়েছে তোমার ?

তারও পর খানিক নিঃসাড়, অনড় হয়ে বসে রইলেন নিমাই জননী । কোন সদুত্তর এলো না । এদিকে শ্রীবাস আদি মহান্তগণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন । সকলেই উদ্বেলিত, অনুসন্ধিৎসু নিমাক্রির খোঁজে ।

সবকিছু কেমন নিঃস্তব্ধ । প্রাণহীন ।

খাঁ-খাঁ শূন্যতা বিরাজ করছে চতুর্দ্দিকে ।

পাখিরাও বুঝি আজ কাকলি ভুলে গিয়ে নিঝুম হয়ে আছে ।

নিঃঝুম হয়ে আছে আম জাম পনসের পাতাগুলি ।

মাঘ মাসের সকাল । উঠোনে লতানো সবুজ দূর্বা ঘাসগুলির দিকে এক পলক তাকিয়েই নিজের অজান্তেই সহসা কেমন চমকে উঠলেন শ্রীবাসাচার্য । একি হলো ! আজ একি হলো ! ঘাসের ডগায় মুক্তাবৎ শিশির বিন্দুগুলি আজ অশ্রুকণা বলে মনে হলো কেন ? এ কার বিগলিত অশ্রুধারা ?

শ্রীবাস ভারাক্রান্ত স্বরে ডেকে উঠলেন, মা, মাগো—

শচীদেবী দেয়ালে হাত রেখে উঠে দাঁড়ালেন ধীরে ধীরে । শ্রীবাস ও অন্যান্য মহান্তদের দিকে তাকালেন এক পলক । তারপর ঘর-সংসারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অর্ধস্ফূট স্বরে বললেন, 'বাবারা তোমরা শোনো, এ ঘর-সংসার, এ পোড়া ভদ্রাসন, এ সংসারের যাবতীয় কিছু তোমাদের দিয়ে গেলাম । তোমরা বিষ্ণুভক্ত । এ ঘর-সংসারও ভগবান বিষ্ণুর । এসব নিয়ে তোমরা যা ভালো বোঝো কোরো । আমি আর এসবের মধ্যে নেই ।'

শচীদেবী ধীরে ধীরে উঠোন পেরিয়ে সদরের দিকে পা বাড়ালেন ।

সহসা বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন শ্রীবাস ।

ধুলোয় লুটিয়ে পড়লেন শচীমাতার গন্তব্য পথে ।

'আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত ।
গড়াগড়ি যায় কেহো করে আত্মঘাত ।।
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন ।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন ।।
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে ।
সে-ই আসি ডুবে মহা বিরহ-সাগরে ।।
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া ।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া ।।"

[চৈ. ভাগবত/২।২৬।১২৬-১২৯]



অতঃপর এই "সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া" পয়ারাংটির সূত্র ধরে আমরা দু'কদম অগ্রসর হবার চেষ্টা করবো। প্রশ্ন হলো, প্রভু সন্ন্যাস করতে চলে গেছেন অর্থাৎ গৃহত্যাগী হয়েছেন একথা ভক্ত মহান্তগণ কেমন করে টের পেলেন? শচীদেবী একটা নিরানন্দ, বেদনার আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন সত্য, কিন্তু নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে গ্রহত্যাগ করেছে এ কথা তিনি কদাপি মহান্তদের বলেন নি। তবে কি চৈতন্যের পার্ষদ তথা বৈষ্ণব ভক্তরা জানতেন নিমাই অচিরাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করবেন? এ কথা কি স্বয়ং নিমাই ভক্তদের পূর্বাহ্নে বলেছিলেন?

এমন একটি বেদনা-করুণ ঘটনার সদুত্তর খুঁজতে আমরা আরো একটু পিছনে ফিরে যাবো। ফিরে যাবো আরেকটি শোকার্ত বেদনার্ত দিনে। সেটি কোন দিন? না যেদিন শ্রীবাসাচার্যের প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যু ঘটলো। মৃত্যু হয়েছিল 'চারিদণ্ড রজনী যখন'। অর্থাৎ আড়াই প্রহরেরও আগে, প্রায় দু'প্রহরের সময়। মৃত পুত্রকে কোলে তুলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবী।

তখন শ্রীবাস অঙ্গনের আরেকটি নিভৃত কক্ষ প্রেমানন্দে সরগরম। শ্রীখোল, করতাল, পাখোয়াজ আর খঞ্জনির তালে তালে বৈষ্ণব মহান্তগণ দু'হাত তুলে নৃত্য করছেন। মধ্যিখানে মধ্যমণি হয়ে নাচছেন। শচীনন্দন গৌরাঙ্গ। সকলে কৃষ্ণ প্রেমে বহ্যহারা। সন্তান হারা মালিনীদেবীর বুকফাটা হাহাকার খোল করতালের আওয়াজ ডিঙিয়ে পৌঁছালো না কৃষ্ণানুরাগীদের কর্ণকুহরে।

শুধু সন্তানহীন পিতার খাঁ-খাঁ বুকে নিরঞ্জনের বাজনা বেজে উঠলো নিজেরই অজান্তে। পিতামাতার মন! ঈশ্বরের দিব্যচক্ষুর মতো সুদূর থেকে এঁরা সন্তানের ভালোমন্দ ঠাওর পান। শ্রীবাস বেরিয়ে এলেন পায়ে পায়ে। বদ্ধ দরজার আগল খুললেন নিঃশব্দে, যাতে কৃষ্ণপ্রেমীদের না ব্যাঘাত হয়।

মালিনীদেবী কাঁদছেন। কাঁদছেন অন্যান্য আপ্তবর্গ কুলনারীরা।

শ্রীবাস ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন প্রাণপ্রিয় পুত্রের সামনে। মাথায় আলতো করে হাত রাখলেন। শীতল। নিথর নিঃস্তব্ধ। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো আচার্যের দু'চোখ বেয়ে। ঘাড় নাড়লেন নিজেই নিজের মনে। অস্ফুটে বললেন, তোমরা কেঁদো না। আর যদি কাঁদতেই হয় কিঞ্চিৎ পরে কেঁদো। এ কক্ষে গোরাচাঁদ কাঁদছে। সে কান্নাও বড়ো দুঃখের। হারানোর বেদনা দিয়ে পাওয়ার আর্তিতে তোমরা ব্যাঘাত কোরো না।

পরিশেষে খবর পৌঁছালো চৈতন্যের কাছে। শুনে চমকে উঠলেন নিমাই।



> 'সম্ভ্রমে বোলয়ে প্রভু "কহ কতক্ষণ?"
> শুনিলেন "চারিদণ্ড রজনী যখন।"

সবিস্ময়ে নিমাই আকাশের দিকে তাকালেন। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে

আসন্ন ঊষার আলো প্রতীয়মান হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। পরক্ষণে জিজ্ঞাসার চোখে তাকালেন আগন্তুক ভক্তটির দিকে। শুধালেন, এতোক্ষণ গত হয়েছে। কিন্তু আমরা জানতে পারিনি কেন ?

তখন সেই বার্তাবাহ ভক্তটি বললেন,

'তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীবাস।
কাহারে ইহা নাহি করেন প্রকাশ।।
পরোলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।'

শুনে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন চৈতন্য। পুত্র কন্যা হারা পিতার মতো কেঁদে উঠলেন হায় হায় করে। অমনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হায়! এই যদি আমার ভক্তের মন হয়, তাহলে এ কঠিন বন্ধন আমি ছিন্ন করবো কেমন করে।

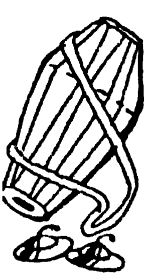
প্রভু বোলে, "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে ?"
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে।।

[চৈ. ভাগবত/২।২৫।৫১]

যে পুত্রহারা জন্মদাতা পিতা আমার নাম-কীর্তনে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় আপন পুত্রশোক বুকে চেপে রাখে, হায়! এমন প্রীতিময় আনুগত্যশীল ভক্তদের আমি ত্যাগ করবো কেমন করে ?

বস্তুত এই 'হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে ?' কথাটাই চৈতন্যের সন্ন্যাস বা যাতিধর্ম গ্রহণের প্রথম ইঙ্গিত। হ্যাঁ, এটি অবশ্যই ইঙ্গিত মাত্র। কেননা, চৈতন্য তখনো ভক্তবৃন্দের কাছে, পার্ষদবৃন্দের কাছে স্পষ্ট করে বলেন নি যে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে অচিরাৎ গৃহত্যাগ করবেন। অর্থাৎ চৈতন্য যদি সন্ন্যাসী না হতেন, কিন্তু 'হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে' কথাটি যদি সন্ন্যাস গ্রহণের ইঙ্গিতবাহীও হতো, তবুও, এই 'হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে' কথাটি দিয়ে কোনদিনই প্রমাণ হতো না যে 'হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে' অর্থে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন।

সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, শচীমাতা ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যাবেন এমন একটা অভিপ্রায় শোনার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য ভক্তরা ধরে নিলেন কেমন করে যে "সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া" ? তবে কি শ্রীবাস বা ওই দিন (নিমাই যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন ওই দিন সকালে উপস্থিত) ভক্তরা জানতেন যে নিমাই অচিরাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্তে গৃহত্যাগ করবেন ? এমন একটি অভিপ্রায় নিমাই কি তাহলে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর ভক্ত ও পার্ষদ মণ্ডলীর কাছে ? হ্যাঁ, নিমাই ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর এ আশংকার কথা। খুবই সুস্পষ্ট করেই বলেছিলেন। কিন্তু সে বিদায়ী সুরে করুণ রাগিণী ছিল না। ছিল স্বতঃস্ফূর্ত অভিমান, কিছু বা নৈরাশ্যও।



তো কোনদিন নিমাই তাঁর এই অবশ্যম্ভাবী পথ পরিবর্তনের কথাটি ব্যক্ত করলেন ? কার কাছে, কখন ? না যেদিন তারই টোলের ছাত্ররা, শিষ্যরা দলবদ্ধ হলো তাদেরই গুরু নিমাক্রি পণ্ডিতের

বিরুদ্ধে। নিমাই এক ঔদ্ধত বিপ্র ছাত্রকে শায়েস্তা করার জন্য 'ঠেঙ্গা' নিয়ে তেড়ে গেছলেন। ছাত্রটির ভাগ্য ভালো নিমাই তার নাগাল পান নি। এই পর্যন্ত। এই মাত্র কারণে তেতে উঠেছিল ছাত্রের দল। জোট বেঁধেছিল গুরু নিমাক্রি পণ্ডিতের বিরুদ্ধে। মারের বদলে মারের কথা প্রকাশ করেছিল সদম্ভে (চৈ. ভা.–২।২৫।২০৬)। প্রিয় ছাত্রদের এই রূঢ় বিরুদ্ধাচারণের অপ্রিয় সংবাদ গুরু নিমায়ের কাছে পৌঁছাতে বিলম্ব হলো না (চৈ. ভা.–২।২৫।২০৯)।

দুঃখিত হলেন চৈতন্য। ভাবিত হলেন। একদিকে নৈয়ায়িকদের অযৌক্তিক বিরোধিতা। অন্যদিকে পাষণ্ডীদের উপদ্রব। তার ওপর রাজকর্মচারী চাঁদ কাজীর গৃহ আক্রমণজনিত প্রতিক্রিয়ার-ও ভাবনা থাকা অসম্ভব না। কারণ, ইতোপূর্বে এ ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল। এসবের ওপর যুক্ত হলো ছাত্রদের বিরোধিতা।

এমন একদিন ঃ নিমাইকে ভারাক্রান্ত গলায় বলতে শোনা গেল প্রিয় পার্ষদ নিত্যানন্দের উদ্দেশে,

'দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া।।
যে যে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে।।'

আরও বললেন,

'সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার।।
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে-ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ-দেখোঁ কে মোহরে মারে।।
তোমারে কহিলুঁ-এই আপন হৃদয়।
গার্হিস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়।।'

নিমায়ের দু চোখে আসন্ন বিদায়ের বার্তাবাহী অশ্রু। নিত্যানন্দের চোখেও তখন আসন্ন আষাঢ়ের ঘনঘটা।

দু'জন দু'জনাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এরপর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিমাই এলেন অন্যতম প্রিয় শিষ্য মুকুন্দের বাসায়। মুকুন্দ ভালো গান গাইতেন। নিমাই বললেন, মুকুন্দ কিছু গান শোনাও। মুকুন্দ কৃষ্ণ-মঙ্গলের গান ধরলেন,

'যত্তে সুজাতচরনাম্বুরুহং স্তনেনু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবীটসি তদ্ বাথতে ম কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।।'

আশঙ্কিতা গোপিনীরা বলছেন ঃ

হে প্রিয়, তোমার যে কোমল চরণযুগল
যা আমরা আমাদের কঠিন স্তনের ওপর
ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে ধারণ করি



আহ ! সেই সুকোমল পদ দ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করছো ;
ভয় হয়, সেই পাদপদ্ম কি বনে পড়ে থাকা
উপলখণ্ডাদি দ্বারা ব্যথিত হচ্ছে না ?
ওগো, সেই ভেবে আমরা মরমে মরে যাচ্ছি,
কেন না, তুমিই যে আমাদের জীবনস্বরূপ ।

[শ্রীমদ্ভাগবত–১০।৩১।১৯]

গান শেষ হলো ।

কিন্তু মুকুন্দের সুধাকণ্ঠী সুরের রেশ তখনো নিমায়ের দু'চোখ জুড়ে । অব্যক্ত বেদনায় নিমায়ের ঠোঁট দুটি তখনো থরথর করে কাঁপছে । খানিক পর চোখ মেলে তাকালেন নিমাই । অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

'... ·মুকুন্দ । শুনহ কিছু কথা ।
বাহির হইব আমি, না রহিব এথা ।।
গার্হিস্থ আমি ছাড়িব সুনিশ্চিত ।'

এরপর নিমাই এলেন গদাধর পণ্ডিতের কাছে । নিমায়ের ছায়াসঙ্গী গদধর । গদাধরের কাছেও সেই একই স্বগতোক্তি করলেন নিমাই, 'না রহিব গদাধর ! আমি গৃহবাসে ।'

প্রাজ্ঞ গদাধর পণ্ডিত নিমাত্রিকে অনেক করে বোঝালেন । বেদের উপমা দয়ে বললেন, শিখা সূত্র ফেলে মস্তক মুণ্ডন করে গৃহত্যাগী হলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় এ কথা তেমায় কে বললো । গৃহাশ্রমের মধ্যেও তো কৃষ্ণকে পাওয়া যেতে পারে । তারপর তোমার অনাথিনী মায়ের কথা একবার ভাবো । বিশ্বরূপ গেল, এরপর তুমিও চলে যাবে বলছো, তাহলে সেই অভাগিনীর কি হবে ? তাছাড়া তুমি যা করতে চলেছো তার সমস্তটাই বেদ বিরুদ্ধ কাজ ।

নিমাই নিরুত্তর ।

গদাধর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তা যদি হয়, বিধির নির্বন্ধ আমি জানি না, তবে তো তুমি মাতৃ-বধের ভাগী হবে নিমাই ।

এবং পরিশেষে বললেন,

'তথাপিহ মাথা মুণ্ডাই.লে স্বাস্থ্য পাও ।
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর' চলে যাও ।।'

দেখতে দেখতে কথাটা ঝড়ের গতিতে রাষ্ট্র হয়ে গেছলো শিষ্য, পারিষদদের মধ্যে । নিমাই শিখা সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে ।

কিন্তু কবে চলে যাবেন নিমাই ?

তা তিনি শিষ্যদের এমন কি অতি প্রিয় পার্ষদেরও ঘুণাক্ষরে বলেন নি । অথচ অন্তর সলিলা ফল্গুর মতো ভেতরে ভেতরে, সন্তর্পনে তিনি প্রায় সমস্ত কিছু মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন । কবে ও কখন গৃহত্যাগ করবেন । কোথায় যাবেন, কার কাছে সন্ন্যাসচর্য দীক্ষা নেবেন, প্রায় সব কিছু । কিন্তু এ হেন গোপনীয়তার কারণ কি ছিল ? মাতা

শচীদেবী আগেভাগে টের পেয়ে যাবেন এ আশঙ্কায় কি ? কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তা মনে হবার কারণ নেই । কেননা, লোক পরম্পরা নিমাই জননী শচীদেবী তা আগেই টের পেয়ে গেছলেন । এবং সেটাই খুব স্বাভাবিক ছিল । চৈতন্য ভাগবতের ষড়বিংশ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে । এ কথা শোনার পর থেকে শচীদেবী বারংবার মুর্ছিত হয়ে পড়ছিলেন । মায়ের মন । এস্থলে ক্রন্দনরতা শচীদেবী এক জায়গায় বলছেন,

'না যাইয় না যাইয় বাপ ! আমারে ছাড়িয়া ।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া ।।'

অন্যত্র বলছেন,

'ধর্ম বুঝাইতে বাপ ! তোর অবতার ।
জননী ছাড়িয়া কোন ধর্ম বা বিচার ।।'

পরিশেষে বলছেন

'তুমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা ।
কেহ জগতে তুহি ধর্ম বুঝাইবা ।।'

এ-' শচীদেবীর কথা নয় । একক বা একামাত্র মায়ের কোন কথা নয় । এ-' জগতের যাবৎ মায়ের জাগতিক, চিরন্তন কথা ।

না, নিমাই জননী অন্তর্জাত এ বাৎসল্য প্রীতিজনীন অস্থিরতা থেকে মা শচীদেবীকে কিছুমাত্র আশার বাণী শোনাতে পারেন নি । ফলতঃ এই দুঃখ, অবিচ্ছেদ্য শূন্যতার আকুলতা ও অচ্ছেদ্য অভিমানের তীব্রতা মা শচীদেবীকে পৌঁছে দিয়েছিল নিমায়ের গৈরিক পথের রাঙা ধূলিকণাগুলি আরও করুণ-কঠিন ভাবে অশ্রুসিক্ত করতে । তার যথার্থ

'শুন শুন নিত্যানন্দস্বরূপ গোসাঞি ।
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন ঠাঞি ।।'
'এইমত বিলাপ করয়ে শচীমাতা ।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা ।।
বিবর্ণ হইল শচী—অস্থি-চর্ম-সার ।
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার ।।
প্রভু দেখে জননীর জীবন না রহে ।
নিভৃতে বসিয়া তানে গোপ্য কথা কহে ।।'



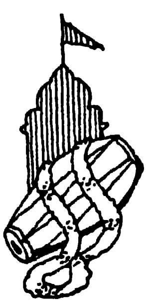
বললেন, মা, তুমি আমার (আমার পক্ষে) নামের জননী—জিহ্বারূপা মাতা (জননী) । অর্থাৎ জিহ্বা নামের যেরূপ জননী, তুমিও আমার সেরূপ জননী । মাতা, তুমি ধরনী আমার, তুমিই আমার পৃথিবী ও পৃথিবীবৎ সর্বংসহা । আমি পৃশ্নিগর্ভ, বামন, (বামনের নাম উপেন্দ্র খর্বাকৃতি ছিলেন বলে 'বামন' বলা হতো । চৈ. ভাগবত ১০।৩।৪২ দ্রষ্টব্য) রূপে তোমারই দ্বারে বারংবার এসেছি । ত্রেতা যুগে তোমার নাম ছিল কৌশল্যা আমি ছিলাম তোমারই গর্ভজাত পুত্র রাম । তারপর দ্বাপর যুগে, সেখানে তুমি মা দেবকী আমি তোমার পুত্র দেবকীনন্দন কৃষ্ণ । এইরূপে যুগে যুগে বারংবার তোমারই দ্বারে এসেছি মাতা । জন্মে জন্মে তুমিই আমার জননী, পালিতা । তুমিই আমার 'আর্চ্চা

বিগ্রহ' । বললেন, 'এই মতো তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে । তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ।' তোমার আমার মধ্যে মননের দিক থেকে কোনদিন বিচ্ছেদ, ত্যাগ নেই । এবং পরিশেষে নক্ষত্রজীবীদের মতো ভবিতব্যের ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, মা, এই যে সঙ্কীর্তারম্ভ সূচিত হলো, এরই মধ্যে আমার আরও দুটি জন্মান্তর ঘটবে—সেই দুই জন্মেও তুমিই আমার জননী হবে মা । তোমারই দ্বারে আমি ছিলাম । আজও আছি । আগামী কালেও থাকবো জননী । সুতরাং 'তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ।'

পুত্রের মুখে এতাদৃশ 'রহস্য কথন' শুনে শচীদেবীর মাতৃ হৃদয়ে কতোটুকু শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ পড়েছিল বলা দুষ্কর । তবে এরকম একটা বিস্ময়কর ধর্মীয় আবহাওয়া তাঁর মনে রেখাপাত কিছু করেছিল নিশ্চয় । কেননা, এই স্থানে চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে, 'শুনিক্রা শচীর কিছু স্থির হৈল মন ।' কিন্তু স্নেহাতুরা মায়ের ভিজে মাটির মতো নরম মন কোন কিছুর বিনিময়ে প্রানাধিক সন্তানকে চিরস্থায়ী চোখের আড়ালে যেতে দিতে পারেন না । চৈতন্য ভাগবতের এতাদৃশ অর্থ সাময়িক অর্থে প্রযোজ্য করেছেন দাস বৃন্দাবন । চিরকালীন অর্থে না । বস্তুত, কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে চৈতন্য সন্ন্যাসোত্তর শচীদেবীর মর্মন্তুদ বিলাপ তাই প্রমাণ করে । এবং এ হেন বিষাদময় আবহাওয়া থেকে দাস বৃন্দাবনও মুক্ত নন ।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, 'চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অব্যবহিত কারণ কি বলা দুষ্কক ।' (ঐ প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ/পৃ-২৮১) । অন্যত্র বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 'গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসীবেশধারী' (২।৯।১) । চৈতন্যের সন্ন্যাস অথবা সন্ন্যাসবেশ ধারনের পিছনে যে গূঢ় কারণ থাক তিনি (চৈতন্য) যে সন্ন্যাস গ্রহণের সমগ্র ব্যাপারটা এক গাঢ় গোপণীয়তার মধ্যে সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন এ কথা গৃহত্যাগের দিন (অব্যবহিত আগে) চৈতন্য নিত্যানন্দের গোপন কথপোকথনে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সে সময় নিত্যানন্দের বাড়িতে গিয়ে খুব সঙ্গোপনে চৈতন্য নিত্যানন্দকে বলেছিলেন,

এই মাত্র না যে, কোন মা তার পলায়নী প্রবৃত্ত সন্তানের পথ পিচ্ছিল করে প্রিয় সন্তানকে ঘরমুখী, দৃষ্টিমুখী করতে চান । বোধহয় দুঃখের চেয়েও, শূন্যতার চেয়েও, দুঃখ, শূন্য মুখিনতা আরও কঠিন । অর্থাৎ দুঃখ, শূন্যতা, নৈরাশ্য, বিরহ সব কিছুই মানুষের জীবনে আসবে, আবার কোন একটা কোন এক সময় আসি আসি করেও না আসতে পারে, আবার আসতেও পারে । এই যে আসার সংশয় আবার না আসারও সংশয় এই দোদুল্যমান মধ্যবর্তী অবস্থাটি বড়ো কঠিন । বস্তুত, দুঃখজাত ঘটনার চেয়েও ঘটিতব্য দুঃখময় ঘটনাটি আরও অসহনীয়, কঠিন ও দ্বান্দ্বিক ।



সেই ঘটিতব্য দুঃখজাত ঘটনার খাতে বহমান এক মা শচীদেবী

তাই করলেন, আবহমান কালের মায়েরা সন্তানজনিত শঙ্কাও সংশয়ে যা সদা করে থাকেন। দিন ও রাত্রির মতো। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নয়। করতে হবে, বা করার জন্যও করা না। জাগতিক নিয়মে দিনের পরে রাত্রি বা রাত্রির পর দিনের মতো এ এক অমোঘ স্ফূরণ।

সে 'পঞ্চ-জন' কে ? না জননী শচীদেবী, গদাধর পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য এবং মুকুন্দ। এমন কি ওই দিন কোথায়, কখন, কার কাছে, এমন কি কোন তিথিতে * চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তারও একটা বিস্তারিত ফিরিস্তি তিনি নিত্যানন্দ গোঁসাইকে দিয়েছিলেন। তাই নিমাই যে দিন শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করলেন, সেদিন সাত সকালে শ্রীবাসাদি মহান্তগণ নিমাই জননী শচীদেবীর পাণ্ডুর মুখাবয়ব ও অশ্রুভারাক্রান্ত দুটি চোখ দেখেও ঠাওর করতে পারেননি যে নিমাই ইহ জন্মের মতো ঘর-সংসারের মায়া ত্যাগ করে গৈরিক পথে পা বাড়িয়েছেন।

[তেরো]

[চৈতন্য যেদিন গৃহত্যাগী হলেন]

'এত বোল বলি নিমাই যদি তুমি রাখ।
সন্ন্যাসে কাজ নাই ঘরে বসে থাক ।।
সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও ।।'

['পদকল্পতরু']

স্বামীহারা, সন্তানহারা চিরদুঃখিনী মায়ের মর্মন্তুদ বিলাপ নিমায়ের গৃহত্যাগের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারলো না। এ যেন সেই কবির কবিতা, 'প্রিয়া তারে রোধিল না, /রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ, /রোধিল না সমুদ্র পর্বত।'

আর বিষ্ণুপ্রিয়া। তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়া। এই সেদিন যিনি এক বুক স্বপ্ন নিয়ে নিমায়ের হাত ধরে এসেছেন স্বামীগৃহে সংসার পাততে। কতো আশা, কতো আলো, কতো মায়াময় স্বপ্ন ভরা সেই দুটি ঢলঢল চোখে সেদিন কেমন করে চিরস্থায়ী বাদলের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো ?



* এ প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' (৩।২।১০) অংশে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এছাড়া 'চৈতন্য ভাগবত' ২।২৬।৬৩-৬৭-৮৯-৯১-৯৪ এবং ১১০ পয়ারে এর সবিস্তৃত আলোচনা আছে। এই সব পয়ার সমূহের উক্তি থেকে জানা যায়, নিমাই যেদিন গৃহত্যাগ করবেন সেদিন পূর্বাহ্নে খুব গোপণীয়তার সঙ্গে নিত্যানন্দকে তিনি গৃহত্যাগের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট দিন ও তিথিতে সন্ন্যাস গ্রহণের কথাও তিনি নিত্যানন্দের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। দিনটি হলো ২৯শে মাঘ, পূর্ণিমা তিথি, সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবস।

নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করবেন এমন একটা উড়ো খবর বাতাসে ভাসতে ভাসতে নিমাই পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার কানেও পৌঁছে গেছলো। এমন একটা কথা বাঙলা চৈতন্য চরিত লেখকদের মধ্যে একমাত্র লোচন বা লোচনানন্দ দাসই কিছু বিস্তারিত লিখে গেছেন। আর লিখেছেন হিন্দুস্থানী লেখক যজ্ঞদত্ত শর্মা। তবে শর্মাজীর এ প্রাসঙ্গিক রচনা বেশি মনোগ্রাহী এজন্য যে, প্রিয়তম স্বামী হারানোর ব্যাকুলতা শুধু জাগরণেই নয়, স্বপ্নেও তিনি দেখিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে।

'দেখি প্রিয়া স্বপ্ন প্রভুন্যাসী।
ছারি চলে মম বনে উদাসী॥
উঠী ভীত হো প্রিয়া পলঙ্গ সে।
পুছেউ প্রভু ক্যৌ উঠী উছঙ্গ সে॥
প্রাত ভয়ো কহ স্বপ্ন ছিপাঈ।
জানল নী গতি প্রভু বৈসাঈ॥'

তখন চৈতন্য বললেন,

'প্রিয়ে কহহুঁ কছু স্বার্থ কথামেঁ।
নহি কহিহহু নহি যথা নিশামেঁ॥
ভব মিথ্যা হৈ সুত পতি নারী।
মাতৃ পিতা পরিজন দুখকারী॥
তনমে কৃষ্ণ শক্তি রহ জবতক।
বন্ধুবর্গ প্রিয় আপনা তবতক॥'

['শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস/মধ্যখণ্ড/দক্ষিণভাগ/২য় সোপান]

যার অর্থ, পতি নিমায়ের পার্শ্ববর্তিনী ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া স্বপ্ন দেখছেন, স্বামী নিমাই গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেছেন। দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে ঘুম থেকে জেগে উঠে ভীত বিষ্ণুপ্রিয়া পালঙ্কে নিদ্রিত স্বামী নিমাইকে জাগিয়ে তাঁর দুঃস্বপ্নের কথা আদ্যোপান্ত বললেন। উত্তরে নিমাই পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্রিয়ে, তোমাকে কিছু স্বার্থের কথা বলছি, তুমি শোনো, রাত্রে এ কথা বলা যায় না, তবু তোমাকে বলছি, যতোদিন যাবৎ কৃষ্ণ আমার প্রাণের শক্তি হয়ে থাকবেন ততোদিন, মাতা পিতা, পরিজন, বন্ধুবর্গ সকলেই আমার প্রাণের দোসর হয়ে থাকবে। কারুকেই আমি ছেড়ে থাকতে পারবো না।

তবুও নিমাই স্নেহময়ী মায়ের চোখে, প্রিয় পত্নীর চোখে জল ঝরিয়ে সন্তর্পনে গৃহত্যাগ করলেন নিশুত রাতের অন্ধকারে। নিঃসঙ্গ একাকি, প্রায় সর্বহারা হয়ে। পিছনে পড়ে রইলো, জননী, জননী জন্মভূমি, প্রিয় পত্নী ও প্রিয়তম পার্ষদ ও আপ্তবর্গ।

১৪৩১ শক। ২৬শে মাঘ। বুধবার।

এই দিন সকাল থেকে শুরু হয়েছিল সংকীর্তন। সারা সকাল, সারা দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমে এলো ধীরে ধীরে নবদ্বীপের বুকে। সন্ধ্যে নাগাদ কীর্তন সমাপ্ত করে নিমাই চললেন গঙ্গা দর্শনে। সঙ্গে পার্ষদবর্গ ও মহান্ত শিষ্যগণ। কিছুক্ষণ পুণ্যতোয়া গঙ্গার ধারে সপার্ষদ বসে থাকলেন নিমাই। খুব বেশিক্ষণ ছিলেন বলে মনে হয় না। কেননা, এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 'ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে।' এবং এই 'ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে' কথাটি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নিমায়ের বাড়ি থেকে গঙ্গার দূরত্ব খুব অধিক ছিল না। মুরারি গুপ্তের রচনা (কড়চা ৪।১৪।৩-১১)



ও লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' (শেষখণ্ড) থেকে জানা যায়, সেসময় নিমায়ের বাড়ির অদূরে গঙ্গা প্রবাহিত হতো।*

লোচন লিখেছেন, চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর মায়ের অনুরোধে একবার নবদ্বীপে এসেছিলেন। সম্ভবত নৌকোযোগে। এবং বাড়ির সামনে বারকোনা ঘাট (গঙ্গার ঘাটে) এসে নেমেছিলেন।

'মায়ের বচনে পুত্র গেলা নবদ্বীপে।
বারকোনা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপে॥'

['চৈতন্যমঙ্গল'/শেষখণ্ড]

সে যাই হোক, গঙ্গার পাড়ে 'ক্ষণেক' থেকে পুনরায় বাড়ি ফিরে এলেন নিমাই। এদিন আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেল, প্রচুর বৈষ্ণব সমাগম হয়েছিল নিমায়ের বাড়িতে। তারা শোভিত মালা, সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি এনেছিল নিমাঞির জন্য। শোভিত মালা আর সুগন্ধি চন্দনে চন্দনে ঢেকে গেছলো নিমায়ের সর্বদেহ। যদিও নিজের গলার মালাগুলি খুলে খুলে তিনি প্রিয় ভক্ত ও শিষ্যবর্গকে উপহার দিচ্ছিলেন। এদিন আরেকটা জিনিষ লক্ষ্যণীয়, তা হলো, নগরবাসী প্রচুর লোক নিমাইকে দেখবার নিমিত্তে রামচন্দ্রপুরে* নিমাইদের বাড়িতে সমবেত হয়েছিল। নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করবে তারাও কি শুনেছিল ? জানি না। তবে নিমাই যে অচিরাৎ

* ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যিনি মুর্শিদাবাদের রেজা খাঁ-এর কানুনগো ছিলেন ও সেই সঙ্গে ছিলেন নদীয়ার যাবতীয় বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত। এই গঙ্গাগোবিন্দ ১৭৯১ খ্রীঃ-তে (বঙ্গাব্দ ১১৯৯) চৈতন্যের ভিটেবাড়ির ওপর একটি মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু চৈতন্যের বাড়ির এতো কাছাকাছি গঙ্গার প্রবাহ ছিল যে মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে সে মন্দিরটি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২২৯)। এরপর এর ৫০ বছর পর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) গঙ্গায় চড়া পড়ায় মন্দিরটি পুনরায় জেগে ওঠে। এরও তিন বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'Calcutta Reivew' পত্রিকা এ প্রসঙ্গে লিখেছে, 'The people point to the middle of the Stream as the Spot where 'Chaitanya' was born.' (C—Review, 1874, Vol.—VIII, Page—90.)। এছাড়া মেজর রেনেল (Rennel) সুদীর্ঘ ১১ বছর পরিশ্রম করে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ম্যাপ তৈরি করেন রেনেলের সেই বহু আলোচিত 'Rennel—1788 Memoir of a map of Hindusthan' এ দেখানো হয়েছে যে, সেই সময় নদীয়া নগরীর দেড় মাইল পরিসর জলঙ্গীও গঙ্গা নদীর ভয়ঙ্কর স্রোতে ধ্বংস অথবা বিলীন হয়ে গেছলো।

---

* চৈতন্যের বাস্তু ভিটার ওপর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে ৬৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দির নির্মান করেছিলেন যে প্রসঙ্গে ১৮৪৬ সালে 'Calcutta Review' পত্রিকা লিখেছে, 'Ganga Govinda Singh created a temple over 63 Feet high, which was washed away 25 years ago by the river. It was at Ramchandrapur (রামচন্দ্রপুর) and supplied foot to many Fakirs and pilgrims of the vaishnavas.' (Cal-Review, 1846/p-423) এতে বেশ প্রমাণিত হয় যে, নবদ্বীপের যে স্থানে চৈতন্যের বাড়ি ছিল সেই স্থানটির নাম ছিল, রামচন্দ্রপুর।



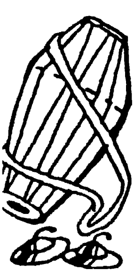
গৃহত্যাগী হবেন একথা যদি নদীয়া নবদ্বীপে রাষ্ট্র হয়ে থাকে তবে সেটা খুব বিচিত্র ভাববার কারণ নেই। কারণ নেই বলছি এ' জন্য যে, নিমাই নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীবাসাদি যে সব পার্ষদদের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তার মধ্যে কোন গোপনীয়তা ছিল না। অর্থাৎ নিমাই তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা অন্য কারুকে বলতে তাঁদের (নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীবাসাদি পার্ষদদের) নিষেধ করেন নি। একমাত্র নিষেধাজ্ঞা ছিল নিত্যানন্দের ওপর, সেটা গৃহত্যাগের সুনির্দিষ্ট দিনটির বিষয়। গৃহত্যাগের দিন অব্যবহিত আগে নিত্যানন্দের কাছে তিনি গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসের সুনির্দিষ্ট সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এবং ইংরাজিতে যাকে বলে 'টপ সিক্রেট' সেই ভাবেই নিত্যানন্দকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন একথা পাঁচ-কান না করতে। একমাত্র পাঁচজন ছাড়া। চন্দ্রশেখর, গদাধর, ব্রাহ্মানন্দ, মুকুন্দ এবং জননী শচীদেবী। এ কথা পূর্বেই বলেছি।

সন্ধ্যে গড়িয়ে ক্রমে রাত্রি নেমে এলো নবদ্বীপ নগরীর বুকে। ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠলো আকাশে। পূর্বেই বলেছি, নিমাইকে দেখবার জন্য এদিন প্রচুর জন সমাগম হয়েছিল নিমাইদের রামচন্দ্রপুরস্থ বাড়িতে। এর মধ্যে ভক্ত, বৈষ্ণব অবৈষ্ণব, সকলেই ছিল। রাত্রি নামতে নগরিয়াগণ ফিরে চললো যে যার ঘরে। কেউ কেউ নৌকো যোগে শান্তিপুরের পথ ধরলো। কিন্তু ভক্তরা তখনো নড়লো না। তারা নিমাইকে ঘিরে রাখলো।

এমন সময় একটি লাউ হাতে হাজির হলেন খোলাবেচা শ্রীধর। নিমায়ের সবচেয়ে গরীব ভক্ত! ফুলের মালা কেনার সাধ্যি তাঁর ছিল না। ফুল দিয়ে মালা গাঁথারও সময় তাঁর নেই। সারাদিনব্যাপি খোলা বেচে কেটে যায়। তাই বাড়ির আজানো গাছের লাউ এনেছে ভক্ত তার প্রিয় নিমাঞির জন্য।

লাউ হাতে ভক্তবৎসল শ্রীধরকে দেখে হাসলেন নিমাই। সেই ভুবন ভোলানো হাসি। কোন বিষাদ নেই, সংশয় নেই, কোন বিহ্বলতা নেই। অথচ আজ রাত্রেই ইহ কালের মতো এই ঘর সংসার, মা, বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রিয় জন্মভূমি সবার, সবকিছুর মায়া পরিত্যাগ করে চলে যাবেন তিনি।

ভুবন ভোলানো হাসি মুখে নিমাই শ্রীবাসকে শুধালেন, এ লাউ 'কোথায় পাইলা?' পরক্ষণে মনে মনে চিন্তা করলেন, আহ্! এই লাউ কি আর আমি ভোজন করবার অবকাশ পাবো। আজ রাত্রেই তো সংসার ছেড়ে চির বিদায় নিচ্ছি আমি। কে খাবে এই লাউ? কিন্তু পরমুহূর্তে কাঙাল ভক্তটির কথা ভেবে মাকে ডাকলেন নিমাই। বললেন, মাগো, আজই এই লাউ রান্না করো, আমি আহার করবো। ঠিক এমন সময় আরেকজন ভক্ত একঘটি দুধ নিয়ে হাজির। নিমাই হেসে বললেন 'বড়ো ভালো ভালো।/দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥'



মাকে দুগ্ধ-লাউ রান্না করতে বললেন নিমাই।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর।

সমস্ত ভক্তদের বিদায় জানিয়ে ভোজনে বসলেন নিমাই।

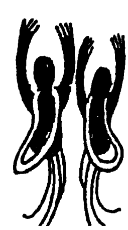
রইলো শুধু দু'জন। গদাধর এবং হরিদাস।

খাওয়া দাওয়া সেরে, মুখশুদ্ধি নিয়ে শয়ন করতে গেলেন নিমাই। এবং নিমায়ের সঙ্গে একই শয়ন কক্ষে হরিদাস ও গদাধরও শয়ন করলেন।

চৈতন্য চরিতকারগণ এ পর্যন্ত প্রায় একই কথা লিখেছেন। একমাত্র সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন অন্যতম চৈতন্য জীবন চরিতকার লোচনানন্দ দাস বা লোচন দাস। লোচন দাসের মতো ওড়িআ লেখক মাধব (পট্টনায়ক) ও

সেই একই কথার পুনরোক্তি করেছেন। মাধব অবশ্য লোচনেরই কথার ওড়িআ অনুবাদ (Translate) করেছেন মাত্র। এবং তাঁর সাহিত্যকীর্তির যা কিছু নিজস্ব, আপনস্ব সবকিছুই প্রায় লোচন দাসকে আশ্রয় (shelter) করে গড়ে উঠেছে। যুগপৎ এই চরিতকারদ্বয়ের লেখনীতে বেশ কিছু বিস্ময়কর (surprising) উক্তির সন্নিবেশ দেখা যায়। চৈতন্য যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন সে রাতের আনুপূর্বিক ঘটনা লোচনের গল্পে খুবই উদ্দীপনকারী (Interesting) বলা যায়। বিস্ময়কর এবং বিভ্রান্তিকরও। অথচ দু' জনাই চৈতন্য তপস্বী (Ascetic)। কিন্তু তবুও কেন চৈতন্য প্রাসঙ্গিক এসব অত্যাশ্চর্য কথার আতিশয্য তাঁদের কাব্যে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে বলা দুষ্কর। লোচনের গুরু ছিলেন নরহরি দাস। 'শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার' (চৈতন্যমঙ্গল/সূত্রখণ্ড /পৃ-৬৪)। নরহরির পদবি কিন্তু দাস নয়। দাস অর্থে বোধকরি চৈতন্যের দাস। দাসানুদাস। যেমন বৃন্দাবন•দাস। অর্থাৎ দাস হলো এখানে আনুগত্যসূচক অর্থ। নরহরির আসল পদবি, সরকার। মুরারি গুপ্তের কড়চার একেবারে শেষ দিকে ৪।১।৫ ও ৪।১৭।১৩ শ্লোকে এবং কবি কর্ণপূরের মহাকাব্যের ১৩।১৪৮ ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৯।১ শ্লোকে নরহরির নাম পাওয়া যায়। নরহরি চৈতন্যের সমসাময়িক। চৈতন্যকে চাক্ষুস দেখেছেন।• এবং শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখর প্রভৃতি চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তাগণের রচনা থেকে জানা যায় চৈতন্যের সঙ্গে নরহরির পরিচয়ও ছিল। যদিও চৈতন্যের অন্যতম বাল্য সহপাঠী ও পার্ষদ মুরারি গুপ্তের কড়চা পাঠ করলে এরকম একটা ধারণা জন্মাবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে নরহরির সাথে চৈতন্যের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। তবে রায় শেখরের রচনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে নিমাই পণ্ডিত চৈতন্য হবার পূর্বেই নরহরি কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। (গৌরপদতরঙ্গিনী/পৃ-৪৫৬/২য় সং)। সুতরাং একজন খ্যাতিবান কবির সাথে নিমাই পণ্ডিতের বা পরবর্তী খ্যাতিবান চৈতন্য সন্ন্যাসীর পরিচয় থাকাটা খুব বিচিত্র ছিল না। এছাড়াও কবি কর্ণপূরের মহাকাব্যে চৈতন্যের সাথে নরহরির সাক্ষাৎ প্রচ্ছন্ন থাকলেও কর্ণপূর তাঁর ১৫৭৬ খ্রীঃ রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামক অন্যতম গ্রন্থে নরহরিকে 'প্রভোঃ প্রিয়ঃ' অর্থাৎ চৈতন্যের প্রিয় বলে বর্ণনা করেছেন (১৭৭ শ্লোক দ্রঃ)।

তো এহেন দাস নরহরির শিষ্য লোচন বা লোচনানন্দ। যদিও লোচনের গুরু নরহরি একজন কবি এবং চৈতন্য বিষয়ক কাব্য রচয়িতা তবুও লোচন মুখ্যত মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' অবলম্বন করে তার 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ লিখেছেন এবং সেজন্য তিনি বারংবার মুরারির কাছে ঋণ স্বীকারও করেছেন তাঁর গ্রন্থে (সূত্রখণ্ড, পৃ-৪/মধ্যখণ্ড, পৃ-৮৬/শেষখণ্ড, পৃ-২১৮ দ্রঃ)। যদিও মুরারিকে লোচন সরাসরি অনুসরণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার লিখেছেন, 'লোচন মুখ্যত মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিলেও অন্যান্য ব্যক্তির মুখে শুনিয়া বা পড়িয়া কোন কোন ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন।



• মুরারি গুপ্তের 'কড়চা'-র ৪।১।৫ ও ৭।১৭।১৩ শ্লোকে এবং কবি কর্ণপূরের মহাকাব্য (১৩।১৪৮) ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের (৯।১) শ্লো' ও 'গৌরপদতরঙ্গিনী' (৪৫৬ অংশ/দ্বিতীয় সং) এবং এছাড়াও ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-য় নরহরি সরকারকে "প্রভোঃ প্রিয়ঃ" বলা হয়েছে (১৭৭ শ্লোক)।

তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের নিকট তিনি কোন কোন ঘটনা শুনিয়াছিলেন (উপাদান/পৃ-২৫০)।

এখন প্রশ্ন হলো, লোচন তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থ লিখলেন কেন ? লোচনদাস নিজেই বলেছেন যে, মুরারি লিখিত সংস্কৃত চৈতন্যচরিত পাঠ করে পাঁচালী-প্রবন্ধাকারে চৈতন্যলীলা লিখবার অদম্য লোভ তাঁর মনে উদয় হয়। এ কথার মধ্যে আতিশয্যের কিছু নেই, কেননা, মুরারি যেভাবে মনোমুগ্ধ লেখনী দিয়ে তাঁর 'কড়চা'য় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা চৈতন্যের লৌকিক, অলৌকিক ও অতিলৌকিক লীলা বর্ণনা করেছেন তাতে লোচনের আকৃষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ থাকে। কেননা, মুরারি সংস্কৃতে অর্থাৎ দেবনাগরী হরফে তাঁর কড়চা লিখেছিলেন। লোচনও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু মুরারির চৈতন্য চবিত পড়েই কি লোচনের মাথায় চৈতন্যলীলা লেখার বাসনা উদয় হয়েছিল ? এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা লোচনই হলো চৈতন্যচরিত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ও বিভ্রান্তিকর চরিতকার। দেখা যাচ্ছে লোচনের রচনায় যত্রতত্র আদি রসের ছড়াছড়ি। অথচ মুরারি এ পথটি সর্বৈব পরিহার করেছেন। প্রশ্ন হলো, যে মুরারির রচনা পড়ে লোচন গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রেরিত হয়েছেন সেই মুরারিকে লঙ্ঘন করে তিনি তাঁর গ্রন্থে চৈতন্য–প্রাসঙ্গিক আদি রসের অবতারণা করলেন কেন ? এ প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার তাঁর 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'লোচন স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, তাঁহার গ্রন্থ পাঠে মনে হয় যে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লেখার তাঁহার আরও তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের সহিত বিশ্বম্ভরের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দেওয়া। দ্বিতীয়ত, নরহরিকে পঞ্চতত্ত্বের* মধ্যে স্থান দেওয়া। তৃতীয়তঃ, নাগরীভাবের উপাসনাকে জনপ্রিয় করা।' (পৃ-২৫৭)। এই নাগরীভাবের* প্রবর্তক ছিলেন লোচনের গুরু নরহরিদাস ঠাকুর। শিষ্য লোচন মূলতঃ গুরুর প্রবর্তিত নাগরীবাদ নামক মতবাদকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেই সম্ভবত চৈতন্যমঙ্গল লিখেছিলেন।

উক্ত লোচন দাস চৈতন্যের গৃহত্যাগের দিনটিকে কেন্দ্র করে এক বিস্ময়কর কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। এ কাহিনী কতোখানি সত্য অথবা

---

* স্বরূপ-দামোদরের তত্ত্ব অনুযায়ী চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস (শ্রীবাস ?) ও গদাধর পণ্ডিত এই পাঁচজন নিয়ে 'পঞ্চতত্ত্ব'। এর ভেতর নরহরি সরকারের নামোল্লেখ নেই। কিন্তু নরহরি-শিষ্য লোচন দাস উপরোক্ত পাঁচজন থেকে শ্রীনিবাস বা শ্রীবাসের নামটি বেমালুম বাদ দিয়ে গুরু নরহরিকে 'পঞ্চতত্ত্বে' স্থান করে দিয়েছেন। (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল/সূত্রখণ্ড/পৃ-২ দ্রষ্টব্য)।

* 'গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটফট করে, আনচান করে, এমন কি তাঁহারা সোয়াস্তি পান না। গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। নাগরীসমূহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই সুখী। গৌর নাগরীদের পানে চান, আদপে তাঁহাদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরী ভাবের গূঢ় রহস্য।' (গৌরপদতরঙ্গিনী-এর ভূমিকা/জগবন্ধু ভদ্র/১ম সং/পৃ-১৫৭)। অন্যত্র এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশাই লিখেছেন, 'এই ব্যাখ্যা লোচনের নাগরীভাব সম্বন্ধে সত্য নহে ; কেননা লোচনের মতে গৌরাঙ্গ "নয়ন সন্ধান শরাঘাত" করেন ; যুবতীরা তাঁহার পদযুগে নিজেদের বুক দিলে এবং তাহাকে ভুজলতা দিয়া বান্ধিলে তা তাঁহার কোলে ঢলিয়া পড়িলে তিনি বাধা দেন না। (চৈ. চ. উ., পৃ-২৬৩)।

আদৌ সত্য কিনা বলা দুষ্কর। তবে ডঃ মজুমদার তাঁর চৈতন্যচরিতের উপাদান নামক সুবৃহৎ সমালোচনা গ্রন্থের (পৃ-২৭৬) বৃন্দাবন দাস ও তস্য মাতা নারায়ণী দেবীর কথোপকথন সম্বোলিত একটি উদ্‌ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে নিমাই যেদিন গৃহত্যাগ করেন সেদিন রাত্রে লোচন নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে যে সব বিহারাদির কথা লিখেছেন তার কিছুমাত্র মিথ্যা বা অত্যুক্তি নয়, কেননা, এই দিন রাত্রে বৃন্দাবন জননী নারায়ণী দেবী নিমাইদের বাড়িতেই ছিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত শয়ন কক্ষে নিমায়ের রসরঙ্গ সচোক্ষে দেখেছিলেন—এমন একটি ইঙ্গিত স্বয়ং নারায়ণী দেবী পুত্র বৃন্দাবনকে দিচ্ছেন ওই উদ্‌ধৃতিতে। ডাঃ মজুমদার এই উদ্‌ধৃতিটি কোথা থেকে চয়ন করেছেন তা অবশ্য বলেননি। তবে এই উদ্‌ধৃতি দেওয়ার পরক্ষণেই তিনি এর সমগ্র ঘটনাটিকেই 'অবিশ্বাস্য' বলে খারিজ করে দিয়েছেন।

এখন দেখা যাক, লোচন নিমায়ের গৃহত্যাগের রাত্রিটিকে উপজীব্য করে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে জড়িয়ে তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে কি কি ঘটনা উপস্থাপিত করেছেন।

লোচন লিখছেন, নিমাই যেদিন গৃহত্যাগ করবেন সেদিন রাত্রে শয়নকক্ষে চিন্তিতা বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে স্বামী নিমাইকে বলছেন,

'কহ কহ প্রাণনাথ মোর শিরে দিয়ে হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা বিদারিতে চাহে হিয়া
আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥

অন্যত্র বলেছেন,

'আমা হেন ভাগ্যবতী নাহি কোন যুবতী
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
বড় প্রতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিল
পত্নী এ নবযৌবন দিবা হাত॥

তখন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে নিমাই বলছেন,

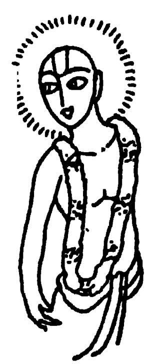
আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিয়া
এ কথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে তোমারে কহিব তবে
এখনে না মর মিছা শোকে॥'

অতঃপর—

'ইহা বলি গৌরহরি আশ্লেষ চুম্বন করি
নানারস কৌতুকে বিহারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিল প্রকারে॥'

তারও পর লোচন লিখেছেন,

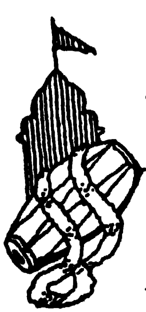
'ত্রৈলোক্য অদ্ভুতরূপ নিরিখে বদন।
অধর বান্ধুলী সাথে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে।
নবকমলিনী যেন করিবর কোরে॥



নানারসে বিথাইয়া বিনোদ নাগর ।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর ॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুলি প্রকাশ ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস ॥'

লোচন দাস নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার একত্রাবস্থিতির এ ধরনের রস-রঙ্গের কথা তার গ্রন্থের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে লিখেছেন । কিন্তু লোচন উল্লেখিত তথ্যের উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা তিনি বলেন নি । তাঁর গুরুদেব নরহরি সরকার নাগরী-ভাবের প্রবর্তক ছিলেন । সে কারণে গুরুর মুখে শুনেও তিনি এসব কথা লিখতে পারেন । এবং সেটাই খুব সম্ভব ছিল । কিন্তু গুরুর মুখে শুনে এসব কথা লিখেছেন এমন ইঙ্গিত লোচন তাঁর গ্রন্থে দেননি । অথচ যে গ্রন্থকে অনুসরণ করে তিনি চৈতন্যমঙ্গল লিখেছেন সেই গ্রন্থের লেখকও (মুরারি গুপ্ত) তাঁর কড়চায় গৃহত্যাগের দিন রাত্রে নিমাই পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাথে রস রঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এমন কথা কদাপি বলেননি বা ইঙ্গিতও দেননি । বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' লেখার আগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু ভাগবতেও গৃহত্যাগের রাত্রে স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে নিমাই বিহারাদিতে লিপ্ত হয়েছিলেন এমন কোন ইঙ্গিত নেই । তাহলে লোচন এ-হেন তথ্যের উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন ? এ প্রসঙ্গে একটি কিম্বদন্তী আছে । ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তার চৈতন্য চরিতের উপাদান নামক গ্রন্থে (২৭৬ পৃষ্ঠায়) এই কিম্বদন্তীটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যথা–'এই সময় লোচনের গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৃন্দাবন দাসের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয় । লোচনের গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, প্রভু সন্ন্যাসের পূর্ব রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ভুবনমোহনীরূপে সাজাইয়া এবং তাঁহাকে শেষ আলিঙ্গন–প্রদানপূর্বক গৃহত্যাগ করেন । বৃন্দাবন দাস এ ঘটনা অবগত ছিলেন না । সুতরাং শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার উল্লেখ নাই লোচনের এই বর্ণনা দেখিয়া বৃন্দাবন দাস সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার মাতা নারায়ণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন । তাহার উত্তরে নারায়ণী বলেন যে, লোচনের একটি কথাও অত্যুক্তি নহে, কারণ ঐ রাত্রিতে তিনি প্রভুর বাটিতে ছিলেন ।'

এই কিম্বদন্তী প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা দরকার । প্রথমত, নারায়ণী দেবী যে চৈতন্যের গৃহে মাঝে মাঝে যেতেন বা থাকতেন এমন কথা বৃন্দাবন দাস বা মুরারি গুপ্ত তাঁদের গ্রন্থের কোন স্থানেই লিখেন নি । সম্পর্কে নারায়ণী দেবী বৃন্দাবন দাসের জননী ছিলেন । যদিচ নারায়ণী দেবী চৈতন্যের গৃহে মাঝে মধ্যে যেতেন বা থাকতেন তাহলে মাতৃনাম প্রচারার্থে বৃন্দাবনের কলমে এই বিষয়টি আবশ্যিক লিপিবদ্ধ হতো । কেননা, চৈতন্যের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে সে যুগে কি নারী কি পুরুষ নিজেকে ধন্য মনে করতো । অবশ্য গৃহে থাকাকালীন চৈতন্য বিশ্বম্ভর মিশ্র বা নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন । তখনো তিনি কোন অর্থেই চৈতন্য হননি । যদিচও চৈতন্যের গৈরিক বিবাগী-বৈরাগী পথে অন্তর সলিলা ফল্গু নদীর মতো তিনি বহে যাচ্ছিলেন । কিন্তু বিশ্বম্ভর বা নিমাই পণ্ডিতের সান্নিধ্যে আসাও এক অর্থে চৈতন্যের সান্নিধ্যে আসারই নামান্তর । কেননা যিনি বিশ্বম্ভর তিনিই পরবর্তীকালে চৈতন্য । সুতরাং এ কথা স্মরণ রেখে বৃন্দাবন দাস তাঁর মাতা নারায়ণী দেবীর চৈতন্যের বাড়িতে যাওয়া-আসার কথাটি নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করতেন । তা করেননি । এ বিষয়ে আদি চৈতন্য চরিতকার মুরারিও আশ্চর্য রকম নির্বিকার ।



দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, নিমাই যখন গয়া থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন নারায়ণী ছিলেন সাকুল্যে চার বছরের বালিকা। এর এক বছর এক মাস অর্থাৎ গয়া প্রত্যাবর্তনের তেরো মাস পর নিমাই গৃহত্যাগ করেন। সুতরাং নিমায়ের গৃহত্যাগের সময় নারায়ণীর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর এক মাস। পাঁচ বছরের বালিকা শয়ন গৃহে আড়ি পেতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমায়ের রস-রঙ্গ দেখেছিলেন একথা বিশ্বাস করতে প্রত্যয় হয় না।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, গৃহত্যাগের দিন নিমাই ভক্তবৃন্দ এবং নগরিয়াদের সঙ্গে 'রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর' পর্যন্ত ছিলেন (২।২৬।৮৯)। তারপর নিমাই সকলকে বিদায় জানিয়ে, ভোজন করে শয়ন কক্ষে যান (২।২৬।৯০-৯২)। রাত্রি 'চারিদণ্ড' থাকতে নিমাই গৃহত্যাগ করেছিলেন। এর থেকে প্রমাণ হয়, রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষার্ধে ও চতুর্থ প্রহরের প্রথমার্ধে মধ্যবর্তী সময়টুকু তিনি শয়নকক্ষে ছিলেন। পাঁচ বছরের বালিকা নারায়ণী নিমায়ের শয়ন গৃহে আড়ি পাতার নিমিত্তে, একাকি রাত্রি তৃতীয় চতুর্থ প্রহরে নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়ন গৃহের সামনে এসেছিলেন এটাও বিশ্বাস করা বেশ কষ্টকর। অন্য ভয় না থাক, অন্তত ভূত প্রেতের ভয় তো তাঁর ছিল। যুক্তি তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় পাঁচ বছরের বালিকা নারায়ণী বেশ নির্ভিক প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, নিমাই ভোজন পর্ব শেষ করে শয়ন গৃহে গেলে শচীদেবী, নিমাই জননী সারা রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় দুয়ারে' বসে ছিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে শ্রীবাস-আদি ভক্তগণ যখন নিমায়ের খোঁজে আসেন তখন নিমাই জননী শচীদেবীকে 'দুয়ারে' জড়প্রায় অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। নারায়ণী দেবী আড়ি পাততে গেছলেন, কিন্তু দরজার সামনে শচীদেবী বসে থাকলে তাঁর পক্ষে কিভাবে আড়ি পাতা আড়ি পাতা সম্ভব হলো ? দেখা যায়, সমবয়স্কা বা সখীস্থানীয়ারা সখী ও সখীর বরের কথাবার্তা শোনার জন্য গোপনে আড়ি পাতে। কিন্তু নারায়ণী তো বিষ্ণুপ্রিয়ার সখী বা সমবয়স্কা ছিলেন না। তারও চেয়ে বড়ো কথা, যা রাধাগোবিন্দ নাথ মশাই তার 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভূমিকা' গ্রন্থে লিখেছেন, নাথ মশাই লিখেছেন, 'পাঁচবছরের কোন বালিকা স্বামী স্ত্রীর গোপন কর্মাদির মর্ম কি বুঝে ? যাহারা তাহার মর্ম বুঝে তাহাদের পক্ষেই "আড়ি পাতা" সম্ভব।' (ঐ/ভূমিকা/পৃ-১৭৯)।

এবং সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা হলো এই যে, বৃন্দাবন দাস যখন চৈতন্য ভাগবত লেখেন তার আগেই নারায়ণী দেবী দেহত্যাগ করেছিলেন। বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত যখন বিশেষরূপে প্রচারিত ও সর্বত্র সমাদৃত তখনই লোচন তার চৈতন্যমঙ্গল লিখতে আরম্ভ করেন। তারও অনেক পর চৈতন্যমঙ্গল শেষ হয়। সুতরাং লোচনের চৈতন্যমঙ্গল পাঠ করে বৃন্দাবন দাস লোচন বর্ণিত নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার নৈশ লীলার কথা মা নারায়ণী দেবীকে কি করে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের চৈতন্য চরিতের উপাদান নামক গ্রন্থের (২৭৬ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত কিম্বদন্তীমূলক উদ্ধৃতিটি আদ্যপান্ত ভ্রান্তিকর বলেই মনে হয়। এসব যুক্তি তর্কের পরও প্রশ্ন থাকে, লোচন দাস ঠাকুর চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার এই নৈশ বিহারাদির সূত্র সমূহ কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন। নাকি সমগ্র ব্যাপারটাই তাঁর স্ব-কল্পিত। কিন্তু লোচন দাস একজন পরম বৈষ্ণব বলেই পরিচিত। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'গৌরাঙ্গ-পরশে সে কুকুর ভাগ্যবান্।' (আদিখণ্ড/পৃ-১৪)। যে গৌরাঙ্গের স্পর্শে অস্পৃশ্য



জীব কুকুর ভাগ্যবান হয়, সেই গৌরাঙ্গের 'নয়ন সন্ধান শরাঘাতে' মানিনীর মানমৃগ কেমন করে বিপথে পালায় ? অথবা কেমন করে নদীয়া নাগরীরা বসন বচন সব স্খলিত করে, নয়ান অলসযুত করে বিশ্বম্ভরের কোলে ঢলে পড়ে ? অথবা–

'পরম সুন্দরী যত সবে হৈল উনমত
বেকত মনের নাহি কথা।
রসে রসে আবেশে লোলিপরে গোরা পাশে
গর গর কামে উনমনা ॥'

[চৈতন্যমঙ্গল/আদিখণ্ড/পৃ-৫৪]

লোচনের গুরু নরহরি নাগরী ভাবের উপাসক ছিলেন। লোচন দাস তাঁরই সুযোগ্য চেলা। সুতরাং চেলা যে গুরুর পথই অনুসরণ করবেন–নদীয়া নাগরীদের ও গৌরাঙ্গের কাহিনী তারই প্রচ্ছন্ন দৃষ্টান্ত। বোধহয় চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়া ও নারায়ণী সম্পর্কিত ঘটনাটিও সেই একই কারণে উদ্ভূত।

[চোদ্দ]
[চৈতন্যের সন্ন্যাস]

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,

'দণ্ড চারি রাত্রি আছে' ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ।।'

চার দণ্ড রাত্রি থাকতে থাকতে নিমাই গৃহত্যাগের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আদি নিয়ে বেরিয়ে এলেন শয়ন কক্ষ থেকে। প্রথমেই তিনি সম্মুখীন হলেন গদাধর ও হরিদাসের। বৃন্দাবনের মতে, গৃহত্যাগের দিন রাত্রে নিমায়ের শয়নকক্ষে গদাধর ও হরিদাস শয়ন করেছিলেন। সুতরাং নিমাই 'রাত্রি চারি দণ্ডে' গৃহ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উভয়েই জেগে উঠেছিলেন।

গদাধর ব্যাপারটা টের পেয়ে নিমায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চলিব সঙ্গে আমি'। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। হরিদাস নির্বিকার।

নিমাই ঘাড় নাড়লেন। বললেন, না, আমার সঙ্গে থাকার কার প্রয়োজন নেই। আমি একলাই যাবো। যিনি অদ্বিতীয় তিনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

নিমাই পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলেন শয়ন কক্ষ থেকে। হাতে ধরা গৃহত্যাগের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।



শয়ন কক্ষের চৌকাঠ ডিঙোতেই পরম বিস্ময়ে চমকে উঠলেন নিমাই।

মা !!

অস্বচ্ছ অন্ধকারে পৌষ মাঘ মাসের নিদারুণ ঠান্ডার মধ্যে জননী শচীদেবী একাকি বসে আছেন। নিদ্রাহীন।

মা–

নিমাই স্থানুর মতো জননীর পদ তলে বসে পড়লেন। কিঞ্চিৎ নীরবতা।

সর্বংসহা জননীর দুটি কর চেপে ধরলেন নিমাই।

মাগো। কম্পিত কণ্ঠে নিমাই বললেন, মাগো, অমৃতময় স্বর্গের মহিমার

চেয়েও এই সুখ-দুঃখ হাসি কান্না ভরা দুর্বল পৃথিবীর প্রতি আমাদের আকর্ষণ প্রবলতর। তারও চেয়ে অনন্ত আকর্ষণ তুমি, মা। স্বর্গ মৃত্যুহীন, সুষম ও কুসুমাস্তীর্ন কিন্তু আজন্ম লালিত মা-র স্নেহচ্ছায়া ফেলে কে স্বর্গে যেতে চায়।

মাগো—

'আপনার তিলার্দ্ধেকো না লইয়া সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ॥
দন্ডে দন্ডে যত তুমি করিলা আমায়।
আমি কোটি কল্পে নারিব শুধিবার॥'

কম্পিত পায়ে নিমাই উঠে দাঁড়ালেন। শক্ত করে দুটি হাত চেপে ধরলেন নিজের বুকে। আদ্র কণ্ঠে বললেন, মাগো, কোন চিন্তা কোরো না তুমি। জানি, তবু তুমি চিন্তিত হবে। দ্যাখো, চোখ তুলে তুমি দ্যাখো মা, এই বুকে হাত রেখে বলছি, তোমার যাবৎ ব্যবহার, তোমার যতেক পরমার্থ সব ভার আমি নিচ্ছি, সব কিছু।

নিঃস্পন্দ শচীমাতা।

নীরব।

মৃতপ্রায়।

অদূরে বহতা গঙ্গার স্রোতধারা যেন দিক্‌ভ্রম করে শচীমায়ের দু'চোখ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ শীত, কুয়াশা, হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে কারা যেন জেগে উঠলো।

পাখি ডাকছে। ঘুম ভেঙেছে বিহঙ্গের। নিমাই টালমাটাল পায়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করলেন। আভূমি প্রণাম করলেন জননীর পদতলে। তারপর নীলাম্বুধি অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে।

এই যে নিমায়ের গৃহত্যাগ, জগৎ সংসারের মায়া ছিন্ন করে চলে যাওয়া। এটিকে আমরা নিমায়ের মহানিষ্ক্রমণ আখ্যায়িত করতে পারি। এই অন্ত থেকে অনন্তে যাত্রা এর শুরু হয়েছিল কবে? আমরা বলেছি দিনটি ছিল

১৪৩১ শকের ২৬শে মাঘ। বুধবার। ইংরাজি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ। রাত্রি চার দন্ড থাকা কালীন নিমাই গৃহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই নির্দিষ্ট দিনটি নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। অর্থাৎ দিনটি সুনির্দিষ্ট কিনা। অর্থাৎ এই ২৬শে মাঘ দিনটিতে আদৌ নিমাই গৃহত্যাগ করেছেন কিনা এই নিয়ে বির্তক। বির্তকটা পন্ডিতদের। যাকে বলে পন্ডিতের লড়াই। চিরাচরিত ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ নাথ মশায়ের বক্তব্য হলো, 'শ্রী মন্মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের ২৮শে মাঘ শুক্রবার পূর্ণিমা রাত্রিতে সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ করেন এবং ২৯শে মাঘ শনিবার মাঘী সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।' অন্যত্র আরেক চৈতন্যচরিত বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার বলছেন, 'এই উক্তি বিচারসহ নহে; কেননা বৃন্দাবনদাস বলেন যে বিশ্বম্ভর "দন্ডচারি রাত্রি আছে" জানিয়া শয্যা ত্যাগপূর্বক মাকে প্রণাম করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন (২/২৬/৩৬১)। মুরারিও বলেন—"মুগ্ধং নিনায় রজনীং চ তদুম্বিতোহগাৎ" (৩/১/৬)। রাত্রির চার দন্ড ও পূর্ণিমার চার দন্ড—এই আট দন্ডের মধ্যে নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া যাওয়া, মস্তক-মুন্ডন, সন্ন্যাসের আয়োজন প্রভৃতি করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র গ্রহণের অবসর থাকে না।'



আমরা ডঃ মজুমদারের যুক্তিই স্বীকার্য বিবেচনা করি। কেননা, নিমাই রাত্রি চারি দন্ড থাকাকালীন গৃহত্যাগ করে ছিলেন। অবশিষ্ট বাকী চার দন্ড ছিল পূর্ণিমা তিথির অবস্থিতি। কিন্তু এই অবশিষ্ট চার দন্ডের ভেতর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্ব সমাধা না হলে পূর্ণিমা ছেড়ে যায়। অর্থাৎ শুক্ল পক্ষ ছেড়ে কৃষ্ণ পক্ষ পড়ে যায়। আর কৃষ্ণ পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণও প্রশস্ত নয়। নিমাই স্বয়ং প্রিয় পার্ষদ নিত্যানন্দকে বলছেন,

'শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাঞি।
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ জন ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥'

[চৈঃ ভাগবতে/২/২৬/৫৬-৫৭]

এ প্রসঙ্গে কড়চা লেখক মুরারি গুপ্তও সেই একই কথা বলেছেন,

'ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতে মকরাৎমনিষী।
সন্ন্যাস মন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥

[কড়চা/৩/২/১০]

এবং লোচনদাস লিখেছেন,

'মুন্ডন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে।
সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে॥
মকর লেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥'

['চৈতন্যমঙ্গল'/মধ্যখন্ড]

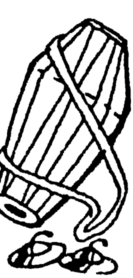
অর্থাৎ লোচন ও মুরারি প্রায় একই কথা বলেছেন। মুরারি বলেছেন, সূর্য যখন মকর রাশি হতে কুম্ভ রাশিতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন সংক্রমণ সময়ে (অর্থে মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে) নিমাই কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র পেয়েছিলেন।

অন্যত্র কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,

'চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥'

[চৈ. চরিতামৃত/২/১/১১]

তাহলে এ যাবৎ সমস্ত ঘটনাটি কি দাঁড়াচ্ছে, নিমায়ের আবির্ভাব হয়েছিল ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে। এবং নিমাই চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত গৃহস্থাশ্রম করেছেন। অর্থাৎ ১৪০৭ + ২৪ = ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন— যথার্থ মাঘ মাসের শেষ দিন নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্য-বিষয়ক জ্যোতিষী গণনা থেকে জানা যায়, ১৪৩১ শকের মাঘ মাসটি ২৯ দিন ছিল অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখ বা সংক্রান্তির দিন ছিল ২৯শে মাঘ। ওই দিন পূর্ণিমা ছিল অর্থাৎ শুক্লপক্ষ। এবং যেহেতু মাঘমাস, তাই মাঘ শুক্লপক্ষ। এই পূর্ণিমা তিথিতে ও সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে (অর্থাৎ উত্তরায়ণ কালে এই যে সংক্রমণ আসছে সেই সংক্রমণে) নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।



তাহলে ২৮শে নয় ২৬শে মাঘ বুধবার শেষ রাত্রে (রাত্রি চার দন্ড থাকতে) নিমাই গৃহত্যাগ করেছিলেন। এবং বৃহস্পতিবার ২৭শে মাঘ কাটোয়ায় পৌছান। এই দিন অর্থাৎ ২৭শে মাঘের রাতটুকু নিমাই পঞ্চ পার্ষদের সাথে কীর্তন করে কাটিয়ে দিলেন। এঁরা ছিলেন নিমায়ের পূর্ব কল্পিত সেই পাঁচ

জন। ২৬শে মাঘ গোপনে এই পাঁচ জনের কথা নিমাই নিত্যানন্দকে বলেছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাঞি।/এ-কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ জন ঠাঞি ॥' সহ শচীদেবীও ছিলেন। কিন্তু শচীদেবী আসেন নি। তাই নিত্যানন্দ সহ পাঁচজন। নিত্যানন্দ, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ। এই পঞ্চসখাকে নিয়ে কীর্তন করে ২৭শে মাঘের হিমেল রাতটুকু অতিবাহিত করলেন নিমাই।

'এই মত কৃষ্ণকথা আনন্দ প্রসঙ্গে।
রহিলেন সে নিশা ঠাকুর সভাসঙ্গে ॥'

[চৈ,ভাগবত/২/২৬/১৬৫]

এলো শুক্রবার ২৮শে মাঘের উষালগ্ন। এদিন সকাল হতে চললো নিমায়ের সন্ন্যাসের আয়োজন।

এ প্রসঙ্গে মুরারি লিখেছেন,

'তথাপরাহ্নে নৃহরেরবাপ্ত্যো
ন্যাসোক্তকর্ম্মানি চকার শুদ্ধঃ।'

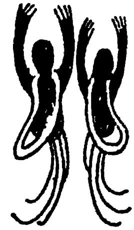
এবং বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,

'কথং কথমপি সর্ব্বদিন অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হৈল প্রেমরসে ॥'

কিন্তু ২৮শে মাঘ ক্ষৌরকর্মাদি সম্পন্ন হলেও নিমায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ অর্থাৎ সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু বাধা ছিল। কেননা, ২৮ শে মাঘ পূর্ণিমা ছিল ঠিকই, কিন্তু সংক্রান্তি ছিল না। সুতরাং ক্ষৌরকর্মাদি করে নিমাই সেদিন সংকল্প করে থাকলেন। দেবীপূজার পূর্বদিন ষষ্ঠীর দিন যেমন দেবী বরণের সংকল্প হয়। নিমাই তদ্রূপ ২৮শে মাঘ সন্ন্যাস বরণের সংকল্প করে থাকলেন। এবং ২৯শে মাঘ শনিবার সংক্রান্তির দিনে চার দণ্ডের মধ্যে (অর্থাৎ পূর্ণিমা থাকতে থাকতে, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি থাকাকালীন) সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে গুরু কেশব ভারতীর নিকট নিমাই সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।

নিমায়ের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন পাঁচ জন পার্ষদ। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও চন্দ্রশেখর। কিন্তু নিমায়ের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন একজন। তিনি আচার্য চন্দ্রশেখর। নিমাই ই তাঁকে বলেছিলেন, 'বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর' তুমি।/তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি।'

এরপর এলো মস্তক মুণ্ডনের সময়। নাপিত ক্ষুর হাতে নিমায়ের সম্মুখে আসতেই ভক্তরা কেঁদে উঠলেন। হায়, এমন চাঁচর চিকুর কেশদাম এক্ষুনি মুণ্ডন হবে। স্বয়ং নাপিত পর্যন্ত কাঁদতে লাগলো এমন দৃশ্য অনুভব করে। 'হাথ নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে।' বৃন্দাবন দাস বা কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি এই ক্ষৌরকারের নামটি উল্লেখ করেন নি। তবে ওড়িআ লেখক ঈশ্বর দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' (সপ্ত-দশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচনা) * এই গ্রন্থে (২৯ অধ্যায়) নাপিতের নাম উল্লেখ করেছেন। এখানে নরসুন্দরের নাম লম্বোদর দাস। 'শুনিল লম্বোদর দাস। ততক্ষণে উড়িলা সাহস।'



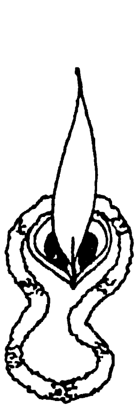
অতঃপর গঙ্গা স্নানান্তে গুরু কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা নেবার পালা। কিন্তু ঠিক এই জায়গায় যুগপৎ নিমাই ও কেশব ভারতী উভয়কেই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়তে দেখা যায়। ভাবনা ছিল সন্ন্যাস মন্ত্র নিয়ে। সন্ন্যাসের মন্ত্র হলো, 'তত্ত্বমসি'। অর্থাৎ তৎ + ত্বম্ = সন্ধিতে তত্ত্বম্। তত্ত্বমসি = তৎ (সেই

ব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। এটি হলো মায়াবাদী শাঙ্করাচার্যের অর্থ। শঙ্করের মতে পরমব্রহ্ম সর্বতোভাবে নির্বিশেষ এবং এই নির্বিশেষ ব্রহ্মই মায়ার প্রভাবে জীব রূপে প্রতিভাত। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নেই এবং সেই কারণেই মায়াবাদী আচার্য শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সত্তাকে স্বীকার করতেন না। 'তত্ত্বমসি' শব্দটি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যপর অর্থ করে, 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রে দীক্ষা নিলে শ্রীকৃষ্ণকে অস্বীকার করতে হয়, শ্রীকৃষ্ণ ভজনা ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু নিমায়ের পক্ষে এটা অকল্পনীয় ব্যাপার। কৃষ্ণকে ত্যাগ করা, অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। আবার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে হলে এই 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রেই দীক্ষা নিতে হবে। নিমাই দো-টানায় পড়লেন।

এহেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুহূর্তে অকস্মাৎ অমানিশার নীলাম্বুধি অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝলকানির মতো নিমাই একটি সুতীব্র আশার আলো দেখতে পেলেন। চোরা মেঘে ঢাকা পড়া চাঁদ হঠাৎ যেন দ্যুতিময় হয়ে উঠলো মেঘ সরে গিয়ে। নিমায়ের মনে পড়লো গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালীন একটি স্বপ্নিক ঘটনা। গৃহী নিমাই একদিন স্বপ্ন দেখলেন, এক ব্রাহ্মোণোত্তম ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন নিমায়ের কাছে। তাঁর প্রশান্ত মুখে স্বর্গীয় হাসি। অতঃপর ব্রাহ্মণের মুখাবয়ব নিমায়ের কর্ণমূলে স্পর্শ করলো। দেবনাগরী ভাষ্যে উচ্চারিত হলো একটি অমোঘ মন্ত্রোধ্বনি। 'তত্ত্বমসি'। চমকে উঠলেন নিমাই। উত্তেজনায় ঘুম ভেঙে গেল। আর চোখে ঘুম এলো না সে রাত্রে। সারারাত্রি শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া মানেই প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে ত্যাগ করা। হায়। তা আমি কেমন করে পারবো।

এ'প্রসঙ্গে মুরারি লিখেছেন, 'স্বপ্নে দৃষ্টো ময়া কশ্চিদাগত্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥/ সন্ন্যাসমন্ত্রং মৎকর্ণে কথয়ামাস সুস্মিতঃ/তৎ শ্রুত্বা ব্যথিতো রাত্রৌ দিবা চাহং

* সন্ন্যাস বিধি সম্পর্কে 'মহানির্বাণতন্ত্রে' বলা হয়েছে, 'বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু, পতিব্রতা ভার্যা এবং অসমর্থ বন্ধুকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে নারকী হতে হয়। গৃহকর্ম সম্পাদন করে, নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে, বন্ধু স্বজন গ্রামীন প্রতিবেশীদের প্রীতিপূর্ণ অনুমতি নিয়ে এবং তাঁদের অনুমতি পেলে পরম ঈশ্বরকে প্রণাম করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে হবে। তারপর সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট প্রার্থনা করতে হবে এই বলে—হে পরমব্রহ্মণ, গৃহাশ্রমে আমার এ'তো বছর কেটে গেল, অনুগ্রহ করে এবার আমাকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিন। অতঃপর গুরু বিধিবৎ বিচার করে, দীক্ষাকামীকে শান্ত ও বিবেকবান মনে করলে তাকে শিষ্য করবেন ও সন্ন্যাস আশ্রমের আদেশ দেবেন। তখন শিষ্য স্নান সেরে আহ্নিকে বসবেন ও আহ্নিক সমাপন করে দেব ঋষি ও পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁদের অর্চনা করবেন। এবং বিধিবৎ অর্চনা শেষে পিতৃপিন্ড দান করে পিতৃদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করবেন। তারপর ঋণত্রয় মুক্তির জন্য এই বলে শ্রাদ্ধ (নিজের) করতে হবে 'ঋণত্রয় বিনির্মুক্তোহস্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।' তারপর 'ঐং-ক্লীং-হুং স্বাহা' মন্ত্রে ঘৃতাক্ত যজ্ঞসূত্র অনলে নিক্ষেপ করতে হবে। এই ভাবে শিখা-সূত্র ত্যাগ করে, দেহী ব্রহ্মময় হন ও এই ভাবে ব্রাহ্মণদের সন্ন্যাসাশ্রম হয়। তখন গুরু সেই শিষ্যের কর্ণমূলে এই বলে দীক্ষা দেবেন—'তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞহংসঃ সোহহং বিভাবয়।/নির্মমো নিরহংকারঃ স্বভাবেন সুখংচর ॥' অর্থাৎ 'তুমিই সেই মহাপ্রাজ্ঞ সেই মহাপ্রাজ্ঞ হংস, 'তিনিই আমি' এরূপ ভাবনা করো। মায়ামমতাশূন্য হয়ে, নিরহংকার হয়ে স্বভাব সুখে বিচরণ করো।'



বিরোদিসি ॥/কথং প্রিয়ং হরিং নাথং ত্যক্ত্বান্যদুচিতং মম ॥' (কড়চা ২/১৮/১–৩)।

নিমাই এই অসহনীয় স্বপ্নের কথাটি একদা সহপাঠি ও বাল্যবন্ধু মুরারি গুপ্তকে বলেছিলেন। তখন মুরারি (মুরারি গুপ্ত তখন চৈতন্যের প্রিয় ভক্ত) ব্যথিত নিমায়ের মনে দুঃখের নিরশনের উদ্দেশে বললেন, 'মুরারি ঃ প্রাহ তৎ শ্রুত্বা তন্মন্ত্রে ভগবন্ স্বয়ম্ ।/ষষ্ঠীসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব ॥ (কড়চা–২/১৮/৩–৪)। যার সারার্থ, 'ভগবন্! সেই মন্ত্রে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস চিন্তা করে তুমি সুখী হও।' মুরারি চৈতন্যের মনের বিহ্বলতা দূর করার জন্য আরও বললেন, 'প্রভো, তুমি 'তত্ত্বম্' শব্দটিকে সন্ধিবদ্ধ শব্দ মনে না করে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ শব্দ মনে করো। তাহলে দেখবে তোমার মনে আর দুঃখ থাকবে না। কেননা এই 'তত্ত্বমসি' শব্দটির ব্যাসবাক্য হচ্ছে, তস্য (তাঁহার অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের) ত্বম,(তুমি, অর্থাৎ জীব) অসি (অর্থাৎ হও)। অর্থাৎ জীব যেমন ব্রহ্মের ব্রহ্মও তদ্রূপ জীবের। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি, সুতরাং সে শক্তিমান ব্রহ্মেরই অংশ। অতএব এই অর্থ যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রে দীক্ষা নিলেও কৃষ্ণকে ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

মুরারির এ হেন উক্তি শুনে নিমায়ের মনে আর কোন চিন্তা রইলো না। অতএব তিনি সুনির্দিষ্ট 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রেই দীক্ষা নেবেন মনঃস্থির করলেন। এ প্রসঙ্গে অন্যতম প্রাচীন চৈতন্য জীবনীকার কবি কর্ণপুর (পরমানন্দ সেন) বলেছেন, 'শ্রীমান্নায়ণ জল ধৌতঃ সমবদৎ দ্বিজৈকঃ স্বপ্নে যে শ্রুতিমভি মহাবাক্যমবদৎ ।/অতো হেতুহিত্বা প্রভুচরনমন্যৎ কিমুচিতং মমেতি ক্রন্দামি ক্ষণমপি ন মে নির্বৃত্তিরিহ ॥/ইতি শ্রুত্বা গুপ্তঃ সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ প্রভো তৎ ষষ্ঠী তৎপুরুষবচনং তত্র কুরু ভোঃ ।/তথা শ্রুত্বা নাথঃ সমুদিতমনাঃ সাম্প্রতমভূত্তথা তে চ শ্রুত্বা ব্যথিত মনযোগাঢ়মভবন্ ॥' (মহাকাব্য ১১/৪১–৪২)। অর্থাৎ 'শ্রীমান (নিমাই) সজল নয়নে বললেন, এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আমার কর্ণমূলে মহাবাক্য (তত্ত্বমসি বাক্য) বলেছেন। অতএব (বাক্যানুসারে) প্রভুর (আমার কৃষ্ণের) চরণ পরিত্যাগ করে অন্য কিছু (সন্ন্যাস ধর্ম করা) করা কি আমার পক্ষে উচিত হবে? এই জন্য আমি কাঁদছি (অর্থাৎ আমি বুঝে উঠতে পারছি না কি করবো)। এই কথা শুনে তৎক্ষনাৎ মুরারি গুপ্ত বললেন, 'প্রভো! তুমি সেই মহাবাক্যটিকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বচন করো।' এই কথা শুনে প্রভু (নিমাই) সম্যকরূপে আনন্দিত চিত্তে বললেন–'সাম্প্রত', (অর্থাৎ ঠিক কথাই বলেছো)। এই কথা শুনে ভক্তগণ (অর্থাৎ নিমাই অচিরাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন বুঝতে পেরে)ভক্তগণ কাঁদতে লাগলেন।' (মহাকাব্য ১১/৪১–৪২-এর অনুবাদ)।



অতঃপর নিমাই তাঁর স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রটির কথা ভাবী সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীকে আদ্যোপান্ত বললেন। সেই সঙ্গে 'তত্ত্বমসি' শব্দের মুরারি কৃত অর্থটিও বললেন। (কড়চা ৩/২/৭–৯ দ্রঃ)। এ প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ নাথ মশাই তাঁর সম্পাদিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' (মধ্যখন্ড/দ্বিতীয়ার্ধ) গ্রন্থে লিখেছেন, 'তত্ত্বমসি' যে সন্ন্যাসের মন্ত্র, তাহা সন্ন্যাসী কেশবভারতী অবশ্যই জানিতেন। তথাপি প্রভু কেন প্রভুর স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রটি ভারতীর কর্ণমূলে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"ইহা তোমার সম্মত কি না, বল?" ইহার হেতু এই। কেশব ভারতী সন্ন্যাসের মন্ত্র জানিলেও, তাহার বিশুদ্ধ অর্থ তিনি জানিতেন না, জীব ব্রহ্মের ঐক্যবাচক অর্থই তিনি জানিতেন, কেন না, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের

অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ।' (পৃঃ ৩৬৩)

বৃন্দাবন দাস ২/২৬/১৯৭–৯৮ পয়ারে যা লিখেছেন, দেখা যাচ্ছে, মুরারি গুপ্তের 'কড়চা'-তেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে । বৃন্দাবন লিখেছেন,

'প্রভু বোলে "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন ।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে ।
এত বলি প্রভু তাঁর কর্নে মন্ত্র কহে ॥'

অন্যত্র মুরারি লিখেছেন,

'ততঃ সমীপং স গুরোর্হিতার্থী গত্বাত্যাবদং কর্ণসমীপ ঈশঃ ।
স্বপ্নে মহামন্ত্রবরো হি লব্ধঃ শৃণষ্ব তৎ কিং সম্মতং স্যাৎ ॥
বরেত্রয়য়ংতৎশ্রবণাস্তিকং স্বযং প্রোবাচ ন্যাসোক্তমনুং বিশুদ্ধম ।
শ্রত্বানৃবদৎ সোহপি হবেরিদং স্যাৎ সন্ন্যাসমন্ত্রং পরমং পবিত্রম ॥
ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দত্ত্বা লৌকৈকনাথো গুরুরব্যয়াত্মা ।
গুরো দদস্বাদ্য মনীষিতং মে সন্ন্যাসমিত্যাহ পুটঞ্জলিঃ প্রভুঃ ॥'

['কড়চা'/৩/২/৭–৯]

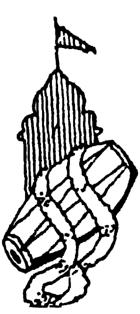
যার মমার্থ হলো, 'অনন্তর গুরুর (কেশবভারতী) হিতার্থী ঈশ্বর (নিমাই) তাঁহার (কেশবভারতীর) নিকটে গিয়ে তাঁর কর্ণ সমীপে বললেন, 'আমি স্বপ্নে মহামন্ত্র বর লাভ করেছি । আপনি তা শুনুন, এবং বলুন আমাকে এতে আপনার সম্মতি আছে কিনা ।' এই বলে নিমাই ভারতীর কর্ণকুহরে তিন বার সেই পরম পবিত্র ও বিশুদ্ধ সন্ন্যাসমন্ত্র উচ্চারণ করলেন । তাই শুনে কেশব ভারতী বললেন, 'হ্যাঁ, এটিই ভগবানের (হরির) পরম পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র ।' অতঃপর সেই লৌকৈকনাথ, সর্বলোক গুরু, অব্যয়াত্মা প্রভু (নিমাই) ছলে গুরুকে দীক্ষা দিয়ে, পুটাঞ্জলি হয়ে বললেন, 'হে গুরুদেব, এক্ষণে আমার অভীষ্ট সন্ন্যাস আমাকে দান করুন ।' *

উক্ত প্রাসঙ্গিকী সম্পর্কে লোচন দাস লিখেছেন,

'মন্ত্র শুনি ন্যাসিবর হৈলা প্রেমময় ।
কম্প পুলকিল অঙ্গ রাধাকৃষ্ণ কয় ॥
বৃন্দাবন যমুনা ফুকারে ঘন ঘন ।
বুঝিল এ জন কৃষ্ণ শচীর নন্দন ॥'

['শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'/নদীয়া/পৃঃ১৫৬]

নিমাই বা বিশ্বম্ভর মিশ্রের সন্ন্যাস করণ বা সন্ন্যাস গ্রহণ মোটামুটি এভাবে সমাপণ হলো । কিন্তু বিশ্বম্ভর মিশ্রকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করে গুরু কেশবভারতী অতঃপর আরেক চিন্তায় পড়ে গেলেন । 'মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি ।' কেননা, সন্ন্যাস কথাটির গূঢ় অর্থই হলো, স্ব=নাশ । অর্থাৎ এ পর্যন্ত (সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু ছিল, যাবৎ যতো কিছু ছিল) তার সামগ্রীকতা থেকে সার্বিক বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন জীবনে পদার্পণ । সুতরাং সন্ন্যাস উত্তর জীবনে প্রাক্ সন্ন্যাস জীবনের মাতৃ-পিতৃদত্ত নামটিরও বিলুপ্তি ঘটে । এ কারণে কেশবভারতী চিন্তায় পড়লেন । ঠিক চিন্তাও না, দ্বিধা ও



* কাটোয়ার গৌরাঙ্গ বাড়িব সিংহদরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে শ্রীচৈতন্যের মস্তক মুণ্ডনের স্থানটি চিহ্নিত রয়েছে দেখা যায় । তার পাশে ভিতরে রয়েছে শ্রীচৈতন্যের নাম প্রকাশের ও সন্ন্যাস-গ্রহণের স্থান ।

সংশয়ে পড়লেন তিনি। সংশয়ান্বিত হলেন এই জন্য যে, তিনি নিজে ছিলেন সম্প্রদায় সূচক 'ভারতী' উপাধি ধারী। সুতরাং গুরু পরম্পরা নিমায়েরও এই সম্প্রদায়বাচক উপাধি প্রাপ্য। কিন্তু 'ভারতী' মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উপাধি। আর এই মায়াবাদীরা বিশেষত কৃষ্ণের ও কৃষ্ণ ভজনের পারমার্থিকতাকে স্বীকার করে না। কিন্তু নিমাই তো মায়াবাদী নন। কৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী। এমন এক শিষ্যকে উপাধি দিতে গিয়ে গুরু ভারতী স্বভাবতই সংশয়ে পড়লেন। কেননা, ভাগবতের ২১১ পয়ারে ভারতী নিজেই বলেছেন, 'চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমন বৈষ্ণব/আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব।' সুতরাং ভারতী'এই বলে আশ্বস্থ হলেন যে, 'ভারতী' উপাধি শুধু প্রতিকূল না, এবং বেমানানও। কোন বৈষ্ণবের পক্ষেও অযোগ্য। অতঃপর ভারতী স্ব-সম্প্রদায়ের গহনতা অতিক্রান্ত হয়ে, নিমাই কর্তৃক পরিশোধিত মন্ত্রের আনিবার্য পথ ধরে বিশ্বম্ভর মিশ্রের নব নামকরণ করলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। কেননা, এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে নিজেই বলেছেন,

"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তত প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।"

অতঃপর আমরা এবার থেকে বিশ্বম্ভর ওরফে নিমাই বা 'নিমাঞি'-কে শুধুমাত্র চৈতন্য নামেই খ্যাপন করবো। অবশ্য প্রাক্ সন্ন্যাস অধ্যায়ে আবশ্যিক প্রয়োজনে আবারো বারংবার নিমাই আসবেন শচীমাতার দুলাল হয়ে, ভক্ত, আপ্তবর্গ ও নগরিয়াদের নিমাঞি হয়ে। সন্ন্যাসোত্তর জীবনে তিনি কর্মে ধর্মে ও প্রাতিষ্ঠানিকতায় 'চৈতন্য' নামে চিহ্নিত হবেন। কেননা, অতঃপর ক্ষেত্র বদলের ইতিবৃত্তে গন্তব্যাভিসারী বিশ্বম্ভর মিশ্রের গূঢ় জীবন ব্যাপ্তচারণিকতাকে 'পজিটিভ' ভাবে জানতে হলে, তার কালন্তর, কর্ম ও ক্ষেত্রভূমির পটভূমিকা আনুপুঙ্খ জানার ক্ষেত্রেও চৈতন্য নামের শাশ্বত স্ফুরণ আবশ্যিক। এবং তৎসহ আমরা চৈতন্যরূপী বিশ্বম্ভর মিশ্রের প্রাক্ ও উত্তর সন্ন্যাস জীবনের কয়েকটি দিন আনুপুঙ্খিক ভাবে অঙ্কের হিসেবে বুঝে নেবো তাঁর পদসঞ্চারের ক্ষেত্র ও দিনমান-দিনগত সময়টুকু।

আমরা ইতোপুর্বে অবগত ছিলাম যে, নিমাই ১৪৩১ শকের ২৬শে মাঘ বুধবার শেষ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করেছিলেন। ২৭শে মাঘ গঙ্গা পার হয়ে কোন এক সময় কাটোয়া (কণ্টক নগরে) পৌঁছেছিলেন।* (সঠিক কোন সময় তিনি

• পুত্রকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য নাকি গঙ্গা তীরস্থ নগরকে নিমাই জননী 'কণ্টকনগব' বলেছিলেন মনের দুঃখে। সেই কণ্টকনগর থেকে কেউ বলে কাটোয়া হয়েছে। ('পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'/অখন্ড সং/বিনয় ঘোষ/পৃঃ ২৯৮,৩০২)

• কিন্তু ওড়িআ লেখক ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শচীদেবী পুত্র নিমায়েব সন্ন্যাস করণের অব্যবহিত পরে কাটোয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং নিমায়ের দীক্ষাগুরু কেশব ভাবতীর কাছে এই বলে অনুরোধ উপরোধ করেছিলেন যে,—'এবে মো পুত্র লেউটাঅ।/মোর সম্পদ সর্ব নিঅ॥/এতেক বলি কর তাড়ি।/সন্ন্যাসী গোড়তলে পড়ি॥/' অর্থাৎ সন্ন্যাসী (কেশব ভাবতীর) পদতলে পড়ে শচীমাতা তাঁকে (ভারতীকে) বললেন, আমার ছেলেকে ফিরেয়ে দাও, তার বদলে আমার যা কিছু ধন সম্পদ আছে সব নাও। ('চৈতন্য ভাগবত' (ওড়িআ) ৪০ অধ্যায়)।



কাটোয়ায় পৌঁছে ছিলেন তা জানা যায় না)। যাই হোক, এদিন অবশিষ্ট অংশ ও দিনগত রাতটুকু পঞ্চ-পার্ষদের সাথে কীর্তন করে ('কৃষ্ণকথা আনন্দ প্রসঙ্গে') অতিবাহিত করলেন। এলো ২৮শে মাঘ। এদিন অতিবাহিত হলো সন্ন্যাসের আনুষঙ্গিক আয়োজনে। ২৯শে মাঘ সংক্রান্তি ও পূর্ণিমার সংক্রমণ মুহূর্তে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করলেন নিমাই।

নিমায়ের নতুন নামকরণ হলো, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সংক্ষেপে চৈতন্য।

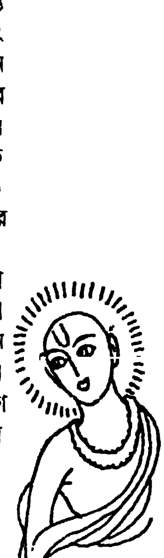
২৯শে মাঘ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের দিন রাত্রিটি কাটোয়ায় গুরু সমীপে অতিবাহিত করলেন চৈতন্য। সারারাত্রি গুরু শিষ্যে কীর্তন রসে মগ্ন রইলেন। ১লা ফাল্গুন প্রাতঃকালে বনে চলে যাবার মানসে 'চলিলা পশ্চিম মুখে করি হরিধ্বনি।' এই 'পশ্চিম মুখে' যাত্রা কালে চৈতন্যের সাক্ষী ছিলেন পাঁচ জন। যে পাঁচজন পার্ষদ সন্ন্যাস কালে চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন অর্থাৎ নিত্যানন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এঁদের মধ্যে দু'জনকে এই 'পশ্চিম মুখে'। যাত্রাকালে চৈতন্যের সঙ্গী হতে দেখা গেল না। এঁরা হলেন চৈতন্যের মেসো চন্দ্রশেখর ও চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ অনুষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোথায় চলে গেলেন জানা যায় না। সম্ভবত নবদ্বীপেই ফিরে গেছলেন তিনি। কিন্তু চন্দ্রশেখর আচার্য চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত কাটোয়ায় ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য যখন লোকালয় ছেড়ে বনে চলে যাওয়া মনস্থ করলেন, তখন—'তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।/সভাস্থানে কহিলেন "প্রভু বনে গেলা" ॥[1]এই অতীব দুঃসংবাদটি পৌঁছে দেবার অভিপ্রায় নিয়ে চন্দ্রশেখর ফিরে এসেছিলেন নবদ্বীপে।

তাহলে চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দকে বাদ দিয়ে আর তিনজন, নিত্যানন্দ মুকুন্দ ও গদাধর চৈতন্যের সঙ্গে থাকলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 'পশ্চিম মুখে' যাত্রা কালে চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন পাঁচজন। বাকী দুজন কে কে ? না গুরু কেশবভারতী ও গোবিন্দ। কিন্তু গোবিন্দ কে ? ইনিই কি সেই কড়চা লেখক বিতর্কিত কর্মকার গোবিন্দ দাস। যিনি নাকি চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের নিয়ত সঙ্গী ছিলেন। জানা যায় না। তবে অনুমিত হয়, হয়তো ইনিই সেই। যদিও বৈষ্ণব সাহিত্যের সুপন্ডিত রাধাগোবিন্দ নাথ মশাই সংশয় প্রকাশ করেছেন উক্ত গোবিন্দ নামটি নিয়ে। তিনি তাঁর 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে (সম্পাদিত/অন্ত্যখন্ড) লিখেছেন, 'এই পয়ারে যে গ্রন্থকার "গোবিন্দ"-র কথা বলিলেন, এই "গোবিন্দ" কে ? কোথা হইতেই বা ইনি প্রভুর পাছে পাছে চলিলেন ? "গোবিন্দ" সম্বন্ধে এই উক্তিও কি কিম্বদন্তীমূলক? আর, পূর্ববর্তী ২৫ পয়ারে বলা হইয়াছে, কাটোয়া হইতে প্রভু চন্দ্রশেখর আচার্যকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন ; সুতরাং কাটোয়া হইতে পশ্চিম দিকে গমনের পথে তিনি প্রভুর সঙ্গে থাকিতে পারেন না। কিন্তু ২/২৬/১৪৬ পয়ারে কথিত "ব্রহ্মানন্দ" কোথায় গেলেন বা রহিলেন ? "ব্রহ্মানন্দ" স্থলে লিপিকার প্রমাদবশতঃই কি "গোবিন্দ" পাঠ হইয়াছে ?[1](পৃঃ ১০ এর টীকা দ্রঃ)। কিন্তু রাধাগোবিন্দবাবুর এ হেন যুক্তি ঠিক যুক্তিযুক্ত বলে প্রত্যয় হয় না। প্রত্যয় হয় না এজন্য যে, যে পাঁচজন বৈষ্ণব মহাজন চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় কাটোয়ায় উপস্থিত ছিলেন তারা বৈষ্ণব সাহিত্যে শুধু বিখ্যাত নন চৈতন্যের বিশ্বস্ত পার্ষদ বলেও পরিচিত। চন্দ্রশেখর আচার্য সম্পর্কে চৈতন্যের মেসো। কেননা চন্দ্রশেখরের স্ত্রী ছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা ও নিমাই জননী শচীদেবীর সহোদরা। গদাধরকে তো চৈতন্যের ছায়াসঙ্গী বলা হয়।



নিত্যানন্দ ছিলেন অন্যতম প্রিয় পার্ষদ। আর মুকুন্দের চেয়েও বেশি গায়ক মুকুন্দের ভক্ত ছিলেন চৈতন্য। বাকী থাকেন ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দের সাথে চৈতন্যের কি ধরণের সম্পর্ক ছিল চৈতন্য চরিত গ্রন্থে তা প্রকট নয়। বরং প্রচ্ছন্ন। কিন্তু এই প্রচ্ছন্নতার মধ্যেও এটা বেশ স্পষ্টতর যে, তিনিও চৈতন্যের প্রতি বিশ্বস্ত পার্ষদদের একজন ছিলেন। সুতরাং সকলেই বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিচিত ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে লিপিকার প্রমাদবশতঃ ব্রহ্মান্দের জায়গায় গদাধর বা গদাধরের জায়গায় মুকুন্দ বা নিত্যানন্দ লিখতে পারেন, কিন্তু পাঁচ অতি পরিচিত কোন একজনের নামের স্থলে সম্পূর্ণ এক নতুন নাম বসিয়ে দেবেন একথা বিশ্বাস হয় না।

এখন দেখা যাক, 'চলিলা পশ্চিম মুখে করি হরিধ্বনি'—এই 'পশ্চিম মুখে' বলতে চৈতন্য কতোদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। চৈতন্য ভাগবতের ৩/১/৫১ ও ৩/১/৫৫ পয়ার থেকে জানা যায় যে তিনি গহন বনভূমির ভেতর দিয়ে রাঢ়াঞ্চল পর্যন্ত এসেছিলেন। এবং ৩/১/৮৪ পয়ার অনুসারে চৈতন্য বক্রেশ্বর এর (বর্তমান বীরভূম) চার ক্রোশ নিকটবর্তী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পূর্বমুখে যাত্রা করেন—'গঙ্গামুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র' (৩/১/৯৩)। অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকেই আবার ফিরে চললেন। কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি থেকে জানা যায় রাঢ় দেশে তিন দিন ভ্রমণ করেছিলেন চৈতন্য। 'রাঢ় দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ' (৩/৩)। অন্যত্র বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 'দিন-তিন-চারি যত দেখিলাম গ্রাম।/কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরি হাম॥' (৩/১/১০০)। এই 'দিন-তিন-চারি' কথাটা বোধ হয় কথার কথায় এসে গেছে। যেমন দু'দিন ছিলাম, তিনদিনের মাথায় যাত্রা করেছি, এমনকে আমরা দু-তিন দিন ছিলাম বলে থাকি। বৃন্দাবন দাস হয়তো সেই যুক্তিতেই একদিন বাড়িয়েছেন। আসলে কবিরাজ গোস্বামীর 'রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ' কথাটিই সঠিক। কারণ, কবি কর্ণপূর (মহাকাব্য ১১/৬১) ও মুরারি গুপ্ত (কড়চা ৩/৩/১৮) তে ওই একই কথা প্রকাশ করেছেন। তিনদিন। অর্থাৎ ১লা, ২রা, ৩রা ফাল্গুন। ৪ঠা ফাল্গুন গঙ্গাতীরে পৌঁছালেন। এবং ৫ই ফাল্গুন নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে চৈতন্য হরিদাসের গোঁফা—ফুলিয়া নগরে অবস্থান করতে লাগলেন। ফুলিয়া হলো শান্তিপুর থেকে তিন মাইল পূর্বে। পরদিন ৬ই ফাল্গুন এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে। নিত্যানন্দকে সেই মতোই নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। নিত্যানন্দের নবদ্বীপে পৌঁছাতে চারদিন সময় লেগেছিল। স্বাভাবিক নিয়মে এলে একদিনের বেশি লাগবার কথা না। নিত্যানন্দ ভাবের মানুষ, কখনো কদম্ব বৃক্ষে বাঁশি বাজিয়ে, কখনো 'গোষ্ঠে' (গোচারণ ভূমে) গড়াগড়ি খেয়ে, কখনো গো-বৎসের মতো গাভীর দুধ খেয়ে, কখনো হেসে, কখনো 'পথে বসি করেন রোদন', কখনো বা 'সর্প-প্রায় গঙ্গার স্রোতে ভাসে', এসব করে গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে যখন তিনি 'নবদ্বীপে প্রভু-ঘাট মিলিল আসিয়া' ততোদিনে চারদিন অতিক্রান্ত। অর্থাৎ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌঁছালেন ৯ই ফাল্গুন। ২৭শে মাঘ চৈতন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন। এই ২৭শে মাঘ থেকে ৯ই ফাল্গুন ১২ দিন শচীদেবী পুত্রের শোকে আহার করেন নি।



'যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস অবধি আইর উপবাস॥
দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন।'

চৈতন্য—১২

এমন এক মর্মান্তিক সময়ে নিত্যানন্দ উপস্থিত হলেন নবদ্বীপে। এবং এসে সর্বাগ্রে তিনি যেটি করলেন, তা হলো, বুঝিয়ে সুঝিয়ে শচীদেবীকে আহার করালেন। বললেন, নিমাই যখন বুকে হাত দিয়ে বলেছে, মায়ের সমস্ত ভার তার– ব্যবহার, পরমার্থ সব কিছু, তখন তুমি মিছেমিছি দঃখ পাচ্ছো কেন। তাছাড়া তোমার উপবাস মানে তো নিমায়েরই উপবাস। মা হয়ে সন্তানকে তুমি উপোসী রাখবে ?

অতঃপর দ্বাদশ দিনে উপবাস শচীমাতা ভঙ্গ করলেন। সেই সঙ্গে নিমায়ের ভক্তদের ভোজন করিয়ে তাঁদের তৃপ্ত করলেন তিনি। আসলে নিমায়ের ভক্ত পার্ষদদের নিমাই-জ্ঞানে ভোজন করিয়ে নিজেই পরিতৃপ্ত হলেন তিনি। কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা হলো, প্রায় সকল বিখ্যাত চৈতন্য চরিত গ্রন্থে এস্থলে চৈতন্য-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন খরব নেই। প্রিয় পতির গৃহ ত্যাগ জনিত কারণে এখানে তাঁর মানসিক অবস্থাটি আমরা বিলক্ষণ অনুধাবন করতে পারি। যে বনস্পতি জড়িয়ে বনলতা আকাশ ছোঁয়ার নিরন্তর স্বপ্ন দেখে, সেই বনস্পতি বনলতা হতে বিচ্ছিন্ন হলে স্বপ্নিক বনলতার সোনালি আশা কতোখানি কুয়াশাচ্ছন্ন, তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে যায় তাও আমরা অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় চৈতন্য চরিতাবলী সমূহে তার ইঙ্গিত নেই। না মুরারি না কর্ণপূর, এমন কি কৃষ্ণদাস বা বৃন্দাবনও এ বিষয়ে অভাবনীয় নিশ্চুপ। কিন্তু কেন ? বলা দুষ্কর। একমাত্র ব্যতিক্রম লোচনানন্দ। আর ওড়িশার মাধব পট্টনায়ক।

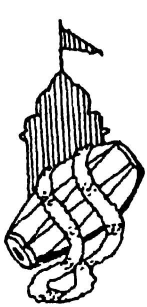
চৈতন্য-জননী শচীদেবী সহ চৈতন্যের অন্যান্য ভক্ত পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে নিত্যানন্দ এলেন শান্তিপুরে। চৈতন্য ততোক্ষণে ফুলিয়া থেকে শান্তিপুরে এসে গেছেন। এসে উঠেছেন নির্ধারিত অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে। কদিন থেকেই কিছুই প্রায় খাওয়া হয় নি। প্রায় বিশ-পঁচিশ রকম অন্ন-ব্যাঞ্জন দিয়ে রাজকীয় খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলেন আচার্য। স্বহস্তে রন্ধনকার্য করলেন আচার্য্যানী সীতাদেবী। এ স্থানে চৈতন্যের খাদ্য তালিকাটি নিবেদন করার লোভ সম্বরণ করা গেল না। যথা, দুরকম শাক (শাল্যন্ন, বাস্তুক), পটল, কুষ্মান্ড, বড়ি, মানকচু, চই মরিচ সুক্তা, বার্তাকী ভাজা, ফুলবড়ি ভাজা, আ-কুষ্মান্ড মানচাকী, নারিকেল, ছানা, মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মান্ড, মধুরাম্ল-বড়াম্লদি পাঁচ রকম অম্ল, মুগবড়া, মষবড়া, কলাবড়া, মিষ্টান্ন, ক্ষীরপুলি , সঘৃত-পায়স, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, দুগ্ধ-চিড়া, কলা (চাঁপাকলা), সন্দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা এতো সব খাদ্যের বহর দেখে চৈতন্য বললেন,

'প্রভু কহে সন্ন্যাসের ভক্ষণ নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ ॥'
[চৈঃ চরিতামৃত/২/৩]

তখন অদ্বৈত বললেন,

'আচার্য্য কহেন ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারি ভুরি ॥
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।'
[চৈ চরিতামৃত/২/৩য় পরিচ্ছেদ]



তখন চৈতন্য পিতৃ প্রতিম আচার্যের সাথে আহার বির্তকে আর না গিয়ে শুধু সংশয়াম্বিত কণ্ঠে বললেন, 'এত অন্ন খাইতে না পারি।' অর্থাৎ 'সন্ন্যাসীর ভক্ষণ নহে উপকরণ' বা 'ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ' প্রভৃতি নীতি

ধর্মের কূট বির্তকে আর গেলেন না। শুধু ব্যক্তিগত অপারগতা দেখিয়ে বললেন, 'এত অন্ন খাইতে না পারি।' উত্তরে অদ্বৈত বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি অকপটে আহার করো। যদি খেতে না পারো, ভুক্তাবশেষ 'পাতে' রেখে দিও।' চৈতন্য আবার নীতি ধর্মের বির্তকে জড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে।' অদ্বৈতাচার্য এরপর হক কথাটি বলে ফেললেন। বললেন, দ্যাখো বাপু, আর কেউ জানুক না জানুক তোমার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আমি তো বিলক্ষণ জানি। 'তিনজনের ভক্ষ্য পিণ্ড তোমার এক গ্রাস। তার এখানে যা খাবার দেওয়া হয়েছে এতো তোমার পাঁচ গ্রাসও হবে না। সুতরাং চাতুরী ছেড়ে ভোজন শুরু করো। 'এত বলি জল দিল দুই গোসাঞ্রির হাতে।' অর্থাৎ চৈতন্য ও নিত্যানন্দের হাতে।

এস্থানে পরস্পর অমিল দুটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য যখন রাঢ়াঞ্চল সফর শেষে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে এসে উঠলেন, নিত্যানন্দ অবধূতও তখন চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। বলতে হয়, এক মুহূর্তও একে অপরের সঙ্গছাড়া হননি। সেই সঙ্গে চৈতন্যের মানসিক পরিস্থিতিও এখানে বেশ জটিল দেখানো হয়েছে এবং তৎসহ আমাদের বোধগম্যের জটিলতাও বাড়িয়ে দিয়েছেন চরিতকার কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়। আসলে এ হেন জটিলতার প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের সদ্য ফেলে আসা স্মৃতির স্মরণ বিস্মরণ নিয়ে। অবধূত নিত্যানন্দ রাঢ়ের মানুষ, স্বভাবতই রাঢ়ভূমির পথ-ঘাট, লাল মাটি, শাল পিয়ালের গহিন জংগল সবকিছুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সদ্য আগত চৈতন্যের ক্ষেত্রে যা সর্বৈব অপরিচিত ছিল। কিন্তু শান্তিপুরের গঙ্গা কেন ও কেমন করে তিনি বৃন্দাবনের যমুনা বলে ভ্রম করলেন সেটা বেশ বিস্ময়কর বলে মনে হয়। বিস্ময়কর মনে হয় এইমাত্র কারণে, যে চৈতন্যের আশৈশব আকৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ ও পরবর্তী গঙ্গার সঙ্গে নিবিড় সখ্যতা ছিল, প্রেম ও প্রেমিকার গহন স্মৃতি যে বহতা গঙ্গার পাড়ে চির চিহ্নিত, সেই প্রতীতি নদীকে চৈতন্যের ভুল হয় কেন। এবং সন্দেহ আরও গাঢ় হয় সেইখানে, যেখানে পরিচিত নদী ধারাকে বিভ্রম বশে যমুনা বলে প্রত্যক্ষ করছেন চৈতন্য। এটা কিন্তু কোন গূঢ়ার্থব্যঞ্জক প্রত্যয় না, বিভেদহীন গঙ্গা যমুনারও ইংগিত নয়, খুব সাদামাটা সহজভাবে যমুনাকে যমুনা ভাবার নামান্তর মাত্র। দেখা গেল, আবার পরক্ষণে সেই স্মৃতিভ্রম চৈতন্য সন্ন্যাস বিষয়ক কূট প্রশ্নে অবতীর্ণ হচ্ছেন, সে যুগের প্রখ্যাত অধ্যাপক অদ্বৈতের সঙ্গে (চৈঃ চঃ ৩/৩/ দ্রঃ)। জিজ্ঞাস্য সেখানেই। অবশ্য গঙ্গা বিষয়ক বিভ্রান্তির ঘটনাটি কবিরাজ গোস্বামী ও দাস বৃন্দাবন যুগপৎ অভিন্ন লিখেছেন। কিন্তু বিভেদ দেখা যাচ্ছে নিত্যানন্দের বিষয়ে। বৃন্দাবন দাসের আখ্যায়িকায় দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য রাঢ়াঞ্চল সফর করে ফুলিয়ায় পৌছে নিত্যানন্দকে প্রেরণ করলেন নবদ্বীপে। এবং পরদিন পৌছালেন (ফুলিয়া থেকে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি শান্তিপুর নগরে। দুটি ঘটনাই স্ব-ইচ্ছায় ঘটেছিল। অর্থাৎ চৈতন্যের ইচ্ছায়। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে এসময়কার ঘটনাগুলি অন্যরকম ভাবে লেখা আছে। গোস্বামী মহাশয়ের মতে, শচীদেবী ও অন্যান্য ভক্তদের শান্তিপুরে নিয়ে যাবার জন্য চৈতন্যের আজ্ঞাবাহী নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসেন নি। এসেছিল রত্ন আচার্য, নিত্যানন্দের আজ্ঞাবাহী হয়ে। এবং রাঢ়ভূমি সফর শেষে চৈতন্য যে অদ্বৈতাচার্যের বাসায় উঠেছিলেন এটা সম্পূর্ণ



নিত্যানন্দের গোপন অভিপ্রায় বশতঃই ঘটেছিল।

'আচার্য্য রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্যের ঠাঞি॥
প্রভু লঞা যাব আমি তোমার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥'

[চৈ চরিতামৃত ৩/৩/, রিফ্লেক্ট সং]

অন্যত্র বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,

'প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ।
সভার করহ গিয়া দুঃখবিমোচন॥
এই কথা তুমি গিয়া কহিও সভারে।
আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে॥
সভার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাও শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের ঘরে॥'

[৩/১/১২৪-১২৭]

উপরোক্ত দুই মহাজনের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাঠ করেও একটা অভিন্ন সুর আমাদের মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং তা হলো, যেন পূর্ব পরিকল্পিত পথরেখা ধরে চৈতন্য এগিয়ে যাচ্ছেন, নীলাচলে যাবেন যেমন পূর্ব-পরিকল্পিত, তদ্রূপ অদ্বৈত মন্দিরে আসার ব্যাপারটিও তাঁর অজানা থাকে না। এমন চৈতন্যের রূপ ও রূপকারতত্ত্ব বিষয়টি আপাত সমতাহীন মনে হলেও আসলে কিন্তু চৈতন্য প্রতিকূল স্রোতে পাড়ি দিয়েছিলেন অনুকূল আবহাওয়াকে সামনে রেখেই। বিষয়টি কোথাও কোথাও অনির্দেশ্য মনে হবে, প্রচ্ছন্ন মনে হবে। কিন্তু নায়কের পূর্ব-উত্তর কার্যাবলীর যুক্তিযুক্ততার যৌক্তিকতা সুদৃঢ় যুক্তিকারে (a tortiori) বিশ্লেষণ করলে এর প্রকৃত উন্মোচনী রূপটি অনিবার্য ভাবে ফুটে ওঠে।

ওদিকে আচার্য রত্নের মারফৎ পুত্রের সংবাদ পেয়ে প্রাণপ্রিয় সন্তানকে চাক্ষুস দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন মা শচীদেবী। এ পরিস্থিতিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার মানসিকতা কেমনটি ছিল আমরা তথ্যগত ভাবে তার হদিশ পাইনি। চরিতকারেরা এ বিষয়ে বিস্ময়কর ভাবে নীরব থেকেছেন। এবং তাঁদের নীরবতার চেয়েও এ হেন নিঃস্তব্ধ থাকার অলিখিত কারণ আমাদের আরও আশ্চার্যান্বিত করে। তবে বিষ্ণুপ্রিয়া যে এসময় শ্বশুরালয়ে ছিলেন না এটা পূর্বাপর ঘটনাবলী থেকে যথেষ্ট ধারণা করা যায়।



বোধকরি চৈতন্য যেদিন অদ্বৈত মন্দিরে এলেন তার পরদিন প্রভাতে মা শচীদেবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। যদিও অদ্বৈতের বাড়িতে এ পর্যায়ে তিনি (চৈতন্য) 'দশদিন ভোজন কীর্তন' করেছিলেন এরকম একটা ইংগিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ আমাদের দিয়েছেন। তবে দু'দিনের মাথায় মাতা পুত্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে মনে হয়। শচীদেবী এসেছিলেন দোলায় চড়ে। সঙ্গে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সহ রত্ন আচার্য। কতিপয় পাড়া প্রতিবেশী নরনারীও সেই সঙ্গে এসেছিল। মাতা পুত্রের এই মিলনাত্মক দৃশ্যটিই বোধকরি চৈতন্য চরিতে সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক। চৈতন্য কাঁদছেন, শচী কাঁদছেন, যুগপৎ কান্নার

অনন্ত বেদনা আমাদেরও দু'চোখ অশ্রুসজল করে তোলে।

অখন্ড কীর্তন চলছিল অদ্বৈত ভবনে। খোল করতাল, খঞ্জনি, মৃদঙ্গের শব্দে চতুর্দিক সরগরম। এমন সময় বেদনা ভারাক্রান্ত শচীদেবী, ভক্তগণ, পিছনে রত্নাচার্য বন্যার জলের মতো প্রবেশ করলেন অদ্বৈত মন্দিরে *। মাকে দেখে মুহূর্তে বিহ্বল হয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী নিমাই। স্তনদায়িনী সর্বংসহা জননীর পাদমূলে আভূমি লুটিয়ে পড়লেন মুহূর্তে। নিমাইকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন শচীমাতা। বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোত নিমায়ের দু'চোখে। হঠাৎ কাঁদতেও যেন ভুলে গেলেন তিনি। অভিমান-ভরা পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন নিমায়ের দিকে। কবির মানস তুলিতে যে নিমায়ের রূপ ছিল ঃ

'অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো
এত ভৈল শুধুই সুনেহা॥'

অথবা –

'চাঁচর চিকুর চূড়া চারু ভালে।
বেড়িয়াছে মালতির মালে॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
সপত্র সহিত ফুলশাখা॥
কসিত কাঞ্চন জিনে অঙ্গ।
কাটি মাঝে বসন সুরঙ্গ॥

---

* পুরীর জগন্নাথের পান্ডারা আজও কতোদূর উদ্ধত ও নির্মম হতে পারে তারই একটি জ্বলন্ত নজির ঘটেছিল ১৯৮৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর। এদিন জনৈকা হিন্দু রমনী (নাম শ্রীমতি ডঃ কমলেশ চৌধুরী, ইনি একজন শিক্ষিকা) জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন যথারীতি পূজো ও জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্তে। ডঃ চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন কটকের রাধানাথ টেনিং কলেজের শিক্ষিকা ও প্রখ্যাত ওড়িআ কবি শ্রীমতি প্রতিভা রায়। এবং তৎসহ ডঃ চৌধুরীর কন্যা সোনালি। যেহেতু ডঃ চৌধুরীর গায়ের রঙ ফর্সা ও মাথার চুল 'বব' করা ছিল তাই পান্ডারা তাঁকে খৃষ্টান বলে সনাক্ত করে। অতঃপর শ্রীমতি চৌধুরী ও শ্রীমতি রায় জগন্নাথকে প্রণাম করতে গেলে ও দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু প্রণামী রাখলে পান্ডারা আরও বেশি অর্থ দাবী করে। ডঃ চৌধুরী তাতে অসম্মত হলে তার উত্তরে পান্ডারা হুমকি দেয় যে, উনি (ডঃ চৌধুরী) খৃষ্টান এবং সেজন্য ওঁকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে। কেননা খৃষ্টান হয়ে হিন্দুর মন্দিরে ঢুকে তিনি হিন্দু ধর্মকে কলুষিত করেছেন। তখন শ্রীমতি প্রতিভা রায় নিজেদের বারংবার হিন্দু বলা সত্ত্বেও এবং নিজেকে কটক রাধানাথ ট্রেনিং কলেজের শিক্ষিকা বলা সত্ত্বেও পান্ডারা তাঁদের মন্দির থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেয়। শ্রীমতি রায়কেও কেটে টুকরো টুকরো করে দেবার হুমকি দেয় পান্ডারা এবং ডঃ চৌধুরীর মেয়ে সোনালির হাত থেকে পাঁচ টাকার একটি নোট জোর করে ছিনিয়ে নেয়। এবং তারও চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, এ ঘটনা মন্দির প্রশাসনিক অফিসার মহোদয়ের উপস্থিতিতেই ঘটেছিল। (সূত্র 'পরিবর্তন'/১৯৮৮ এর ২৭ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা/পৃঃ ৫৯ দ্রষ্টব্য) এছাড়া পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডাদের পুরানো দিনের দৌরাত্ম্য জানতে হলে James Peggs এর 'A History of Orissa' (General Baptist Mission/London—1846) বইখানার বিশেষত 170-73 পাতা দেখতে পারেন।



চন্দন তিলক শোভে ভালে।
আজানুলম্বিত বনমালে॥
নটবর বেশে গোরাচাঁদ।
রমনীগণের কিবা ফাঁদ॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে।'

['ভক্তিরত্নাকর'/বাসু ঘোষ কৃত শ্লোক/পৃঃ ৯৩৪–৩৫]

অথবা–

'শচীকে নন্দন আজ দেখি মৈঁ চারু।
বারিজ বদন সুখ সদননি মদন মানো লোচন চারু॥
হাব হুলাস বাস মুখ পাননি অধর বিম্ব অতি চারু।
তিলক সুচারু অলক কলরোলনি কর্নন কুন্ডল গন্ডনাসা চারু॥
ভৌঁহন সৌহন মোমন গৌহন মোহন চিবুক সুচারু।'

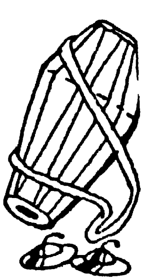
যার অর্থ, 'শচীনন্দনের লাবন্যময় রূপ আমি দেখলাম পদ্মমুখখানি সুখের আধার, চারু লোচন যুগলে যেন মদন বাস করেন। ভাবোল্লসিত মুখমন্ডলে অতি চারু বিম্বাধর। তাঁর চারু নাসায় সুচারু তিলক; চারু অলকদাম, চারু গন্ডদেশ, কমনীয় কর্ণ কুন্ডলের ধ্বনি। প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও আমি মনে মনে সেই মোহন চিবুকের সৌন্দর্য কীর্তন করি। (ব্রজভাষী সাহিত্য 'ক্ষণদাগীতি চিন্তামনি' থেকে ডঃ নির্মল নারায়ণ গুপ্ত কৃত অনুবাদ)।

অথবা যে গোরাচাঁদের অরূপ রূপের অপরূপ মহিমা সংক্রামিত করেছে নদীয়ার কুলবধূদের।

বেলা অবসানে ননদিনী সনে
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া
কলসী ভাঙ্গিয়া এনু॥
কাঁপে কলেবর গায়ে আসে জ্বর
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ পাথারে
সাঁতারে না পাই থা॥

[গৌর পদ তরঙ্গিনী]

যে গোরাচাঁদের 'রূপ নিরখিয়া (নিরীক্ষণ করে) নদীয়ার কুল বধূদের কাঁখের কলস মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়, সেই অমিয়া মাখা নবনী সম গোরাদেহ দু'হাতে আকড়ে স্থির স্থবির হয়ে বসে রইলেন জননী শচীদেবী। কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন বাক্য স্ফূরিত হলো না। পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন নিমাঞির পানে। বিস্ময়ের ঘোরে যেন কাঁদতেও ভুলে গেলেন তিনি।



নিমায়ের দু'চোখ অশ্রুস্নাত। বললেন, মা, 'তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।/তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥'

মান-অভিমান, স্নেহ, বিহ্বলতা, আর্তি, সংশয় সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। ভরা বর্ষায় ভিন্ন ভিন্ন শাখা নদীর জলধারা যেমনটি মূল নদীতে আছড়ে পড়ে, ও তার দু'কূল প্লাবিত করে দুর্বার, গর্জমান হয়ে ছুটে যায়, তদ্রূপ সর্বংসহা জননীর বুকের ভেতর রক্ষিত বেদনার নদীটি দু'কূল ছাপিয়ে এবার যেন আছড়ে পড়লো দু'চোখের কূলে কূলে, ভরভরন্ত হয়ে। সেই

প্লাবিত অশ্রুবন্যার বেগে শচীদেবী নয়, কঠোর সন্ন্যাসব্রতী 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যও' ভেসে গেলেন।

মাতা পুত্রের এই বেদনা-করুণ মিলনান্তক দৃশ্যটি যুগ কাল অতিক্রান্ত করে আজও বেদনার সঞ্চারণ ঘটায় আমাদের অনুভবে। আসলে শচীদেবী বা চৈতন্যের জন্য আমাদের তেমন দুঃখ থাকেনা। যদি ঘটনাটি গৌণ বলে মনে হয়। মুখ্য হলো দুঃখজাত আবহাওয়া। কে কাঁদে, না মা, কে কাঁদে-না পুত্র। এখানে চৈতন্য শচীদেবীর চেয়েও বড়ো কাছের মনে হয় এই মা আর পুত্রের শাশ্বত নৈতিকতার সৌন্দর্যে শোধিত চিরায়ত প্রত্যাশাকে।

'দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করি নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥'

দু'চোখ কুয়াশাচ্ছন্ন, অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায়, তারই মাঝে শচীদেবীকে বলতে শোনা গেল,

'কান্দিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥'

চৈতন্যের দু'চোখে শ্রাবণের নিরবচ্ছিন্ন বাদল ঝরে চলেছে। সন্ন্যাসী চৈতন্য অশ্রুসজলা জননীর কোলে বসে কখন নিমাই হয়ে গেছেন তা নিজেরই খেয়াল নেই।

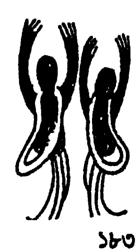
'কাঁদিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিব সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নাহিব উদাস॥
তুমি যাহা কহ আমি তাহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥'।

তো এই শেষোক্ত দু লাইনের অর্থ কি ? না মা তুমি যদি চাও আমি আবার গৃহে ফিরে যাই/এবং এই যদি তোমার আজ্ঞা হয়, আদেশ হয়, সে আদেশ সে আজ্ঞা আমি শিরোধার্য বলে মেনে নেবো। কোন পুত্র বিরোহী মায়ের কাছে গৃহহারা পুত্রের দেয় এ হেন প্রস্তাব আমাদের কাছে তুলনাহীন। সাত সাগর ছেনে মণি-মুক্তা এনেও এর তুলনা করা যাবে না। কিন্তু তুলনারোহিত এই অত্যানন্দ প্রস্তাবের উত্তরে জননী শচীদেবী পুত্রকে যা বললেন তা আমাদের পরম বিস্মিত করে। তিনি বললেন—

'তাহে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে সেই দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥'

[চৈতন্য চরিতামৃত/মধ্যলীলা/তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

কিন্তু এখানে স্বভাবতই সমীচীন কারণবশতঃ একাধিক প্রশ্ন এসে যায়। অন্তত দুটি কারণে এর নিশ্চয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। প্রথমত,



চরিতামৃতের এই যে পয়ারাংটি, 'নীলাচলে নবদ্বীপে সেই দুই ঘর' এ কথাটি আজ থেকে অনূর্ধ পাঁচশো বছর কাল প্রায় আগে অবিকল এই ভাবে বলা কতোখানি সম্ভবপর ছিল, অন্তত শচীদেবী পুত্র নিমাইকে যে সময় এ কথা বলছেন, বা কবিরাজ গোস্বামী নিমাই জননীর মুখ দিয়ে এ কথা বলিয়েছেন যখন, তৎ-সময়কালীন পরিস্থিতিতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত কথা ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চারিত হওয়ায় সততই আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্যের সম্মুখীন হতে হয় যদিও এটি স্বগত জিজ্ঞাস্য হিসাবেই চিহ্নিত হবে। কেননা, মা শচীদেবী বা শ্রীল গোস্বামীকে আমাদের জিজ্ঞাস্যের যেমন সুযোগ নেই, তেমনই মহাকালের চলমান রথ ও তার রূঢ় রথী ও তার ধাবমান অবিচল-অশ্ব সেই সব যুগ যুগান্তের সীমান্ত ছাড়িয়ে এতোদূর অগ্রসরমান যে রথচক্রের জীর্ণ-শীর্ণপ্রায় চিহ্নরেখাই আজ আমাদের একান্ত সম্বল। আর ঠিক এখানে ইতিহাস কথা বলে মানুষের সঙ্গে। সুতরাং এই ইতিবৃত্তই তখন সাক্ষ্য ও সাক্ষী।

বেশ মনে পড়ে, এ নিবন্ধের লেখক বেশ কয়েক যুগ আগে তার দক্ষিণ ফেরৎ ঠাকুরমার মুখে শুনে থাকে, দক্ষিণ তীর্থে গেলে মানুষ আর বাড়ি ফেরে না। দক্ষিণ তীর্থ কি, না নীলাচল ক্ষেত্র। অর্থাৎ ইদানীন্তন পুরী। তো ঠাকুরমার আমলে দক্ষিণ তীর্থে গিয়ে যে মানুষ ফেরৎ আসতো ঠাকুরমার পুনর্গমন তার প্রমাণ রাখে। কিন্তু তথাপিও মানুষের মুখে মুখে হুবহু এরকম একটা কথা প্রচলিত গানের প্রথম কলির মতো ঘুরে বেড়াতো। সেই 'সব তীর্থ একবার' গঙ্গাসাগরের মতো। এর নেপথ্যে কি কিছু কারণ নেই? আজকের প্রজন্ম দু'তিন পুরুষ আগের ইতিহাস ঘাটলে দেখবেন, দক্ষিণ ফেরৎ পুণ্যোৎসাহী মানুষকে রীতিমত তেঁতুল খাওয়ানো হচ্ছে লোনা কাটানোর জন্য। আর পুরীর পান্ডারা এইমাত্র মন্দির কর্তৃত্ব সরকারী অধিগ্রহণের আগে পর্যন্ত যে ধরণের বদরাগী ছিল (এখনো কি নেই ?)* তা বোধকরি নীলাচল প্রত্যাবর্তিত পুণ্যার্থী মাত্রেই অবগত থাকবেন।

কিন্তু এতো গেল একটা দিক। এর আরেকটা দিকও রয়েছে। সেটা হলো যাত্রাপথের দুর্গমতা। চৈতন্য সমকালীন যুগে পদব্রজই ছিল যাতায়াতের অন্যতম সম্বল। অবশ্য চরিতামৃতে বা চৈতন্য ভাগবতে কিছু কিছু স্থানে 'দোলা'-র কথা বলা আছে। কিন্তু তা সুদীর্ঘ যাত্রার জন্য উল্লেখিত হয়নি। তখন বিপদ সঙ্কুল নদীপথ ও সূর্যহারা অরণ্য-কুটিল সর্পিল চরণরেখাই ছিল পান্থজনের একমাত্র অবলম্বন। এছাড়াও 'নীলাচলে নবদ্বীপে সেই দুই ঘর' কথাটির তাৎক্ষণিক প্রতিকূলতাজনিত ইতিহাসও আছে। সেটা পথিকের পথের ইতিহাস। গৌড়বঙ্গ থেকে উৎকলগামী পথের ইতিবৃত্ত। আমরা ইতোপূর্বে অবগত রয়েছি যে, চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের বৎসরটি হলো ১৪৩১ শক বা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ এবং এই ১৫১০ খ্রীঃ বা ১৪৩১ শকাব্দেই তিনি নীলাচল যাত্রা করেছিলেন। কবি কর্ণপূর তাঁর 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে লিখেছেন যে, সে সময় গৌড়াধিপতি যবন রাজা ও প্রতাপরুদ্রের (উৎকলরাজ) উভয়পক্ষীয় ভয়ংকর সৈন্যদের মধ্য দিয়ে চৈতন্যকে গমন করতে হয়েছে। এবং এ জন্য তাকে বার বার রাজপথ পরিত্যাগ করে বনপথ অবলম্বন করতে হয়েছে। 'হন্ত ইদানীং গৌড়াধিপতে যবন ভূপালস্য গজপতিনা সহ বিরোধে গমনাগমনেব ন বর্ত্ততে কথময়ং চতুর্ভিরেব পরিজনৈঃ সহ গচ্ছতি।' এমন কি চৈতন্য যখন ১৪৩৫ শকে (১৫১৪ খ্রীঃ) নীলাচল থেকে গৌড় প্রত্যাবর্তন করেন তখনও উভয়পক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ নির্মল নারায়ণ গুপ্ত মশাই তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৫০৯

সালে (?) শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ থেকে উড়িষ্যায় যাবার পর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় বাঙলা উড়িষ্যা সীমান্তে যুদ্ধবিগ্রহ সব সময় লেগেই থাকত। হুসেন শাহের রাজত্বকালে এ বিবাদ শেষ হয় নি। চার বছর পরে পুরী থেকে ফেরার পথেও শ্রীচৈতন্য দেখেছিলেন সীমান্তে আগের মত অশান্তি লেগে আছে (পৃঃ ১৬)।

সুতরাং এ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভিত্তিক একটা জিনিষ বোধকরি সুস্পষ্ট হলো যে, গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের সঙ্গে উৎকল রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র যে মুহূর্তে ভয়ংকর সীমান্ত যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক সেই মুহূর্তে শচীদেবী গৃহত্যাগী পুত্রকে 'নীলাচলে নবদ্বীপ সেই দুই ঘর' কথাটি বলছেন। অবশ্য শচীদেবী সর্বান্তকরণে এ কথা বলেছেন কিনা বলা শক্ত। যদিও কবিরাজ গোস্বামী তেমন কোন ইংগিত আমাদের দেন নি। কিন্তু তা যদি থাকতো, তবুও তৎসময়কালীন পরিস্থিতিতে শচীদেবী একমাত্র (অবলম্বন বিশেষ) পুত্রকে সুদূর প্রবাসী হতে সমর্থন করতেন কিনা তা সতত্ই বিবেচ্য বিষয়।

যাই হোক, শচীদেবীর এই উক্তি দিয়ে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যের নীলাচল যাত্রার দুর্গম পথটি যেমন প্রশস্ত করলেন, তেমনই পূর্ণচ্ছেদ টানলেন নদীয়া নবদ্বীপ ও চৈতন্যের মধ্যে। শৈশব, কৈশোর, প্রাক্ যৌবন ও যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত নিরবিচ্ছিন্ন নবদ্বীপ থেকে ক্রমে এভাবে চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন 'নদের নিমাই'। নিমায়ের বয়স তখন সাকুল্যে ২৪ বৎসর। 'চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ/প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপ-তলতঃ।' (মহাকাব্য ২০/৪০)।

অতঃপর নিমাইকে বাঙলা থেকে বিদায় দেবার সন্ধিক্ষণে তাঁর জীবন মৃত্যুর হিসাব নিকাশটি আরেকবার আমরা দেখে নিই। নিমায়ের জন্ম ১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন/৮৯২ বঙ্গাব্দ/ইংরাজি ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ২৭শে ফেব্রুয়ারী। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৪৩১ শকের ২৯শে মাঘ/ইংরাজি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ। নিমায়ের তিরোভাব ১৪৫৫ শকের ৩১শে আষাঢ়/১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন/৯৪০ বঙ্গাব্দ। নিমাই মোট গৃহবাসী ছিলেন, ২৩ বৎসর ১১ মাস ৬ দিন। তাহলে অঙ্কের হিসাবে নিমায়ের সন্ন্যাস জীবনের সময়সীমা দাঁড়ায়, ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন। এই ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন সন্ন্যাস জীবন কালের সিংহ ভাগ সময় নিমাই পুরীতে কাটিয়েছেন। নিবাসস্থল ছিল কাশী মিশ্রের বাড়ি। যা আজও 'গম্ভীরা' নামে খ্যাত। দেখা যাচ্ছে এই ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন সন্ন্যাস জীবনের মোট ১৮ বছর নিমাই নীলাচলে (পুরী) উক্ত গম্ভীরায় কাটিয়েছেন। কিন্তু অঙ্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে বোধ হয় এ সময় সঠিক ১৮ বৎসর দাঁড়ায় না। কেননা, নীলাচলে দীর্ঘ অবস্থান কালে নিমাই ভারতের অপরাপর আরও কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। যেমন,

দাক্ষিণাত্য গমনাগমনে সময় লেগেছিল দুই বৎসর
গৌড়দেশে গমনাগমনে সময় লেগেছিল প্রায় আট মাস
বৃন্দাবন গমনাগমনে সময় লেগেছিল প্রায় দশ মাস



মোট প্রায় বিয়াল্লিশ মাস

সুতরাং ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন থেকে ৪২ মাস বা প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদ দিলে দাঁড়ায় প্রায় ২০ বছর ১ মাসের মতো। কিন্তু ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মশায়ের 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে 'আট-নয় মাস' ও 'প্রায়' প্রভৃতি আনুমানিক-অর্থক কথাগুলি থাকায় প্রত্যয় হয় যে, বাকী ২ বছর

১ মাস সময় দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন ও গৌড়দেশ খাতেই ব্যয় হয়েছিল। তাছাড়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের অব্যবহিত পর নিমাই যে রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং পরিভ্রমণ অন্তে ফুলিয়া ও শান্তিপুরে (অদ্বৈতাচার্যের গৃহে) অবস্থান করেছিলেন সে সময়টিও ওই ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন সময়কালের মধ্যেই দেখতে হবে। তাছাড়া অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশাই নিমায়ের মোট ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন সন্ন্যাস জীবনে নীলাচলে অবস্থিতির বাইরে যে ৪২ মাস বা সাড়ে তিন বছর দেখিয়েছেন তার মধ্যে নিমায়ের রাঢ়দেশ ভ্রমণ ও ভ্রমণান্তে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে উপস্থিতি যেমন ধরা নেই তেমনই সাড়ে তিন বছরের কম আবার বেশিও ভ্রমণের সময়সীমা একাধিক চৈতন্যচরিতে বর্ণিত আছে। (মহাকাব্য ২০/৪০, চৈতন্য চরিতামৃত ২/১/১৪ দ্রষ্টব্য)

[পনেরো]

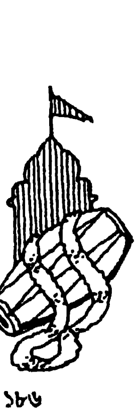
চৈতন্য কি ওড়িআ ছিলেন?

চৈতন্য বাঙালি ছিলেন না ওড়িআ ছিলেন এ নিয়ে পন্ডিত মহলে বেশ কিছু বিতর্ক রয়েছে। আর এ হেন বিতর্কের সূচনা করেছেন বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম চৈতন্য চরিতকার জয়ানন্দ। তিনি তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে কিছু অভিনব কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। তার মধ্যে চৈতন্যের পূর্বপুরুষরা নাকি ওড়িআ ছিলেন এই কাহিনীটিই সর্বাধিক চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ।

বৈষ্ণবিয়া কবি জয়ানন্দ তাঁর বিতর্কিত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের নদীয়া খন্ডে (পৃ-৯৬) লিখেছেন,

'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ
আছিল যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাঞা গেল
রাজা ভ্রমরের ডরে॥

মজার ব্যাপার হলো এই যে, কবি জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে যে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন, অর্থাৎ 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে' এ সংবাদ ষোড়শ শতাব্দীর আর কোন বইতে পাওয়া যায় না। এমন কি আদি চৈতন্য চরিতকার মুরারির কড়চা বা কর্ণপূরের মহাকাব্যেও না। এ দুটি দবশ্য সংস্কৃত গ্রন্থ। কিন্তু সংস্কৃত ছাড়াও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচনার আগে বাঙলা চৈতন্য চরিত গ্রন্থও একাধিক রচিত হয়েছিল। যেমন কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত'। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'। এছাড়াও জয়ানন্দ নিজেই তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের সৃষ্টি বা আদি খন্ডে লিখেছেন যে, তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনার পূর্বেই সার্বভৌমের চৈতন্যসহস্রনাম, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভ াগবত, গোপাল বসুর চৈতন্যমঙ্গল ও পরমানন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গ বিজয় প্রভৃতি পুস্তক রচিত হয়েছিল। কিন্তু সার্বভৌম, বৃন্দাবন দাস, গোপাল বসু বা পরমানন্দ গুপ্ত তাঁদের গ্রন্থ সমূহে এমন কোন তথ্য বা সূত্র পরিবেশন করেন নি যার ওপর নির্ভর করে বলা যায় চৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা ওড়িআ ছিলেন।



সুতরাং প্রশ্ন হলো, জয়ানন্দ এরকম অভিনব তথ্যটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন ? এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে লিখেছেন, 'জয়ানন্দ এমন অনেক নুতন সংবাদ দিয়েছেন, যাহা ষোড়শ শতাব্দীর অন্য কোন বইতে পাওয়া যায় না। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা সমসাময়িকের উক্তি হিসেবে খুবই মূল্যবান। কিন্তু শ্রীচৈতন্য বা তাঁহার সঙ্গীগণের সম্বন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার প্রদত্ত এই নূতন তথ্য কতদূর সত্য তাহা যাচাই করিয়া লইবার উপায় নাই। তিনি জনপ্রবাদ যেমনভাবে শুনিয়াছেন তেমনি লিখিয়াছেন।' (পৃষ্ঠা-২৩৭)

যুক্তি তর্কের ওপর নির্ভর করে যদিচ ধরেই নেওয়া হয় যে, কবি জয়ানন্দ চৈতন্যের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে যে তথ্য তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন সেই সূত্রটি তিনি পেয়েছেন জনপ্রবাদ বা লোকশ্রুতির মাধ্যমে অর্থাৎ 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে ৷ শ্রীহট্ট দেশেরে পালাঞা গেল রাজা ভ্রমরের ডরে' ॥ এই তথ্যটি তিনি জনশ্রুতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের নদীয়া খন্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন।

যুক্তি তর্কের ওপর নির্ভর করে এ কথাও মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, সে সময় (আজ থেকে পাঁচ শতাধিক বৎসর আগে) ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালাদেশে কোনও বই পত্রের প্রচলন ছিল না। সে সময় পাঠ্যশিক্ষার সমস্ত নিয়ম কানুনটাই ছিল যৎ সামান্য পুঁথির ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষাব্রতীরা দূর দেশ থেকে সেই সকল পুঁথির নকল আনতেন। তৎকালীন পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই সেই কারণে মুখস্ত বিদ্যা বা শ্রুতি বিদ্যার ওপর নির্ভর করতো এবং সংস্কৃত চর্চা ছিল কথিপয় মানুষের করায়ত্ব।

এ প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি মাধব আচার্য লিখেছেন, 'ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে/লোকভাষা রূপে কহি সেই পরমাণে।'

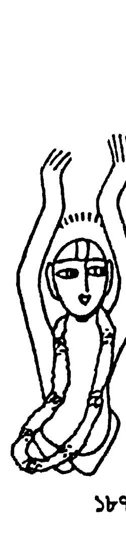
ষোড়শ শতাব্দীর আরেক কবি রামচন্দ্র খান লিখেছেন, 'সপ্তদশ পর্ব্ব-কথা সংস্কৃতে বন্ধ/মূর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ।'

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি দৌলত কাজী লিখেছেন, 'দেশীয় ভাবে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দ/সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ।'

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার কবি রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র লিখেছেন, 'না রহে প্রসাদগুণ না রহে রসাল/অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।'

উপরোক্ত এই সব প্রাচীন কবিদের উদ্ধৃতি সমূহ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে ষোড়শ এমন কি সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে ও খুব বড়ো মাপের শিক্ষার প্রসার বিশেষত সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার বাঙালাদেশে ঘটেনি। সে সময় সাধারণ মানুষের কাছে স্ব-স্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক বাঙলা ভাষাই ছিল শিক্ষার বাহক। এবং লোক পরম্পরা কোন অতীত ঘটনা জনশ্রুতির মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তো।

সুতরাং লোকশ্রুতির যুগের মানুষ বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ যদি লোক পরম্পরা কোন জনশ্রুতিকে তাঁর গ্রন্থে স্থান দেন সেটা কবির ক্ষেত্রে খুব দোষণীয় কিছু বলে মনে হয় না। বরং এটাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল। কেননা, জয়ানন্দের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় সময়কার লেখকরাও প্রচুর জনশ্রুতিকে তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ঠাঁই দিয়েছেন। যেমন বৃন্দাবন দাসের কথা ধরা যাক ; তিনি তো নিত্যানন্দ ও গদাধর গোস্বামীর মৌখিক অনেক ঘটনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে সেই সকল ঘটানাকে তাঁর ভাগবতে ঠাঁই



দিয়েছেন। বৃন্দাবন দাস নিজেই লিখেছেন, 'নিত্যানন্দ প্রভুর মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব/কিছু কিছু শুনিলাঙ সবার মহত্ত্ব।' অন্যত্র গদাধর গোস্বামী প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'যেমন কৃষ্ণের প্রিয় পাত্র বিদ্যানিধি।/গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥' (চৈ. ভাগবত, ২/২০/৩০৯ ও ৩/১১/৫১৭ দ্রষ্টব্য) চৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজও রঘুনাথ দাসের মুখে মুখে শোনা অনেক কথা তাঁর গ্রন্থে ঠাঁই দিয়েছেন। যথা, স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল। রঘুনাথ দাস মুখে যেসব শুনিল।/সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া।' (চরিতামৃত ৩/৩)। যেমন লোচন দাস গুরু নরহরি সরকারের মুখে শোনা বহু ঘটনা তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এভাবে মুরারি কর্ণপুর প্রায় সকল বৈষ্ণব মহাজনেরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে অল্প বিস্তর জনশ্রুতি বা মৌখিক শোনা কথাকে বিনা দ্বিধায় স্থান দিয়েছেন।

সুতরাং 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে' এমন একটি তথ্য জয়ানন্দ যদি জনশ্রুতির মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হবার কারণ নেই। মধ্যযুগের সকল বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে যখন জনশ্রুতি বা লোকশ্রুতির প্রভাব স্বল্পবিস্তর বিদ্যমান দেখা যাচ্ছে তখন জয়ানন্দের ক্ষেত্রে তার রকমফের ঘটার কারণ থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জয়ানন্দ 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে'–এরকম একটি সংবাদ পেলেন কার কাছ থেকে। ধরে নিলাম, তিনি কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজনের কাছে এ তথ্যটি পেয়েছেন। তাই যদি হয়, তাহলে জয়ানন্দের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন চৈতন্য চরিতকারের বইতে এই তথ্যটি নেই কেন? সন্দেহ জাগে সেখানে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর বইতে লিখেছেন, 'জয়ানন্দ শোনা কথার ওপর নির্ভর করিয়া অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে এইসব মারাত্মক ভুল খবর রহিয়া গিয়াছে।' (চৈ, উ, ২৩০)।

তবে কি 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে'–এই সংবাদটি যিনি জয়ানন্দকে দিয়েছেন তিনি ভুল খবর দিয়েছিলেন? নাকি এই কাহিনীর পুরো ঘটনাটাই কবি জয়ানন্দের স্ব-কল্পিত? কোনটি সত্য বলা দুষ্কর। তেমনই বুক ঠুকে এ কথাও বলা যাবে না যে, যেহেতু জয়ানন্দকবির সংবাদটি মিথ্যে, ভিত্তিহীন তাই 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে'–এ হেন সংবাদ আর কোন চৈতন্য জীবনীকারের রচনাতে পাওয়া যায় না। কেননা, প্রায় সকল চৈতন্য জীবনীকারের গ্রন্থে এমন কিছু না কিছু তথ্য আছে যা দ্বিতীয় কোন চৈতন্য চরিতকারের রচনাতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ চৈতন্যের মৃত্যু রহস্যের ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রায় সকল চৈতন্য চরিতকারই চৈতন্যের মৃত্যু বা তিরোধানের কথা লিখে গেছেন। কিন্তু একেকজন একেকরকম মৃত্যুর কারণ দেখিয়েছেন। কারো সাথে কারুর বক্তব্যে কিছুমাত্র মিল নেই। যেমন–বৃন্দাবন দাসের মতে, চৈতন্য জগন্নাথের দারুময় দেহে লীন হয়ে গেছেন। জয়নন্দের মতে, আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন পায়ে ইঁটের টুকরো বেঁধে ব্যথা হয়। তারপর সপ্তমী তিথিতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় তোটা গোপীনাথের মন্দিরে মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে, সমুদ্রে পতন তারপর অচৈতন্য অবস্থায় 'জালিয়া'দের জালে উঠে আসা ও 'চৌদ্দশত পঞ্চান্নে' অন্তর্দ্ধান। অন্যত্র নবাবিষ্কৃত পুঁথি 'চৈতন্যচকড়া (বৈষ্ণবদাস লিখিত) মতে রাত্রি দশ দণ্ডে চন্দন বিজয়ের সময় চৈতন্যের মৃতদেহ জগন্নাথ মন্দিরের গড়ুড় স্তম্ভের নীচে পড়ে



থাকতে দেখেছিলেন লেখক স্বয়ং ।

চৈতন্য জীবনীকারদের রচনায় এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যা একের বক্তব্যের সাথে অন্যের বক্তব্যের মিল নেই । বরং বলা যায়, মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি ।

সুতরাং 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে'—জয়ানন্দের এই বক্তব্য আর কোন চৈতন্য গ্রন্থে নেই বলে সমস্ত বক্তব্যটাকে অলীক বা মিথ্যে বলে পর্যবসিত করা যায় না । কারণ, আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে দেখতে পেলাম, এক চৈতন্যচরিত গ্রন্থে এমন অনেক তথ্য আছে যা অপরাপর চৈতন্য চরিতে পাওয়া যায় না । সে কারণে 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে' জয়ানন্দের এ সংবাদটি যেমন সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, তেমনি অলীক বা মিথ্যে বলে অস্বীকার করাও দুষ্কর ।

যাই হোক, চৈতন্যের পূর্বপুরুষরা শ্রীহট্টের জয়পুরে বসবাসের আগে যে ওড়িশার যাজপুরে বসবাস করতেন এ কথা ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দীনেশচন্দ্র, অসিত বন্দোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার সকলেই বলেছেন । যদিও জয়ানন্দের সূত্র থেকেই তাঁরা এ কাহিনী সূত্রিত করেছেন । কিন্তু চৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা যেহেতু ওড়িশাবাসী* সেই হেতু ওড়িআ ছিলেন এমন কথা কোন ঐতিহাসিকই বলেন নি । এমন কি এই বিতর্কের যিনি প্রধান হোতা সেই জয়ানন্দও না ।

বোধহয় এমন কথা বাঙলাদেশে একজনই বলেছেন । তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু ।*

আর বলেছেন ওড়িশার ইদানীন্তন ঐতিহাসিকেরা ।

যদিও সমরেশ বসু সাহিত্যিক এক কথায় ঔপন্যাসিক বা গল্পকার সে কারণে তাকে পুরোদস্তুর ঐতিহাসিক, বলা সঙ্গত নয় । কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে আমাদের যে, যিনি 'গঙ্গা' লিখেছেন তিনিই কালকূট ছদ্মনামে লিখেছেন 'শাম্ব' । মূলত একজন সার্থক ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ঐতিহাসিক না হলেও অনেক ইতিহাস কিন্তু তাঁকে পড়তে হয়, জানতে হয় । এবং নিজেও একদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়ে যান । সুতরাং এমন একজন সচেতন ও যুগ কালোত্তীর্ণ কথা সাহিত্যিক ইতিহাস থেকে চরিত্র এনে মনগড়া কালিকলমের কেরামতি দেখাবেন একথা ভাবা যায় না নিশ্চয় । যদিও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ইতিহাসের গল্প কোন ইতিহাস নয় । কিন্তু সমরেশ বসু 'ভ্রমর' হয়ে যে কাহিনী শুনিয়েছেন তা ইতিহাসের গল্প হলেও

* বৈষ্ণব কবি জয়নন্দের মতে চৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা একসময় ওড়িশার যাজপুরের অধিবাসী ছিলেন . পরে রাজা ভ্রমরের (কেপিলেন্দ্র দেব) অত্যাচারে শ্রীহট্টের জয়পুরে চলে আসেন`। ওড়িশার যাজপুর অঞ্চল থেকে শ্রীক্ষেত্র বা পুরীর দূরত্ব চল্লিশ ক্রোশ অর্থাৎ প্রায় আশি মাইল । পুণ্যসলিলা বৈতরণী নদীর তীরে অবস্থিত এই যাজপুর ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এক প্রসিদ্ধ নগরী ছিল ।



* সমরেশ বসুর ছদ্মনাম 'কালকূট' সকলের জানা । কিন্তু 'ভ্রমর' নামটিও যে সাহিত্যিক সমরেশ বসুর আরেকটি ছদ্মনাম তা হয়ত অনেক পাঠক/পাঠিকারই অজানা । এবং এই ছদ্মনামে তিনি একমাত্র শারদীয় সংখ্যা 'প্রসাদ' পত্রিকায় লিখতেন । 'প্রভু, কার হাতে তোমার রক্ত' এই শিরোণামে ১৩৯০-এর শারদীয়াতে একটি উপন্যাসোপম লেখায় চৈতন্য ওড়িয়া ছিলেন একথা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন ।

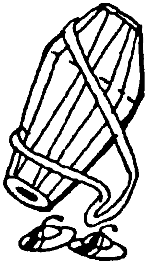
ইতিহাস নিয়ে লেখা নিছকই গল্প নয়। বরং নিজের কথায়, নিজের মতো করে ইতিহাসকেই বলতে চেয়েছেন তিনি। 'ভ্রমর' এক্ষেত্রে গল্পকার সমরেশ বসু না, ইতিহাসের একটি করুণ-কঠিন সময়কার সূত্রধর মাত্র।

তো এই সমরেশ বসু 'ভ্রমর' ছদ্মনামে, ভ্রমর হয়ে লিখেছেন 'প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত'। এখানে তাঁর প্রভু কে, না আমাদের চৈতন্যদেব, শচীমার নিমাই, নবদ্বীপ নাগরিয়াদের গৌরাঙ্গ। তো এই গৌরাঙ্গ, নিমাই বা চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে 'ভ্রমর' এক জায়গায় বলেছেন,

'যাজপুরেই ছিল নিমায়ের পৈতৃক ভিটা। রাজা কপিলেন্দ্র (?) দেবের উপাধি ছিল ভ্রমর। তাঁর ভয়ে নিমায়ের কয়েক পুরুষ আগে, তারা যাজপুর ছেড়ে শ্রীহট্টের অধিবাসী হয়েছিল। নিমাই সেই পূর্বপরুষদের ভিটার অন্বেষণে গিয়েছিল। আপনারা বাঙালীরা বিশ্বাস করতে চান না, নিমাই প্রকৃত পক্ষে ছিল ওড়িআ। যদি এ কথাটা মানতে না চান, অন্তত তার পূর্বপুরুষরা যে ওড়িআ ছিলেন, সে বিষয়ে মতানৈক্য থাকা উচিত না। সেই ভিটার অন্বেষণ করতে গিয়ে, নিমাই পরম বৈষ্ণব কমললোচনের গৃহে একদিন বাস করেছিলেন।' (প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত/শারদীয় প্রসাদ ১৩৯০/পৃ-৬৯)

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে চৈতন্য যাজপুরে গেছলেন। প্রথম বার গৌড়দেশ থেকে ছত্রভোগ হয়ে পুরী যাত্রা কালে তিনি জলেশ্বর, বাঁশদা, রেমুনা হয়ে যাজপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও একথা স্পষ্ট করে বলা আছে। 'কথোদিনে মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর।/আইলেন যাজপুরে-ব্রাহ্মণনগর ॥' (৩/২/২৭১)। এছাড়াও কবি কর্ণপুরের মহাকাব্য (১১/৮০/, ১১/৮২) ও কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে (২/৫) চৈতন্যের যাজপুর গমনের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু চৈতন্য পৈতৃক ভিটে দেখতে যাজপুরে গেছলেন এমন কথা কোন চরিতকার লেখেন নি। এমন কি এই বিতর্কের নায়ক কবি জয়ানন্দও না। তাহলে সমরেশ বসু এ তথ্যটি কোথায় পেলেন ? পরন্তু তিনি লিখেছেন, 'নিমাই প্রকৃত পক্ষে ওড়িয়া।' নিমাই বাঙালি হতে পারেন, ওড়িআ-ও হতে পারেন এটা আমাদের বা নিমায়ের ক্ষেত্রে কোন অসম্মানজনক ব্যাপার না। নিমাই মানুষের ঘরে মানুষ হয়েই যখন জন্মেছেন তখন তার জাতি-গোত্র তো একটা থাকবেই, সে ওড়িআ কি বাঙালি হোক। বড়ো কথা, তিনি কি সত্যিই ওড়িআ ছিলেন ? তাঁর পিতৃপুরুষেরা কি সত্যিই ওড়িআ ছিলেন ? যদি তা হয়ে থাকে, অথবা না-ও হয়ে থাকে তাহলেও, সমরেশ বসু এ তথ্যটি কোথায় পেলেন ?

সমরেশ বাবুর সপক্ষে অবিশ্যি ওড়িশার কয়েকজন ওড়িশি ঐতিহাসিক আছেন। যেমন তারিণীচরণ রথ। রথ মহাশয় চৈতন্যকে ওড়িশি ব্রাহ্মণ হিসেবে বর্ণনা করে এক জায়গায় লিখেছেন, 'Chaitanya himself emerged from a highly learned and respectable Oriya Brahmin family of Orissa and had migrated for a time of Bengal owing to disagreement with the King of orissa.' (Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol-VI, Pt-III, P-448)



তো চৈতন্য যে ওড়িআ ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে ছিলেন এ তথ্যটি রথ মহাশয় পেলেন কোথায় ? উত্তর, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'। 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে' জয়ানন্দ বর্ণিত এই লাইনটি ধরেই তারিণীচরণ রথ মহাশয় চৈতন্যকে ওড়িআ বামুন বাড়ির ছেলে ধরে নিয়েছেন

এবং জয়ানন্দের পরের লাইনটি 'শ্রীহট্টদেশেরে পালাঞ্রা গেল রাজা ভ্রমরের ডরে' সংবাদটির সূত্র ধরেই লিখেছেন, 'and had migrated for a time of Bengal owing to disagreement with the king of Orissa'. আর আমাদের সমরেশ বাবু সম্ভবত তারিণীচরণ রথ মহাশয়ের এই উক্তি থেকেই চৈতন্যকে 'ওড়িয়া' বানাবার যুগপৎ সূত্র ও সুযোগ পেয়েছেন।

যদিও এ পর্যন্ত যা আলোচনা হলো, তাতেও কিন্তু এই প্রমাণ হয় না যে, চৈতন্য ওড়িআ ছিলেন না। আবার চৈতন্য ওড়িআ ছিলেন সেই প্রমাণও হয় না। চৈতন্য আদৌ ওড়িআ ছিলেন কি ছিলেন না এটা এ যাবৎ কুয়াশাচ্ছন্নই রয়ে গেল।

বোধহয় চৈতন্য বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশাই একবার এই কুয়াশাকে উন্মোচন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন,

'নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশায় বলেন যে এই "ভ্রমর" কপিলেন্দ্র দেব, কেন-না তাঁহার গোপীনাথপুর শিলালিপিতে "ভ্রমর" উপাধি দেখা যায়। কিন্তু কপিলেন্দ্র ১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের জন্মের ৫১/৫২ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যাধিরোহণ করেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কপিলেন্দ্র রাজা হওয়ার পরেই শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষ যাজপুর হইতে শ্রীহট্টে পলায়ন করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মিশ্র-বংশের তিন বার (যাজপুর, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ) বাসস্থান পরিবর্ত্তনের কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়ানন্দের কথায় বিশ্বাস করিয়া উড়িয়া লেখকেরা শ্রীচৈতন্যকে উড়িয়া বলিয়া দাবী করিতেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য পাশ্চাত্ত্য বৈদিককুলে বাৎসগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং শ্রীচৈতন্যের আত্মীয় ও কুটুম্বের বংশধরদের নিকট হইতে জানা যায়; আমি আমার উড়িয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম- উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য বৈদিক শ্রেণী বলিয়া কোন শ্রেণী আছে কিনা; তাঁহারা বলিলেন এইরূপ শ্রেণী উড়িষ্যায় নাই। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষ যাজগ্রামে বাস করিয়াছিলেন, এ কথা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও, তাঁহারা যে উড়িয়া ছিলেন তাহা মানিয়া লইতে পরিলাম না।' (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান/পৃ-২৩৭)।

এবং এই প্রসঙ্গে পরিশেষ বক্তব্যটি হলো ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের। শ্রী বন্দোপাধ্যায় চৈতন্যের ওড়িআ হওয়ার ব্যাপারটি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। যদিচও ডঃ মজুমদারের মতো কোন প্রামাণ্য বিতর্কের মধ্যে তিনি যেতে চাননি। প্রায় বিষয়টি তিনি তর্ক বিতর্কের বাইরে রেখে, এক তরফা আপশোস করে লিখেছেন, 'ওড়িয়া সহিত্যের ইতিহাসকারগণ জয়দেবকে যেমন ওড়িয়া বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তেমনি জয়ানন্দের একটি সংশয়পূর্ণ উক্তিকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে খাড়া করিয়া তাঁহারা মহাপ্রভুকে ওড়িয়া বলিয়া কাড়িয়া লইতে চান।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/দ্বিতীয় খণ্ড (চৈতন্যযুগ)/পৃ-১৯৪)।

অতঃপর সর্ব পরিশেষে আমাদের বক্তব্য হলো, চৈতন্যকে যদি ওড়িআ বলে ধরেও নেওয়া হয়, (ধরে নিলাম তিনি ওড়িআ) তাহলে, চৈতন্য ওড়িশাকে দুর্বল করেছেন, হীনবীর্য্য করেছেন, বর্তমান ওড়িআ লেখকরা চৈতন্যের মাথায় এ হেন কলঙ্কের বোঝা চাপাচ্ছেন কেন? একজন ওড়িআ হয়ে চৈতন্য নিজের জাতি ও দেশকে দুর্বল নিবীর্য্য করবেন কেন? যেমন ওড়িআ ঐতিহাসিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতবের কথা ধরা যাক, তিনি (শ্রী মহাতব) লিখেছেন, কবিরাজ গোস্বামী নাকি চৈতন্যকে নির্দোষ প্রমাণ করার



জন্য পরবর্তীকালে একটা মন গড়া কাহিনী ফেঁদেছেন। ডঃ মহাতবের মতে,

'A doctrine that preaches inaction and sentimentalism harmful to the ordinary man in his daily walk of life and it is simply fatal to an administrator who holds the destiny of millions. The attempt to make the Bhakti cult a mass religion and to influence the King and his officers by its sweet passimistic philosophy and no doubt been total to the Social and political life of the country. (History of Orissa/Vol-1/page-329).

অতঃপর চৈতন্য ওড়িআ ছিলেন কি ছিলেন না তা পাঠকদের বিচার্য। কিন্তু চৈতন্যের ওড়িআ হওয়া বা না হওয়ার এই হলো পৌর্বাপর্ব ইতিহাস।

[ষোলো]

চৈতন্য কি স্বল্প-শিক্ষিত ছিলেন?

প্রবন্ধ এবং রুদ্ধশ্বাস ইংরাজি থ্রীলারের ককটেল—মুন্সীয়ানায় তৈরী সাম্প্রতিক প্রকাশিত চৈতন্যের মৃত্যু প্রাসঙ্গিকী নিয়ে লেখা একটি বাঙলা কেতাবে দেখা গেল, বিশ্বম্ভর মিশ্র অর্থাৎ চৈতন্যের শিক্ষা-দীক্ষার দৌড় নাকি খুব বেশিদুর ছিল না। বলা বাহুল্য, এই নিশ্চিৎবাদী কেতাবটি লেখকের তিন নম্বর (সম্ভবত) চৈতন্য বিষয়ক অভিব্যক্তি। এই লেখকের নাম ও ছদ্মনাম যথাক্রমে যুধিষ্ঠির জানা ওরফে মালীবুড়ো।

তো বইখানা আগাগোড়া পাঠ নেওয়ার পর দেখা গেল, শ্রী জানা মশাই চৈতন্যের অন্তর্ধান বা মৃত্যু রহস্য উম্মোচন করতে গিয়ে বিশ্বম্ভর মিশ্র অর্থাৎ চৈতন্যের শিক্ষা দিক্ষা অর্থাৎ কিনা পড়াশোনা-রহস্য উম্মোচন করে দিয়েছেন এক জায়গায়। একজন মানুষের মৃত্যুর গল্প শোনাতে গিয়ে তার পড়াশোনার গল্প শোনানোর কতোখানি প্রয়োজন আছে আমাদের এ যাবৎ জানা নেই। বিশেষত চৈতন্যের ক্ষেত্রে। কেননা, শ্রীজানা মশাই বর্ণিত চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের দুর্গম পথে হাঁটতে গিয়ে বিশ্বম্ভর মিশ্রের আকাদেমিক বিদ্যার সামনে এসে হঠাৎই বেশ হতভম্ব হয়ে যেতে হলো। কিছুতেই বোধগম্য হলো না, লেখক মালীবুড়ো চৈতন্যের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে তাঁর চরিত্র, তাঁর পড়াশোনা পঠন-পাঠনের কথা হঠাৎ টেনে আনলেন কেন? অবিশ্যি, তিনি (শ্রীজানা মশাই) প্রায় গল্পের গোয়েন্দার মতো চৈতন্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে যেভাবে নীলাচলের দুর্গমাতিদুর্গম স্থানে বিচরণ করেছেন তা পাঠ করে কোনান ডয়েলের গল্পের বিখ্যাত চরিত্রটির কথা মনে করিয়ে দেয়। বোধকরি শ্রীমশাই যাবৎ পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যিনি 'হটশট' নিয়ে দুর্গ-বিশেষ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশে যুগপৎ সাহসী ও সমর্থ হয়েছেন।

তো এই সাহসী লেখক তাঁর অত্যুৎসাহসী বই-এর এক জায়গায় জনৈক

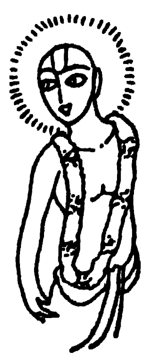
প্রভুজীর* বকলমে লিখেছেন, (তাঁর লেখা থেকেই হুবহু তুলে দিচ্ছি) তিনি লিখেছেন,

'এ কথা খুব অপ্রিয় শোনালেও বলছি, চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার ছাড়া আর কোন তত্ত্ব প্রচার করেন নি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাঁর নাকি সে যোগ্যতা ছিল না। তিনি টোলে মাত্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। দর্শন বা অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না। এ কথাটা হয়-ত একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষে কোন দার্শনিক মতবাদ বা রসতত্ত্ব প্রচারের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি চেয়ে ছিলেন সঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়ে 'যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চন্ডাল' সবাইকে এক করতে। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল শুধু 'হরেকৃষ্ণ' নামের। বিশেষ কোন তত্ত্বের নয়। প্রকৃত পক্ষে নিয়মিত সঙ্কীর্তনের দল বার করেই নবদ্বীপ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন এক অভূতপূর্ব সাড়া।' (পৃ-১৯৬)

তাহলে এই মূল্যবান উদ্ধৃতিটি থেকে আমরা কি জানতে পারলাম? না চৈতন্য হরিনাম ছাড়া আর কিছুই প্রচার করেন নি। ইচ্ছে থাকলেও ওই 'খোড় বড়ি খাড়া'গোছের হরিনাম ছাড়া আর কোন শাস্ত্রীয় রসতত্ত্ব বা যুক্তি যুক্তার প্রচার করার মতো তাঁর কোন যোগ্যতাও ছিল না। এবং তিনি টোলে মাত্র ব্যাকরণ পড়েছিলেন। এবং সেই হেতু অলঙ্কার বা দর্শন শাস্ত্রে তাঁর কোনও ব্যুৎপত্তি ছিল না।

শ্রী জানা মশায়ের লেখা থেকে আরেকটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট হচ্ছে, তা হলো, চৈতন্য টোলে কেবল ব্যাকরণই পড়েছিলেন। নীতিশাস্ত্র, দর্শন অলঙ্কার বা বেদ-বেদান্ত এসবের ধারে কাছেও যাননি। না যান, তাতে আমাদের কোন বিপত্তি নেই। আপত্তি থাকারও কথা নয়, শুধু শ্রী জানা মশায়ের লিখিত বক্তব্য থেকে এই জিনিষটা বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, যদি চৈতন্য ব্যাকরণটাও না জানতেন তাহলেও চৈতন্যের ক্ষেত্রে চৈতন্য হওয়ার কোন বাধা থাকতো না। অন্তত আজ যে চৈতন্যকে আমরা দেখছি সেই চৈতন্য

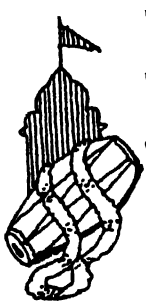
* আমরা একাধিকবার পুরীতে গিয়ে সেখানকার পণ্ডিত, সাহিত্যিক, মঠের মহন্ত ও জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডা ছাড়াও গুন্ডিচা, টোটা গোপীনাথ, গম্ভীরা প্রভৃতি মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে এবং বিশেষত আনন্দময়ী আশ্রমের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' পুস্তক খ্যাত লেখক ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের মা-র সাথে যুধিষ্ঠির জানা ওরফে মালীবুড়ো বর্ণিত এই প্রভুজী প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এবং আমরা নিজেও টোটা গোপীনাথ ও যমেশ্বর মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে একাধিকবার চিরুনী অভিযান চালিয়েছি এই যুধিষ্ঠিরবাবু বর্ণিত বিদগ্ধ প্রভুজীর সন্ধানে। কিন্তু আমরা যেমন তাঁর সন্ধান পাইনি তেমনই পুরীর দীর্ঘকালের পুরাতন বাসিন্দারাও দিতে পারেন নি যুধিষ্ঠিরবাবু বর্ণিত এই প্রভুজীর সন্ধান। জয়দেববাবুর বইতে যে প্রভুজীর উল্লেখ আছে তিনি স্টেটসের অধ্যাপক। এবং তিনি ভীষণরকম চৈতন্য বিশেষজ্ঞ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরবাবুর প্রভুজী যে জয়দেববাবুর 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' গ্রন্থে বর্ণিত প্রভুজী নন তা যুধিষ্ঠিরবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন। তাহলে যুধিষ্ঠিরবাবুর গ্রন্থের এই প্রভুজী কে? ইনি কি লেখকের স্ব-কল্পিত? আনন্দময়ী আশ্রমের শ্রীযুক্তা মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'মালীবুড়োর বইতে লেখা প্রভুজী আমার ছেলের বই-এর অনুকরণে লেখা একটা কাল্পনিক রিচিত্র।' এধরনের কোন প্রভুজী নাকি পুরীতে কেউ নেই।



হওয়ার ক্ষেত্রে। কেন না, 'শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষে কোন দার্শনিক মতবাদ বা রসতত্ত্ব প্রচারের আদৌ প্রয়োজন ছিল না' তাঁর শুধু একটাই প্রয়োজন ছিল, সেটা 'হরেকৃষ্ণ' নামের। এর জন্য কোন দর্শন অলঙ্কার এমন কি ব্যাকরণেরও প্রয়োজন লাগে না। সুতরাং চৈতন্য যদি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ধাতানি ঠ্যাঙানি খেয়ে ব্যাকরণটাও না শিখতেন তাতেই বা কি ক্ষতি ছিল ? অন্তত চৈতন্যের চৈতন্য হওয়ার ক্ষেত্রে তো কোন বাধা ছিল না।

অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জননেতা বা রাজা বাদশাহদের নাম ইতিহাসে কোন বিরল ঘটনা নয়। যেমন আকবর বাদশা অশিক্ষিত ছিলেন। অশিক্ষিত বলতে আমরা নিরক্ষরের কথা বলছি। কিন্তু আকবরের তাতে 'মহামতি আকবর' ইতিহাস খ্যাত হতে বাধা ছিল না। তদ্রূপ চৈতন্যের পড়াশোনার ব্যাপারে যে চার পাঁচজন বিশিষ্ট পণ্ডিত তথা অধ্যাপকের নাম পাওয়া যায়–সে গুলো যদি ভ্রান্ত হয়, মিথ্যে বা গুজবও হয়, তাতেই বা আমাদের বা চৈতন্যের কি এসে যায়। চৈতন্য বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা বলে যে তাঁকে পড়াশোনা করতেই হবে, কিংবা যেহেতু তিনি বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা সেই হেতু তাঁর পড়াশোনা না থাকলেও তাঁকে যেন তেন প্রকারেণ পণ্ডিত বানাতে হবে এমন কোন মাথার দিব্যি আমাদের ওপর নেই। সম্ভবত মুরারি, কর্ণপূর বা বৃন্দাবন, কৃষ্ণদাসাদি ভক্ত কবিদের ওপরও ছিল না। তবু অশিক্ষিত চৈতন্যের ওপর 'শিক্ষিত' নামক আক্ষরিক অর্থটি চাপলো কেন ? এ ইতিহাসের ভুল না ঐতিহাসিকদের ভুল ? আর যদি তই হয়, তাহলে নির্মম মহাকালের চির-চিহ্নিত শিলাপটে ব্যাকরণ অলঙ্কার তথা দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চৈতন্যের নাম এতোকাল কেমন করে প্রত্যক্ষ হয়ে রইলো ? সত্যাতিসত্য সময়ের নিরিখে এর যুক্তিযুক্তা যাচাই হলো না কেন ?

এর প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠিরবাবু বলতে পারেন, পৃথিবীর কোন যুক্তিই যুক্তির শেষ কথা নয়। আজকে যা চরম সত্য বলে প্রমাণিত হলো সময়ের বিচারে কাল তা মিথ্যে পর্যবসিত হতে পারে। এই 'কাল' কালই আসতে পারে। আবার দু'শো বছর পাঁচ শো বছর পরেও আসতে পারে। আসলে মিথ্যার সত্যবিরোধী যৌক্তিকতার ওপর অনিবার্য সত্যের আগমনী সময়টি নির্ভরশীল। হয়তো ততোদিনে 'সূর্য স্থির পৃথিবীটা ঘুরছে' এই চিরন্তন সত্য বলার অপরাধে ব্রুনোদের (জিওদানো ব্রুনো) দাঁড়াতে হয় হিংস্র ঘাতকের নিষ্ঠুর খড়্গের নীচে। কিন্তু ব্রুনোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্রুনোর যৌক্তিকতার মৃত্যু হয় না। আবার ব্রুনো জন্মে ব্রুনোরই যুক্তি নিয়ে। ক্রমে এই ভাবে সত্যের জন্ম মৃত্যু সত্যের সময়কে কুশলী শিল্পীর মতো তৈরী করে। অথবা কুশলী শিল্পীর মতো ব্রুনোদের জন্ম মৃত্যু দিয়ে সময়ই তৈরি করে নেয় তার আগমনের আবহাওয়া।



সুতরাং পাঁচশো বছর ধরে চৈতন্যকে পণ্ডিত বলেছি বলে যে আজও তাঁকে পণ্ডিত বলতে হবে এমন কোন কথা নেই। এ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরবাবুর প্রভুজীর বকলমে লেখা বক্তব্য ঠিকই আছে। এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও একমত। কিন্তু মুশকিল বাধাচ্ছে চার্বাক কবির সেই আমোঘ শ্লোকটি–

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মাহানীঃ প্রজায়তে॥'

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র দিয়ে কোন কিছুর বিচার নির্ণয় করলে চলবে না। তাকে যুক্তি দিয়েও বিচার করতে হবে, নচেৎ তা ধর্মহানির কারণ ঘটে।

সুতরাং চৈতন্য স্বল্পশিক্ষিত ছিলেন না দিকগজ পণ্ডিত ছিলেন যুগপৎ শাস্ত্র

ও যুক্তি এই দুই দিয়েই তার বিচার করা দরকার। আশা রাখি যুধিষ্ঠির বাবুও একমত হবেন আমাদের এ সিদ্ধান্তে।

* · * *

ঐতিহাসিক তথা প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র এক জায়গায় লিখছেন, তাঁহার পিতা (চৈতন্য) জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপন্ডিত ছিলেন। ইনি পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ; বাড়ী শ্রীহট্ট,-নবদ্বীপে পড়িতে আসিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্ট আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তলিখিত একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্ব আমরা নবদ্বীপবাসী অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম। ইহার বর্ণাশুদ্ধিমাত্র নাই—অক্ষরগুলি গোটা গোটা, অতি সুন্দর। চৈতন্যের জন্মিবার ১৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৯০ শকে এই পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তক এখন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের কাছে আছে। নবদ্বীপে পাঠ সমাপন্তে ইনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গুণবতী কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য/দীনেশচন্দ্র সেন/১ম খণ্ড/পৃ-২৯৮)

তো ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই উক্তি থেকে দুটো জিনিষ বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যে, চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র অন্তত সংস্কৃত শাস্ত্রে রীতিমত সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং দ্বিতীয় যেটা আমরা জানতে পাচ্ছি, তা হলো, জয়ানন্দের মতে,

'শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিঞা।
নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইঞা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে॥'

(চৈতন্যমঙ্গল/নদীয়া খণ্ড)

জয়ানন্দের এই পয়ারসমূহ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে জগন্নাথ মিশ্র এবং জগন্নাথ মিশ্রের শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তীরা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, অত্যাচার-অনাচার প্রভৃতি থেকে উদ্ধার পাবার মানসে শ্রীহট্টের জয়পুর থেকে নবদ্বীপে পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ ও নীলাম্বর চক্রবর্তীরা অত্যাচারিত অনাচারিত হবার ভয়ে নবদ্বীপ পালিয়ে এলেও, নবদ্বীপে আসার পিছনে মিশ্র জগন্নাথের সম্ভবত আরেকটি সুপ্ত বাসনাও ছিল। তা হলো অধ্যয়নের বাসনা। কেননা, সেসময় নবদ্বীপের অপরাপর অংশগুলি যথা আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামনপৌখরা, হাটভাঙ্গা, চাঁপাহাটি, রাতুপুর বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাদুপুর, বেলপৌখেরা, মায়াপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র (টোল) গড়ে উঠেছিল। এবং সে কারণে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে। যেমন শ্রীহট্ট থেকে এসেছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্তী, মিশ্র জগন্নাথ, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর ও মুরারি গুপ্ত প্রমুখেরা। তেমনই চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন, পুণ্ডরীখ বিদ্যানিধি, চৈতন্যবল্লভ দত্ত। বুঢ়ন থেকে এসেছিলেন হরিদাস ও রাঢ়দেশের একচক্রা গ্রাম থেকে নিত্যানন্দ প্রমুখেরা।



অর্থাৎ অনাচার অত্যাচার বা প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে পড়েই সকলে নবদ্বীপে আসেননি । কেউ কেউ এসেছিলেন । কিন্তু অধিকাংশেরাই এসেছিলেন শিক্ষা বা শিক্ষকতার মানসে । তাই শ্রীহট্ট ত্যাগের সময় সর্বাগ্রে নবদ্বীপকেই মনে পড়েছিল জগন্নাথ মিশ্রের ।

এমন এক সুপণ্ডিত পিতার সন্তান চৈতন্য । এবং তারও চেয়ে বড়ো কথা, চৈতন্যের শিক্ষা-দীক্ষার সময় এই নবদ্বীপই ছিল গৌড় বাংলার পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি । এমন এক সুপণ্ডিত পিতার সন্তান ও শিক্ষা-দীক্ষার পীঠস্থানে বড়ো হওয়া চৈতন্য কেমন করে স্বল্প-শিক্ষায় সন্তুষ্ট হবেন ভাববার বিষয় । অবিশ্যি ছাত্রাবস্থায় তাঁর ওপর বেশ ঝড় ঝাপটাও বয়ে গেছলো একথাও মিথ্যে নয় । পিতার অকালমৃত্যু, বড়োদাদা বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ এসব পারিবারিক মর্মান্তিক ঘটনাগুলি চৈতন্যের ছাত্রজীবনেই ঘটেছিল । কিন্তু এসব কারণে কি চৈতন্যের লেখাপড়া খুব বেশি বিঘ্নিত হয়েছিল ? স্বামী জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরও শচীদেবী কি নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠান নি ? বনমালী ঘটক যখন নিমায়ের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে শচীদেবীর কাছে গেছলেন তখনও কি শচীদেবী বলেন নি 'পিতৃহীন বালক আমার ।/জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর ।'

শচীদেবী যখন বনমালী ঘটককে 'জীউক পড়ুক আগে' কথাগুলি বলছেন তখন কি নিমাই খুবই বালক ? তা তো নয় । অন্তত ১৫।১৬ বছর বয়স তো হবেই । তাহলে এতে কি এই প্রমাণ হয় না-যে, ১৫।১৬ বছর বয়সেও নিমাই পড়াশোনা করছেন । এবং 'জীউক পড়ুক আগে,, তবে কার্য্য আর' নিমাই প্রসঙ্গে শচীদেবীর পূর্বোক্ত কথার অর্থ কি এই হয় না যে, ছেলে আমার আরও লেখাপড়া শিখুক, তারপর 'তবে কার্য্য আর' অর্থাৎ ভালোমতো লেখাপড়া শেখার পর নিমায়ের বিয়ে-থা দেবো । শুধু মাত্র নিমায়ের বাল্য ও কৈশোর সময়কার তিন তিনজন শিক্ষকের নাম পাওয়া যায় । যথা—(এক) গঙ্গাদাস (দুই) বিষ্ণু মিশ্র এবং (তিন) সুদর্শন পণ্ডিত । এই তিনজন পণ্ডিতের কাছে মোট আট বছর শিক্ষানবীশী ছিলেন নিমাই । প্রথম গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট দু'বছর ব্যাকরণ ও অন্য দু'বছর সাহিত্য শিখেছিলেন । তারপর বিষ্ণু মিশ্রের কাছে দু'বছর স্মৃতিশাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন । এবং শেষোক্ত দু'বছর সুদর্শন পণ্ডিতের কাছে ষড়দর্শন শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন ।

এ ছাড়াও আরও দু'জন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকের কাছে নিমাই বিদ্যাভাস করেছিলেন, এঁরা হলেন যথাক্রমে তৎকালীন নবদ্বীপ-শান্তিপুরের প্রখ্যাত পণ্ডিত তথা অধ্যাপক অদ্বৈতাচার্য ও বাসুদেব সার্বভৌম । এর মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে দু'বছর তর্কশাস্ত্র ও অদ্বৈতাচার্যের কাছে বেদ পড়েছিলেন নিমাই ।

'প্রথমে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে ।
দুই বর্ষে ব্যাকরণ কৈলা সমাপনে ॥
দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলঙ্কার ।
তবে গেলা শ্রীমান বিষ্ণু মিশ্রের গোচর ॥
তাঁহা দুই বর্ষ স্মৃতি জ্যোতিষ পড়িলা ।
সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা ॥
তাঁর স্থানে ষড়দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে ।
তবে গেলা বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে ॥



'তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বিবৎসর ।
এবে তুয়া* পাশ আইলা বেদ পড়িবারে ॥'

[অদ্বৈত প্রকাশ/১২ অধ্যায়/পৃ-৪৮]

নিমাই কতোদিন অদ্বৈত আচার্যের কাছে বেদ পড়েছিলেন তাও 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থের লেখক ঈশান নাগর বলে দিয়েছেন ।

'গৌরের এক বর্ষ হৈল অতিক্রম ।
তাহে বেদ ভাগবত হইল পঠন ॥'

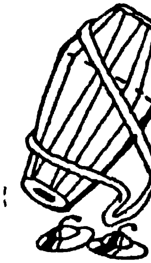
অর্থাৎ গৌরের বেদ পাঠ করতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল । তাহলে হিসেবে দেখা যাচ্ছে, সর্ব সাকুল্যে মোট ১১ বছর বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পাঠ নিয়েছিলেন নিমাই । তবুও স্বল্প শিক্ষিত বলে নিমায়ের একটা বদনাম চালু আছে । কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, চৈতন্যের সমসাময়িক কালে সমাজে টাকা পয়সাঅলা লাখোপতির চেয়ে গরীব পণ্ডিতের মান প্রতিপত্তি খুব কম ছিল না । তখন মানুষ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সত্যি সত্যি খাতির করতো, সম্ভ্রম করতো । এখন যেমন রাজনৈতিক দাদা বা রকফেলার ব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন । এবং তারও চেয়ে বড়ো কথা, চৈতন্য যদি স্বল্প শিক্ষিত হতেন তাহলে অদ্বৈত, গদাধর, আচার্য শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখররা গ্রামতুতো সম্পর্কে নিমায়ের সঙ্গে মিশলেও বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রমুখ প্রখ্যাত জ্ঞানতপস্বীরা আর যাই হোক একজন স্বল্প শিক্ষিতের (নিমায়ের) সঙ্গে গূঢ় শাস্ত্র আলোচনায় বসতেন না । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা আমরা প্রত্যয়ী হতে বাধ্য আছি । কিন্তু কেন ? চৈতন্যের জীবিতবস্থায় বাঙলা ওড়িশায় বেশ কিছু ভক্তমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছিল । এসকল ভক্তমণ্ডলীতে সর্ব সাকুল্যে ৪৯০ জন পরিকরের মধ্যে ৫৮ জন লেখক ছিলেন । অর্থাৎ শতকরা ১২ জন ভক্ত কবিত্ব সম্পন্ন ছিলেন । কবিত্বসম্পন্ন হতে হলে পাণ্ডিত্যের দরকার । কর্ণপুর, স্বরূপ দামোদর, নরহরি, সার্বভৌম, রূপ গোস্বামী এঁরা তো রীতিমত সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন । এছাড়াও ওড়িশি পণ্ডিত ও কবি কানাই খুন্টিয়া, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে । কেবল মাত্র ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই কি এঁরা স্বল্প শিক্ষিত এক গেরুয়াধারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন ? আর যদি ধরে নিই তা-ই হয়েছিলেন ধর্মীয় আফিমের নেশায় বিলক্ষণ বুঁদ হয়ে গেছলেন এসব পণ্ডিতগণ । অর্থাৎ সর্ষের ভেতরে ভূত থাকলে সে সর্ষে যেমন ভূত ছাড়াতে অপারগ, পরন্তু সে ভূতেরই পাকা সমর্থক হয়ে ওঠে । তেমনই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের ভেতর (লোহার বাসরে কালনাগিনী ঢোকার মতো) ধর্ম ঢুকে, পণ্ডিতের বিজ্ঞানী দৃষ্টি, সন্ধানী দৃষ্টি—যাকে আমরা জ্ঞান চক্ষু বলবো, তা নিছক ধর্মের নেশায় ধর্মময় হয়ে উঠেছিল । এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত চৈতন্যের চেয়ে ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞ চৈতন্যের প্রভাব মুখ্য, অধিকতর হলেও সন্ধিৎসার কিছু থাকে না । কেননা, গর্ভধারিণী মা যদি অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত ঈশ্বরের বা সংজ্ঞাহীন ধর্মের আশায় গর্ভের সন্তানকে হেলায় নদী-সাগরে বিসর্জ্জন দিতে পারে, অথবা কোন পিতা যদি ঔরসজাত সন্তানকে নিছক এক ছাগ শিশুর মতো বলি দিতে পারে ঈশ্বরের উদ্দেশে, তাহলে একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত কেন বিস্মরণ হবেন না তাঁর পাণ্ডিত্য । সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অপত্য



* এখানে 'তুয়া' অর্থে অদ্বৈতাচার্যকে বলা হয়েছে 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' পৃ-৪১৬ দ্রষ্টব্য ।

স্নেহের চেয়েও কি তার পাণ্ডিত্য অধিক ক্ষমতাশালী ? তা তো হবার নয়। তাহলে ? বস্তুত এই ঈশ্বর কেন্দ্রিক ধর্ম এমনই জিনিষ যা মনিব কেন্দ্রিক ধর্ম– অর্থাৎ আমাদের ব্যবহারিক সাংসারিক বা সামাজিক জীবনের নীতি নৈতিকতাকে নিমেষে তছনছ করে দিতে পারে। সুতরাং এই যৌক্তিকতার ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে কর্ণপুর, স্বরূপ দামোদর, বা ওড়িশার কানাই খুন্টিয়া বা জগন্নাথ দাস আদি পণ্ডিতেরা নিছক ধর্মের আকর্ষণে চৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কেশব কাশ্মীরির কথা ছেড়ে দিলেও রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌমের মতো বিগদ্ধ ব্যক্তিরা অর্ধ বা স্বল্প শিক্ষিত চৈতন্যের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন কেন ? স্বল্প শিক্ষিত চৈতন্য-ই বা ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন সর্বগণ্য পণ্ডিতের সাথে ডিবেটিঙে (Dibeting) বসলেন কোন সাহসে ?

আমাদের এ হেন প্রাসঙ্গিকী আলোচনায় সাধারণ পাঠক, পণ্ডিত পাঠক এবং বৈষ্ণব মহান্তগণ সকলেই হয়তো ক্ষুন্ন হবেন। ক্ষুব্ধ হওয়ায়ও বিচিত্র না। এবং এই এক অমোঘ দ্বন্দ্বে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমরাও ক্ষুন্নতা বোধ করি। কিন্তু কিছু কিছু ফুল তুলতে গিয়ে কিছু কাঁটার জ্বলা সহ্য করতে হয়। এক্ষেত্রে সত্যকে আমরা কন্টকাকীর্ণ ফুল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সত্য যে কঠিন'। খাঁটি কথা বলেছেন তিনি। খাদ না দেওয়া সোনার মতো খাঁটি কথা এ যেন সেই রেভারেণ্ড লালবিহারীর 'ফোক টেলস অব ইণ্ডিয়া'র সোনার কাঠি রুপোর কাঠি গল্পের মতো। সাত সাগর তেরো নদীর পারে এক পাতালপুরীর রুদ্ধ ঘরে ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা। তাকে অহরহ পাহারা দিচ্ছে এক সর্বনাশা রাক্ষস। সাত সাগর তেরো নদী পেরিয়ে ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে বধ করে সেই রাজকন্যাকে আনতে হবে। এখানে রাজকন্যাই সত্য, আর তাকে আহরণ করতে হলে তেমনই সত্য সেই সাত সাগর তেরো নদী পারের দুর্গমতা। অর্থাৎ রাজকন্যাকে সত্য বলে স্বীকার করতে হলে সাত সাগরে তেরো নদী পারাপারের দুর্গমতা, বন্ধুর পথকেও আমাদের স্বীকার করতে হবে। কেননা, বন্ধুর পথ অতিক্রম অনতিক্রমের মধ্যেই রাজকন্যার প্রাপ্তি বা প্রাপ্তিহীনতা নির্ভর করে। সুতরাং মিথ্যার কুয়াশা জালে ঢাকা কোন সত্য, বা সত্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন কোন মিথ্যাকে উন্মোচন করতে হলে মিথ্যা বা সত্যের প্রচ্ছন্নতাকে আগে অতিক্রম করা দরকার। দরকার এজন্য যে, চৈতন্যকে যিনি বা যাঁরা স্বল্প শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত বলছেন তাঁরা যেমনটি কোন যুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে এ কথা বলছেন, তদ্রূপ চৈতন্যের পাণ্ডিত্যে যাঁরা আস্থাশীল তাঁরাও তেমনই কোন না কোন যৌক্তিকতা নির্ভর হয়ে এমন কথা বলেছেন। পারতপক্ষে এই দ্বি-যুক্তির যৌক্তিকতা দ্বন্দ্বে যাঁর জয় আমরা তাঁকেই বিজিত বলবো। আর এই জয় পরাজয়ের দ্বন্দ্বে প্রবিষ্ট হতে হলে চৈতন্যকে যারা স্বল্প শিক্ষিত বলছেন এবং যাঁরা পণ্ডিত বলছেন সেই দুই শিবিরের কথাই আমাদের বলতে হবে। এক জনকে বাদ দিয়ে নয়। এবং এটা শুধু মাত্র শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিতের ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রেই। অর্থাৎ যেখানে সত্য প্রচ্ছন্ন, কুহেলিকায় ঢাকা, সংশয়োন্বিত সেখানেই যৌক্তিকতার সার্থে আমরা দু'পক্ষের কথা দু'পক্ষের মতো করে বলবো।



সুতরাং আমরা আবার যুধিষ্ঠির জানা ওরফে মালীবুড়ো মশায়ের কথায় ফিরে আসি। যুধিষ্ঠিরবাবু জনৈক প্রভুজীর বকলমে এক জায়গায় বলেছেন,

'তিনি (চৈতন্য) টোলে মাত্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। দর্শন বা অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না (চৈ. অ. র./পৃ-১৯৬)।

এখন যুধিষ্ঠিরবাবুর কথামতো আমরা ধরে নিলাম, চৈতন্য কেবল মাত্র সবেধন নীলমনি ব্যাকরণটাই পড়েছিলেন। দর্শন বা অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না। হয় তো ছিল না। চৈতন্যের দর্শন বা অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকতেই হবে তারও কোন কথা নেই। দর্শন অলঙ্কার পড়েন নি সুতরাং ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ হেন চমকপ্রদ তথ্যটি যুধিষ্ঠিরবাবু কোথায় পেলেন? যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নি যে এ তথ্যটি যুধিষ্ঠির বাবুর সংগ্রহ নয়, প্রভুজী কর্তৃক যুধিষ্ঠীরবাবুকে দেয়। কিন্তু তাহলেও একটা প্রশ্ন থাকে, এবং তা হলো, প্রভুজীর অনেক যুক্তির ভেতর তিনি বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন সে ক্ষেত্রে এ হেন তথ্যটিকে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন কেন? সুতরাং পক্ষান্তরে লেখক যুধিষ্ঠিরবাবুও প্রভুজীকে সমর্থন করেছেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন সেখানে নয়। মূল প্রশ্ন হলো, এ তথ্যটি কি প্রভুজী যুধিষ্ঠিরবাবুদের মতো রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌমাদি ব্যক্তিরা জানতেন না? বিশেষত অদ্বৈতাচার্য? আর তা যদি তিনি (অদ্বৈত আচার্য) জানতেন তাহলে, নিজের পুত্র অচ্যুত বা অচ্যুতানন্দকে তিনি স্বল্প শিক্ষিত নিমায়ের টোলে পড়তে পাঠালেন কেন? বিশেষ করে নিজে একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক হয়ে।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থের ৪২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'অচ্যুতানন্দ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের টোলে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িয়াছিলেন। এবং অদ্বৈত চরিতকার ঈশান নাগর এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'একদিন শ্রী অচ্যুত কহে গৌরচন্দ্রে।
মুখের উপমা ভালি কৈছে হয় চন্দ্রে॥
মৃগাঙ্কে কলঙ্ক বহু দেখি বিদ্যমান।
অনুজ্জ্বল রোপ্যবর্ণ সেই অপ্রধান॥
তাহা শুনি নিমাই বিদ্যাসাগর আনন্দে।
সস্নেহ প্রশংসি কহে শ্রীঅচ্যুতানন্দে॥
আহ্লাদের অংশে হয় মুখের উপমা।
কোন বস্তুর সর্ব্ব অংশে না হয় তুলনা॥

['অদ্বৈত প্রাকাশ'/ঈশান নাগর/১২অধ্যায়]

উপরোক্ত পয়ার থেকে জানা যাচ্ছে ছাত্র অচ্যুতের এক গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের উত্তর দিচ্ছেন পণ্ডিত নিমাই। হয়তো তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে কিশোর অচ্যুতকে বোঝানোর মতো নিমায়ের দর্শন জ্ঞান ছিল। যেমন গ্রাম বাংলার স্বল্প শিক্ষিত পাঠশালার গুরু পণ্ডিতেরা ছাত্রদের অঙ্ক বাংলা ভূগোল ইংরাজী সব কিছুই পড়ান। কিন্তু উপরোক্ত পয়ারে অচ্যুতের দার্শনিক প্রশ্ন ও নিমায়ের উত্তর কি এই প্রমাণ করে যে, অচ্যুত নিতান্ত না-বালক অবস্থায় এই প্রশ্ন করেছে? এবং প্রশ্নের উত্তর দেখে কি মনে হয় নিমায়ের দর্শন শাস্ত্রে কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না? সুতরাং এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের অচ্যুতের বয়স জানা দরকার। জানা দরকার কতো বছর বয়েসে তিনি নিমায়ের টোলে অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন।



ঈশানের 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে অদ্বৈত আচার্যের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুত জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৪১৪ শক বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। আর নিমায়ের জন্ম হয়েছিল ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে। অর্থাৎ

হিসেবে নিমাই অচ্যুতের চেয়ে বছর সাতেকের বড়ো ছিলেন। আমরা হিসেব কষলে আরও দেখতে পাবো যে, অন্তত ১৬/১৭ বছরের আগে নিমাই কোন টোল খোলেন নি। কারণ ঈশানের অদ্বৈত প্রকাশ মতে অদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের বয়েস যখন পাঁচ বছর তখন নিমাই অদ্বৈত আচার্যের কাছে পড়তে আসতেন। অদ্বৈত আচার্যের প্রথম পুত্র অচ্যুতের জন্ম ১৪১৪ শকে। দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের জন্ম এরও চার বছর পরে অথাৎ ১৪১৮ শকে। নিমাই অচ্যুতের চেয়ে সাত বছরের বড়ো ছিলেন। আবার অচ্যুত কৃষ্ণদাসের চেয়ে চার বছরের বড়ো। সুতরাং কৃষ্ণদাসের পাঁচ বছর বয়সের সময় অদ্বৈতাচার্যের কাছে নিমায়ের পড়তে আসা মানে নিমায়ের তখন বয়েস দাঁড়ায় (১৪০৭+১৪১৮+৫=১৬) বছর। ঈশান লিখেছেন, নিমাই অদ্বৈতাচার্যের কাছে এক বছর বেদ ও ভাগবত পড়েছেন। 'গৌরের এক বর্ষ হৈল অতিক্রম।/তাহে বেদ ভাগবত হইল পঠন ॥(১২ অধ্যায়)। অর্থাৎ ১৬/১৭ বছর বয়েসে নিমাই অদ্বৈত আচার্যের কাছে বেদ ও ভাগবত পাঠ নিয়েছিলেন। সম্ভবত শিক্ষানবীশী শেষ করে নিমাই টোল খোলেন। এবং তা করেন প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহের পর। এসময় নিমায়ের বয়েস ওই ১৬/১৭ বছরই ছিল। তাহলে অচ্যুত যখন নিমায়ের টোলে পড়তে আসেন তখন তাঁর বয়েস অন্তত ১০/১১ বছর। নিমাই বিবাহের বেশ কিছু দিন পর পূর্ববঙ্গ যাত্রা করেছিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মতো অচ্যুৎও তখন গুরুর সঙ্গী হয়েছিলেন। এমন এক বয়েসের পুত্রকে অদ্বৈত আচার্য জেনেশুনে শুধু মাত্র ব্যাকরণ জানা স্বল্প শিক্ষিত নিমায়ের টোলে শিক্ষানবীশীর জন্য পাঠাবেন, বিশেষত অধ্যাপক অদ্বৈত, এ কথায় প্রত্যয়ী হতে স্বভাবতই আমাদের সংশয় হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলা অংশের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে নিমায়ের অধ্যয়ন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও নিমায়ের বিবাহ বর্ণনা আছে। এতে জানা যায়, বিশ্বম্ভর অর্থাৎ নিমাই অতি অল্প সময়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং এই অধ্যায়ে (আমরা অবিশ্যি ষোড়শ অধ্যায়ে পাচ্ছি) একটি শ্লোক আছে, এতে নবদ্বীপে আসা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত (ভক্তিরত্নাকরের মতে এর নাম কেশব ভট্ট বা কেশব কাশ্মিরী) এক জায়গায় বলছেন,

'ব্যাকরণ পড়াই নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্য শাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগান ॥'

[চৈ. ভাগবত/১।১৬।২৯]

উপরোক্ত এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থের (৩৩৫) পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'ইহা হইতে মনে হয় শ্রীচৈতন্য কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়েন নাই।' এবং সেই সঙ্গে তিনি উদাহরণ স্বরূপ "Padyavali Introduction" গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন, তা হলো, "His studies however appear to have been chiefly confined to Sanskrit Grammar especially kalapa Grammar, and possibly to some literature and rhetoric to which allusion is made,"

ডঃ মজুমদার কবিরাজ গোস্বামীর যে দুটি লাইন পড়ে এই মন্তব্য করেছেন তারই নীচের দুটি লাইন পড়লে কিন্তু উপরের লাইন দুটির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অহঙ্কার-বশে নিমাইকে বলছেন,

'ব্যাকরণ শাস্ত্রে তুমি পড়াহ কলাপ ।/শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥' অর্থাৎ যে দিগ্বীজয়ী উপরের লাইনে বলছেন, 'ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম ।' সেই দিগ্বিজয়ী তারই নীচের লাইনে বলছেন, 'ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ ।' সুতরাং দিগ্বিজয়ীর কথার অর্থ এই হয় না যে নিমাই কেবল ব্যাকরণই জানতেন । বরং দিগ্বিজয়ীর কথায় তাঁর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার এবং সেই সঙ্গে নিমাই বিরোধিতাই প্রকাশ পাচ্ছে । কারণ, এস্থানে দ্বিগ্বিজয়ী যদি নিমায়ের ব্যাকরণ শিক্ষাকেই কেবল মাত্র স্বীকৃতি দিতেন তাহলে ব্যাকরণ ব্যতীত নিমাই আর অন্য কিছু পড়েছেন কিনা আমাদের মনে সংশয় দেখা দিতো । দিগ্বিজয়ী তা বলনে নি । তিনি কেবল মাত্র বিরোধিতার জন্যই নিমায়ের বিরোধিতা করেছেন । সুতরাং কবিরাজ গোস্বামীর 'ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম ।/বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার করে গুণ-গান ॥' এই দুটি লাইন থেকে কখনোই প্রমাণ হয় না যে নিমাই ব্যাকরণ ব্যতীত আর কিছু পড়েননি । অবিশ্যি নিমাই ব্যাকরণ ব্যতীত আর কিছু পড়েন নি এ কথা ডঃ মজুমদার কখনোই বলেন নি । বরং তিনি বলেছেন, 'ইহা হইতে মনে হয় শ্রীচৈতন্য কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছু পড়েন নাই ।' কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ এই তিনটি শাস্ত্রের কথা তিনি বলেছেন । অন্যত্র জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে নিমায়ের শিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন—'স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে ।'

এবং এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ আমাদের বক্তব্য হলো, যে চৈতন্যের মুখ দিয়ে নিসৃত হয়েছে 'তৃণাদপি সুনীচেন'র মতো শ্লোক• তাঁর কেবল মাত্র ব্যাকরণ শাস্ত্র ব্যতীত অপরাপর শাস্ত্রে কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না একথা যুধিষ্ঠিরবাবুর মতো সহজ ভাবে ধরে নেওয়া বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয় । কেননা, চৈতন্যের জীবিত কালে তাঁর ভক্তের যেমন অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না তাঁর বিরোধীদেরও । বিরোধীদের অনেক বক্তব্য চৈতন্য চরিতকারগণ লিখেছেন । যেমন গোপাল চাপালের কথা । গোপাল শাক্তধর্মী অর্থাৎ তান্ত্রিক ছিলেন । এছাড়াও তৎকালীন নৈয়ায়িক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকেই চৈতন্য ও বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী ছিলেন । তাঁরা চৈতন্যের সম্পর্কে অনেকবার অনেক কিছু বলেছেন । চৈতন্যের নামে কাজীর কাছে নালিশ করেছেন । মদ্যপ জগাই মাধাইকেও হয়তো তারাই লেলিয়ে দিয়েছিলেন, এমন কি চৈতন্যের বালক শিষ্যদের চৈতন্যবিরেধী মনোভাবের পিছনেও তাঁদের প্রচ্ছন্ন হাত থাকতে পারে । কিন্তু এতো সত্ত্বেও চৈতন্য বিরোধীরা নিমাই ওরফে চৈতন্যের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি । কেন ?

অতঃপর আমরা এ কালের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতের কথা দিয়ে এ প্রাসঙ্গিক আপাত-যবনিকা টানবো । চৈতন্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১ম-খণ্ড) গ্রন্থে এক জায়গায় লিখছেন, 'মহাপ্রভু বহুভাষাবিদ্‌ ছিলেন । তিনি উড়িষ্যা দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া উড়িয়া ভাষা বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি তামিল ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন । যখন তিনি তেলেগু এবং মালায়লম ভাষী লোকেদের দেশে ভ্রমণ

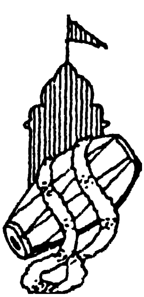


• 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।/অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ অর্থাৎ তৃণের চেয়েও নীচ হয়ে, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হয়ে, নিজে অমানী হয়ে কিন্তু অপরকে মান দান করে নিরন্তর যেন ঈশ্বরের নাম করতে পারি ।

করিতেছিলেন, তখন তিনি সেই দেশের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন (পৃ-৩১০)।

অবিশ্যি অ্যাকাডেমিক শিক্ষার সঙ্গে বহুভাষা জানার খুব একটা নিকট সম্পর্ক নেই। এক ব্যক্তি পড়াশোনা না শিখেও বহুভাষায় পারদর্শী হতে পারেন। কিন্তু চৈতন্যের ক্ষেত্রে ডঃ দীনেশচন্দ্রের উক্তিটি এ কারণে প্রনিধানযোগ্য যে, কোন ব্যক্তির জানার তৃষ্ণা থাকলেই তাবৎ অজানাকে জানার সীমানার মধ্যে আনতে পারে। চৈতন্যের সে তৃষ্ণা ছিল। সুতরাং বিদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে তার রকমফের হবার কথা নয়! কেননা, যুক্তির দিক দিয়ে একথা স্পষ্টত বলা যেতে পারে, তা হলো, তামিল, তেলেগু বা মালায়লম অথবা ওড়িআ ভাষা চৈতন্যের যতোখানি না শিখলে চলতো তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকরণ, স্মৃতি, তর্ক, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। অন্তত তদানীন্তন সংস্কৃত পঠন পাঠনের যুগে, এবং নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য আবহাওয়ায়, আর বিশেষত সেসময়কার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তী যাঁর মাতামহ তার ক্ষেত্রে স্বল্প শিক্ষার ঘটনাটি কতোখানি সত্যাসত্য আমাদের ভেবে দেখা দরকার। অবিশ্যি একথা বলছি বলে তার অর্থগত দিকটি এই ভাবে ধরে নেওয়া সমুচিত হবে না যে, কারু বাপ ঠাকুর্দা পণ্ডিত ছিল বলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও পণ্ডিত হতে হবে। তবে বংশের ধারা—হেরিডিটি (Heredity) তো উত্তর প্রজন্মের মধ্যে বর্তায়। অন্তত এইটিই আমাদের সর্বাগ্রে ধরে নিতে হবে। আবার পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিত নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণের* কথা ধরা যেতে পারে।

বস্তুত, নানান উদাহরণ ও ততোধিক প্রশ্নজাল বিস্তার করে আমরা কদাপি প্রমাণ করতে চাইছি না যে, চৈতন্য ব্যাকরণ ছাড়াও আরও অপরাপর সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। স্বল্প বয়সে পিতা পুরন্দর (জগন্নাথ) মিশ্রের মৃত্যু, বড়দাদা বিশ্বরূপের অভূতপূর্ব গৃহত্যাগ, এসব পারিবারিক কারণে চৈতন্যের শিক্ষাদীক্ষার পরিধি সীমিত বা স্বল্প হওয়া বড়ো সঙ্গত কারণ, এবং এটা যেন স্বাভাবিক ভাবে সত্য, তেমনই এটাও অপ্রত্যয় হওয়ার কারণ নেই যে, ব্যাকরণ ছাড়াও চৈতন্য অপরাপর সংস্কৃত শাস্ত্রেরও পাঠ নিয়েছিলেন বিভিন্ন পণ্ডিতদের সাহচর্যে। এবং এ কথা চৈতন্যচরিত গন্থেই লিপিবদ্ধ আছে। আবার চৈতন্যচরিত গ্রন্থের সব ঘটনাবলী যেমন সর্বাংশে সঠিক নয়, তেমনই চৈতন্যচরিতের কোন কোন ঘটনা-প্রবাহকে বেঠিক বলাও দুষ্কর এজন্য যে, সর্বাংশে সঠিক বা বেঠিক বলতে যা বোঝায়, বা যা বোঝানো উচিত ক্ষেত্র বিশেষে তা আমরা পাই না। সেক্ষেত্রে কিছু সঠিক বা বেঠিক উভয়ের সমর্থন থেকে যায়। হয়তো যুগপৎ সমান সমর্থন থাকে না। কিন্তু পাল্লাভারির দিকটিকেই বা আমরা বেদবাক্য বলে কেমন করে মেনে নিতে পারি? এটা শুধুমাত্র যুক্তির প্রশ্ন নয়, মানসিকতার প্রশ্নও বটে। কেননা,



* দঃ পূঃ রেলের সদর দপ্তরের কর্মী শ্রী বিশ্বেশ্বর মিদ্দা মশায়ের কাছে এ বিষয়ে একটি গল্প শুনেছি আমরা। বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণের বন্ধু ছিলেন মিদ্দাবাবুর এক অতীত বংশধর। তিনি গল্প করতেন, বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণ বেশ অশিক্ষিত ছিলেন বলে সকলে তাঁকে সাগরের ছেলে নারান-ডোবা বলতো। অর্থাৎ সাগরের ছেলে ডোবা। মিদ্দাবাবু এ কাহিনী বংশ পরম্পরা তাঁর বাবার মুখে শুনেছিলেন।

চৈতন্যকে যিনি বা যাঁর উক্তিতে আমরা স্বল্প শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত অথবা পণ্ডিত বলতে পারি আমাদের এই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, তাঁরা উভয়ে চৈতন্যানুরাগী ভক্ত ছিলেন। এবং আমাদের আরও স্মরণ রাখতে হবে, তা হলো, এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে যে যাকে ভালোবাসে, সমর্থন করে, যে যার প্রতি সতত অনুরক্ত, ভক্ত সেই ভক্তের একমাত্র অধিকার থাকে ভক্তিস্পদের ভালো বা মন্দের সমালোচনা করা। কেননা, বর্ষার নদীর মতো দু কুল ছাপানো ভালোবাসা, বাৎসল্য নিয়ে মা সন্তানকে শাসন করে, কিন্তু শাসনের রূঢ়তা কদাপি মা-র সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, বাৎসল্য প্রীতিকে মিথ্যে করে না।

আমরা আরও লক্ষ্য করলে দেখবো, অসংখ্য চরিতকারগণ তাঁদের গ্রন্থে মূলত ভক্তির তুলি হাতে ভগবান চৈতন্যের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ভগবানের ছবি ভক্তের তুলিতে অঙ্কিত হয়নি। আর তখনই ধুলো মাটির পৃথিবীতে আশ্চর্য ভাবে নেমে এসেছেন অলৌকিক ভগবান। আমাদের ঘরের আমাদের নরম-সবুজ বাঙলার নিমাই। যেখানে অলৌকিকতা, অতিমানুষতার চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে, মহান ও মহৎ হয়ে উঠেছে চৈতন্যের সুখ আবার দুঃখও, আশা আবার আশাহীনতা, রোগ, শোক, বেদনা, মৃত্যুর কাতরতা, যা এক মানুষেরই থাকে। আর এখানেই চৈতন্যচরিত ও চরিতকারদের সার্থকতা।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, তা হলো চৈতন্য যখন নীলাচলে অবস্থান করছেন তখন গৌড়দেশ থেকে একটি গোপন বার্তা আসে জগদানন্দের মারফৎ। পত্র প্রেরক স্বয়ং আচার্য অদ্বৈত। আর তাতে বলা ছিল,

'বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

[চৈঃ চঃ/১৯অ]

ডঃ সুকুমার সেন এটিকে 'হেয়ালী কবিতা' বলে উল্লেখ করেছেন। হয়েতো তাই হবে। কিন্তু আশির দশকে অত্যাধুনিক কবিতার যুগে আচার্য অদ্বৈতের প্রেরিত উপরোক্ত চারটি লাইন বিশ্লেষণ করতে একথাও মনে হয়, এ যদি হেয়ালীও হয় তবে তার বক্তব্য সাধারণ লোকের জন্য নয়, এর বোদ্ধাও খুব সাধারণ লোক হতে পারে না। মনে হয়, পণ্ডিতের কাছে পাঠানো পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যপুর্ণ পত্র। এবং যা মানুষ ও তার সর্বপরি মনুষ্যত্বের কথা বহন করে।

আর তাই মাননীয় যুধিষ্ঠিরবাবু (মোলীবুড়ো) যা লিখেছেন, 'তিনি (চৈতন্য) টোলে মাত্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। দর্শন বা অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না।' এ কথার বিরোধিতা না করলেও, এমন কথা সমর্থনের সহযোগিতা করারও ভরসা হয় না। কেননা, এর 'না' এবং 'হ্যাঁ' দুটি দিকই চৈতন্যচরিতে সমর্থিত॥



[উৎকল পর্ব]

[সতেরো]

চৈতন্য যে পথে পুরী গেছলেন

'Biographics are but the clothes and buttons of the man—the biography of the man himself can not be written.'

—মারক্ টোয়েন

একজন মানুষ আরেক মানুষের পূর্বাপর সহমর্মী হতে পারে, তার সুদীর্ঘ স্থিতি বা দীর্ঘতর চলমান পথের অভিযাত্রী-সহযাত্রী হওয়াও বিচিত্র না, এমন তো আমরা প্রায়শ হয়েও থাকি। কিন্তু একটি জীবন ঘিরে আরেক প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ—সে একান্ত স্ত্রী বা অভিন্নহৃদয় বন্ধু হতে পারে, (ঐশ্বরিক আভূষণে বর্ণাঢ্য একটি জীবন) তার আনন্দময়তার উত্তরণ, তার বোধি, অথবা ব্যাপ্তি, যা সুখ বা দুঃখের দ্বান্দ্বিকতায় প্রচ্ছন্ন, তার চেতন কিংবা অবচেতন মনের নস্টালজিয়া (Nostalgia) যা আক্ষরিক অর্থে সপ্নিক বা স্বপ্নের প্রচ্ছায়ায় অভিব্যক্ত, অর্থাৎ একটি মানুষের অব্যক্ত যা কিছু অনুভূতি তার সুখ বা দুঃখের, তা আমরা কেমন করে অনুভব করবো ? এটা প্রশ্ন এবং উত্তর যুগপৎ দুটোই ধরা যেতে পারে। কেননা, কিছু কিছু প্রশ্নের মধ্যে পূর্বাপর উত্তরও থেকে যায়।

রবীন্দ্রানাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'-এর পাতায় বলেছেন, কোন আত্মচরিত অবিকল আত্মজীবনীর (biography) মতো নাও হতে পারে। শুধুমাত্র স্মৃতির বিভ্রম বশতঃ কবি এমন কথা বলেছেন প্রত্যয় হয় না। বোধকরি সবার জীবনের কিছু কথা একান্ত নিজের জন্য থেকে যায়, যা না বলার সুখ থাকে নিজস্ব অনুভবের মধ্য দিয়ে। দুঃখজাত যন্ত্রণাও থাকে। আর সে সুখের তৃপ্তি বা যন্ত্রণার দুঃখ আমরা একটি মানুষের জীবনের পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ থেকে আহরণ করে থাকি। এরই মধ্যে চলে যাওয়া মহাকালের রথচক্রের চিহ্ন ও মানুষের অনুভব মিশ্রিত হয়ে তৈরি হয় ইতিহাস। বিশ্বম্ভর মিশ্রের চৈতন্য হওয়া এমনই এক বিস্তৃত ইতিহাস। কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত, দাস বৃন্দাবনের ভাগবত, মুরারির কড়চা অথবা কর্ণপূরের মহাকাব্য-আদি এমনই এক মহাকালের নিক্রমণ রথচক্রের চিহ্নরেখা। আর সেই চিহ্নরেখা ধরেই আমাদের পদচারণা।

* * *

অতঃপর আবার আমরা চৈতন্যের পরবর্তী জীবন আলেখ্যে ফিরে আসবো। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি, বিশ্বম্ভর মিশ্র কি ভাবে ও কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দুঃখিনী মা ও ততোধিক দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার বন্ধন ছিন্ন করে, সমাজ সংসারের চিরায়ত গণ্ডি ডিঙিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন। কথা হলো, অতীতকে বিস্মরণ না হলে তো সন্ন্যাস নেওয়া যায় না। ফেলে আসা পথের জীর্ণ পত্ররাজির মতো সমুদ্র-তুল্য মায়ের বিরাট ভালোবাসা, আর তার ক্রমান্বয়ে উত্তাল ঢেউগুলির মতন বিষ্ণুপ্রিয়ার স্মৃতি কি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেছলো চৈতন্যের জীবন থেকে, অথবা পরবর্তী জীবন, উৎকলে দীর্ঘ আঠারো বছরে কোন একদিন ? আমরা তাই এবার দুঃখ বা



সুখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করবো। আসলে একথা বলা এ জন্য যে, কেউ জ্বলুনির মধ্যে সুখ পায়, আবার কেউ সুখের মধ্যে অসুখের জ্বালা অনুভব করে। চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবন সেই দুটি পথ ধরে আমাদের পরস্পর পরস্পরমুখী পথে নিয়ে চললো।

কবিরাজ গোস্বামীর কলমে দেখা যাচ্ছে, তিনি লিখছেন,

'মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাহা বহু নৃত্যগীত হৈল॥' [চৈ.চ. ২৭৷৩-৪]

কবিরাজ গোস্বামীর এ হিসেবটির মধ্যে কিছু গরমিল লক্ষ্য করছি আমরা। কেননা, কবিরাজের হিসেব মেনে নিলে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য অন্তত দশ দিন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে শান্তিপুরে বসবাস করেছেন। আর তা করেছেন সন্ন্যাস নেওয়ার পর ও রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ করে ফিরে এসে।

কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন:

'এই মতে দশ দিন ভোজন কীর্তন
এইরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন॥'

[চৈ. চরিতামৃত ২৷৩৷১৩৩]

অবিশ্যি পদকর্তা বাসু ঘোষ বিরচিত ('গৌরপদতরঙ্গিনী' ১ম সংস্করণ পৃ. ৩৮০) এর একটি পদেও ওই একই কথা বলা হয়েছে। এবং এতেও দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাসোত্তর চৈতন্য রাঢ়াভূমি থেকে প্রত্যাবর্তন করে অদ্বৈত আচার্যের শান্তিপুর গৃহে* দশদিন অতিবাহিত করেছিলেন।

'এইরূপে দশদিন অদ্বৈতের ঘরে।
ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে॥'

['গৌরপদতরঙ্গিনী' / ১ম সং / পৃ. ৩৮০]

এ'প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর বৃহৎ-আয়তন 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যাহা হউক কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানিয়া লইলে বলিতে হয় যে আনুমানিক ১০ই, ফাল্গুন হইতে ১৯শে ফাল্গুন পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে ছিলেন।' (পৃ. ১৪)।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তৎকালীন হাঁটা পথের যুগে ১৯শে ফাল্গুন শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে ওই ফাল্গুন মাসের মধ্যে পুরীতে পৌঁছানো কি সম্ভব? ডঃ মজুমদারও তাঁর গ্রন্থে এরকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যদিও তা সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন যে, 'তবে প্রভু ভাবোন্মত্তভাবে চলিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভব হইতেও পারে।' কিন্তু চৈতন্যের সহযাত্রী অন্যান্য পার্ষদবর্গ যথা নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণও কি চৈতন্যের ন্যায় অনুরূপ ভাবোন্মত্ত ছিলেন? দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথের বিবরণী থেকে তা তো মনে হবার কারণ নেই। অন্তত কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত ও দাস বৃন্দাবনের ভাগবতে এর পুঙ্খানিপুঙ্খ বিবরণ আছে। পরমানন্দ সেনের নাটকে ও মহাকাব্যে, মুরারির কড়চায়, জয়ানন্দ, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলেও এর কিছু কিছু বিবরণ আছে। মোদ্দা কথা, চৈতন্য সপার্ষদ যে পথে পুরী গেছলেন সেই পথ ছিল অতীব বন্ধুর, শঙ্কটময় ও বিপদসঙ্কুল। পথে দস্যু তস্করের ভয় ছিল। গহিন জঙ্গল পথে হিংস্র বন্য জন্তুরও অভাব ছিল না। কিন্তু তারও চেয়ে বড় ভয়



*শান্তিপুর ছাড়াও অদ্বৈত আচার্যের নবদ্বীপে আরও একখানা বাড়ি ছিল।

যেটা ছিল, যা যাত্রারম্ভে শঙ্কিত করেছিল চৈতন্যকে, সেটা ছিল সীমান্ত যুদ্ধের ভয়াবহতা। কোন সীমান্তে সে যুদ্ধ ? না চৈতন্য যে পথে পুরী গমণ করবেন সেই পথের ওপর।

যুদ্ধটা চলছিল ওড়িশা ও গৌড়বাঙলা সীমান্তের মধ্যে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ। একদিকে উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র। অন্যদিকে গৌড়বাঙলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রীঃ)। এবং এই একমাত্র কারণে ঠিক হলো, সপার্যদ চৈতন্য সোজাসুজি পথে না গিয়ে, সামান্য ঘুর রাস্তায় ছত্রভোগের পথ ধরে উৎকল রাজ্যে প্রবেশ করবেন।

স্বভাবতই আমাদের একটা কথা মনে হতে পারে, মনে হতে পারে, চৈতন্য যেন খুব চটজলদি সিদ্ধান্তে বাঙলাদেশ ছেড়ে ওড়িশা রাজ্যে গমণ করেছিলেন। আবার এমনও মনে হতে পারে যে, ভারতবর্ষে এতো এতো জনপদ থাকতে তিনি হঠাৎ ওড়িশার পুরীতেই বা গেলেন কেন ? জগন্নাথের চরণে আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য ? কিন্তু তা যদি হয় তাহলে তো ভারতবর্ষে আরও অনেক পবিত্র তীর্থস্থান রয়েছে। গয়া-বারানসী-বৃন্দাবন-হৃষিকেশ। যে কৃষ্ণের জন্য, কৃষ্ণসখী শ্রীমতীর জন্য তিনি মাতোয়ারা, ভাবোন্মত্ত, সেই ননীচোরা কৃষ্ণের সন্ধানে তো তিনি কৃষ্ণের শাশ্বত আবাসভূমি মথুরা বৃন্দাবনে গেলেই পারতেন। খুব কাছে, ভাঙনধরা অজয়ের তীরে কদম্বখণ্ডীর ঘাটেও তাঁকে পাওয়া যেতে পারতো। কিংবা আরও দূরে দ্বারকায়, গর্জমান প্রভাসের তীরে তীরে, কিন্তু তা তিনি যাননি। শেষ আঠারো বছরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতেই। কিন্তু কেন ?

এই 'কেন'-র উত্তর হযতো চৈতন্যমাতা শচীদেবীর একটি নির্দেশনামা সঙ্কলিত পয়ারে আমরা পেতে পাবি। এখানে চৈতন্যের একটি প্রশ্ন ছিল, আর তা ছিল জননী শচীদেবীর উদ্দেশ্যে। যথা–

'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥

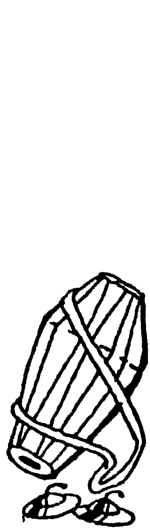
কেহ যেন এই বলে না করে নিন্দন।
সেই কর্ম্ম কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥'

'দুই ধর্ম্ম' অর্থে বোধহয় গার্হস্থ্য ধর্ম এবং সন্ন্যাস ধর্ম এই দুই বিপরীত মেরুকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্তত মায়ের তত্ত্বাবধানের দিকটিও তো গার্হস্থ্য ধর্মের মধ্যে পড়ে। যা চৈতন্য সন্ন্যাসোত্তর জীবনে করেও ছিলেন।

'তখন এর উত্তরে জননী শচীদেবীকে বলতে শোনা গেল ঃ

তিঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ॥
তাহে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥'

[চৈ. চরিতামৃত/মধ্যলীলা/২য় পরিচ্ছেদ]



সুতরাং, শচীমাতার এ হেন উক্তি থেকে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের এমন একটা কথা সহজে মনে হতে পারে যে, বোধকরি জননীর এই উপদেশ শুনে নিমাই নীলাচল পুরীধামে গমন করেছিলেন। কিন্তু এমন কথা চিন্তা করার পিছনে যথেষ্ট কারণ বা যুক্তি থাকলেও, এর কিছু আগের ইতিহাসে এই প্রমাণ হয় না যে, মাত্র শচীদেবীর নির্দিষ্ট করা ও নির্দেশ মতো ওড়িশার পুরীতে তিনি গমন করেছিলেন। কেননা, চৈতন্যের পূর্বোক্ত জীবনী থেকে (এমন কি যখন তিনি সন্ন্যাসও গ্রহণ করেননি) আমরা স্পষ্টত জানতে পারছি, সন্ন্যাসী

হওয়া বা নীলাচলে যাবার 'ব্লু প্রিন্ট' খুব গোপনে হলেও শচীমাতার নীলাচল নির্দিষ্ট করার বহুদিন আগেই তৈরি হয়ে গেছলো। যা এই গ্রন্থের বহু আগেই উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের এ কথা ভাববার কারণ নেই যে, খুব চটজলদি, ঝটিতি সিদ্ধান্তে চৈতন্য সন্ন্যাস পরিগ্রহণ করেছিলেন ও পরিগ্রহন্তে গৌড়বাঙলা ত্যাগ করে উৎকল দেশের সমুদ্রনগরী পুরী অঞ্চলে চলে গেছলেন।

নীলাচল যাত্রার প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্ন্যাসী চৈতন্যের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল শান্তিপুর। এসময় অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে তিনি বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত করেছিলেন। সঠিক কতোদিন তিনি আচার্যের বাড়িতে ছিলেন এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। যদিও একমাত্র কবিরাজ গোস্বামী হিসেব কষে বলেছেন তিনি (চৈতন্য) এসময় টানা দশদিন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে ছিলেন।

'এই মত দশদিন ভোঁজন কীর্ত্তন।
এইরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ॥' [২৩।১৩৩]

কিন্তু মুরারি গুপ্তের কড়চা (৩।৪।২৩), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত (৩।২৩৮১) পাঠ করলে এমন ধারণার যথেষ্ট কারণ থাকে যে চৈতন্য বোধহয় আচার্যের শান্তিপুরের বাড়িতে একদিনই ছিলেন। অবিশ্যি, কর্ণপূরের মহাকাব্যে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এসময় একাধিক দিন চৈতন্য শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে ছিলেন ও জননী শচীদেবীর সাথে এখানেই তার নীলাচল যাত্রার পূর্বে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল।

'ততোঽদ্বৈতপ্রীত্যা প্রণতহরিদাস্য চ মুদা।
জগন্নাথক্ষেত্রং জিগমিষুরপি স্বপ্রিয়বশঃ ॥
শচীদেব্যা তৎপচিতমতুলমন্নং নিজজনৈঃ।
সমং তৈর্ভুঞ্জানঃ কতি চ গময়ামাস দিবসান্ ॥'

[মহাকাব্য/১১।৭৪]

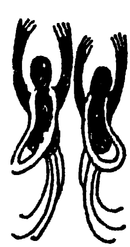
ক্রমে শান্তিপুর তথা গৌড়বাঙলা ত্যাগের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগলো। জননী শচীদেবীর কাছে আগেই যাবার অনুমতি পেয়েছেন তিনি। চলেছেন সুদূর নীলাচলে। বিচ্ছেদের দুঃখে উদ্বেলিত ভক্তগণ। মা শচীদেবীর মনে নিঃস্বতার জাল বুনে চলেছে মহাকালের মাকড়শা।

আসন্নপ্রায় দিনের এক সকাল। গৌরকান্তি চৈতন্য অরুণকান্তি বস্ত্র পরিধান করে নিঃসংকোচে এসে দাঁড়ালেন ভক্তদের কাছে। দু'চোখে হৈমালয়িক ধৈর্য। যেন নয়ানজুলির কালো জলে ফোটা শ্বেত পদ্মের ওপর কৃষ্ণকালো দুটি ভ্রমর—এমন দুটি চোখ নির্নিমেষে চেয়ে রইলো পার্ষদ ও অতিপরিচিত মানুষগুলির দিকে। অতঃপর করজোড় করে দাঁড়ালেন নদীয়ার নিমাই। বললেন,

'তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এক ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব ॥'

স্তব্ধ ভক্তগণ। ভগবান ভক্তের কাছে ভিক্ষা চাইছেন। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

'আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন
মধ্যে মধ্যে আসি তোমা দিব দরশন।'



হে নবদ্বীপবাসীগণ, এবার আমাকে বিদায় দাও। কিন্তু তার আগে নীলাচল যাত্রার অনুমতি চাই তোমাদের কাছে। সুদূর সমুদ্রনগরী সেই স্থান। কলি

অবতার জগন্নাথের আবাসস্থল। কিন্তু জন্মের মতো আমি যাব না। মাঝে মধ্যে আবার আসবো তোমাদের কাছে, তোমাদেরই টানে এই নদীয়ায়।

এমন সময় বৃদ্ধ হরিদাস এসে পড়লেন চৈতন্যের পদতলে। দু'চোখে অশ্রুবন্যা। বললেন, প্রভু, গৌরসুন্দর, তুমি এ দেশ ছেড়ে চলে গেলে আমি এ পোড়া জমিনে কেমন করে বাঁচবো। নীলাচলে যাবার শক্তি আমার নেই। আমি বড় অধম, পাপিষ্ঠ। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যে আমি বাঁচবো না।

শুনে চৈতন্য ম্লান হাসলেন, বললেন, তুমি এতো দৈন্য দেখাচ্ছো কেন হরিদাস। প্রিয় পার্ষদ, আমরা কেউ কারুকে ছেড়ে বাঁচবো না। আমি জানি, সেই মতো জগন্নাথের কাছে তোমার কথা নিবেদন করবো। তোমাকে আমি নীলাচলে নিয়ে যাবো হরিদাস।

মহানিষ্ক্রমণের সময় আগতপ্রায়। কবির ভাষায় বুঝি 'বন্দরের কাল হলো শেষ'। সুতরাং মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে নাবিককে।

গৈরিক পথের মহাযাত্রীর সঙ্গে কে কে সহযাত্রী হবেন তাও ক্রমে ঠিক হয়ে গেল।

'নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥'

[চরিতামৃত/মধ্য/২য় পরিচ্ছেদ]

অবিশ্যি নিত্যানন্দ গোসাঞি চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গেছলেন কিনা এ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। যদিও মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপূর, নিত্যানন্দের শিষ্য বৃন্দাবন দাস, কবিরাজ গোস্বামী সকলেই নিত্যানন্দকে চৈতন্যের নীলাচলের সহযাত্রী বলেছেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কবি জয়ানন্দ এ যুক্তি মেনে নিতে রাজী নন। তাঁর মতে, চৈতন্য আগেই নিত্যানন্দ গোস্বামীকে নীলাচলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

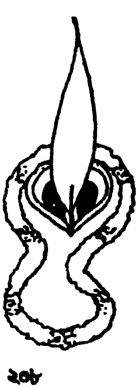
'তুমি আগে রহ গিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে।
আমি সর্ব্ব পারিষদে যাব তোমার পশ্চাতে ॥'

['চৈতন্যমঙ্গল'/উৎকলখণ্ড/পৃ. ৯০]

এরপর দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের নির্দেশ পেয়ে জনৈক রামদাসকে সঙ্গে নিয়ে নিত্যানন্দ আগেই নীলাচলে চলে গেলেন। জয়ানন্দ কবির এ উক্তি বেশ সংশয়পূর্ণ বলে মনে হয়। কেননা, এর পরবর্তী পয়ারে তিনি লিখেছেন,

'নিত্যানন্দ আগে পলাইল নীলাচলে।
নিভৃতে রহিল কেহ দেখিতে না পারে ॥'

চৈতন্যের ইচ্ছাক্রমে যে নিত্যানন্দ রামদাসকে সহযাত্রী করে পূর্বাহ্নে নীলাচলে পৌঁছালেন, পরবর্তী পয়ারে সেই নিত্যানন্দের নীলাচলে পলায়ন ও লুকিয়ে থাকার মধ্যে বড় একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্যের ইচ্ছাক্রমে যে নীলাচলে গেল পরক্ষণে তাকে লুকিয়ে পালিয়ে গেল বলার অর্থ কি?



তবে চৈতন্যের নীলাচল যাত্রার প্রাক্কালে কে কে তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন এ বিষয়ে বেশ কিছু চরিতাকারদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্যের নীলাচল যাত্রার সহযাত্রী ছিলেন চারজন। নিত্যানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ আর মুকুন্দ দত্ত। বৃন্দাবন দাসের মতে পাঁচজন, যথা—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ। অন্যত্র কবি কর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন, গদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, মুকুন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে চৈতন্য নীলাচল যাত্রা করেছিলেন (১১।৭৬)।

আবার এই কর্ণপূর তাঁর নাটকে (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক) লিখেছেন, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ এই চারজন চৈতন্যের নীলাচল যাত্রার সঙ্গী ছিলেন। (নাটক ৬।৪, শ্লোক পঞ্চম)। তবে চরিতকারদের তালিকা ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে চৈতন্যের হৃদ্যতা বুঝে একথা বলা যায়, অন্তত নিত্যানন্দ, গদাধর, দামোদর ও গায়ক মুকুন্দ চৈতন্যের অবশ্যই সঙ্গী ছিলেন। তবে আরও কেউ কেউ থাকতে পারেন।

অতঃপর আবার মহানিক্রমণের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসা যাক।

বৃদ্ধ হরিদাসকে আশ্বস্ত করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন গৌরকান্তি। মুণ্ডিত মস্তক। দু'পাশে ভক্তবৃন্দ আকুল চোখে তাকিয়ে আছে। চৈত্রের ধু-ধু আকাশের দিকে চাতক যেমনটি তাকিয়ে থাকে। দু'চোখ বাঁধনহারা অশ্রু।

নিমাই ধীর পায়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করলেন। চরণে হাত রেখে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললেন, এবার আমাকে বিদায় দাও মা।

শচীদেবী পুত্রের মাথায় আঘ্রান দিলেন। সহসা কারা যেন বুকফাটা হুতাশ্বাসে কেঁদে উঠলো।

স্বয়ং আচার্য কাঁদছেন।

গেরুয়া সন্ন্যাসী এগিয়ে চলেছেন ধীরে ধীরে। পিছনে অমোঘ বন্ধন। সম্মুখে জোয়ারের টান।

চৈতন্য বললেন, সবই তোমাদের দিয়ে গেলাম। অমিয় কৃষ্ণনাম। আমি সেই আশায় চলেছি।

(আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট যেদিন দ্বিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন সেদিন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন অনুচরদের মধ্যে। এমন সময় সহকর্মী পেরডিকাস শুধালেন, সম্রাট আপনি নিজের জন্য কি রাখলেন ? আলেকজাণ্ডার বললেন, আশা।)

সমস্ত কিছু খুইয়ে বিরক্ত সন্ন্যাসী চৈতন্য চলেছেন সেই আশার পথ ধরে প্রাপ্তির কিনারার খোঁজে।

তারও পিছনে আচার্য অদ্বৈত।

চৈতন্য করজোড়ে বললেন, এবার আপনি ফিরে যান আচার্য।

থমকে দাঁড়ালেন অদ্বৈত পণ্ডিত। বললেন, তুমি যাবেই তা আমি জানি। কিন্তু পথ বড় বিপজ্জনক নিমাই। খুব সঙ্কটময়। হাঁটা পথে নীলাচলে পৌঁছানো বেশ দুষ্কর। কেননা, যে পথ ধরে তুমি যাচ্ছো সে পথে এখন দুই রাজা সীমান্ত যুদ্ধে লিপ্ত। গৌড়ের হুসেন শাহ্ আর উৎকলপতি প্রতাপরুদ্র। দু'জনেরই আচরণ মহাদস্যুর মতো (চৈ. ভাগবত ৩।২।১২)।

সম্ভবত অদ্বৈত আচার্যের কথা মতো চৈতন্য সোজাসুজি পরিচিত পথে না গিয়ে 'দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া' ছত্রভোগের দিকে এগিয়ে চললেন।



[আঠারো]

চৈতন্য যে পথ পুরী গেছলেন

শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে চৈতন্য ঠিক কোন পথ ধরে নীলাচলে পৌঁছেছিলেন এ নিয়ে চৈতন্য চরিতাকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কবি কর্ণপুর, লোচন দাস ও মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রেমুনা থেকে যাত্রা বিবরণী দিয়েছেন। কিন্তু শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে তিনি কিভাবে রেমুনা পর্যন্ত এলেন তা বলেন নি। তবে তিনি যে তমলুক (তাম্রলিপ্ত) হয়ে রেমুনা পৌঁছেছিলেন এ কথা লোচন ও মুরারির বইতে পাওয়া যায়।

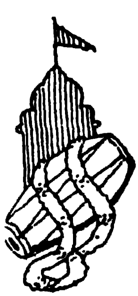
অন্যত্র বৃন্দাবন দাস তাঁর ভাগবতে লিখেছেন, চৈতন্য শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে 'দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া' আটিসারা* হয়ে ছত্রভোগ* যান। এবং ছত্রভোগ থেকে নৌকা যোগে তিনি উৎকল সীমানা প্রয়াগঘাটে* পৌঁছান।

অন্যদিকে জয়ানন্দের বক্তব্য হোল, শান্তিপুর থেকে যাত্রা করে সুরনদী অর্থাৎ গঙ্গাকে বামে রেখে কাচমনি বেত্রড়ার ডাইনে দিয়ে চৈতন্য প্রথমে কুলীনগ্রামে এসে পৌঁছালেন। কুলীনগ্রাম থেকে নদীপথ সেয়াখলি দিয়ে তাম্রলিপ্তে (তমলুক) এলেন। তারপর 'মন্ত্রেশ্বর-কুলে বিষ্ণুহরি দেখিঞা' পৌঁছালেন স্বর্ণরেখা (সুবর্ণরেখা) নদীর তীরে। এবং এই স্বর্ণরেখা তীর হতে ক্রমে দাঁতন, জলেশ্বর, বাঁশদা, রামচন্দ্রপুর ছাড়িয়ে রেমুনাতে পৌঁছালেন। তারপর রেমুনায় গোপীনাথকে দর্শন করে, সরো নগর ও বাঙ্গালপুরের ভেতর দিয়ে, অসুরগড় নামক স্থান ডাইনে রেখে ভদ্রকে এসে পৌঁছালেন।

'রজনী প্রভাতে স্বর্ণরেখা নদী
পার হৈঞা উতরিলা বারাসতে।
দাঁতন জলেশ্বর পার হৈঞা
উতরিতা আমরদাতে ॥
বাঁশদা ছাড়িয়া রামচন্দ্রপুর দিয়া
রেমুনাএ গোপীনাথ দেখি।
সরো নগরের দেউলের ভিতর
সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ করি সাক্ষী ॥
রজনী প্রভাতে চৈতন্য গোসাঞি
বাঙ্গালপুরের মাঝ দিয়া ॥
অসুরগড় ডাইনে করিয়া
ভদ্রকে উতরিলা গিঞা ॥'

[চৈতন্যমঙ্গল/উৎকল খণ্ড]

ভদ্রক থেকে পৌঁছালেন যাজপুরে। সেই যাজপুর, যেখানে চৈতন্যের



* আটিসারা—বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর নামক স্থানের নিকট একটি গ্রামের নাম আটিসারা। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর মতে বর্তমানের আটঘরা গ্রামই হলো অতীতের আটিসারা।

* ছত্রভোগ—বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর মজিলপুর থেকে ২/৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত 'খাড়ি' নামক গ্রাম।

* প্রয়াগঘাট—ডায়মণ্ড হারবারের সমীপবর্তী মন্ত্রেশ্বর নদের কোন ঘাটকে বলা হয়েছে।

পূর্বপুরুষদের বাস্তুভিটা ছিল বলে বিতর্ক আছে। তারপর এই যাজপুর থেকে মন্দাকিনী নদী পার হয়ে, পুরুষোত্তমপুর, আমরাল হয়ে, কটকে সাক্ষীগোপীনাথ দর্শন করে অবশেষে এসে পৌঁছালেন প্রার্থিব জগন্নাথক্ষেত্রে।

কড়চাকার গোবিন্দ দাসের বক্তব্য কিন্তু অন্যরকম। গোবিন্দ দাসের মতে চৈতন্য শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে বর্ধমান, দামোদর, হাজিপুর, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সুবর্ণরেখা, হরিহরপুর, বালেশ্বর, নীলগড়, বৈতরণী (নদী), সাক্ষীগোপাল হয়ে পুরীতে আসেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এইরূপ একটি রাস্তা রেনেলের ম্যাপে দেখা যায়। কিন্তু এইটি সহজ পথ নহে। সবচাইতে সোজা রাস্তা হইতেছে বৃন্দাবনদাস বর্ণিত পথ। ঐ পথেই শ্রীচৈতন্য পুরীতে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।' (পৃষ্ঠা- ২৪৫)

ছত্রভোগ থেকে পুরী

'এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করি সুখী॥'

['চৈতন্যভাগবত'/৩।২।৫৮ ৫৯]

চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের ২৯ তারিখে। সেদিনটা কাটোয়ায় অতিবাহিত করে পরদিন ১লা ফাল্গুন বেরিয়ে পড়লেন রাঢ়দেশ ভ্রমণে। ১লা থেকে ৪ঠা ফাল্গুন রাঢ়দেশে কাটলো। ৫ই ফাল্গুন ফিরে এলেন নদীয়ায়। এরপর ফুলিয়া নগরে কয়েকদিন অতিবাহিত করে ১০ই ফাল্গুন শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে এসে উঠলেন। কবিরাজ গোস্বামীর হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ১০ থেকে ১৯শে ফাল্গুন পর্যন্ত এই দশদিন চৈতন্য শান্তিপুরে ছিলেন।

১৯শে ফাল্গুন (১৪৩১ শক) শান্তিপুর থেকে চৈতন্য যাত্রা শুরু করলেন নীলাচলের উদ্দেশ্যে।

চৈতন্য যে সময় নীলাচলের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পদযাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন সেটা ছিল ভ্রমণের উৎকৃষ্ট সময়। বসন্ত ঋতু। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। এসময় গর্জমান নদী-নদীর স্রোত বেশ শান্ত। তেমনই বর্ষার কোন প্রকোপ থাকে না। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে এই সময়টিকে ভ্রমণ, মৃগয়া ও যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত সময় বলা হয়েছে।

কিন্তু চৈতন্য যে সময় নীলাচলের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন ঋতু ও প্রাকৃতিক দিক দিয়ে সে সময়টি উপযুক্ত হলেও, দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক দিক থেকে তা কদাপি প্রশস্ত ছিল না। উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০ খ্রীঃ)ও গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) এই দুই রাজা তখন তুমুল সীমান্ত যুদ্ধে লিপ্ত। এখানে একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্ত যেখান থেকে শুরু হয়েছে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে (চৈতন্য যখন নীলাচলে যাত্রা শুরু করেছিলেন) কিন্তু তেমনটি ছিল না। সেসময় ওড়িশাদেশের সীমানা ছিল বাঙলাদেশের আরও ভেতরে। বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে মাদ্রাজের গুন্টুর জেলা পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। (মাদলাপঞ্জি ১ম খণ্ড ১৯৫০ সং)।



ডঃ উৎকল সীমান্তে পৌঁছানোর সহজ ও প্রশস্ত পথ বর্জন করে একটু ঘুর

পথে, ছত্রভোগের পথ ধরে পুরী যাওয়া মনস্থ করলেন চৈতন্য।

সে সময় ওড়িশা সীমান্তে প্রবেশ করা যে কতোখানি দুষ্কর ছিল তা ছত্রভোগের•(দক্ষিণদেশের অধিকারী) রামচন্দ্র খানের জবানী থেকেই বোঝা যায়। চৈতন্য নীলাচলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তার উত্তরে রামচন্দ্র খান বলছেন,

'সে দেশে এ দেশে, কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি লয় প্রাণ॥'

অর্থাৎ ওড়িশা বা বাঙলা দেশের লোক এখন কেউ কারু দেশে যাচ্ছে না। দু' দেশের রাজারা নিজ নিজ রাজ্যের সীমান্তে ত্রিশূল পুঁতে রেখেছে। (ত্রিশূল অর্থে মাটির নীচে লুকানো তীক্ষ্ণধার ফলক, পথ চলতে গিয়ে যা বিদ্ধ হবে)। তার ওপর আছে 'জাশু' সাব্যস্তের ভয়। 'জাশু' শব্দটা এসেছে, 'জাসূদ' বা 'জাসূস্' কথা থেকে। যার অর্থ হলো গুপ্তচর বা গোয়েন্দা। তাই কোন পথিক দেখলে রাজাদের সৈন্যরা গুপ্তচর সন্দেহে তাকে মেরে ফেলছে।

দক্ষিণদেশের অধিকারী রামচন্দ্র খানের মুখে সীমান্ত যুদ্ধের এ হেন ভয়াবহতা শুনেও চৈতন্য যখন নীলাচলে যাবার সংকল্প থেকে কোনরকম নিরস্ত্র হলেন না তখন স্বাভাবিকভাবেই রামচন্দ্র খানের মনে সন্দেহ দেখা দিলো। এমন রক্তক্ষয়ী ভয়াবহতার মধ্যে, প্রায় মৃত্যুকে মুঠোয় চেপে, এ মানুষটা সীমান্ত টপকাতে চাইছে কেন? তবে কি সুলতান রাজার বিরুদ্ধে কোন চর হয়ে উড়িষ্যা দেশে চলে যাচ্ছে? আবার এমন তো হতে পারে, রাজকর্মচারী চাঁদকাজীর সঙ্গে যে বিরোধ বাঁধিয়েছিলেন চৈতন্য সেটা রামচন্দ্র খান জানতেন। সম্পর্কে চাঁদকাজী ছিলেন সুলতান হুসেন শাহের দৌহিত্র। সেই চাঁদকাজীর ঘরবাড়ি, বাগান তার বৈষ্ণব ভক্তদের দিয়ে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন চৈতন্য। সেদিক দিয়ে এই মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী পুরোদস্তুর রাজদ্রোহী। রামচন্দ্র খান ভাবলেন, এমন এক রাজ-বিদ্রোহী মানুষকে শত্রুর দেশে চলে যেতে সাহায্য করলে, এবং তা ভবিষ্যতে সুলতান রাজার গোচরে গেলে আমার ভবিষ্যত কি হবে। এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে রামচন্দ্র খানের মনে সন্দেহাতীতভাবেই মৃত্যু ভয় দেখা গেল। তিনি বললেন,

'তাহাতে ডরাঙ প্রভু। শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে নশ্বর, এথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার॥'

প্রভু, আমার দিকটা তুমি ভেবে দেখো। আমি কে, না এই দক্ষিণদেশের অধিকারী। কিন্তু দেশের রাজার একজন নশ্বর ভৃত্য মাত্র। কেননা, সুলতান রাজার ইচ্ছাক্রমে আমার ওপর এ ভার ন্যস্ত আছে। সুতরাং রাজার বিরুদ্ধে কিছু করার মতো আমার স্বাতন্ত্রতা নেই। এখন আমি যদি রাজার ইচ্ছার প্রতিকূল কাজ করি সেক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা থাকবে।



তবু চৈতন্যেরই জয় হলো। অধিকারী রামচন্দ্র খান রাজার লোক হয়েও সন্দিহান সন্ন্যাসীর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। উপেক্ষা করতে না পারার কিছু কারণ ছিল। আর তা জানতে হলে আমাদের আরেকটু আগের ঘটনায় ফিরে যেতে হয়। চৈতন্য আর রামচন্দ্র খানের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা। অধিকারী রামচন্দ্র দোলা (পাল্কি) যোগে শতমুখী গঙ্গার পাড় ধরে চলেছেন। আর ঠিক এসময় তরুণ সন্ন্যাসী চৈতন্য গঙ্গাস্নান করে

সিক্তবসনে উঠছেন। জ্যোতির্ময় রূপ। দেখে রামচন্দ্র খানের কেমন ভয় হলো। দোলা থেকে নেমে এলেন সন্তর্পনে। শুধালেন, 'কে তুমি ?' এমন সময় জানা গেল, এই লোক এই দক্ষিণদেশেরই অধিকারী। চৈতন্য বললেন, তুমি এই দক্ষিণদেশের অধিকারী, বড়ো ভালো হ'লো (কেননা, আমাকে তোমার অধিকারভুক্ত স্থানের মধ্যদিয়ে যেতে হবে) আমি নীলাচলে যেতে চাই। কিন্তু কিভাবে সেখানে উপনীত হবো তুমিই আমাকে বলে দাও।

এবং এর পরই এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। 'নীলাচলচন্দ্র' বলে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন চৈতন্য। তরুণ রূপবান সন্ন্যাসীকে দেখে প্রথম থেকে একটা ধর্মজনিত ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল রামচন্দ্রের মনে। এ যুগেও গৌরাঙ্গ সাদৃশ্য কোন গৈরিক সন্ন্যাসীকে দেখে কারো মনে আধিদৈবিকতাজনিত ধর্মীয় ভাবনার সঞ্চার হতে পারে। সিক্তবসন গৈরিক সন্ন্যাসীকে 'নীলাচলচন্দ্র' বলে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখে রামচন্দ্র খানের মনে এরকম একটা ধর্মীয় ভীতির প্রভাব আসতে পারে। এরকম আবহাওয়ায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব বিচিত্র ছিল না। বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমার নীলাচলে যাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

রাত্রি তিন প্রহর নাগাদ অম্বুলিঘাট থেকে নৌকা ছাড়লো। সুন্দরবনের নদী। জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। তার ওপর জল ডাকাতের প্রাদুর্ভাব। এ সত্ত্বেও রাত্রির গভীর অন্ধকারে নৌকা ছাড়লো। নৌকায় কীর্তন করতে লাগলেন মুকুন্দ। শঙ্কিত মাঝি বললো, মহাশয়, আপনারা যা করছেন তাতে বুঝি আর প্রাণ থাকে না। এ বনবিবির দেশ। এখানে ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর। তার ওপর আছে পানী ডাকাইতের ভয়। অন্তত 'উড়িয়ার দেশ' না আসা পর্যন্ত আপনারা শান্ত হয়ে থাকুন।

'নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি॥'

[ভাগবত/৩/২/১৩৪ ৩৫]

অবশেষে নৌকা প্রয়াগঘাটে এসে ভিড়লো। এখান থেকেই ওড্রদেশ অর্থাৎ উড়িষ্যার সীমানা শুরু। এই প্রয়াগঘাটকে আমাদের পূর্বসূরী চৈতন্য বিশেষজ্ঞরা ডায়মণ্ডহারবারের সমীপবর্তী মন্ত্রেশ্বর নদের কোন ঘাট বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে ঠিক এখান থেকে ওড্র দেশের সীমানা শুরু হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী আমাদের কিছুটা সন্দিহান করে তুলেছেন।

যাই হোক, এই প্রয়াগঘাটের মাটি ছুঁয়েই শুরু হয়েছিল চৈতন্যের উৎকল যাত্রার শুরু।* কিন্তু 'উড়িয়াদের দেশে' ঢুকে প্রথমেই তিনি বাধার সম্মুখীন হলেন। বাধাটা এলো 'দানী'র কাছ থেকে। কৃষ্ণপদাবলীতে যে দানীর কথা লেখা আছে এ সে দানী নয়। পদাবলীর দানীকে শ্রীমতী-সখী ললিতা বলছেন, 'লক্ষ লক্ষ লক্ষ নহে, এক লক্ষ্য দান দাও হে।' কিন্তু এ দানীর



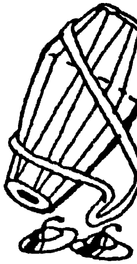
*'Chaitanya Mahaprabhu walking of the banks of river Bhagirathi travelled from Prayag Ghat in the Midnapur District of Bengal to Balasore, then to Cuttack, Bhubaneswar and Puri.' (Souvenir/All India Sri Chaitanya Fifth centenary celebrations committee, Orisa-Puri—Feb.-1986)

বক্তব্য অন্যরকম । সপার্ষদ চৈতন্যকে দেখে সে বলে উঠলো, 'গোসাঞি । করহ শুভ তুমি ।/এ-সভার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি ॥' গোঁসই, তুমি চলে যাও আমার আপত্তি নেই । কিন্তু যাবার আগে তোমার ও সঙ্গীদের দান আমাকে দিয়ে যাও, তবেই তোমারা ছাড় পাবে । একেই বোধহয় বলে, a thing done of given in recognition of something received.

অতঃপর 'দানী' মানুষটি সম্পর্কে আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা দরকার । দানী কি ?* সে ওড়িশা দেশের সীমানায় দাঁড়িয়ে এভাবে 'দান' চাইছেই বা কেন ? আমরা দেখতে পাচ্ছি, দানী মোটেই নিরিহ লোক না । তার গলায় রীতিমতো জবর্দস্তির সুর পাচ্ছি । বলছে, 'এ সভার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি ।' নচেৎ না । এবং এসময় চৈতন্যকেও বেশ বিহ্বল হতে দেখা গেল । পার্ষদদের থেকে খানিক দূরে গিয়ে হেঁট মস্তকে কাঁদতে লাগলেন তিনি ।

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে । দানী চৈতন্যের কান্না দেখে হোক, বা সন্ন্যাসী ফকিরদের কাছে কোনরকম 'দান' পাবার সম্ভাবনা নেই জেনেই হোক, সপার্ষদ চৈতন্যকে উৎকল রাজ্যে প্রবেশ করতে আর কোন বিপত্তি করলো না সে । বোধকরি ওড্রদেশে প্রবেশের এটাই ছিল শেষ বাধা । ক্রমে শেষ বাধা অতিক্রম করে নীলচলের পথে এগিয়ে চললেন তরুণ সন্ন্যাসী চৈতন্য ।

ক্রমে এসে পৌঁছালেন স্বর্ণরেখার (সুবর্ণরেখা) কিনারায় । নদীর নাম স্বর্ণরেখা কেন ? না এখানকার বালি খুঁড়লে সোনা পাওয়া যেতো একসময় । চৈতন্যের সময় পাওয়া যেতো নিশ্চয়ই । সুবর্ণরেখা থেকে কিছু দূরে চৈতন্যের পদচিহ্ন আঁকা একটি গ্রামের নাম দাঁতন । এই স্থানটির দাঁতন নামকরণও যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ । কিংবদন্তি যে, চৈতন্য এখানে নিমডালের দাঁতন দিয়ে দন্তমাজন করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে L.S.S.O' Mally তাঁর 'Bengal District Gezette—Midnapore' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Dantan a village in the south of the Midnapore Subdivision, situated 40 miles south of Midnapore……According to local tradition, chaitanya on his way to Jagannath, about 200 years ago, brushed his teeth here, and from this circumstance the village got the name of Dantan (tooth-brush). Page, 177-78. যেহেতু চৈতন্য এখানে দন্তধাবন করেছিলেন তাই তার স্মৃতি হিসেবে এখনো এখানকার এক মন্দিরে মহাপ্রভুর পদচিহ্ন ও পাথরের তৈরি দাঁতনকাঠি পূজিত হয় (পরিবর্তন/চৈতন্য সংখ্যা/১৬-১ মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৬) । এখান থেকে চৈতন্য নন্দ কাপাসিয়া রাস্তা ধরে পদব্রজে সুবর্ণরেখার তীরে এসে পৌঁছান । বাঙলা ও ওড়িশার মধ্যে প্রবাহিনী পুন্যতোয়া এই নদী । সুবর্ণরেখার কাচস্বচ্ছ জলে মনের আনন্দে স্নান করলেন চৈতন্য । (এখানে নিত্যানন্দ কর্তৃক 'দণ্ড' ভাঙার এক গূঢ় ইতিহাস আছে । কিন্তু সে ইতিহাসের গল্প আমরা আরেকটু এগিয়ে নীলাচলের



* দানী :—'দানী' অর্থে দান । কিন্তু এখানে এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, আদায়কারী । আরও পরিষ্কার অর্থ হলো, মাশুল আদায়কারী । এখানে দানী মাশুল আদাই করার জন্য নিযুক্ত এক রাজকর্মচারী । তদানীন্তন কালে এক রাজত্ব থেকে আরেক রাজত্বে যেতে হলে একটা রাজকর দিতে হতো । এটা সম্ভবত ব্যক্তি পিছু কর ছিল । ব্যক্তির সঙ্গের দ্রব্যাদির জন্য নয় । কেননা, চৈতন্যের সঙ্গে তো প্রায় ব্যবহারিক দ্রব্য হিসেবে কিছুই ছিল না ।

নিকটবর্তী আঠারো নালায় গিয়ে শুনবো ।।

সুবর্ণরেখা কিনারা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললেন চৈতন্য । অনেকখানি পদব্রজে হাঁটার পর এসে পৌঁছালেন ওড়িশাদেশের জলেশ্বর গ্রামে । জলেশ্বর জায়গাটা হলো বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর পরগণায় অবস্থিত একটি প্রাচীন নগর । এখানে জলেশ্বর নামক শিব বিদ্যমান । জলেশ্বর শিবের মন্দির দর্শন করলেন চৈতন্য । বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, চৈতন্য যখন জলেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তখন পূজারীগণ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও মাল্যাদি দিয়ে শিবলিঙ্গের পূজো করছিলেন । অতঃপর বাঁশধা (বাঁশদা) হয়ে, বালেশ্বর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত রেমুনা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন । এসব সুদীর্ঘ পদযাত্রা কিন্তু পদব্রজে অতিক্রম করেছিলেন চৈতন্য । সম্ভবত শূন্যপায়েই । পাদুকা অর্থাৎ কাষ্ঠ-খড়মও থাকতে পারে । কিন্তু এক্ষেত্রে না থাকা স্বাভাবিক ছিল । স্বাভাবিক বলছি এজন্য, কেননা, তৎকালীন চৈতন্য প্রাসঙ্গিকী বিবিধ চিত্রাবলীতে শূন্য পায়ে পাদুকাবিহীন চৈতন্যকে লক্ষ্য করা গেছে । তবে, পাদুকা অর্থাৎ কাষ্ঠখড়ম যদি থেকেও থাকে তা তৎকালীন মেঠো পথ ও আঙুল পরানো পাদুকার জন্য, আশাকরি, পথিক সন্ন্যাসীর পথ চলা অধিক ক্লান্তিকর করে তুলেছিল । অন্তত, খড়মের প্রাচীন সংস্করণ (যা চৈতন্যের সময়ে বিদ্যমান ছিল) সচোক্ষে দেখলে সঙ্গতকারণে তাই মনে হয় । চৈতন্যের পরবর্তী পরিক্রমা যাজপুর । রেমুনা থেকে সপারিষদ চৈতন্য যাজপুরে এসে পৌঁছালেন । জয়ানন্দ কথিত চৈতন্যের পূর্বপুরুষের বাস্তুভূমি । এখানেই বয়ে চলেছে সেই পুন্যসলিলা বৈতরণী নদী । আর এখান থেকে শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ নীলাচলের দূরত্ব 'দশ যোজন প্রমাণ' অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ ক্রোশ বা আশি মাইল ।

যাজপুর থেকে সপার্ষদ চৈতন্য কটকনগরে এসে পৌঁছালেন । ওড়িশার দুটি প্রসিদ্ধ নদীর কূলে গড়ে উঠেছে এই শহর । নদী দুটি হলো কাটজুড়ি ও মহানদী । একসময় এই কটকনগরই ছিল ওড়িশার রাজধানী । কটক থেকে চৈতন্য যাত্রা করলেন সাক্ষীগোপালের উদ্দেশ্যে । সাক্ষীগোপাল নামটির পিছনে এক পৌরাণিক কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে । তবে বর্তমানে ওড়িশায় সাক্ষীগোপাল নামে যে স্থান রয়েছে চৈতন্যের যাত্রা পথের এই সাক্ষীগোপাল সেই স্থান নয় ।

সাক্ষীগোপাল বিগ্রহ দর্শন করে চৈতন্য বেরিয়ে পড়লেন ভুবনেশ্বরের পথে । সেই ভুবনেশ্বর যার অন্তত আরও চারটি নাম আছে । যথা—গুপ্তকাশী, একাম্রকক্ষেত্র, হেমাচল ও স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র । গৈরিক সন্ন্যাসী ভুবনেশ্বরে এসেছেন এ কথা বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস সকলেই বলেছেন । কিন্তু তিনি বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গেছলেন কিনা আমরা স্পষ্ট তার হদিশ পাচ্ছি না । ভুবনেশ্বরের মন্দির অর্থাৎ বর্তমানে আপনারা যাকে বলছেন লিঙ্গরাজ টেম্পল । যার পাশেই বিশাল বিন্দুসরোবর ও অনন্তবাসুদেবের মন্দির । তবে দাস বৃন্দাবনের গ্রন্থে যেভাবে অনেকখানি জুড়ে শিব ও বিন্দুসরোবরের কথা লেখা আছে তাতে মনে হয় চৈতন্য হয়তো লিঙ্গরাজের দর্শন নিয়েছিলাম ।

ভুবনেশ্বর থেকে চৈতন্যের যাত্রাপথ কমলপুর । এই কমলপুর থেকে পুরীর দূরত্ব খুব বেশি না । মাত্র তিন ক্রোশ অর্থাৎ ছয় মাইল (চৈ. চরিতামৃত ২।৬।১৪৫ দ্রঃ) । ভার্গীনদীর তীরবর্তী এই স্থান থেকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের

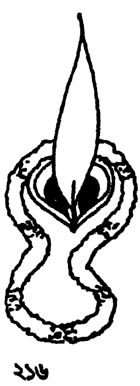


চূড়োর ধ্বজা (পতাকা) স্পষ্ট দেখা যায়। অন্তত চৈতন্যের সময় তা দেখা যেতো।

কমলপুর থেকে চৈতন্য এলেন আঠারোনালায়। এটি একটি আঠারো খিলানযুক্ত সেতু। ২৯০ ফিট লম্বা। কিন্তু এর নাম আঠারোনালা হলো কেন বলা দুষ্কর। কেননা, এর নীচে রয়েছে ১৯টি সুড়ঙ্গ। ইতিহাস বলছে, করবংশীয় রাজা মচ্ছকেশীর আমলে নবম শতাব্দীতে এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এবং এটিই ছিল উত্তর দিক থেকে পুরীধামে প্রবেশ করার ভার্গী বা ভার্গবী নদীর ওপর একমাত্র সেতুপথ। তবে কিংবদন্তী আছে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন না'কি বারংবার সেতুবন্ধনে বিফলপ্রাপ্ত হয়ে, অবশেষে জগন্নাথের আজ্ঞাক্রমে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রের ছিন্নমস্তক নদীগর্ভে দান করে এই সেতু নির্মাণ করেছিলেন। যার জন্য এর নাম 'আঠারো নালা'। ('চৈতন্য চকড়া'/সদাশিব রথশর্মা সম্পাদিত/পৃ. ৪, Puri Gazetteers by L.S.S.O.' Melly, 1920, Page-337)।

তো এই আঠারোনালায় পদার্পণ করে চৈতন্যকে হঠাৎ ক্ষুব্ধ হতে দেখা গেল। এর আগেও আমরা চৈতন্যের ক্ষুব্ধতা লক্ষ্য করেছি। তবে সেটা ছিল সন্ন্যাস নেওয়ার আগে। যখন তিনি ছিলেন নবদ্বীপের নিমাই। সেসময় পাষণ্ডীদের ব্যাপারে নিমায়ের চোখে বার বার অশান্ত আগুন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যখন কাজী, এমন কি পড়ুয়া ছাত্রদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বেঁধেছিল। তবে সন্ন্যাস গ্রহণের পর অর্থাৎ সন্ন্যাসোত্তর জীবনে বোধকরি আঠারোনালায় এসে প্রথম বিক্ষুব্ধ হলেন চৈতন্য। এর কারণ খুব জটিল। একখানা 'দণ্ড' ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা মন কষাকষি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। আর তা হয়েছিল নবদ্বীপের নিমায়ের সাথে রাঢ়ার নিত্যানন্দের। কিন্তু দণ্ড ভাঙার ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল সে বিষয়ে সকল চরিতকরা একমত না। বৃন্দাবন দাসের মত সুবর্ণরেখা নদীর তীরে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী চৈতন্যের দণ্ড ভেঙেছিলেন (৩।২।২০৬)। কবি কর্ণপূরের মতে এই দণ্ড ভাঙার ঘটনাটা ঘটেছিল কটক থেকে যাজপুর যাওয়ার পথে (মহাকাব্য—১১।৮০, ৮২)। কর্ণপূর কবির এ ধারণাটি বোধহয় ভুল, কেননা, চৈতন্য যাজপুর হয়ে কটক গেছলেন, কটক থেকে যাজপুর নয়। তবে কর্ণপূর তার নাটকে এ ধারণা আগাগোড়া সংশোধন করেছেন। তার নাটকের মতে দণ্ড ভাঙার ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল কমলপুরে (নাটক—৬।১৪)। কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতেও ওই কমলপুরের কথাই লেখা আছে। নিত্যানন্দ এই কমলপুর নগরে চৈতন্যের দণ্ডটি তিন খণ্ড করে ভার্গবীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন (চরিতামৃত—২।৫।১৪০-৪১)।

অতঃপর স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, নিত্যানন্দ হঠাৎ চৈতন্যের দণ্ড ভাঙতে গেলেন কেন? আর যদি ভাঙলেনই তো তিন খণ্ড করলেন কেন? দু'খণ্ড বা চার খণ্ডও তো করতে পারতেন। তা না করে তিন খণ্ড করলেন কেন? বস্তুত, যুক্তিবাদের বিচারে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা বেশ দুষ্কর। এটা একটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতাবাদের ব্যাপার। সেই দৃষ্টি ও মানসিকতা দিয়ে বিষয়টিকে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। এখানে 'দণ্ড' একটি লালসার প্রতীক। মায়াবদ্ধ সংসারী জীব মানুষ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত। আর দেহ মন এবং বাক্য হলো সেই সুখভোগের সহায়ক। মন থেকে ভোগ-বাসনার উৎপত্তি, ও বাক্যদ্বারা তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, আর দেহ দিয়ে তা ভোগ করে মানুষ। বস্তুত, এই তিন সহায়ককে বশীভূত করার



প্রতীকী হলো ভগ্ন দণ্ডের তিন খণ্ডাংশ। যা সুবর্ণরেখা অথবা ভার্গবী নদীর জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ।

এদিকে আঠারোনালায় পৌঁছে চৈতন্য নিজের দণ্ডটি নিত্যানন্দের কাছে চেয়ে বসলেন। এ যাবৎ যে দন্ড নিত্যানন্দের কাছে গচ্ছিত ছিল। উত্তরে নিত্যানন্দ বললেন, তোমার দণ্ড তিন খণ্ড হয়ে গেছে। এবং সেই খণ্ডগুলো কোথায় পড়ে গেছে আমার মনে নেই। শুনে চৈতন্য খানিক দুঃখ পেলেন, কিছুটা ক্ষুব্ধও হলেন। বললেন, 'নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা।/সবে দণ্ড ধন ছিল—তাহা না রাখিলা॥' নীলাচলে এনে এই আমার উপকার করলে তোমরা, সবে মাত্র ধন বলতে একটা দণ্ড—বাঁশের লগুড় ছিল সেটাও তোমরা কেড়ে নিলে (চৈ. চরিতামৃত ২।৫।১৫১)। বললেন, যাও, তোমাদের সঙ্গে আমি আর যাবো না। জগন্নাথ দর্শনে হয় তোমরা আগে যাও, নয়তো আমি আগে যাই। তখন অন্যতম পার্ষদ গায়ক মুকুন্দ দত্ত বললেন, 'প্রভু। তুমি চল আগে।/আমি সব পাছে যাব, নাহি যাব সঙ্গে॥' (চরিতামৃত ২।৫।১৫৪)। মুকুন্দের মুখে এ কথা শোনা মাত্র চৈতন্য বায়ুবেগে ধাবিত হলেন জগন্নাথ মন্দিরের দিকে।

[উনিশ]

নীলাচলে চৈতন্য

Not everything that is faced can be changed. But nothing can be changed until it is faced.

—(জেমস বল্ডউইন)

কথাটার ভাবার্থ হলো, আমরা যা কিছুর সম্মুখীন হই তার পরিবর্তন ঘটাতে পারি না। কিন্তু যতোক্ষণ না কোন একটা কিছুর মুখোমুখী হবো, ততোক্ষণ তার পরিবর্তন করতে পারবো না।

যদিচ ধরা যায়, সন্ন্যাসী চৈতন্য এমনই এক রকমফের ঘটানোর পরিবর্তিত মনোভাব নিয়ে সুদূর গৌড় বাঙলা থেকে কলিঙ্গদেশে ছুটে এসেছিলেন, তাহলে, আশা রাখি, বক্তব্যের দিক থেকে বড় ধরনের অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু অতঃপর ঝটিতি প্রশ্ন আসে, কিসের পরিবর্তন চেয়েছিলেন তিনি? কেন পরিবর্তন? কিন্তু এর সদুত্তর দেওয়া যতোখানি সহজসাধ্য, উত্তরের যৌক্তিকতা মানসিকতার দিক দিয়ে নির্বিবাদে হজম করা ততোধিক দুরুহ বলে প্রত্যয় করি। সুতরাং নিমাই বা চৈতন্যের পূর্বাপর প্রবাহমান জীবন—কাহিনীর মধ্যে এর উত্তর চয়ন করতে হবে। যেমন কোন এক বৎসরের বর্ষার সম্ভাবনা ওই বৎসরের অন্যান্য ঋতু সমূহ যথা শীতের তীব্রতা অথবা গ্রীষ্মের দাহ আদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ, যদিচ চৈতন্য কোন পরিবর্তনের মানসিকতা নিয়ে কলিঙ্গদেশে আগমন করে থাকেন, তাহলে, কোন পরিস্থিতির মধ্যে তিনি গৃহত্যাগ দেশত্যাগ করলেন আমাদের দেখতে হবে। এবং সেই সঙ্গে আমাদের অনুধাবন করতে হবে তাঁর উত্তর জীবনের ঘটনাবলীও।



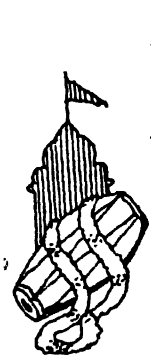
তো চৈতন্য যখন দেশত্যাগ করলেন তখন ভারতবর্ষীয় তথা খণ্ডিত ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গদের দিকটি একবার দেখে নেওয়া দরকার। বিশেষত কোন কোন দেশে হিন্দু ও মুসলমান নরপতি ছিলেন। আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি, চৈতন্য অর্থাৎ নিমাই জন্মগ্রহণ করে ছিলেন বাঙলার ৮৯২ সালে। অর্থাৎ ১৪০৭ শকে। ইংরাজি মতে বছরটা ছিল ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যান্য মতে ৮৯০ হিজরী, ১৫৪২ সংবৎ, ৮৯৩ বগড়ী ৮৪৮ মগী, ৮৯৫ ত্রিপুরাব্দ ও ৮৯৩ ফসলী।

এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্বসাকুল্য ২৩ বছর ১১ মাস ৬ দিন সংসার ধর্ম করে, ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের ২৯ তারিখে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন চৈতন্য। এবং ওই শকে অর্থাৎ ১৪৩১ শকের ফাল্গুন মাসে (এ নিয়ে বিতর্ক আছে) দেশ ত্যাগ করে প্রায় পাকাপাকি বসবাসের মানসিকতা নিয়ে, ওড়িশাদেশের পুরীতে চলে এলেন। বলতে গেলে এখানেই তিনি রাজগুরু কাশী মিশ্রের বাড়ির এক চোরাকুঠরীতে (গম্ভীরা) বাকী জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব কাহিনীর সূত্রপাত করার আগে আমাদের দেখতে হবে, চৈতন্য যখন গৃহত্যাগ ও দেশত্যাগ করে ওড়িশাদেশে পৌছালেন তখন দিল্লী বাঙলা ও ওড়িশা এবং সেই সঙ্গে বাঙলা ও ওড়িশার পার্শ্ববর্তী এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে কোন কোন রাজা ছিলেন।

চৈতন্য বাঙলা ত্যাগ করে ওড়িশাদেশে চলে এসেছিলেন ইংরাজির ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলা ও ওড়িশার সিংহাসনে তখন যথাক্রমে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩–১৫১৯) ও গজপতি প্রতাপরুদ্র দেব (১৪৯৭–১৫৪০)। আর দিল্লীর তখ্‌তে রয়েছেন সিকন্দর লোদী (১৪৮৮–১৫১৭)। এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ যথা আসামের রাজ সিংহাসনে তখন সুসঙ্গ মুংগ (১৪৯৭–১৫১৯) ত্রিপুরার সিংহাসনে ধন মানিক্য (১৪৯০–১৫২২), নেপালের সিংহাসনে ভুবনমল্ল (?), জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে মহারাজ পর্বত রায় (১৫০০–১৫১৬), এবং বিজয়নগরের সিংহাসনে তখন আসীন ছিলেন ওড্ররাজ প্রতাপরুদ্রের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯–১৫২৯)। (A History of South India/Nilkanta Sastri)। উপরোক্ত পরিসংখ্যান দেখলে বেশ বোঝা যায়, চৈতন্য মুসলমান রাজ্য ছেড়ে শুধুমাত্র হিন্দু রাজ্যে চলে এসেছিলেন তাই নয়, সেই হিন্দুরাজ্য ঘিরে আরও কথিপয় হিন্দুরাজ্য তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাছাড়া উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র দেব নিজেও ছিলেন প্রভূত শক্তিশালী।

* * *

আপনাদের স্মরণ আছে নিশ্চয়ই, সন্ন্যাসী চৈতন্যকে আমরা ইতোপূর্বে আঠারো নালায় রেখে এসেছি। ঠিক আঠারো নালায় তিনি রয়েছেন তা নয়, দণ্ডভাঙা হেতু মন-মালিন্যে পার্ষদদের ছেড়ে তিনি নিঃসঙ্গ একলা ছুটে চলেছেন নীলাচলের পথে। তাঁকে অচেনা পথ চিনিয়ে নিয়ে চলেছে জগন্নাথ মন্দিরের উড্ডীয়মান লাল ধ্বজা। বোধকরি সমুদ্রের বিস্তীর্ন বালুকাময় পথ ধরে* তিনি ধেয়ে চলেছেন পূর্ণ নয়, পূর্ণাতি পূর্ণের সন্ধানে। সময়টি তখন কেমন ছিল আমরা সঠিক জানিনা। তবে সূর্যোজ্জ্বল দিনমান থাকাই



---

* পুরীর প্রাচীন বাড়িগুলির মেঝে বড় বড় পাথর দিয়ে উঁচু করে বাঁধানো। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে মেঝেতে উঠতে হয়। কৌতূহলী হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে জেনেছি, একসময় (বোধ হয় বর্ষায়) পুরীর রাজপথে সমুদ্রের জল ঢুকে পড়তো।

স্বাভাবিক। সকাল ও মধ্যাহ্নের মাঝামাঝি কোন এক সময়। ঋতু ছিল বসন্ত। কিংশুকের গন্ধমাখা ফাগুন ছিল বাতাসে। এসময় আকাশে মেঘ থাকার কথা না। সমুদ্রের উথালি পাথালি হাওয়ায় ইতস্তত ঝাউবন আর বরকলির গাছগুলির মধ্যে কাঁপন লেগেছিল নিশ্চয়। কোন এক রোমাঞ্চে, অভূতপূর্ব বিহ্বলতায় তারা যেন মাথা দোলাচ্ছে। অদূরে গর্জমান সমুদ্র। আকাশ ও জলধির রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। লুনিয়াদের অজস্র পানসি দুলছে ঢেউয়ের তালে তালে। সমুদ্রের ফেনায়িত জল সারিবদ্ধ ভাবে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। নয়ানজুলির কালো জলে ফোটা একটি শ্বেত পদ্ম তখন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে সিংহ দরজার দিকে।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নোবিনস্থো যতির্বা
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

(ওগো: আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি কোন ক্ষত্রিয় রাজা নই। বৈশ্য বা শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহী অথবা বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু নিয়ত প্রকাশমান নিখিল পরমানন্দ, পূর্ণ অমৃত সমুদ্র স্বরূপ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আসছেন॥(

*　　　*　　　*

বিশাল সিংহ দরজা দিয়ে বায়ুবেগে এগিয়ে চলেছেন এক গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী। মুণ্ডিত কেশ। আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় ক্রমান্বয়ে মহা-বিগ্রহের দিকে ধাবমান। জগন্নাথ ও সচল জগন্নাথের এই প্রথম মিলনের দৃশ্যটি অভূতপূর্ব ভাবে ধরে রেখেছেন চৈতন্যের অন্যতম ওড়িয়া ভক্ত ঈশ্বর দাস।*

প্রবেশ হেলে সিংহদ্বার। কীর্ত্তন শবদ গম্ভীর
ভিতরে প্রবেশ গোঁসাই। বট দর্শন কলে যাঁই।
দেউল প্রদক্ষিণ করি। গরুড় পৃষ্ঠে কম্বুধারী।
তহুঁ বিজয়ে শ্রীচৈতন্য। শ্রী জগন্নাথ দরশন।
[চৈতন্য ভাগবত / ওড়িআ/৪৮ অধ্যায়]

অতঃপর সুবিশাল সিংহ দরজা অতিক্রম করে, বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণীতে পা রাখলেন চৈতন্য। অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি এক লহমায় পেরিয়ে মূল মন্দিরে প্রবেশ করলেন। আমরা দেখেছি, ত্রয়ী বিগ্রহের কাছে পৌঁছাতে হলে বিশাল একটি হলঘর অতিক্রম করতে হয় ভক্তদের। যার মধ্যিখানে গরুড়-স্তম্ভ। মাথার ওপরে পাথরের ছাদ। দেয়ালে অজস্র ভাস্কর্য। কিন্তু চৈতন্যের সময় তা স্পষ্ট ছিল না নিশ্চয়।

তখন ইলেকট্রিসিটির উদ্ভব হয়নি। মশাল বা প্রদীপের আলো থাকতে পারে। কিন্তু এতো বড় মন্দির দিবানিশি মশাল, প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করে রাখা দুষ্কর। তাছাড়া, পুরাতন বই পত্রে বিশেষত বিদেশী ভ্রমণকারী ও



* উক্ত ঈশ্বর দাস প্রসঙ্গে প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'The History of Medieval Vaishnavism in orissa' গ্রন্থে লিখেছেন, Thus Iswara Dasa lived possibly in the first half of the 17 Century. (page 88)

ইংরেজ পর্যটকদের লেখায় জগন্নাথ মন্দিরের গোচ্ছিকা ও পড়িহারী–ছড়িদারদের প্রসঙ্গে যে ধরনের কাহিনী শোনা যায় ; তাতে করে জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তর খুব আলোক স্বচ্ছ ছিল বলে মনে হয় না। (N. B. 'A History of Orissa'/General Baptist mission/ by James Paggs/London-1846/ এই বইটি পুরীর রঘুনন্দন লাইব্রেরীতে (দ্বিতল) পাওয়া যাবে)।*

সুতরাং অস্বচ্ছ পথ ধরে এগিয়ে চললেন চৈতন্য। দু'পাশে ঔৎসুক্য নিয়ে ছড়িদার প্রতিহারীরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কে এই ব্যাকুল সন্ন্যাসী ? গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন। গুম্ফশ্মশ্রু আদিমুণ্ডিত মস্তক। নৈমিষারণ্যে বসবাসকারী নিত্য যাগযজ্ঞ–হোম তপরত মহাপ্রাজ্ঞ মুনি তরুণের মতো চেহারা। বোধকরি অতুলনীয় দেহ সৌন্দর্যের অধিকারী, আয়তচক্ষু, উন্নতদর্শন মুখাবয়ব বিশিষ্ট এক তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে কয়েক মুহূর্ত সংবিত হারিয়ে ফেলেছিল মন্দিরের প্রহরী ও ছড়িদারেরা। তা না হলে মত্ত হস্তীর মতো পা ফেলে চৈতন্য জগন্নাথ বিগ্রহের কাছাকাছি কেমন করে পৌঁছে গেলেন। উর্ধ্বায়িত দুই হাত। আবেগে প্রাবল্যে ভাবুকতার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান সন্ন্যাসী চৈতন্য ক্রমে বিগ্রহের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছেন। ঘনবদ্ধপ্রায়। আর তখনই বোধকরি সংবিত ফিরে আসে মন্দিরস্থ গচ্ছিতাদের।

অচেনা সন্ন্যাসীকে বাধা দিতে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো অনন্ত প্রতিহারী। বিশালাকার বলিষ্ঠ দৈত্যের মতো চেহারা। অনন্ত প্রাতিহারী চৈতন্যকে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যেতে নিষেধ করলো। দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালো গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীর সামনে। আর তখনই ঘটলো সেই অভাবনীয় অঘটন।

'ভাবের আবেশে গোরা হইল তৎপর।
প্রতিহারী অনন্ত (গাচ্ছিকার) যে বলিষ্ঠ শরীর ॥
নিষেধ করিতে গোরা ভাব-তনু ধরি।
করে আড়াইন দেহে দ্বার প্রতিহারী ॥
অনসন পিণ্ডি ঠায়ে যাইন পড়িলে।
হাহাকার দেউলরে সর্ব্বে নিবর্ত্তিলে ॥'

[চৈতন্য চকড়া/সদাশিব রথশর্মা সম্পাদিত/পৃঃ ৮]

অর্থাৎ সন্ন্যাসী চৈতন্যকে ক্রমশঃ জগন্নাথের বিগ্রহের দিকে ধাবমান হতে দেখে প্রতিহারী অনন্ত এসে বাধা দিলো। এখানে চকড়ায় লেখা আছে,

* 'A History of orissa' বইতে লেখক Jemes Paggs জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখছেন : 'Thus The pundas exceedingly oppress the people, and by a variety of cheating tricks get from them their wealth. Sometime when the pilgrims enter the enclosure of the temple, they steal the ornaments from the noses and ears and take away their cloths and money. If they resist, the pundas assemble and beat them till they make off, crying out, 'O father, O mother, I die, I die and thus they escape from the temple. Or if the pundas see a beautiful young woman, they allure her in the temples and seduce her, let her go, telling her 'this is a holy place, and I am a holy man. (page 170-71).



'নিষেধ করিতে গোরা ভাব-তনু ধরি ।' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অনন্ত প্রতিহারী শুধুমাত্র চৈতন্যকে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যেতে মৌখিক বাধা দেয়নি, চৈতন্যের শরীরেও হাত রেখেছিল । আর তখনই ভাব-উন্মুক্ত চৈতন্য তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে জগন্নাথের দিকে এগিয়ে গেলেন । ঘটনাটা খুব সামান্য মনে হলেও অসামান্য রূপ নিলো মুহূর্তে । চৈতন্যের যৎ-সামান্য ধাক্কায় (সম্ভবত এক হাতের) দৈত্যপ্রায় অনন্ত গোচ্ছিকা এক খণ্ড নুড়ি পাথরের মতো ছিটকে পড়লো অনসরপিণ্ডির পুজোপীঠের চাতালের ওপর । হায় হায় করে উঠলো উপস্থিত ছড়িদার পাণ্ডার দল ।

চৈতন্যের সামান্য ধাক্কায় যে লোক অনসরপিণ্ডির পাথরে মুখ থুবড়ে পড়লো সেই অনন্ত প্রতিহারী বা অনন্ত গোচ্ছিকা সম্পর্কে আরেকটু বলা দরকার । অনন্ত শুধু নিজে বলশালী পালোয়ান ছিল না, তার বংশেরও বীরত্বের একটা বড় ধরনের সুনাম ছিল । তাদের কোন এক পূর্বপুরুষ এক মত্ত হাতিকে শুধুমাত্র তার দাঁত ধরে পরাজিত করে ছিল বলে তার বংশধরেরা 'মত্তগজ প্রতিহারী' উপাধি পেয়েছিল । অনন্ত ছিল তেমনই এক পরাক্রান্ত বংশের উত্তরসূরী । সেই অনন্তকে এক অচেনা না জানা সন্ন্যাসীর সামান্য ধাক্কায় অনসরপিণ্ডির চত্বরে• মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে হায় হায় করে উঠলো প্রত্যক্ষদর্শী পাণ্ডারা ।

ঝোড়ো বাতাসের মতো ত্বরিত গতিতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো নীলাচলের সর্বত্র । অবশেষে দেশের রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের কানেও খবরটা পৌঁছে গেল একসময় করণের• মাধ্যমে । রাজা করণকে বললেন,

'রাজা আজ্ঞা দেলে সর্ব্বে আলাপন কর ।
সকল ঘটনা কহ মোহর ছামুর ॥'

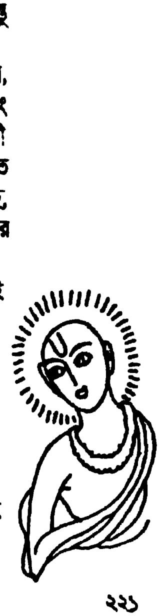
[চকড়া/পৃঃ ৮]

রাজা বললেন, এই গেরুয়া বসনধারী যুবা সন্ন্যাসীটি কে তোমরা সত্ত্বর খোঁজ নাও । কে এই চৈতন্য ? প্রয়োজনে তাঁর সাথে আলাপন করো । কিন্তু সন্ন্যাসির সমস্ত খবর আমার চাই ।

এই যে এতোক্ষণ 'চৈতন্য চকড়া' থেকে যা কিছু বললাম, উদ্ধৃতি দিলাম, তার মূল লেখক শ্রীল গোবিন্দ দাস বাবাজী, ওড়িয়া ভাষায় লেখা । এবং এটি সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন পুরীর প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা । পুরীর প্রাচীন গঙ্গামাতা মঠ থেকে এই পুঁথিখানা আবিষ্কৃত হয় ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন । গ্রন্থকারের জবানী থেকে জানা যাচ্ছে, ১৫৩৪ অব্দে এ পুঁথিটি লেখা হয়েছিল । এবং লেখক সেই গ্রন্থখানা সমাপ্ত করে

• অনসরপিণ্ডি—এ প্রসঙ্গে 'চৈতন্য চকড়া'র সম্পাদক পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা মশাই লিখেছেন, 'মুখ্যমন্দির আর মুখ্যশালার ভিতরে যে প্রশস্ত স্থান আছে, সেই স্থানে স্নান পূর্ণিমা থেকে আষাঢ় অমাবস্যা পর্যন্ত শবর সেবকগণ যে পূজা করেন, তাকে 'অনসর' বলা যায় । যে স্থানে সেই পূজা হয় তার নাম 'অনসরপিণ্ডি' বা গুপ্ত পূজার স্থান

• করণ—তদানীন্তনকালে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ১৪টি ও রাজদরবারে ১০টি 'করণ' ছিল । এ প্রথা এখনো মন্দিরের ক্ষেত্রে আছে । সমস্ত দলিল দস্তাবেজ লেখার কাজ এই করণরা করে থাকে । মন্দিরে যে বিখ্যাত 'মাদলা পঞ্জি' লেখা হয় তাও এই করণরা করে থাকে । মন্দিরে যে বিখ্যাত 'মাদলা পঞ্জি' লেখা হয় তাও এই করণদের দ্বারা লিখিত । এক কথায় করণ অর্থে করণিক বা কেরানি (Clerk) শব্দের অনুরূপ ।



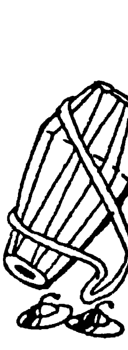
রাজা প্রতাপ রুদ্রের কাছে নিবেদন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, চৈতন্য চকড়া নামক এ গ্রন্থখানা আবিষ্কৃত হওয়ায় চৈতন্য ও চৈতন্যের নীলাচলে বসবাস প্রসঙ্গে অনেক নতুন ও চমকপ্রদ সংবাদ আমরা জানতে পেরেছি। যেমন অনন্ত গোছিকার প্রসঙ্গ, দেবদাসী লাবণ্যের প্রসঙ্গ। এগুলি অন্যান্য চৈতন্যচরিতে নেই। এছাড়া অতিবড়ি জগন্নাথের সঙ্গে মিলন, গোদাবরী রাজগুরুর পদত্যাগ, জগমোহনের স্তম্ভে ষড়ভুজ মূর্তি স্থাপন, অষ্টভুজ নারায়ণ দর্শন, উৎকলীয় বৈষ্ণবদের নাম প্রচার, কৃষ্ণচিন্তামণি রহস্য, সিদ্ধবকুল প্রসঙ্গ, অচ্যুতানন্দ দাসের মন্ত্রগ্রহণ, আহুলা মঠ প্রসঙ্গ, মূর্তি মণ্ডপে চৈতন্যের মূর্তি স্থাপন, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে প্রদীপ প্রজ্বলন প্রভৃতি অনেক নতুন ও অভিনব তথ্য এ গ্রন্থে রয়েছে। যা এতোকাল আমাদের অজ্ঞাতে ছিল।

কিন্তু অন্যদিকে এই নব আবিষ্কৃত গ্রন্থ 'চৈতন্য চকড়া' প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহলে কিছু প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে এর প্রাচীনত্ব নিয়ে। কেননা, এই গ্রন্থের মূল পুঁথি পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তা পুঁথি থেকে নকল করা পুঁথি।

চৈতন্য চকড়া মূল পুঁথি থেকে অনুলিপি হয়েছিল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। লিপিকার গঙ্গামাতা মঠের অধিকারী রসিকরাজ প্রভুর শিষ্য বাবাজী ভগবান দাস গোস্বামী। চৈতন্য চকড়া প্রসঙ্গে উৎকলের অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সাথে এই গ্রন্থের লেখকের কিছু আলোচনা হয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় চকড়ার পামাণ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এটিকে প্রক্ষিপ্ত রচনা বলেছেন। তবে এর সমস্ত কিছু প্রক্ষিপ্ত অথবা প্রাচীন গ্রন্থ ও পাঠ বিচারে যে সব সূত্র অবলম্বন করা হয় তার কোনটিই এ গ্রন্থের ক্ষেত্রে খাটে না এ কথা অবিশ্যি তিনি বলেন নি। বস্তুত, ঐতিহাসিকতার দিক থেকে 'চৈতন্য চকড়া' যে একেবারে নির্ভরযোগ্য নয় একথা বলা দুষ্কর। বিশেষত এ গ্রন্থে উল্লেখিত একটি ঘটনা আজ অমোঘ সত্য হিসেবে প্রকাশ হয়েছে। ঘটনাটি হলো, ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চৈতন্যের জন্মের প্রায় চারশত বছর আগে জগন্নাথ মন্দিরের বিমান অংশের দেয়ালে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংস নিধন পর্যন্ত প্রত্যেকটি লীলা ধারাবাহিক ভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে এই কারুকার্য্য, এবং মূর্তিগুলি চুনের পলেস্তারায় ঢেকে ফেলা হয়। সম্ভবত রাধাকৃষ্ণের বা গোপীপরিবৃত কৃষ্ণের কিছু মিথুনাচার মূর্তি উৎকীর্ণ থাকায় এগুলি ঢেকে ফেলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে চকড়ায় লেখা আছে,

'শিখি খেনি গোরা রায় বেড়া বুলাইলে।
দেব দেবী সহ প্রভু দেউল দেখিলে ॥
ভাগবত কৃষ্ণলীলা দেউলে দেখিল।
ভাবময় গোরা রায় চমৎকার পুনঃ ॥
সর্ব্বত্র দেউলে ভগবতের বর্ণন।
বড় শৃঙ্গাররে রাধা প্রেমময় গায়ন ॥
গীতগোবিন্দ, মুদ্রিত গোবিন্দর প্রীতি।

[চৈতন্য চকড়া/পৃ ৭-৮]



চৈতন্য চকড়ার এই বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে চকড়ার আবিষ্কারক সদাশিব রথশর্মা মশাই জগন্নাথ মন্দির গাত্রে ভাস্কর্যাদি থাকার আশঙ্কা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করেন। ফলে জগন্নাথের পাণ্ডাদের সাথে বিরোধ অবশ্যম্ভাবি হয়ে ওঠে। এ নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়। বিতর্ক শেষে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত

গড়ায়। অবশেষে আদালতের নির্দেশে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই দাবীর সত্যতা প্রমাণে উদ্যোগী হন। মন্দিরের একটি অংশের চুনের পলেস্তারা উন্মোচন করতে 'চৈতন্য চকড়া'র বিবরণীই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

সুতরাং 'চৈতন্য চকড়া' গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে একে গুরুত্বহীন ভাবা যায় না। তবে নাতি দীর্ঘ প্রাচীন উৎকল করনী ভাষায় লেখা এই গ্রন্থের সমস্ত তথ্য গ্রহণীয় বলে ধরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই। সমস্ত চৈতন্য চরিতে যেমন প্রচুর কল্পনা ও ভাবাবেগের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে চকড়ার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অন্যত্র দেখা যাচ্ছে, চকড়ায় কিছু সন তারিখে ভুল আছে। ভুল আছে সদাশিববাবুর ফুটনোটেও। আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি, চৈতন্য নীলাচল যাত্রা করেছিলেন ১৪৩১ শকের ফাল্গুন মাসে, ইংরাজি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। এবং ওই ১৪৩১ শকের ফাল্গুন মাসে তিনি নীলাচলে এসে উপস্থিত হন। চৈতন্য ফাল্গুন মাসে শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে ওই ফাল্গুনেই সুদূর নীলাচলে পৌঁছাতে পেরেছিলেন কিনা এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। হয় তো বা তিনি চৈত্র মাসে পৌঁছেছিলেন। তর্কের খাতিরে এ কথা যদি আমরা ধরেও নিই, তবু এ কথাও ঠিক যে তিনি (চৈতন্য) ১৪৩১ শকে ইংরাজির ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচলে এসে পৌঁছেছিলেন। সমস্ত প্রামাণ্য চৈতন্যচরিত গ্রন্থে এই হিসেব উল্লেখ আছে। কিন্তু চকড়ায় দেখা যাচ্ছে, এর ছয় মাস আগে 'শতবর্ষ চউদশ একত্রিশ শুভ।/ভাদ্র শুক্লানবমী দিবসান্ত ঠাব॥/ন্যাসী গোরা রায় আসি ক্ষেত্রে প্রবেশিলে।' অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দের (ইং ১৫০৯ খ্রীঃ) ভাদ্র শুক্লানবমীর দিন গোরা রায় (চৈতন্য) ক্ষেত্রে (শ্রীক্ষেত্রে) প্রবেশ করলেন। ('চৈতন্য চকড়া পৃঃ ৪)। সদাশিববাবু তাঁর ফুটনোটেও নির্বিবাদে চৈতন্যের প্রথম নীলাচল আগমনের এহেন সন তারিখ উল্লেখ করেছেন।

আরও কিছু অসংলগ্ন তথ্য চকড়ায় রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সদাশিববাবু সেই অসংলগ্নতাকে সমর্থন করতে গিয়ে অসংলগ্নতার মাত্রা আরও মাত্রাধিক করে তুলেছেন। যেমন অনন্ত প্রতিহারীর উপাখ্যানটি ধরা যেতে পারে। কে এই অনন্ত প্রতিহারী? সদাশিববাবু যার উত্তরে বলেছেন, চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২৭ পয়ারে বৃন্দাবন দাস যাকে 'অজ্ঞ পড়িহারী' বলেছেন সেই নাকি অনন্ত প্রতিহারী। বৃন্দাবন দাস কি অনন্তকে 'অজ্ঞ' আর প্রতিহারীকে 'পড়িহারী' বলেছেন? তা যদি হয়, তবে, চৈতন্যের ছোট্ট থাপ্পড় খেয়ে যে দৈত্যবৎ অনন্ত চক্কর খেয়ে অনসরপিণ্ডির পাথরে মুখ থুবড়ে পড়লো—ভগবান চৈতন্যের এ হেন অভূতপূর্ব শক্তির কথা চৈতন্যভক্ত বৃন্দাবন বেমালুম চেপে গেলেন কেন? সদাশিববাবু এর উত্তরে কি বলবেন? তাছাড়া বৃন্দাবন দাস 'অজ্ঞ পড়িহারী'র প্রসঙ্গটি চৈতন্যের প্রথম জগন্নাথ দর্শনের দিনটিকে কেন্দ্র করে বলেছেন.। আর 'চৈতন্য চকড়া'য় অনন্ত প্রতিহারীর প্রসঙ্গ এসেছে চৈতন্যর প্রথম জগন্নাথ দর্শনের অন্তত মাস দেড়েক পরে। চকড়ার মতে, চৈতন্যের প্রথম জগন্নাথ দর্শনের দিনটি হলো, ১৪৩১ শকের ভাদ্র শুক্লানবমীর দিবসান্ত। আর অনন্ত প্রতিহারীর প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে ওই শকে কার্ত্তিক দশমীর রবিবার দিন। সুতরাং চৈতন্য ভাগবতের সঙ্গে চৈতন্য চকড়ার শুধুমাত্র সময়ের গরমিল নেই, ইতিহাসেরও ক্রমহীনতা আছে।



সুতরাং চকড়া প্রসঙ্গের সাময়িক ইতি টেনে আমরা আবার চৈতন্য ভাগবত আদি অপরাপর চরিত গ্রন্থে ফিরে আসবো।

আমরা বৃন্দাবন দাসের কথা মতো চৈতন্যকে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহ

দরজায় প্রবেশ করিয়ে গোবিন্দ দাস বাবাজীর 'চৈতন্য চকড়ায়' ফিরে গেছলাম। ফিরে গেছলাম অনন্ত প্রতিহারীর (গোষ্ঠিকা) আখ্যায়িকায়।

অতঃপর আবার আমরা দাস বৃন্দবন ও কৃষ্ণদাস আদি জীবনীকারদের বক্তব্যে ফিরে আসছি।

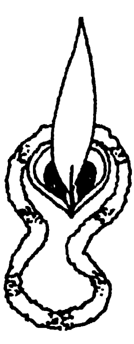
চৈতন্যের প্রথম জগন্নাথ দর্শনের কথা বলতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে সে সময় চৈতন্যে ভাবোন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুত জগন্নাথ মন্দিরের আভ্যন্তরিক আবহাওয়ায় (এযাবৎ) কোন দর্শনার্থীর মনে ভাববাদের উন্মেষ হওয়া কোন বিচিত্র না। খুব শঠ অসৎ মানুষেরও বোধকরি জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' মন্ত্রের বাসনা জাগ্রত হবে। সুতরাং ভাববাদী, ভাবুক চৈতন্যের মনে জগন্নাথ দর্শনে ভাবের উন্মেষ ঘটার, ভাবোন্মত্ত হওয়া কোন বিচিত্র ঘটনা ছিল না।

বৃন্দাবন দাস লিখছেন,

'হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন।
দেখিলে জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥'

আর এই 'কোলে করিবার' বাসনা জাগ্রত হতেই চরম বিপত্তি ঘটলো। জগন্নাথকে ধরবার মানসে লাফ দিলেন চৈতন্য। পারলেন না। পড়ে গেলেন ঘিয়ে ভেজা, অন্ধকারাচ্ছন্ন পাথরের মেঝেতে। আর তখনই পাণ্ডারা ছড়িহাতে রে-রে করে ছুটে এলো। ক্ষুব্ধ পাণ্ডাদের লাঠির ঘা পড়লো চৈতন্যের পিঠ লক্ষ্য করে। হয়তো জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে নিতে যাওয়ার অপরিণামদর্শীতার জন্য এদিনই ক্ষুব্ধ পাণ্ডাদের হাতে চৈতন্যের মৃত্যু ঘটতে পারতো। বোধকরি একমাত্র সার্বভৌম ভট্টাচার্য সেদিন উপস্থিত থেকে চৈতন্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এর জন্য সার্বভৌমকেও বেতের ঘা খেতে হয়েছিল পরিছাদের হাতে। তবু তিনি কি এক দুর্দমণীয় আকর্ষণে সেদিন নিজের পিঠ আড়াল দিয়ে চৈতন্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। বেতের ঘায়ে জর্জরিত চৈতন্য তখন সজ্ঞাহীন।

অতঃপর এই সার্বভৌম নিজের লোকজন ডেকে ধরাধরি করে সংজ্ঞালুপ্ত চৈতন্যকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আর ঠিক এসময় মুকুন্দ, নিত্যানন্দাদি ভক্তরা সিংহ দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন নিমাইয়ের সজ্ঞাহীন দেহ কিছু লোক ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ভক্তরা তাদের অনুসরণ করলেন। এই ভাবে নিমাইয়ের সাথে সাথে নিমাইয়ের অন্যান্য সঙ্গীরাও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে এসে হাজির হলেন।



কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত'য় এ কাহিনী একটু ঘুরিয়ে অন্যরকম ভাবে লেখা হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামীর মতে, সার্বভৌম সংজ্ঞাহীন চৈতন্যকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার পর নিত্যানন্দ-মুকুন্দ-আদি ভক্তরা সিংহদ্বারে এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা এসে সেখানে শুনতে পেলেন, কিছু লোক তখন বলাবলি করছিল,

'এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ।
মূর্ছিত হইলা—চেতন না হয় শরীরে:
সার্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেল ঘরে॥'

[চৈতন্য চরিতামৃত/২।৬।১৪-১৫]

লোকজনের মুখে একথা শুনে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ ধরে নিলেন পর্যন্ত

সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি চৈতন্য ব্যতীত আর কেউ নয় । অতঃপর তাঁরা সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ি যাবার মনস্থ করলেন । কিন্তু তাঁরা কেউই সার্বভৌমের বাড়ি চেনেন না । ঠিক এসময় দৈবাৎ সার্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য সিংহ দরজার সামনে উপস্থিত হলেন । গোপীনাথ আচার্যের সাথে চৈতন্যের অন্যতম নীলাচল সঙ্গী গায়ক মুকুন্দ দত্তের ইতোপূর্বে নবদ্বীপে পরিচয় হয়েছিল । অপ্রত্যাশিত ভাবে উভয়ে উভয়কে দেখে চিনতে পারলেন । এরপর চৈতন্যের সঙ্গীদের সার্বভৌমের বাড়ীতে যেতে আর কোন অসুবিধে রইলো না ।

অতঃপর গদাধর, মুকুন্দ, নিত্যানন্দাদি ভক্তরা যখন সার্বভৌমের বাড়িতে এসে পৌঁছেলেন সংজ্ঞাহীন চৈতন্যের তখনো চেতনা ফিরে আসেনি । বেলা 'তিন প্রহর' সময় সংজ্ঞালুপ্ত চৈতন্য ধীরে ধীরে চোখ মেললেন । 'আমি কোথায়' গোছের ঘোর তখনো কাটেনি । আনন্দে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলো ভক্তরা । কোলাসে হরিধ্বনি করে উঠলো ।

চৈতন্য চোখ মেলে শুধালেন, 'কহ দেখি আজি মোর কোন বিবরণে ?' আমার কি হয়েছিল, কেন, তোমরা আমাকে সবকিছু খুলে বলো ।

তখন নিত্যানন্দ বললেন,

'জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা ॥
দৈবাৎ সার্ব্বভৌম আসিলেন সেই স্থানে ।
ধরি তোমা' আনিলেন আপন ভবনে ॥'

পার্ষদ নিত্যানন্দের মুখে আদ্যপান্ত কথাবার্তা শুনে ক্রমে ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুর স্মরণ পড়লো চৈতন্যের । সঙ্কটঘন মুহূর্তগুলি দুঃস্বপ্নের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠলো । জগন্নাথকে কোলে নিতে যাবার জন্য লম্ফ দেওয়া, লাঠি হাতে পাণ্ডাদের তেড়ে আসা, সবকিছু ।

আর এসব অনিবার্য, ভীতিকর দৃশ্যগুলি মনে পড়তে চৈতন্য খানিক অপ্রস্তুত গলায় বলে উঠলেন,

'দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিলা নিকটে ।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহা সঙ্কটে ॥
আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া ।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥'

সার্বভৌম মশাই ছিলেন বলে বড়ো সঙ্কট থেকে বেঁচে গেছি । কিন্তু আর কদাপি নয়, চৈতন্য বললেন, এরপর যদি জগন্নাথ দর্শন করতেও যাই, বাইরে থেকে, দূর থেকে দেখবো ।



সার্বভৌম সায় দিলেন । বললেন, সেই ভালো । আমিও তাই তোমাকে যুক্তি দিই । কিন্তু একটা কথা, সার্বভৌম সাবধানী গলায় বলেন, জগন্নাথকে দূর থেকে বা কাছ থেকে দেখো । কদাপি একলা মন্দিরে যেওনা । যখন তোমার জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছে হবে, যেদিন, আমাকে অবশ্য বলবে । হয় আমি নতুবা আমার লোকজন তোমার সঙ্গে থাকবে । মনে রেখো ।

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সাবধান বাণীর প্রত্যুত্তরে চৈতন্যকে স্পর্শকাতর গলায় বলতে শোনা গেল :

'জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নাহিব ।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব ॥'

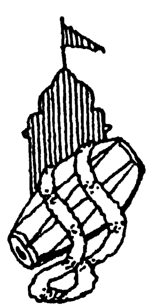
এই যে 'গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব' একথা সাময়িক ভীতি বশত

চৈতন্যের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তা কিন্তু ঠিক নয়। এটা ছিল চিরস্থায়ী সংকল্পের কথা। বস্তুত, চৈতন্য যে সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর কাল নীলাচলবাসী ছিলেন তার কোনদিনও এই সংকল্পের কোন নড়চড় ঘটেনি। প্রকোপিত মন্দিরে তিনি যখনই গিয়েছেন দুঃস্বপ্নের রাত্রির মতো তাঁকে বারম্বার বাধা দিয়েছে প্রথম দিনের এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। বোধকরি সেই থেকে জগন্নাথ দর্শনার্থে আর কদাপি মন্দিরস্থ গর্ভগৃহে প্রবেশ করেননি চৈতন্য। অবিমৃশ্যকারী পড়িছাদের জন্য এটা হয়েছিল। সার্বভৌমের হুঁশিয়ারীও তাঁকে দ্বিধাগ্রস্থ করেছিল। শেষে আঠারো বৎসর জীবৎকালে তাই প্রতিবন্ধকতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে থেকে, অদূরে দাঁড়িয়ে গড়ুরস্তম্ভের আড়াল থেকে জগন্নাথ দর্শন করেছেন চৈতন্য। কুত্রাপি তার কোন রকমফের ঘটেনি।

এরপর সার্বভৌম ও চৈতন্য বিষয়ক তিনটি ঘটনার উল্লেখ আমরা করবো। আমাদের মনে রাখতে হবে, নীলাচলে পদার্পণ করে যে সুহৃদ ব্রাহ্মণের সাথে চৈতন্যের প্রথম আলাপ হয়েছিল তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্য। সুতরাং সার্বভৌম কোন মানসিকতায় নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যকে দেখেছিলেন, এবং তা কেন আমাদের জানা দরকার। কেননা, এর উত্তরপর্বেই আমরা এক বিচিত্র পটভূমিকায় উপনীত হবো। যেখানে নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যের সাথে শাঙ্কর-বেদান্তবাদী গৃহী প্রবীন সার্বভৌমের একটি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মুর্হূত হঠাৎই ঝলক দিয়ে উঠবে আমাদের যুক্তিবাদী মানসিকতায়। প্রশ্ন ছিল, সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতা নিয়ে। একজন যুবা, যার ষড়্‌রিপু প্রভাবিত শরীরে বিশেষত কাম ও কামোদ্দীপকতা আছে, যা সৌন্দর্য কিন্তু মায়াময় নারীকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে যা নিন্দক ও অনুচিত। সর্বোপরি যুবা সন্ন্যাসী চৈতন্যের কাছে এমন একটি তর্ক রাখলেন সার্বভৌম। বললেন, আশ্চর্য! এটা আমি ভাবতে পারি না, একজন গৃহী যুবক ঘর গার্হস্থ্য, জায়া জননীকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়, কিন্তু কেন, আর তার সন্ন্যাসই বা কেমন তা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো।

উত্তরে চৈতন্য বললেন, 'শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।/সন্ন্যাসী নাহি জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।/বাহির হইলুঁ শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥' (ভাগবত/৩।৩।৬১-৬২)।

সার্বভৌম শান্ত গলায় বললেন, তুমি কৃষ্ণপ্রেমী, কৃষ্ণ অন্বেষী, এমন অনুসন্ধিৎসা সবার থাকা ভালো। কৃষ্ণকে আমরা স্বরূপ ব্রহ্ম ভগবান বলে থাকি। কিন্তু কোন্ মানুষ ভগবানের না আনুগত্য চায়। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেছেন, 'অহং তব, ত্বং মামকীনঃ ন'—আমি তোমার কিন্তু তুমি আমার না। আমি কেমন তোমার না—'তরঙ্গঃ সমুদ্রঃ, হি, সমুদ্রঃ ক্বচন তারঙ্গ ন।' ঢেউ সমুদ্রের কিন্তু সমুদ্র কখনো ঢেউ-এর না।



সার্বভৌম বললেন, এমন এক অসীম, অরূপ সমুদ্রের ঢেউ হতে কে না চায়। এর মধ্যে আমি তোমার কোন দোষ দেখি না। কিন্তু তার জন্য শিখা সূত্র মুড়িয়ে গেরুয়া ভেক নেবার আবশ্যক কি? পরন্তু সংসার ত্যাগের বাসনা জন্মায় কেমন করে?

সার্বভৌম বলতে লাগলেন, তুমি অত্যন্ত সুবুদ্ধিমান, তোমার কথাবার্তা থেকে তা বেশ বুঝতে পারছি। কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রাপ্তিজনিত তোমার ইচ্ছা, যা তুমি নিজে ব্যক্ত করেছো, অত্যন্ত সুবুদ্ধি অধিকন্তু ঈশ্বরচেতা না হলে প্রেমভক্তি নিমিত্ত কারু বাসনা জাগ্রত হয় না। তা আমি অবগত আছি। আবার এ-ও ঠিক, এই যে কৃষ্ণভক্তি—যা তুমি যাচ্ঞা করো, এবং জীবের

ক্ষেত্রে যা পরম কাম্যবস্তু, আমি জানি, তোমার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তুমি তা অনুধাবন করেছো। কিন্তু তথাপি বলি, এরকম বিচারক্ষমা সুবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তুমি কি কারণে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করলে ?

চৈতন্য নীরবে কিন্তু সাগ্রহে অগ্রজপ্রতীম তথা বেদান্তবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সমস্ত যুক্তি সানন্দে শুনছিলেন।

সার্বভৌম বললেন, এটা সুস্পষ্ট এবং ততোধিক স্পষ্টতর ভাবে যা অভিব্যক্ত করা যেতে পারে, তা হলো, এই যে ঈশ্বর কেন্দ্রিক সাধন-ভজন, বিশেষত প্রাপক ভজনের ক্ষেত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ যে অনাবশ্যক শুধু তাই নয়, পরন্তু নিতান্ত প্রতিকূল, আমার বিশ্বাস জ্ঞানান্বেষণের এমন একটি দিক তোমার প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। তুমি যে বুদ্ধিমান তা আমি বারম্বার, আবারো বলছি, কিন্তু সে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তুমি সন্ন্যাসের অপকারিতার দিকটি বিশ্লেষণ করো নি। সন্ন্যাসে ভক্তিসাধনে অনুকূল কি আছে ? প্রথমত দ্যাখো, সন্ন্যাসী–সন্ন্যাসী ব্যতিরিক্ত কারুকে নমস্কার করে না, অথচ এটা এক শাস্ত্র বহির্ভূত ব্যাপার। আমাদের শাস্ত্রই বলেছে, 'জীবকলয়া ভগবন্ তত্রএব প্রবিষ্টঃ ইতি আশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ।' যার অর্থ হলো, অন্তর্যামী ভগবান সর্বজীবে বিরাজমান একথা মনে রেখে কুক্কুর, চণ্ডাল, গো এমন কি গর্দভাদি জীবমাত্রকেও ভূমি দণ্ডবৎ করা সমীচীন। কিন্তু সন্ন্যাসী তা করে না।

সন্ন্যাসী অপকারিতার আরেকটি দিক হলো, আত্মদম্ভ। সন্ন্যাসীরা সতত একথা মনে করেন, যারা গৃহী যারা সংসারী তারা অবিরত বিষয়সুখে মত্ত, আর এই বিষয়সুখজনিত সর্বনাশা অজ্ঞতা গৃহীদের অন্ধ করে, কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর তা করে না—এই উপলব্ধি নিয়ে সন্ন্যাসী ধারণা পোষণ করে, সে মহাজ্ঞানী কেননা, সেই বিজ্ঞতার নির্দেশে সে সংসার সুখ পরিত্যাগ করে ব্রত-সন্ন্যাস নিয়েছে।

অতঃপর সার্বভৌম গীতা (৬।১) অধ্যায়ের সূত্র ধরে বললেন, 'যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি, /সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ।/নিরগ্নিঃ ন, ন চ অক্রিয়ঃ।' (ধন-জন-পুত্র-কলত্র-স্বর্গাদিরূপ কর্মফলের অপেক্ষা না রেখে যিনি অবশ্যকর্তব্যরূপে শাস্ত্র বিহিত কর্ম করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, তিনিই যথার্থ যোগী। পরন্তু, যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু সন্ন্যাস বেশী হয়েছেন সন্ন্যাস ভেক ধারণ করেছেন তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী নন। অন্তত সেক্ষেত্রে তাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী খ্যাপন করা যায় না)।

সার্বভৌম আরও বললেন, দ্যাখো, স্বয়ং কৃষ্ণই গীতা (৭।১৪-১৬) শ্লোকে বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভজনে গুণময়ী দৈবী মায়ার কবল থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণভজনা করতে হবে একথা তিনি কখনো বলেননি। মহারাজ অম্বরীষ রাজর্ষি জনক অজাতশত্রু এঁরা কদাপি সন্ন্যাসী ছিলেন না, তথাপি তাঁদের নিকট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও পরমার্থ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। অথচ এঁরা সকলেই ব্রহ্মবিৎ ছিলেন।



পরিশেষে সার্বভৌম বললেন,

'যে সব মহান্তগণ ত্রিভাগ বয়সে।
গ্রাম্য রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥'

[চৈ. ভাগবত/৩।৩।৫৬]

বস্তুত, এই 'ত্রিভাগ বয়সে'-র অর্থগত দিকটি আমাদের সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করতে হবে। মানুষের পূর্ণ বয়সের গড়পড়তা সাধারণত একশো বছর ধরা হয়ে থাকে। অবিশ্যি এখন, এই জলে তেলে ভেজালের যুগে এ কথার কোন

স্বার্থকতা থাকে না। কিন্তু চৈতন্যের সময়কালে, প্রকৃতি ও মানুষ মানুষের বড়ো বিপক্ষচারী ছিল না। বন্যা-ঝড়ঝঞ্ঝা ছিল, মহামারি ছিল, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্পাদি ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ ও মানুষের মঙ্গল চেতনাও ছিল মানুষের সপক্ষে। হয়তো আরও কিছু কিছু কারণে, (বোধকরি মানুষের স্বেচ্ছাচারী বশত প্রাকৃতিক বিরূপতার কারণে) আমরা পিতৃ-পিতামহের প্রাপ্য আয়ু থেকে আজ বঞ্চিত। তবুও রাজা-জমিনদার বাড়ির হেলেপড়া জরাগ্রস্থ মিনারের মতো, অতীত অঙ্কের হিসেব আজও আমাদের মধ্যে (স্মৃতি হয়েও) প্রত্যক্ষভাবে রয়ে গেছে, মানুষের গড় আয়ুষ্কালের হিসেব ১০০ বছর। স্মৃতি হলেও এ স্মৃতি বড়ো মধুর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্মকেও একদা এমনতর কথা শুনিয়েছিলেন। যা এ' গ্রন্থে একাধিক বার উল্লেখিত হয়েছে। নৈয়ায়িক, বেদান্তবাদী সার্বভৌম সন্ন্যাস গ্রহণের অনৌচিত্যের কথা বলতে গিয়ে এই শতায়ু সময় কালের বিভিন্ন বিভাজনের কথা চৈতন্যকে এক জায়গায় বলেছেন।

অর্থাৎ এই যে মানুষের একশো বছর আয়ুষ্কাল এই দীর্ঘ সময় সীমা চার ভাগে বিভক্ত। যাকে আর্যাবর্ত যুগে বলা হতো, 'চতুরাশ্রম'। জীবনের প্রথম পর্বকে বলা হতো, ব্রহ্মচর্যাশ্রম। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্ত্রী ও সন্তানাদি সংশ্রব জীবন। যাকে বলা হতো, গার্হস্থ্যাশ্রম। এবং শেষতম জীবনের সময়টিকে বলা হতো, বানপ্রস্থ। অর্থাৎ স্ত্রীকে পুত্রের হেপাজতে রেখে অথবা সহসঙ্গী করে, সমাজ সংসার পরিত্যাগ করে, বনচারী জীবনকে মানান করে নেয়া। এই বনবাসী বনচারী জীবনের অভিজ্ঞতাই নিয়ে আসতো সন্ন্যাস গ্রহণের সার্থকতা।* এই সন্ন্যাসচারণ ছিল মানুষের জীবনের শেষ ও অন্তিম এবং জলের চেয়ে তরল বোধির পর্যায়।

ভট্টাচার্য সার্বভৌম পণ্ডিত এই চতুরাশ্রমের উদাহরণ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের দিকটি খুব কঠোর কঠিনভাবে তুলে ধরেছেন চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রেক্ষাপটে।

'সন্ন্যাস-আশ্রম' প্রসঙ্গে শাস্ত্রের বক্তব্য হলো, 'ক্রমপ্রাপ্তান বানপ্রস্থধর্ম্মানাহ বনমিতি।/আয়ুষস্তৃতীয়ং ভাগং পঞ্চসপ্ততিবর্ষ পর্যন্তম্‌।/ততঃ পরং ক্ষীণেন্দ্রিয়স্য ঈষদ্‌ বিরাগেহপি সন্ন্যাসধিকারঃ স্যাদিতিভাবঃ॥' (ভাগবত ১১।১৮।১)। অর্থাৎ বানপ্রস্থী পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত বনে বাস করবেন। অতঃপর ক্ষীণ ইন্দ্রিয়সমূহের ঈষদ্‌ বিরাগ হলে সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে।

অতঃপর সার্বভৌম বললেন ঃ

'যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার॥'*

সার্বভৌম বললেন, তুমি সন্ন্যাসী, তথাপি নিমাই বলে সম্বোধন জানিয়ে



*কিন্তু 'গরুড় পুরাণ'-তে আছে, স্বগৃহে থেকে কিন্তু সংসারের দায়িত্বভারমুক্ত হয়ে জীবনযাপন করেও পরবর্তী জীবনের অর্থাৎ 'সন্ন্যাস আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। (গরুড় পুরাণ/৪৯ অধ্যায়)।

*শ্রীমদ্‌ভাগবত (৯।১৮।৪০) শ্লোকে মহারাজ যদু বলেছেন, 'অবিদিত্বা সুখং গ্রামং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পুরুষ।' গ্রাম্যসুখ না জেনে (উপভোগ না করে) কারু (মানুষের) গ্রাম্যসুখে বিতৃষ্ণা জন্মে না। এ প্রসঙ্গে চৈ. ভাগবতের (৩।৩।৫৬) পয়ারে সার্বভৌমকে সেই একই কথা পুনঃরোক্তি করতে দেখা যায়।

তোমাকে বলছি, তোমার যা বয়স যাকে আমরা যৌবনের উন্মেষকাল বলে চিহ্নিত করতে পারি—এ বয়সে মানুষের ইন্দ্রিয়সুখজনিত চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, এবং তা সন্ন্যাসের ধর্মরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক না। ইন্দ্রিয়গত সুখ বাসনা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে নিরাসক্তির সংকেত বহন করে। সুখ ও সুখানুভূতির মধ্যে সুখজনিত অসুখের উন্মেষ ঘটে। জীবনের সেই অনীহা, সুখের অনিত্যতার উপলব্ধির অঙ্কুরোদ্গম পত্রোদ্গম ঘটে জীবনের সায়াহ্নে, শাস্ত্রে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'বানপ্রস্থ' রূপে। এবং সেই বৃক্ষ মহীরুহ রূপ ধারণ করে পরবর্তী জীবনে। যার নাম সন্ন্যাস। সুতরাং তুমি যে সন্ন্যাস পন্থার অনুবর্তী হয়েছো, নিমাই, আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে তুমি তোমার অভীষ্টের অনুকূল পন্থা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছে।

সার্বভৌম পরিশেষে বললেন, আমার যুক্তি শাস্ত্র যুক্তিসম্মত, কিন্তু পৃথিবীর কোন যুক্তি শেষ কথা না, এ-ও আমি জানি। সুতরাং, তোমার সন্ন্যাসের সপক্ষে যে যুক্তি, যা তুমি একমাত্র জানো, তা অতঃপর তুমি আমাকে বলো।

সার্বভৌম কর্তৃক সন্ন্যাস গ্রহণের অনৌচিত্য প্রকাশের প্রত্যুত্তরে চৈতন্য কি বলেছিলেন তা জানার আগে, মুখ্যত বিষয়—সার্বভৌম প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা আমাদের অবগত থাকা দরকার। কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে 'সার্বভৌম উদ্ধার' কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। 'উদ্ধার' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্ভবত এখানে কৃপা বলে মনে হয়। কে কৃপা করলেন, না চৈতন্য। কার প্রতি কৃপা, না সার্বভৌমের প্রতি। এখানে 'কৃপা' এবং 'উদ্ধার' এই দুটি শব্দের অর্থগত দিক কি অভিন্ন? অর্থাৎ 'উদ্ধার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কি 'কৃপা'? এক ব্যক্তি অথৈ জলে তলিয়ে যাচ্ছে, সে সাঁতার জানে না, তাকে জল থেকে 'উদ্ধার' করার অর্থ তো তাকে 'কৃপা' করা নয়। এ এক ন্যূন্যতম মানবিকতা। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন চৈতন্য। এরা উভয়ে ছিল বে' পথের পথিক। লম্পট মদ্যপ। চৈতন্য তাদের বিপথমুখী মানসিকতাকে সমাজমুখী, ধর্মমুখীন করতে চেয়েছিলেন। এ এক ধরণের উদ্ধার। কিন্তু সার্বভৌম একাধারে ধার্মিক, প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তি। প্রখ্যাত চৈতন্যবিদ্ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, 'বাসুদেব*' সার্বভৌম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত। এমনতর এক পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তিকে 'উদ্ধার' করার অর্থ কি? বেদান্তবাদী নৈয়ায়িক সার্বভৌমকে কৃষ্ণময় ভক্তিপথে প্রবিষ্ট করার চৈতন্যিক সফলতাকে কি এখানে 'উদ্ধার' বর্ণিত করা হয়েছে? কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, দ্বিপথগামী দুই মানসিকতা, আর যদি সেই উভয় মানসিকতা সৎ হয়, প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের হয়, কিন্তু তা যদি কখনো একমত ও একত্রিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাহলে, এই একত্রিভূত আনার পিছনে যার অবদান সেই অবদানকারীকে কি আমরা অন্যের উদ্ধারকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করবো? কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে এর সার্থকতা কি তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।



তবে গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী চৈতন্য ঠিক কতোদিন গৃহস্থাশ্রমী নৈয়ায়িক

---

*সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নাম 'বাসুদেব' সার্বভৌম এমন কথা লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত আর কোন চৈতন্যচরিতে পাওয়া যায় না। লোচন লিখেছেন, 'উত্তরিল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ঘরে'। অন্যত্র চক্রবর্তী নরহরি লিখেছেন, 'জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য' (পৃ. ৩)। চৈতন্যমঙ্গল/শেষখণ্ড দ্রঃ।

সার্বভৌমকে বৈষ্ণবিয় ভক্তিপথে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন এ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। বৃন্দাবন দাসের মতে এটা একদিনে ঘটেছিল। আর কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন, সার্বভৌমের মত পরিবর্তন করতে অন্তত ১২ দিন লেগেছিল চৈতন্যের। অবিশ্যি একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের একদিনে মত পরিবর্তন হয় অথবা হবে বলে আমাদেরও প্রত্যয় হয় না।

সার্বভৌম জগন্নাথ মন্দিরের পড়িছা বাহিনীর হাত থেকে চৈতন্যকে রক্ষা করেছিলেন সত্য, আর তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বোধকরি সাতদিন চৈতন্য নির্বিবাদে সাবভৌমের মুখে বেদান্ত পাঠ শ্রবণ করলেন। চৈতন্য সার্বভৌমকে বললেন, 'আমি সর্বতোভাবে তোমার ছায়া (আশ্রয়) গ্রহণ করলাম। সূর্যতাপ দগ্ধ জীব যেমন শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করে, তদ্রূপ, সংসার-তাপ-দগ্ধ আমি শান্তি লাভের আশায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম।' (চৈতন্য ভাগবত/৩।৩।৭৩ দ্রঃ)।

কিন্তু পণ্ডিতে পণ্ডিতে মিলনে যা অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ দ্বি-পাণ্ডিত্যের পাণ্ডিত্যজনিত ভিন্নতা প্রকট হয়ে উঠলো অচিরাৎ। সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৭।১০) অংশ থেকে একটি শ্লোক পাঠ করে চৈতন্যকে বললেন, 'বোল দেখি সন্দেহ তোমার স্থানে।'

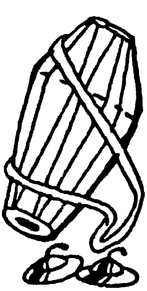
শ্লোকটি ছিল, যথা—

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈ তুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত হরিঃ ॥'

[মভা ১।৭।১০]

অর্থাৎ আত্মারামঃ (আনন্দস্বরূপ আত্মগত রমণশীল) মুনয়ঃ চ (মুনিগণও) নিগ্রন্থাঃ অপি নিগ্রন্থ হইয়াও, ছিন্ন মায়াগ্রন্থি এবং বিধিনিষেধাতীত হইয়াও উরুক্রমে (বিপুলবিক্রম ভগবানে) অহৈতুকীং (হেতুশূন্য) ভক্তিং (ভক্তি) কুর্ব্বান্তি (করিয়া থাকে, যেহেতু) হরিঃ শ্রীহরি হইতেছেন ইত্থম্ভুগুণঃ (এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট)।

তো সার্বভৌম এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকটির তেরো রকম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যান করলেন। এবং পরিশেষে 'আর শক্তি নাহিক' বলে বিরত হলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের তেরো রকম ব্যাখ্যার পর তদতিরিক্ত এই শ্লোকের বিশ্লেষণ করা যে কারু পক্ষে আর সম্ভব না এ বিষয়েও নিশ্চিৎ ছিলেন সার্বভৌম। কিন্তু পরক্ষণে সার্বভৌম পণ্ডিতকে পরম বিস্ময়ে ফেললেন চৈতন্য। যখন চৈতন্য বললেন, 'এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।'



সার্বভৌমের এই তেরো প্রকার ব্যাখ্যার উত্তরে চৈতন্য কি বলেছিলেন, অথবা 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের আরও নতুনতর কি কি ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট করে কোন চরিতকার লেখেন নি। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, 'অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া।' আর আমাদের অন্যতম চৈতন্য বিশেষজ্ঞ মজুমদার বিমানবিহারী মশাই বলেছেন, 'শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর দিন যতই যাইতে লাগিল ততই শ্রীচৈতন্য কৃত ভাগবতের শ্লোক বিশেষের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কবিকর্ণপূর বলিলেন নয় প্রকার, বৃন্দাবন দাস এয়োদশাধিক প্রকার, কৃষ্ণদাস এই প্রসঙ্গে আঠারো প্রকার' চৈতন্যচরিতের উপাদান/পৃ. ৩৫০-৫১)।

মূলত, সার্বভৌমের এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের তেরো প্রকার ব্যাখ্যার উত্তরে চৈতন্য কি বা কতো প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন তা যেমন

স্পষ্ট নয়, তেমনই, তিনি (চৈতন্য) এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের সার্বভৌমকৃত তেরো প্রকার ব্যাখ্যার উত্তরে আদৌ কোন ব্যাখ্যান করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। আসলে বিষয়টি যে সন্দিগ্ধ, প্রশ্নাতীত নয়, তা কবি কর্ণপুরের নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠ করলে বেশ বোঝা যায়।

কর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যের এক জায়গায় লিখেছেন,

'অসৌ বিতণ্ডা ছলনি গ্রহাদ্যৈ
নিরন্তধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষম্।
চকার বিপ্রঃ প্রভুনা স চাশু
স্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ।

[মহাকাব্য/১২।২৬]

উপরোক্ত এই শ্লোকটির অর্থগত দিকটি অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায়, কবি কর্ণপুরের মতে, সন্ন্যাসী চৈতন্য 'বিতণ্ডা' ও 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা সার্বভৌমকে নিরস্তবুদ্ধি করেছিলেন। কথাটা অভূতপূর্ব হলেও সত্য, কেননা অন্যতম চরিতকার কর্ণপুর লিখেছেন। যদিও কর্ণপুর মহাকাব্যে এ কথা লিখেছেন, কিন্তু তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' জাতীয় কোন শ্লোকের যেমন উল্লেখ নেই, বেদান্ত বা ভাগবত বিচারের কথাও এখানে অনুল্লেখ্য। কিন্তু কোন 'ছল' ও 'বিতণ্ডা' দিয়ে চৈতন্য প্রবীন সার্বভৌমকে নিরস্ত বুদ্ধি করেছিলেন তা কর্ণপুর আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।

এরপরই আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবো সেই অভূতপূর্ব ঘটনা। যা বর্ণিতব্য, কিন্তু যুক্তিবাদী তথা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় বিশ্লেষণ হওয়া দুষ্কর। এবং তা হলো, বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, প্রায় বিদ্যুতের ঝলকানির মতো, ঝটিতি, 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' প্রশ্নের উত্তর মুহূর্তে বলে উঠলেন,

'সন্ন্যাসী' কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়।
তোর লাগি এথা মুক্তি হইলুঁ উদয়॥'

* * *

'অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে মুক্তি বই নাই আর॥'

* * *

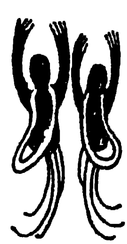
'সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পড় মোর স্তব॥'

আর এসব কথার পরক্ষণে চৈতন্য আবির্ভূত হলেন সার্বভৌমের মুখোমুখি সেই পরম বিস্ময়কর কিন্তু অসৌম্য, অশান্ত রূপ নিয়ে, যা ছিল 'কোটিসূর্যময়' প্রখর। সার্বভৌমের সমীপবর্তী ষড়ভুজ মূর্তিমানে রূপান্তরিত হলেন চৈতন্য।

অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটিসূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥'

অন্যতম কৃষ্ণদাস অবিশ্যি চৈতন্য ভাগবতের বৃন্দাবন দাসের মতো অতোটা বিশ্বস্ত হতে পারেন নি। তিনি এতাদৃশ চৈতন্যের ষড়ভুজ থেকে দুই হাত ছেটে 'চতুর্ভুজ' করেছেন। আগে চৈতন্য। আর পিছনে 'পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।' (মধ্য/ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

উপরোক্ত ষড়ভুজ বা চতুর্ভুজ ঘটনার সাথে মনসামঙ্গল জাতীয় প্রচারমুখীন গ্রন্থের বেশ মিল আছে বলে মনে হয়। প্রচারার্থে কোপী মনসা যেমনটি ক্ষতির পর ক্ষতি সাধন করে চাঁদকে বারম্বার চমক দিয়েছেন, ও পরিশেষে পরোক্ষ আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেছেন, বোধকরি তদ্রূপ,



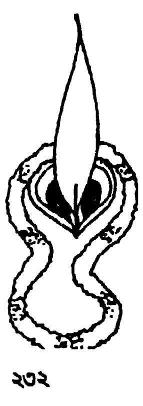
বিস্ময়কর এক মূর্তির অভিব্যক্তি দিয়ে বেদান্তবাদী নৈয়ায়িক সার্বভৌমকে আনুগত্যে সম্মত করেছিলেন চৈতন্য। কোন প্রতীকী (Symbol) অর্থে এই ষড়ভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্তি ব্যবহারিত হয়েছে বলে মনে হয়।

আমরা ইতোপূর্বেই বলেছি, চৈতন্যের নীলাচল অবস্থিতি কাল মোট ১৮ বছর স্থায়ী ছিল। অবিশ্যি কিছু কিছু চরিতকার যেমন কবি কর্ণপূর, কবিরাজ কৃষ্ণদাস এই সময়কাল বিশ এমন কি চব্বিশ বছরও টেনেছেন। কিন্তু একটু অঙ্কের হিসেব করলে বেশ বোঝা যায়, চৈতন্যের 'নীট' নীলাচলে অবস্থিতি কাল ছিল ওই ১৮ বছর। অর্থাৎ ইং ১৫১৫ জুলাই (?) থেকে ১৫৩৩ খ্রীঃ এর জুলাই পর্যন্ত।

বস্তুত, ১৩৩১ শকের ১২ই ফাল্গুন শান্তিপুর থেকে যাত্রা করে চৈতন্য যখন প্রথম নীলাচলে এসে পৌঁছালেন তখন থেকে শুরু হয়েছিল তার নীলাচল অবস্থিতি কাল, একথা সত্য। কিন্তু এই প্রথম অবস্থিতি কাল তাঁর স্থায়ী অবস্থিতি ছিল না। প্রথম বার নীলাচলে পৌঁছে মাস খানেকের মতো অবস্থান করে ছিলেন চৈতন্য। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের (১৪৩১ শক) ফাল্গুনে পৌঁছে বৈশাখের ৭ তারিখে বেরিয়ে পড়েছিলেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। মোট ১ বছর ৮ মাস ২৬ দিন দাক্ষিণাত্যে কাটিয়ে ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আবার নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর বছর দুই অবস্থান অন্তে নীলাচলে থেকে আবার বেরিয়ে পড়েন চৈতন্য। ১৪৩৫ শকে (১৫১৪ খ্রীঃ) সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চম বর্ষে বিজয়া দশমীর দিন গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন (চৈ. চরিতামৃত ২।১৬।৯৩)। এসময় গৌড়দেশে প্রায় আট নয় মাস কাটিয়েছিলেন চৈতন্য। আর সর্বাপেক্ষা কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সফলতা অর্জন করেছিলেন তিনি এসময়, রামকেলিতে, হুসেন শাহের মন্ত্রীদ্বয় রূপ ও সনাতনকে দলভুক্ত করে। অতঃপর পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়দেশ থেকে পুরীতে ফিরে আবার ওই সালে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে তিনি বেরিয়ে পড়েন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগ, প্রয়াগ থেকে কাশী, কাশীতে মাস দুই কাটিয়ে ১৫১৬ খ্রীঃ এর প্রথম দিকে নীলাচলে ফিরে এলেন। দেখা যাচ্ছে, এই ১৫১৬ খ্রীঃ থেকে চৈতন্য শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর স্থায়ীভাবে কোথাও যাননি।

[কুড়ি]

ঈশানের মেঘ ও চৈতন্য



প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝাবার্তার সংকেত বহণ করে আনে ঈশানের মেঘ। আমাদের মানুষের জীবনেও মেঘ জমে। কালো মসীকৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘ। ঝড় ওঠে। সে ঝড় অতিক্রান্ত করে কেউ, কারু বা জীবনে সে ঝড় সর্বনাশা সমন হয়ে আসে।

বড় নিষ্ঠুর কিন্তু সত্য, সন্ন্যাসী চৈতন্যের জীবনে উঠেছিল এমন এক প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা। অবিশ্যি স্ব-নাশ সন্ন্যাসীর বন্ধনহীনতা ব্যতিত কিইবা

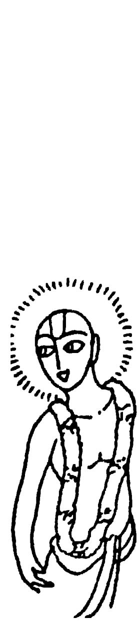
হারানোর থাকে।

আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি, এই যে শিখা সূত্র মুণ্ডিত গেরুয়া সন্ন্যাসী চৈতন্য, যিনি একদিন নিমাই ছিলেন, শচীমার আদরের নিমাই, তিনি কেন, কোন দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণে যুগপৎ জননীর স্নেহ ও স্ত্রীর পিছুটানময় অতীত ছিন্ন করে, সুদূর ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন বর্তমানের গৈরিক পথ ধরে। এবং সেই গৈরিক পথও যে কুসুমাস্তীর্ন ছিল না তা-ও আমরা ইতোপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি। এখন আমাদের দেখতে হবে, এই চৈতন্য, সন্ন্যাসী, যে জোয়ারের টানে ঘর গৃহস্থলী ফেলে সমুদ্রের ডাকে ছুটে এলেন, সেই সমুদ্র অর্থাৎ অগ্রমান বিস্তীর্ন ভবিষ্যতে কোন স্বপ্নের স্বপ্নিক পৌনঃপুনিকতা ছিল যার বাস্তবিক নিশ্চয়তা নিমাইকে প্রলুব্ধ করেছিল।

আবার একথা নিশ্চিৎ বলা যায়,*এক দুর্দৈবের আগুনে পোড়া দগ্ধ মানুষ যখন নিঃসহায়তার বিহ্বলতা থেকে অতিক্রম হওয়ার জন্য মৃত্যুর ত্রাণ চায়, তখনো কিন্তু সেই মানুষ দুঃখজাত, নিঃস্ব অতীত থেকে মৃত্যুর সাহচর্যে সুখকর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। এই মৃত্যুমুখীনতা তাকে স্বপ্নিক করে তোলে। আর কোন মানুষ স্বপ্ন দেখে অনাগত অনাস্বাদিত কিন্তু আশাময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বোধকরি নিমাই সংসার ত্যাগ করেছিলেন এমনই এক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের সন্ধানে।

ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'He prayeth best who loveth best'—অর্থাৎ মানবতামুখীন ও জীবসেবাই যথার্থ ঈশ্বর সাধনা। অন্যত্র গীতায় নৈরাশ্য, নিচেষ্ট ও নির্বেদ পীড়িত অর্জুনের উদ্দেশ্যে কম্বুকণ্ঠে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ বলেছেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত।' আমরা একটু সচেষ্ট হলে দেখবো, অনুসূচিত জাতির উদ্দেশে আজানুলম্বিত দুই বাহু যেমন প্রসারিত করেছিলেন চৈতন্য, তদ্রূপ, নৈষ্কর্মের জড়স্বকূপে নির্বোধ ভেকের মতো, নিচেষ্ট, নৈরাশ্য, নির্বেদ পীড়িত মানুষদের জন্য এক জাতি, একক প্রাণ, এক সেকুলার ভারতবর্ষের স্বপ্নও দেখেছিলেন চৈতন্য। সে স্বপ্ন তাঁর সফলতা পায়নি। কিন্তু সর্বাংশে সফল হয়নি তা আমরা বলি না। এই স্বপ্নের বাস্তব ও স্বপ্নময় বাস্তবতার জন্য চৈতন্যের কোন কোন দুঃস্বপ্নের মতো দুরূহ পথ ধরে হাঁটতে হয়েছিল তা অতঃপর আমাদের জানা দরকার।

কিন্তু তারও আগে পূর্বোক্ত একটি বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন। কেননা পূর্বোক্ত বক্তব্যটি নঞর্থক (Negative) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছিল সংসারী গার্হস্থ্যমুখী চৈতন্যের এই যে ঈশ্বরচেতনা, যা পরবর্তী কালে তাঁকে ছন্নছাড়া, বন্ধনছেঁড়া, বিবাগী-বৈরাগী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এই আশ্রয় ছিল এক নিরাশ্রয়ের আশ্রয়হীনতার আশ্রয় মাত্র। যখন নৌ-ডুবি ঘটে, গর্জমান সমুদ্রে কিংবা গহিন নদীর স্রোতে এক মানুষ নিতান্ত খড়কুটো ধরে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচতে চায়। কেন ? আমাদের নিয়ত জীবন যন্ত্রণা, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, মৃত্যুভয়, মৃত্যুর বিহ্বলতা কিছু কিছু রকমফের আনে। অহরহ এই টানাপোড়েনের চৌহদ্দি ঘেরা আমাদের জীবন। যখন আকণ্ঠ বিষয়ীর বহতা-বিষয়ী-নদীতে চড়া পড়ে, ঘোর সংসারীর সাংসারিক স্পৃহা শরতের মেঘের মতো স্বল্পায়ু হয়ে আসে, তখন

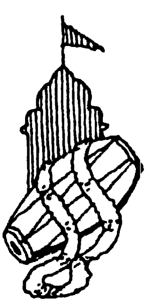


জানতে হবে, এই ভাঙার প্রতিক্ষণে কিছু একটা গড়ার কাজ চলছে অলক্ষ্যে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই যে চৈতন্যের সাংসারিক নিস্পৃহতা, এই স্পৃহা থেকে নিস্পৃহতার আকৃতি কেন তাঁর জীবনে জীবনীভূত হলো। কোন দুঃখের বিহ্বলতায়? পত্নী বিরহে এর বীজ নিহিত ছিল যা আমরা আগেও বহুবার বলেছি। তিনি প্রথমা—লক্ষ্মীপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া—দ্বিতীয়ায় যার পরিপূরক খুঁজে পাননি নিমাই। ক্রমান্বয়ে সংসারের বন্ধন একাধারে শ্লথ এবং ছিন্ন হয়ে আসছিল। কিন্তু তখনো সংসার বিমুখীন আবহাওয়ার মধ্যেও সংসারে ছিলেন নিমাই। এমন সময় নিমায়ের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ কমলাক্ষ ভট্টাচার্য। সে যুগের প্রখ্যাত অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য। নিমাইয়ের থেকে বাহান্ন বছরের প্রাচীন। বললেন, এসো। ঝুরিঅলা বটগাছের মতো অদ্বৈতাচার্যকে পেয়ে শান্তি পেলেন নিমাই। সংসারের খিড়কির চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিরাশ্রয়। অদ্বৈতের ডাকে সেই বেরিয়ে এলেন। অর্থাৎ লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁকে সংসার বিমুখ করলেন আর সে বিমুখতাকে তরান্বিত করলেন অদ্বৈতাচার্য। কিন্তু সংসারী চৈতন্যের সংসারত্যাগের যে উৎস লক্ষ্মীপ্রিয়া বিরহের মধ্যে আমরা দেখলাম তেমনই এক উৎস উত্তর-গৃহত্যাগী চৈতন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের মাধ্যমে। তা কি, এর সদুত্তর পূর্বোক্ত ও উত্তর ঘটনাসমূহের মধ্যে আমাদের অন্বেষণ করতে হবে। আর তখনই সবিস্ময়ে দেখবো, চৈতন্য ভার্গব-বিজয়ী ভীষ্মের মতো, কিভাবে, আচার্য সূচিত পথ ধরে বাহান্ন বছরের জ্যেষ্ঠকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

*　　*　　*

কথা হচ্ছে চৈতন্যের 'অন্ত্যলীলা' নিয়ে। এই অন্ত্যলীলার প্রায় পুরো ঘটনাটা পুরীর পটভূমিকায় লেখা। প্রায় কথাটা বলছি এ জন্য, কারণ, চৈতন্য তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শেষ বছরগুলি পুরীতে অতিবাহিত করলেও পারতপক্ষে সেটা নিরবিচ্ছিন্ন বলা যায় না। চৈতন্যের জীবন যাযাবর সন্ন্যাসীর জীবন। সন্ন্যাসীরা খানিক প্রকৃতগত 'বোহেমিয়ান' হয়ে থাকেন। মন তাঁদের এক স্থানে বাধা থাকে না। যদিও জীবনের অন্তিম বছরগুলি চৈতন্য প্রায় বন্দী অবস্থায় কাশী মিশ্রের বাড়িতে কাটিয়েছেন। কোন বন্ধন ছিল না এই বন্দীত্বের। বোধকরি দুঃখ সেখানে, চৈতন্য এবং আমাদেরও। কিন্তু এই দুঃখজাত কাহিনীর অবতারণার আগে, তা যে কারুর, হঠাৎ স্বরূপ দামোদরের কথা মনে পড়ে যাবে। কে এই স্বরূপ দামোদর? এক কথায় বলতে গেলে চৈতন্যের ছায়াসঙ্গী। অন্তত পুরী-নীলাচলে যে কয়বছর ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার তাঁর 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, '.....গৌড়দেশের ভক্তেরা নিরন্তর তাঁহার নিকট নীলাচলে থাকিবার অনুমতি পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রার্থনা প্রভু পূর্ণ করেন নাই। সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গী যাঁহারা, তাঁহারা সন্ন্যাসী—পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি।' (পৃ. ২২)। অবিশ্যি এ কথা চৈতন্য চরিতামৃতের কৃষ্ণদাসও খুব স্পষ্ট করে বলেছেন



এই স্বরূপ দামোদরকে বৈষ্ণব ধর্মে যে চৌষট্টি মহান্তর উল্লেখ আছে তারই একজন অন্যতম পরিকর হিসেবে নিরূপণ করা হয়। স্বরূপ দামোদর

বৈষ্ণব ধর্মে উল্লেখিত 'অষ্ট প্রধান মহান্ত' এর অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, এটি বৈষ্ণব প্রথানুযায়ী একটি দুর্লভ পদ বলা যায়। স্বরূপ ছিলেন চৈতন্যের পার্ষদ আবার স্বরূপের পার্ষদ ছিলেন চন্দ্রশেখর আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, দামোদর পণ্ডিত রত্নগর্ভ ঠাকুর প্রভৃতি বাঘা বাঘা ব্যক্তিরা। এতে করে বেশ বোঝা যায়, স্বরূপ দামোদরের প্রয়োজন চৈতন্যের কাছে কতোখানি ব্যাপক ও সমর্থিত ছিল। ('ভক্তিরত্নাকর'/নবম তরঙ্গ/নরহরি চক্রবর্তী/পৃ. ৫৮-৯০)।

এই স্বরূপ দমোদর চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বিষয়ক অর্থাৎ নীলাচলে অবস্থানকালীন জীবনের শেষ দিনগুলি নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থখানি খুবই উৎকৃষ্ট ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা ভাষা বা ভাবের জন্য বোধহয় নয়। বিশেষত কৃষ্ণদাসের কথায় যা অনুমান হয়, তাতে এ' প্রত্যয়ী হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকে, এবং তা হলে ভাষা বা ভাবগত কারণে যতোখানি তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি স্বরূপের ঐতিহাসিকতার ওপর, তথ্য নিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস লিখেছেন,

'প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
[১।১৩।১৫]

চৈতন্য চরিতের যে খাঁটি সত্যতা মুরারি আর স্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা'র মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল কৃষ্ণদাস তা অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বরূপ-দামোদরের গ্রন্থ যার নাম নাকি ছিল 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' সেখানা আজও অনাবিষ্কৃত। গ্রন্থখানা রচনার পর কেউ কেউ সে গ্রন্থ দেখেছিলেন নিশ্চয়। এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সন্দেহ হয়, স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি সে গ্রন্থ আদৌ দেখেছিলেন ? স্বরূপ প্রাসঙ্গিক কৃষ্ণদাসের লেখায় তা প্রত্যয় করার নির্বিবাদ ভরসা হয় না।

কৃষ্ণদাস লিখেছেন,

'চৈতন্য লীলারত্ন-সার   স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল   তাহা ইহ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥'
[২।২।৭৩]



অর্থাৎ আমরা শুধু না, চরিতকার কৃষ্ণদাসও স্বয়ং স্বরূপের 'কড়চা' দেখেন নি। তাহলে স্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা'-র কথা তিনি কোথায় পেলেন ? না 'তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।' এখন আমাদের দেখতে হবে এই রঘুনাথটি কে। যুগপৎ চৈতন্য ও স্বরূপ দামোদারের সাথে অথবা স্বরূপের 'কড়চা' বিষয়ক কি সম্পর্ক ছিল তাঁর।

দেখা যাচ্ছে রঘুনাথ দাসের (গোস্বামী) গুরু ছিলেন কড়চা লেখক স্বরূপ

দামোদর।* আর এই শিষ্য রঘুনাথের কাছে স্বরূপের 'কড়চা' বিষয়ক তথ্য যাবতীয় পেয়েছিলেন কৃষ্ণদাস। কেননা, রঘুনাথ দাস চৈতন্যের স্থিতিকালে নীলাচলেই বাস করতেন। সুতরাং চৈতন্যের অন্ত্যলীলাজনিত ঘটনাবলীর তিনি যেমন সাক্ষ্য ছিলেন, অনুরূপ গুরুর রচনা সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন প্রত্যক্ষ-ভাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কৃষ্ণদাসের রচনায় বারম্বার স্বরূপের নাম উচ্চারিত হয়েছে এবং তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বরূপ বিরোচিত কোন উদ্ধৃতি কৃষ্ণদাসের বইতে নেই কেন ? কৃষ্ণদাস এক জায়গায় লিখেছেন,

'অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রচার।
দামোদর-স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥

অথবা কড়চার তখনো অস্তিত্ব ছিল, এবং রঘুনাথ চাইলে তা পেতেনও বা পুঁথিখানা তাঁর নিকটে ছিল, কিন্তু তাতে স্বরূপের 'কড়চায়' এমন কিছু নিষ্ঠুর সত্য ছিল যার পুনরোক্তি করতে কৃষ্ণদাসের কাছে তাঁর মন চায়নি। কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে, কোন সংশয়জনিত পরিস্থিতির আশঙ্কায় রঘুনাথ দাস গোস্বামী মুখ খোলেন নি তা আমাদের জানতে হবে। আবার এ হেন সন্দেহ স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ওপরও বর্তাতে পারে। কেন না, তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,

'শেষ লীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু শেষ বিস্তারিব লীলা শেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥'

[মধ্যলীলা/২য় পরিচ্ছেদ]

এসব কথা বলার পরও বৃদ্ধ কবিরাজ আরও কয়েকশো পৃষ্ঠা চরিতামৃত লিখেছেন। কিন্তু চৈতন্যের অন্ত্যলীলার অন্তর্গত তিরোধানজনিত যে রহস্য -সে বিষয়ে প্রাজ্ঞ কবিরাজ আমাদের এক আধিভৌতিক কাহিনী শুনিয়েছেন মাত্র : কিন্তু কেন ? আর সেই 'কেন'-র উত্তর আমরা অবশ্যই খুঁজবো। কিন্তু এখন না। আরও কিছু পরে। কখন ? না দিনমান শেষে ঘুমের দেশে এক দিনগত

*স্বরূপ-দামোদরের আসল নাম বোধকরি দামোদর। দামোদর গোস্বামী। তবে প্রাক্ সন্ন্যাস কালে তার মাতৃ-পিতৃ দত্ত নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। অর্থাৎ স্বরূপ-দামোদর এই পুরো নামটি তাঁর সন্ন্যাস-উত্তর জীবনে প্রাপ্ত। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে, 'সন্ন্যাস করিলা শিখাসূত্র ত্যাগরূপ।/যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ॥' অর্থাৎ 'যোগপট্ট' তিনি সন্ন্যাসীর নিয়মানুযায়ী পরিগ্রহণ করেন নি। তিনি পূর্ব রূপে অর্থাৎ স্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন বলে তার পরবর্তীকালের নামকরণ 'স্বরূপ'-তে রূপান্তরিত হয়েছিল।



তবে কি এ কথা আমরা ধরে নেবো, আর তা হলে, যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজকে রঘুনাথ গোস্বামী স্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা' বিষয়ে বলেছিলেন তখন স্বরূপের কড়চা তাঁর নাগালে ছিল না। অর্থাৎ 'লোপাট' হয়ে গেছলো।

আয়ুষ্কাল যখন ঢলে পড়বে, সেই পাতাঝরা শীতের দিনের মতো—মানুষ চৈতন্যের জীবনে যেদিন সায়াহ্ন নেমে এসেছিল—সেই সায়াহ্ন বেলার পটভূমিতে আরেকবার আমরা সন্দিৎসু চিত্তে কবিরাজ কৃষ্ণদাসকে খুঁজবো।

তাহলে এই অধ্যায়ে এ যাবৎ আলোচনা ভিত্তিক যা কিছু পরিবেশিত হলো, তাতে করে, আমাদের কাছে স্বরূপের 'কড়চা'-র প্রয়োজনীয়তা খুব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বিশেষত অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে। অবিশ্যি, চৈতন্যের অন্ত্যলীলার সাক্ষী ছিলেন এমন অনেকেই গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু চৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের ছিল বোধকরি ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক। সে সম্পর্কের গণ্ডি ছেড়ে তাঁরা কদাচ বেরিয়ে আসার কল্পনা করেন নি। তাই জগন্নাথে জগন্নাথ লীন হওয়ার ঐশ্বরীয় কাহিনী তাঁদের মানসিকতায় সংক্রমণ ঘটেছে। ওড়িয়া ভক্তগণের লেখনীতে সেই একই আনুগত্য প্রবণতা আমরা দেখতে পাই। 'কলারে কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি।' যার অর্থ জগন্নাথের কালো অঙ্গে কৃষ্ণরূপ চৈতন্য মিশে গেলেন, তার আর কোন চিহ্ন রইলো না। একথা আমরা ওড়িয়া লেখক অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা' গ্রন্থ থেকে পাচ্ছি। অচ্যুতানন্দ ছিলেন চৈতন্যের অন্যতম পরিচিত ব্যক্তি। অচ্যুতানন্দের পরবর্তী ওড়িয়া কবি দিবাকর দাসও সেই একই কথা লিখেছেন, 'এমন্ত ভাবি শ্রীচৈতন্য।/শ্রী জগন্নাথ অঙ্গে লীন॥' (জগন্নাথ চরিত/পৃ. ২৪৭)।

গোস্বামী স্বরূপও ছিলেন চৈতন্যের অন্যতম প্রিয় পার্ষদ। উভয়ে উভয়ের প্রিয় ছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ স্বরূপ কনিষ্ঠ চৈতন্যের ভক্ত ছিলেন সন্দেহাতীত ভাবে। এক অর্থে চৈতন্যও স্বরূপের ভক্ত ছিলেন। যেমন নিত্যানন্দের ছিলেন, যেমন গদাধর গায়ক মুকুন্দ-আদিরা ছিলেন। কিন্তু (আমাদের ধারণা) ভক্ত স্বরূপ সম্ভবত ভগবান চৈতন্যকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন তার 'কড়চা' গ্রন্থে। অন্তত কিছু ক্ষেত্রে তা ঘটেছিল। অপরাপর ভক্তগণের যা আপত্তির কারণ ছিল। আত্মশ্লাঘার কারণ ঘটেছিল এবং সে কারণে 'কড়চা' আর জনসমক্ষে পৌঁছাতে পারে নি। একথা সত্য হতে পারে, আবার কুত্রাপি সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু সত্যান্বেষণের পথে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পুঁথি খোয়া যাওয়ার বিপন্নতা এক চৈতন্য চরিতকার (কৃষ্ণদাস)-কে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল, সেই পরম সম্পদ স্বরূপ কি নিজে খুইয়ে ছিলেন? এমন কি কারু কাছে দিয়েছিলেন বা দিয়ে গেছলেন যে হেলায় হারাতে পারে? সেটা কি সম্ভব, নাকি আদপি অসম্ভব না। এই সম্ভব এবং অসম্ভবের মধ্যে রয়েছে স্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা' হারানোর আসল রহস্য।

এই যে এতোক্ষণ যাবৎ স্বরূপ দামোদরের 'কড়চা' নিয়ে কথা হলো এর কারণ কি? এতো সব সাতকাহানের কি খুব প্রয়োজন ছিল? ছিল। অন্তত শেষ লীলার কিছু অকথিত কাহিনী আমরা জানতে পারতাম। কৃষ্ণদাস বার বার বলেছেন স্বরূপ চৈতন্যের অন্ত্যলীলার সবকিছু জানতেন। স্বরূপ চৈতন্যের অন্ত্যলীলার সাক্ষী ছিলেন। সাক্ষী ছিলেন তো অনেকেই, যেমন, পরমানন্দপুরী যেমন ব্রহ্মানন্দ, গদাধর। তা সত্ত্বেও স্বরূপের নাম উল্লেখ কেন?



ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বভাবতই আমাদের রুটিন মাপা নির্বিরোধ ভাবনার কিছু রকমফের ঘটে যায়। এই যে চৈতন্য চরিতকারগণ--কি মুরারি,

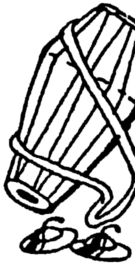
কি কর্ণপূর, এমন কি জয়ানন্দ, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মায় লোচন পর্যন্ত গতানুগতিকত্বের দিক থেকে ভক্ত ভগবানের সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি। তাঁরা ভক্ত হয়ে, সেবাপরায়ণতার মানসিকতায় এক মানব সাদৃশ্য ভগবানের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। সে ছবি কখনো ভগবানের সাদৃশ্য মানুষেরও হয়ে উঠেছে। কিন্তু সততঃ, সর্বত্রই এমন ঘটনার সন্নিবেশ ঘটেছে তা বলি না। এর মাঝে আমরা অবিস্মরণীয় ভাবে চৈতন্যের ধূলোমাটির মানুষের প্রত্যাশিত রূপটিও চোরা মেঘের ফাঁকে সূর্যি উঁকি মারার মতো দেখেছি কখনো কখনো। সেখানে লেখক ও তাঁর লেখনীকে বড় চেনা চেনা, কাছের মনে হয়। ভারি সন্দেহ হয়, এই যে স্বরূপ-দামোদর—ইনিও কি কড়চায় এমন কিছু লিখেছিলেন যেখানে চৈতন্যের মানুষী রূপটি ভগবান চৈতন্যপেক্ষা অধিকতর প্রকাশ্য হয়েছে ?

কিন্তু যেহেতু সংশ্লিষ্ট 'কড়চা'-র কোন প্রামাণ্য অবশিষ্ট আজ আমাদের কাছে নেই, অতীতে কেমনতর ছিল তার একটি নিষ্ফল অনুমান আছে মাত্র। সুতরাং সেই অনুমানের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, বর্ষা প্রতীক্ষিত কৃষকের মতো, আমরা কেবল এই কথারই সম্মুখীন হবো বারম্বার—যদি জয়ানন্দের, কর্ণপূরের, মুরারির, কৃষ্ণদাস প্রমুখের গ্রন্থের মতো স্বরূপ-দমোদরের 'কড়চা' থাকতো, তাহলে, পুরুষোত্তমের—নীলাচলের এই আঠারো বছর—যাকে আমরা অন্ত্যলীলা বলবো—চৈতন্য প্রাসঙ্গিকীর আরও অধিকতর নতুন কিছু আমরা জানতাম। বিশেষত তাঁর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে। শোনা যায়, চৈতন্যের মৃত্যুজনিত পরিশেষটি বড় নির্মম। আবার প্রচ্ছন্নও বটে। স্বরূপের 'কড়চা' থাকলে, অনুমান করি, এই তামসিকতার অবসানে আরও কিছু প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যের সম্মুখীন হতাম আমরা।

[একুশ]

ঈশানের মেঘ ও চৈতন্য [দুই]

শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৈতন্য ঠিক কবে নাগাদ নীচাচলে এসে পৌঁছেছিলেন একথা স্পষ্ট করে কোন চরিত্রকার বলেননি। তবে ফাল্গুন মাসে শান্তিপুর থেকে যাত্রা করে ফাল্গুনেই তিনি নীলাচলে পৌঁছেছিলেন একথা একাধিক চৈতন্য চরিতকারের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু ফাল্গুনের ঠিক কোন তারিখে তিনি অদ্বৈতাচার্যের শান্তিপুরস্থ বাড়ি থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন সেই তারিখটি নিয়ে স্বয়ং চৈতন্য চরিতকাররাই বিতর্ক বাঁধিয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন ১৯শে ফাল্গুন। অন্যত্র কর্ণপূর বলেছেন ১৩ই। সে যুগে (১৫১০ খ্রীঃ) নদীয়ার শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে হাঁটা ও জল পথ মিলিয়ে ফাল্গুনের মধ্যে পুরী পৌঁছানো বেশ দুষ্কর। বিশেষত মাসান্তে ১৯শে ফাল্গুন বেরিয়ে। তবে কর্ণপূরের মতে তিনি (চৈতন্য) ১৩ই ফাল্গুন নদীয়া থেকে যাত্রা করে ফাল্গুনের মধ্যে নীলাচলে পৌঁছাতেও পারেন। এক্ষেত্রে কর্ণপূরের বক্তব্য গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু পথের দুর্গমতা কর্ণপূরের বক্তব্যের স্পষ্টতাকে প্রচ্ছন্ন করে।



কবি কর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যে (১২।৯৪) বলেছেন, চৈতন্য প্রথমবার নীলাচলে এসে মাত্র ১৮ দিন অবস্থান করেছিলেন। তার পরই তিনি দীর্ঘ সফরে দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অর্থাৎ অঙ্কের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ফাল্গুনের ১৩ তারিখে শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে চৈতন্য যদি ফাল্গুনের ৩০ তারিখেও নীলাচলে পৌঁছে থাকেন তাহলে, চৈতন্য চৈত্র মাসের ১৮ তারিখ নাগাদ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন বলা যায়। যদিচও এই তারিখটি স্পষ্ট বা নিশ্চিত না, শুধু মাত্র উদাহরণার্থে ব্যবহারিত হলো।

এই যে ১৮ দিন—সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর নীলাচল বসবাসকালের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ১৮ দিন, এই যৎ সামান্য ১৮ দিনের মাথায় তড়িঘড়ি চৈতন্য আবার কেন পুরী থেকে দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন তা আমাদের অতঃপর জানতে হবে। কিন্তু তার আগে, তারও আগের ইতিহাসটুকু আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার, তা হলো, এই ১৮ দিনে—পুরীতে চৈতন্য পদার্পনের প্রথম ১৮ দিনে চৈতন্য চরিতে কি কি নতুন ঘটনার সংযোগ ঘটলো। নতুন বলছি এ জন্য, যা আমাদের এই পর্যন্ত অজ্ঞাত বা অর্ধজ্ঞাত কিন্তু উপেক্ষিত নয়। এটি আমাদের অতঃপর জানতে হবে।

*　　　*　　　*

ইতোপূর্বে আমরা 'চৈতন্য চকড়া' নামক (গোবিন্দ দাস বাবাজী লিখিত) একটি ওড়িআ গ্রন্থ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। গোবিন্দ দাস বাবাজী লিখিত 'চৈতন্য চকড়া' বলছি এ জন্য যে, প্রায় সমসাময়িক কালে চৈতন্য চকড়া নামে আরেকটি ওড়িআ পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটির লেখক বৈষ্ণব দাস। বৈষ্ণব দাসের গ্রন্থটির পুরো নাম অবিশ্যি 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া'। আর এই দুটি গ্রন্থের আবিষ্কর্তা সদ্য প্রয়াত ওড়িআ পণ্ডিত পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা।

তা এই প্রথম গ্রন্থটি যার নাম 'চৈতন্য চকড়া'—এই গ্রন্থে অনন্ত প্রতিহারী নামে একজন পালোয়ান গোছের ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে। চৈতন্য যখন প্রথম পুরীতে আসেন সে সময় জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বার রক্ষী ছিল সে। চকড়ার বক্তব্যে মনে হচ্ছে, 'মাসলম্যান' হিসেবে নীলাচলে এক ডাকে সবাই চিনতো তাকে।

এ'হেন অনন্ত প্রতিহারী একদিন চৈতন্য সন্ন্যাসীর একটা ছোটখাটো ধাক্কায় প্রায় ভিমরি খেয়ে পড়লো পুজো মণ্ডপের প্রশস্ত চাতালে। ওড়িআ ভাষায় যার নাম 'অনসর পিণ্ডি'। চক্কর খেয়ে একটা লোক যখন পাথরে গামাল মুখ থুবড়ে পড়লো তখন তার অবস্থা খুবই সঙ্গিন হয়েছিল নিশ্চয়। চড়কায় অবিশ্যি সে কথা বলা নেই। তবে তার আপাদ-মস্তক পতনে উপস্থিত পাণ্ডারা যে হাহাকার করে উঠেছিল সে কথা স্পষ্ট লেখা আছে।

> 'নিষেধ করন্তে গোরা ভাব সনু ধরি।
> করে আড়াইন দেলে দ্বার প্রতিহারী॥
> অনসর পিণ্ডি ঠারে যাইন পড়িল।
> হাহাকারে দেউলরে সর্ব্বে নিবর্ত্তিলে॥'

[চকড়া/পৃঃ ৮]



প্রতিহারী অনন্ত পালোয়ান অবিশ্যি এ ঘটনার পরে তুলসীর মালা তিলক ধারণ করে চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। জগন্নাথ মন্দিরের দ্বার রক্ষীর কাজেও ইস্তফা দিয়েছিল সে। কিন্তু ততোদিনে চৈতন্যের অভূতপূর্ব শক্তির

কথা, বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল নীলাচলের সর্বত্র। এ প্রসঙ্গে চকড়া লিখেছে,

'রাজার দুয়ারে যাই করণে কহিলে।
এমন্ত ভকতকথা সরবে জানিলে॥'

অবশেষে কথা এ কান ও কান হতে হতে দেশের রাজার গোচরে পৌঁছালো। উৎকলের রাজা তখন গজপতি প্রতাপরুদ্র। রাজা তো কর্মচারী-দের মুখে এ হেন কথা শুনে তাজ্জব। বললেন, ওই সন্ন্যাসী কে তোমরা খবর নাও। প্রয়োজনে তাঁকে অভ্যর্থনা করো। কিন্তু ওই অসাধারণ সন্ন্যাসীর সব সংবাদ আমার চাই।

ঠিক এই জায়গায় এসে আমরা যেন একটু হোঁচট খেয়ে থমকে গেছলাম।

ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে বছর তিন আগে। তখন সবে 'চৈতন্য চকড়া' বাঙলা রূপান্তর হয়ে বেরিয়েছে। সম্পাদক সদাশিব রথশর্মা। আমাদের বাঙলাদেশে যেমন নীহার রায়, সুকুমার সেন ওড়িশাদেশে তেমনি সদাশিব রথশর্মা। কথা হচ্ছিলো সদাশিব-বাবুর পণ্ডর সাই-এর বাড়িতে বসে। আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল চৈতন্যের সাথে রাজা প্রতাপরুদ্রের কবে নাগাদ যোগাযোগ ঘটেছিল। সেটা ঘটনা পরম্পরা মৌখিক বা চাক্ষুস দুই হতে পারে। কিন্তু তা কবে নাগাদ ঘটেছিল। চৈতন্য যখন প্রথমবার পুরীতে পদার্পন করেন তখন তাঁর বসবাসের স্থায়িত্ব ছিল সাকুল্যে আঠারো দিন। যদিচও এই আঠারো দিন নিয়ে বিস্তর পণ্ডিতি বিতর্ক আছে। কিন্তু তিনি যে এসময় মাসাধিক কখনোই ছিলেন না এ বিষয়ে কোন সন্দিৎসা নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, এই আঠারো দিনের মাথায় কি ওড্ররাজ প্রতাপরুদ্রের সাথে সন্ন্যাসী চৈতন্যের কোন রকম যোগাযোগ ঘটেছিল? এই যে পালোয়ান অনন্ত প্রতিহারীর ভূ-পতিত হওয়া, যার হোতা ছিলেন অপরিচিত, অজ্ঞাত অবজ্ঞাত এক সন্ন্যাসী, এই অভূতপূর্ব সংবাদ কি ওই আঠারো দিনের মাথায় দেশের রাজার কানে পৌঁছে গেছলো?

কিন্তু 'চৈতন্য চকড়া'য় দেখা যাচ্ছে, শ্রীল গোবিন্দ দাসের মতে চৈতন্য প্রথমবার পুরীতে প্রবেশ করছেন, 'শকবর্ষ চউদশ একত্রিশ শুভ।' অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দে। ইংরাজির ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে। আর দিনটি কবে, না 'ভাদ্র শুক্লনবমী বিদসান্ত ঠাব।' অর্থাৎ দিনশেষে ভাদ্র শুক্লানবমীর দিন। (চৈ. চকড়া/পৃ ৪)। আর অনন্ত প্রতিহারীর ভূপতিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল এরও মাস দুই পর। চকড়ার মতে দিনটি ছিল, কার্ত্তিক দশমী রবিবার।

কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, চকড়ার কথিপয় ঘটনাবলীর পিছনে প্রামাণিক সহযোগিতা থাকলেও এর সন তারিখের ওপর কোন সত্যের সমর্থন নেই। কেননা, আমরা সকলেই অতি বিস্তর অবগত আছি যে, চৈতন্য ১৪৩১ শকে (ইং ১৫১০ খ্রীঃ) নীলাচলে প্রথম আগমন করেন। সকল চরিতকার প্রায় এক বাক্যে এ কথা স্বীকার করেছেন। চৈতন্য নীলাচলে প্রথম পদার্পন করেছিলেন ফাল্গুন মাসে। এ কথাও বাঘা বাঘা চৈতন্য চরিতকারগণ দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু কড়চার বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য ভাদ্র মাসে নীলাচলে প্রথম পদার্পন করছেন।

কড়চায় আরেকটি তথ্যগত গরমিল আছে। সেটিও মাস এবং সময়ের। কড়চা লিখেছে, অনন্ত প্রতিহারী জনিত ঘটনাটি ঘটেছিল কার্ত্তিক মাসে। অর্থাৎ চৈতন্যের প্রথম পুরুষোত্তমে প্রবেশের আরও দুমাস পরে। কিন্তু কার্যত

দেখা যাচ্ছে চৈতন্যের প্রথম পুরী আগমনের স্থায়িত্বকাল ছিল সাকুল্যে আঠারো দিন। এরপর তিনি প্রায় দুই বছরের জন্য দাক্ষিণাত্য সফরে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

পরিশেষে চকড়ার আরেকটি তথ্য প্রসঙ্গ আমাদের খুব স্বাভাবিকভাবে সন্দিগ্ধ করে । এবং তা হলো, পালোয়ান অনন্ত প্রতিহারীর পতনজনিত ঘটনাটি কর্মচারী মারফৎ ওড্ররাজ প্রতাপরুদ্রের গোচরে কেমন করে পৌঁছালো। কেননা, রাজা তো তখন পুরীতে ছিলেন না। কটকে আরেক প্রাসাদ ছিল তাঁর, (চৈতন্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর বিপর্যস্ত রাজা এই প্রাসাদে পালিয়ে এসেছিলেন) কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ওড্ররাজ প্রতাপরুদ্র গজপতি তখন কটক প্রাসাদেও ছিলেন না। বস্তুত. তিনি তখন সীমান্ত যুদ্ধে ঘোরতর লিপ্ত। আর সে যুদ্ধ চলছিল বঙ্গদেশের সুলতান হুসেন শাহর সঙ্গে। একটু আগে, চৈতন্য যখন শান্তিপুর থেকে সপার্ষদ নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন থেকে আমরা এ যুদ্ধের গন্ধ পাচ্ছি। বৃন্দবান দাসের কথা, কবিরাজ গোস্বামীর কথা যদি খণ্ডাংশও সত্য হয় তাহলে বলতে হয় খুব ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সে যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধ এতোই দীর্ঘস্থায়ী ছিল যে রাজা প্রতাপরুদ্রের আমলে এর কোনদিনের জন্য পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি।

এ হেন সুদীর্ঘ কালব্যাপি যুদ্ধের কিঞ্চিৎ পূর্ব পর ইতিহাস আমাদের জেনে রাখা দরকার। কেননা, এই যুদ্ধের পোড়া বারুদের ধোঁয়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক সাপের মতো ক্রুর ভয়ঙ্কর চরিত্রের মানুষ। যার নাম গোবিন্দ বিদ্যাধর। এবং এই নামটি খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে এজন্য যে, আমাদের বাঙলার ইতিহাসে যেমন মীরজাফর, ওড়িশার ইতিহাসে গোবিন্দ বিদ্যাধর তেমনই এক কলঙ্কিত, বহু নিন্দিত নাম।

আমরা ইতিহাস পাঠ করলে জানতে পারবো গৌড় বঙ্গের সুলতান হুসেন শাহের মোট রাজত্ব কালের মেয়াদ ছিল টানা ছাব্বিশ বছর ইং ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত। এই একটানা ছাব্বিশ বছরকাল ব্যাপি রাজত্বে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের একমাত্র ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ওড্ররাজ প্রতাপরুদ্র। আর এই প্রতাপরুদ্রের বড়ো মাপের মন্ত্রী ছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধর।

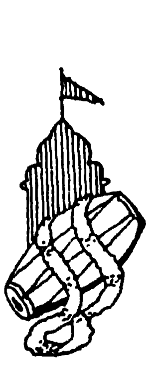
হুসেন শাহের পুরো নাম বোধকরি আলাউদ্দীন হুসেন শাহ। বলতে গেলে খুব ছোটখাটো ছা-পোষা মানুষ থেকে হুসেন শাহ একেবারে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' প্রবাদের মতো বাঙলার সুলতানী তখ্‌তে চড়ে বসে ছিলেন। কিন্তু সে সব ইতিহাস আলোচনা এখানে নিষ্প্রোয়জন। তো এই হুসেন শাহ যখন বাংলার তখ্‌তে আসীন হলেন অর্থাৎ সিংহাসনারোহণ করলেন তখন চলছিল একটা ঘোরতর যুদ্ধের মুহূর্ত। যদিচও সে যুদ্ধ চলছিল গৌড় বাঙলা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী ও জৌনপুরের শর্কী সুলতানের মধ্যে। কিন্তু সে যুদ্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না গৌড়ের নব অধিষ্ঠিত সুলতান। সেটা বোধহয় ইংরাজির ১৪৯৫ সালের কথা। দিল্লী ও জৌনপুরের শর্কী সুলতান বাঙলার সুলতান হুসেন শাহের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করলেন। আর পোড় খাওয়া ভুখোড় রাজনীতিবিদ হুসেন শাহও বোধকরি এটাই চেয়েছিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো তৎক্ষণাৎ। হুসেন শাহ সেই মুহূর্তে সিকন্দর লোদীর আফগান বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজপুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে এক বড়ো মাপের সেনাদল প্রেরণ করলেন। বর্তমান পাটনা (বিহার) থেকে প্রায় ৩০ মাইল পূর্বে 'বড়' (Bord) নামক একটা জায়গায় দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। ফলে ধুন্দুমার যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধে



সিকন্দর লোদীর পক্ষ বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে সন্ধি অনিবার্য হয়ে পড়ে। দেখা যাচ্ছে, এই চুক্তি অনুসারে মুঙ্গের ও দক্ষিণ বিহার সমেত 'বড়' এর পূর্ব দিকের প্রায় পুরো এলাকা বাঙলার সুলতানের দখলে চলে আসে। এবং এর পরবর্তী ইতিহাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে জৌনপুর সুলতানের সাহায্যের জন্য হুসেন শাহ পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। সেই জৌনপুর রাজ্য অবশেষে তাঁরই কব্জায় এসে গেল একদিন। এরই নাম রাজনীতি। অতঃপর নতুন উৎসাহে এগিয়ে চললেন সুলতান। এবার তাঁর লক্ষ্যবস্তু হলো পূর্ব সীমান্তের কামতা ও কামরূপ রাজ্য। শেষোক্ত এই দুই রাজ্য অভিযানে বড়ো ভূমিকা ছিল সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজীর। বিশেষত তদানীন্তন কামতা রাজ্য যেরকম সুরক্ষিত দেখা যাচ্ছে তাতে গাজীর তুখোড় কূটবুদ্ধি ব্যতিত একে কব্জা করা খুব দুষ্কর ছিল বলে মনে হয়। সেনাপতি ইসমাইল গাজীর নেতৃত্বে প্রায় ট্রয় দখলের মতো খুব সুকৌশলে মুসলমান বাহিনী কামতা রাজ্যে প্রবেশ করে। আর এই অতর্কিত হানায় বন্দী হন স্বয়ং কামতারাজ নীলাম্বর। এরপর বিজয় বাহিনী আরও ভেতরে অগ্রসর হয় ও কামরূপ জিলার হাজো (Hajo) নামক স্থান পর্যন্ত স্থায়ীভাবে দখল করে নেয় ('The whole Kingdom as far as Hajo in the Kamrop District was parmanently annexed')। এক-টানা তিন বছর এ যুদ্ধ স্থায়ী ছিল (১৪৯৯–১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ প্রর্যন্ত)।*

অতঃপর দেখা যাচ্ছে, এই কামতা ও কামরূপ অভিযানের সফলতা হুসেন শাহকে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে নিজ রাজ্যের সীমানাভুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করলো। সুতরাং তাঁর পরবর্তী অভিযানের লক্ষ্যস্থল হলো ওড্রদেশ। বর্তমানে আমরা যাকে উৎকল বা ওড়িশাদেশ বলছি। আর সম্ভবত এখানেই শাহ সুলতান রণনীতির দাবা খেলায় একটা বড়ো রকমের ভুল চাল দিয়ে বসলেন। উৎকলের রাজা তখন গজপতি প্রতাপ রুদ্রদেব। হুসেন শাহের মতোই তরুণ। যুদ্ধবাজ এবং শক্তিশালীও। আমরা যে সময়কার কথা বলছি সে সময় বিস্তীর্ণ সীমানা ছিল ওড়িশার। এখনকার মেদিনীপুর জিলার প্রায় সমস্তটাই তখন ওড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একেবারে সরস্বতী নদীর কিনারা পর্যন্ত। সরস্বতী ছিল তখন পূর্ণসলিলা। এখন অবিশ্যি সে দুরন্ত যৌবনা নদী আশি বছরের থুরথুরি বুড়ী হয়ে গেছে। জগন্নাথ মন্দিরের রোজনামচা নথি 'মাদলাপঞ্জী অনুসারে ইংরাজির ১৫০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের সেনাপতি

* অবিশ্যি এই অভিযানের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ কিছু মতভেদ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ডঃ অজয় চক্রবর্তী তাঁর 'Literature in Kamata—Koch-Raj Darbar' গ্রন্থে লিখেছেন, in the Silver coins of Hussain Saha, we find about the Victory of Kamata, Kamarup etc. in 899-919 Hizi-Era equivalent to 1493 A.D. The event was also inscribed in the mosque of KATADUAR in the district of Rangpur. (Page-23)। অন্যত্র মালদার উৎকীর্ণ লিপিতে লেখা আছে, 'The whole operation lasted presumably from A.D 1499 to 1502 when the conquest of this large stretch of territory was publicly recorded by Sultan Hussain in an inscription ot Malda.' এছাড়া এস. এন. ভট্টাচার্যের 'Moghaul Northern East Forntier Policy' বইখানাও বিশেষ দ্রষ্টব্য।



ইসমাইল গাজী প্রায় ঝটিকা গতিতে আরামবাগ জিলার মন্দার থেকে বেরিয়ে ওড়িশার জাজপুর কটক ও অবশেষে সমুদ্র নগরী পুরী পর্যন্ত পৌঁছে যান। প্রচুর হিন্দু মন্দিরও ধ্বংস হয় এসময়।• বোধকরি উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় সে যাত্রায় পুরীর জগন্নাথ মন্দির বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের কবল থেকে বেঁচে যায়। মুসলমান বাহিনীর এহেন আকস্মিক আক্রমণের খবর অবশেষে রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে পৌঁছে যায়। প্রতাপরুদ্র তখন দক্ষিণ অভিযানে ব্যস্ত। কিন্তু সে অভিযান স্থগিত রেখে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন সসৈন্যে। এবং দুর্ধর্ষ মুসলমান বাহিনীকে আরামবাগের নিকট মন্দার পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। এখানে যুদ্ধ চলে দু'পক্ষের। এক সময় সুলতান বাহিনী গড় মান্দারণ দুর্গে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয় প্রতাপরুদ্রের সাঁড়াশি আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে। ফলে ওড়িশা বাহিনী অবরোধ করে মান্দারণ দুর্গ। সুলতান বাহিনী প্রায় ভাত পানি অভাবে মরে যাবার যোগাড়। আর ঠিক এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র অন্যতম সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের ওপরে দুর্গ অবরোধের ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

সেনাপতির ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। এ বিশ্বাসও কোন অযৌক্তিক ছিল না। দেশের রাজা সে দেশের সেনাপতির ওপর বিশ্বাস করতেই পারেন। যেমন সিরাজ করেছিলেন সেনাপতি মীরজাফরের কথায়। আর এই বিশ্বাসই হলো কাল। মিরজাফরের কথায় বিশ্বাস করে সিরাজদৌলা যেমন ধনেপ্রাণে মারা পড়েছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্রও তদ্রূপ এক বিষবৃক্ষ রোপিত করলেন এই বিশ্বাসের মাধ্যমে। আর বিষবৃক্ষের সে ফল ফলতে খুব বেশি দেরি হয়নি। মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করে সিংহাসনলোভী সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর এই একান্ত সময়টুকু কাজে লাগালেন শত্রুপক্ষের সাথে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে। গড়মান্দারণের দুর্গ অভ্যন্তরে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর সঙ্গে একটা গোপন পরামর্শ হলো তাঁর; দুর্গের কঠোর-কঠিন পাথরের আড়ালে সেই অভিসন্ধির কথা কেউ ঘুণাক্ষরে জানলো না। এমন কি ইতিহাসও না।• ফলত এই গোপন দুরভিসন্ধির জন্য অবরোধ ভেঙে যায় ও সুলতানী সৈন্যরা গড়মান্দারণ থেকে জান-প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। অনেক পরে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর সেনাপতির এ হেন বিশ্বাসঘাতকতার হদিস পেয়েছিলেন। কিন্তু ততোদিনে কাঠজুড়ি বৈতরণী নদী

• এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে লিখেছেন, 'যে সেন শাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে।/ দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ॥' এবং এসময় বিজয় বাহিনী জাজনগর ওড়িশার নামে মুদ্রা নির্মাণ করেছিলেন বলেও জানা যায় ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য/নির্মল নারায়ণ গুপ্ত/পৃঃ ১৬-১৭ দ্রষ্টব্য)।

• এ বিষয়টি নিয়ে পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের বিশিষ্ট চৈতন্য বিশেষজ্ঞ ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সাথে আমার আলোচনা হয়েছিল। সেদিন কথা প্রসঙ্গে জয়দেববাবু বলেছিলেন, গোবিন্দ বিদ্যাধর যে বিশ্বাসঘাতক একথা ওড়িয়া ঐতিহাসিকেরা প্রথমে মানেন নি। গোবিন্দ বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তিনিই প্রথম জনসমক্ষে প্রচার করেন। এ নিয়ে পিতৃবন্ধু ওড়িশার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হরেকৃষ্ণ মহাতব মশায়ের সাথে তাঁর মতান্তরও ঘটে। যদিও অনেক পরে মহাতব মশাই জয়দেববাবুর এই তথ্য সর্বান্তভাবে স্বীকার করেছিলেন।—লেখক।



দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। বলতে গেলে তখন কিছুই করার ছিল না রাজার। এক রকম অনন্য উপায় হয়ে বিদ্যাধরকে কোন রকম শাস্তি দান না করে উচ্চ রাজপদেই বহাল রাখলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র একাধারে শক্তিশালী এবং কৌশলী নরপতি ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু এক শক্তিবান ধাবিত অশ্বকে যেমন তার আরোহী-সহিস কঠিন বল্গার বন্ধনে তার শক্তির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার দুরন্ত তেজকে আপন প্রয়োজনে শ্লথ করে, খর্ব করে বারম্বার। অনুরূপ ভাবে, প্রতাপরুদ্র শক্তিবান রাজা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শক্তিকে প্রয়োজনে সংযত করার আসল চাবিকাঠি ছিল কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের হাতে। কথাটা বাস্তবিক যদিও খুব অবিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে। কিন্তু দু'কদম পিছনে তাকালে আমরা দেখবো, এর অবিসংবাদিত ইতিহাস আমাদের অমোঘ সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। আর তখনই আমরা সবিস্ময়ে দেখবো, সে সত্য নিষ্ঠুর ইতিহাসের চেয়েও যেন কঠোর, কঠিনও। আর বোধকরি এ কারণে ওড্র দেশের কিছু প্রাচীন ইতিহাস আমাদের জেনে রাখা দরকার।

দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকালে বিশেষত গুপ্ত আমলে (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়, তৃতীয় শতক) ওড়িশার রাজারা সরাসরি গুপ্তরাজাদের অধীনস্থ ছিল। 'খল্লিকোট' লিপি থেকে জানা যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ার পরও ওড়িশার রাজা (নাম পৃথিবীবিগ্রহ) গুপ্ত বংশীয় রাজাগণের আনুগত্য স্বীকার করে চলতেন। যদিচও পৃথিবীবিগ্রহের শাসন ব্যবস্থা বা তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানা যায় না। এরপর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে ওড়িশার উত্তরাংশে 'মান' বংশ এবং দক্ষিণাংশে 'শৈলোদ্ভব' বংশের শাসন ব্যবস্থার কথা আমরা জানতে পারি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর (সম্ভবত জীবিত গুপ্তর [দ্বিতীয়] পর) এই দুই রাজ বংশের উত্থান ঘটেছিল। এই 'মান' বংশ—উদয়মান, শ্রীধৌতমান ও অজিতমান এই তিনজন বণিকভ্রাতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আর 'শৈলোদ্ভব' বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল রণভীত। শৈলোদ্ভব বংশের অধীনস্থ রাজ্যাংশ 'কঙ্গোদ' নামে অভিহিত ছিল। রণভীতের পরবর্তী রাজাগণের নাম যথাক্রমে সৈন্যভীত মাধবরাজ (প্রথম), অয়শোভীত, সৈন্যভীত মাধবরাজ (দ্বিতীয়) প্রভৃতি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে মান ও শৈলোদ্ভব বংশের একতিয়ার ভুক্ত সমস্ত রাজ্য গোড়াধিপতি শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর শৈলোদ্ভব বংশের রাজারা শশাঙ্কের সামন্তরাজ হিসেবে ওড়িশার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর আসে হর্ষবর্ধনের (Harshavardhana 606-647) আমল। দেখা যাচ্ছে, এই শৈলোদ্ভব বংশের রাজারা হর্ষবর্ধনের আমলেও হর্ষবর্ধনের প্রতিনিধি-স্বরূপ ওড়িশার রাজকার্য পরিচালনা করতেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর শৈলোদ্ভব বংশের রাজারা স্বাধীনতা লাভ করে। এই শৈলোদ্ভব বংশের রাজা সৈন্যভীত মাধবরাজ (দ্বিতীয়) অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় অয়শোভীত বাজপেয়ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। অবিশ্যি কোন কোন ঐতিহাসিকরা এই মত পোষণ করেন যে, উল্লেখ্য 'শৈলোদ্ভব' বংশ ছিল 'গঙ্গ' বংশেরই এক শাখা মাত্র।



এরপর খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গ ওড়িশাকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। ইনি দীর্ঘ ৭২ বছর রাজত্ব করেছিলেন (১০৭৬-১১৪৮ খ্রীঃ)। এঁর রাজ্যসীমা উত্তরে গঙ্গা নদীর মোহানা

থেকে দক্ষিণে গোদাবরীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনন্ত বর্মন বিদ্যানুরাগী এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। এই অনন্ত বর্মনের আমলেই পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

অনন্ত বর্মনের পরবর্তী রাজারা মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে বহুদিন পর্যন্ত ওড়িশার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে নরসিংহ বর্মনের নাম (১২৩৮-১২৬৪ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নরসিংহ বর্মনের আদেশেই কোনার্কের বিখ্যাত সূর্যমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। বস্তুত, নরসিংহ বর্মনের মৃত্যুর পর চোড়গঙ্গ বংশ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজার মৃত্যু ঘটলে কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-৭০ খ্রীঃ) ওড়িশার রাজা হন।

আর এই কপিলেন্দ্র দেবের সময়কাল থেকে ওড়িশার ইতিহাস আমাদের আরও কিছু সবিস্তারে অনুধাবন করতে হবে। কেননা, এই কপিলেন্দ্র দেবই হলেন ওড়িশার 'গজপতি' রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অর্থাৎ আমরা যে গজপতি প্রতাপরুদ্র দেবকে নিয়ে আলোচনায় আসবো এই কপিলেন্দ্র সেই প্রতাপরুদ্রের বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পর্কে তিনি প্রতাপরুদ্রের পিতামহ।

যদিচও কপিলেন্দ্র দেব 'গজপতি' রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তাঁর পূর্বাপুরুষেরা সূর্যবংশ থেকে উদ্ভূত বলে কথিত আছে। এই কপিলেন্দ্র ওড়িশায় এসেছিলেন বলতে গেলে প্রায় সহায় সম্বলহীন অবস্থায়। জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের অনুগ্রহে আর জগন্নাথের প্রসাদান্ন খেয়ে কোনক্রমে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। কিন্তু মানুষটি ছিলেন অতীব বুদ্ধিমান। সম্ভবত এই বুদ্ধিমত্তার জোরে দেশের রাজার নজরে পড়লেন তিনি। তখন ওড়িশাদেশের যিনি রাজা ছিলেন তাঁর নাম মত্ত ভানুদেব। মত্ত অর্থে তিনি পানাসক্ত ছিলেন কিনা জানা যায় না। সে যাই হোক, এই মত্ত ভানুদেব রাজার অধীনস্থ একটা কাজ পেলেন কপিলেন্দ্র। বোধকরি সেটা ছিল দেশের সেনাবাহিনীর কোন কাজ। কেননা, ওড়িশী কবি বাসুদেব রথ বিরোচিত 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন এক সুলতানের সঙ্গে যখন রাজা মত্ত-ভানুদেবের যুদ্ধ বাধে তখন কপিলেন্দ্র দেব রাজাকে বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে বিশেষ সহায়তা দিয়েছিলেন। যার ফলে রাজা ভানুদেব কপিলেন্দ্রর প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্ত্রীপদে বহাল করেন। আগেই বলেছি কপিলেন্দ্র ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। সেই বুদ্ধির জোরে রাজা ভানুদেবের অনুপস্থিতিতে তিনি একদিন দেশের রাজগদ্দি দখল নিয়ে বসলেন। আর দখল কায়েম করতে তাঁকে মূল সহায়তা দিলেন জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডারা।

যদিচও দেশের রাজা হলেন কপিলেন্দ্র, কিন্তু যেহেতু পাণ্ডাদের সহায়তায় তিনি রাজসিংহাসনে বসলেন তাই রাজা হয়েও তাঁকে পাণ্ডাদের অধিকারে থাকতে হলো। সেই সঙ্গে তাদের দিতে হলো প্রভূত ধনরত্ন আর তৈজসপত্রাদি। জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের শক্তি সঞ্চারের এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

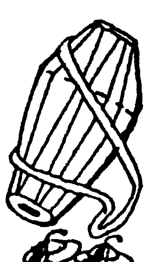


এবার আমরা আসছি কপিলেন্দ্রর পুত্র পুরুষোত্তম দেবের (১৪০৭-১৪৯৭ খ্রীঃ) কথায়। বস্তুত, এই পুরুষোত্তম দেবের সিংহাসন লাভ একটা গোজামিল প্রথায় হয়েছিল। অবিশ্যি রাজনীতিতে যদিও গোজামিল বলে কিছু নেই। রাজ-রাজড়ার ইতিহাস মানেই তো শঠতা আর চক্রান্তের মহা-সঙ্গম। তবু সেই ইতিহাসের নিয়মে বলতে হয়, কপিলেন্দ্র দেবের পর ওড়িশার সিংহাসনের যিনি প্রকৃত হকদার, উত্তরাধিকারী তার নাম হমীর দেব।

কেননা, এই হমীর দেবই ছিলেন কপিলেন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সেই সূত্রে পিতৃ-সিংহাসনের প্রকৃত ও ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী। কিন্তু অতীতে পিতার মতো পুরুষোত্তম দেবও জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের সহায়তায় বড়োদাদা হমীরকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে উৎকলের রাজ সিংহাসনে প্রায় নিষ্কন্টক ভাবে আসীন হলেন। ফলে কপিলেন্দ্রর আমলে যে পাণ্ডারা ধনেজনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবার পুরুষোত্তমের আমলে সেই শক্তি আরও অধিকতর হওয়ার পথটি ত্বরান্বিত হলো। বলতে গেলে এই কপিলেন্দ্র দেব, পুরুষোত্তম দেবের সময় থেকে পুরোদস্তুর শুরু হয়েছিল পাণ্ডা নিয়ন্ত্রণাধীন রাজকার্য। কতোকটা সেই ফিরিঙ্গীদের নিয়ন্ত্রনাধীন জাফর আলী খাঁয়ের মতো অবস্থা। এ প্রসঙ্গে যৎসামান্য একটি উদাহরণ দিলে সমগ্র ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এসময় জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে ৩৬ প্রকার সঙ্ঘ তৈরি হয়। এর মধ্যে যেমন মন্দিরের পুরোহিতশ্রেণী ছিল, সেবকশ্রেণী ছিল, তেমনই গোচ্ছিকা-রক্ষীও ছিল। আর এদের সংখ্যা ছিল অভাবনীয় রকম স্ফীত, প্রায় ১২ শো থেকে ১৮ শো'এর মতো। সুতরাং এতোগুলি ধর্মীয় ধ্বজাধারী মানুষের বিপক্ষে যাওয়া উৎকলের পরবর্তী রাজার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আর এই কপিলেন্দ্র দেব, পুরুষোত্তম দেবের পরবর্তী রাজা হলেন আমাদের অন্যতম আলোচ্য উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র দেব।

গজপতি প্রতাপরুদ্র ছিলেন উৎকলরাজ পুরুষোত্তম দেবের পুত্র। মাতার নাম মহিষী পদ্মাবতী দেবী। পুরুষোত্তম দেবের একমাত্র পুত্র প্রতাপরুদ্র প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পিতৃ-সিংহাসনের উত্তরাধিকার পান ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ চৈতন্যের ওড়িশা আসার প্রায় ১৩ বছর আগে। চৈতন্য উৎকল তথা শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন ১৫১০ খ্রীঃ-এর ফাল্গুন মাসে।

প্রতাপরুদ্র ছিলেন অধিকতর স্বাধীনচেতা রাজা। প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তম দেবও শৌর্য-বীর্যশালী রাজা ছিলেন। যদিচও বহমনী ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তিনি নিজের রাজ্যের দক্ষিণাংশ হরিয়েছিলেন (মৃত্যুর আগে অবিশ্যি এই দখলিকৃত রাজ্যাংশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন)। কিন্তু ধর্মজনিত করণে হোক বা কৃতজ্ঞতা বশতঃই হোক জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের কোন রকম বিরুদ্ধাচারণের মুখোমুখি হননি তিনি। সম্ভবত পরবর্তী ও আমাদের আলোচ্য উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র অতোখানি নির্লিপ্ত ছিলেন না পাণ্ডাদের কাজকর্মের ব্যাপারে। এ ব্যাপারে পাণ্ডাদের সঙ্গে তাঁর একটা ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছিল প্রায় প্রথম থেকেই। চৈতন্য আসার পর তা আরও স্বচ্ছ ও প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু তা, এই বিষয়টি এতোই জটপাকানো যে এর এলোমেলো সুতো খুব সুস্থিরে ও সাবধানে আমাদের খুলতে হবে। কেননা, এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে যথাক্রমে 'গজপতি' বংশের পতন ও 'ভোই' বংশের উত্থান। সেই সঙ্গে চৈতন্য ও গদাধর স্বরূপ-দামোদর প্রমুখ মহাজনদের আকস্মিক মৃত্যুও।



চৈতন্যের ওড়িশা আগমনের বছর খানিক আগেও বিজয় নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রকে রীতিমতো লড়াই চালাতে হয়েছিল। কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী রাজা ছিলেন। যদিচও যুদ্ধের প্রথম দিকে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে (১৫১৩ খ্রীঃ) উদয়গিরির যুদ্ধে তিনি কৃষ্ণদেবের কাছে পরাজিত হন (১৫১৪ খ্রীঃএর ৯ই জুন)।

সুতরাং একথা অত্যন্ত সহজে ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা চলে, চৈতন্য যখন উৎকলদেশে পদার্পন করলেন তখন সে দেশের রাজা ও রাজ পরিমণ্ডিত আবহাওয়া কোনটাই সুস্থির ছিল না। একদিকে পাণ্ডাদের ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে বুকের ওপর বসে দাড়ি ছেঁড়ার মতো অমাত্য রাজকর্মচারী তথা স্বয়ং গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্রান্ত। অর্থাৎ একদিকে যেমন শক্তিশালী রাজকর্মচারী-দের রাজদ্রোহীতায় রাজা বিপন্ন, অনদিকে তেমনই রাজাকে সংশয়াম্বিত করেছিল অন্যতম দুই শক্তিধর রাজার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী ভূমিকা। একদিকে দক্ষিণের কৃষ্ণদেব রায় অন্যদিকে গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ।

আবার এমন কথাও আমরা বলতে পারি, রাজা প্রতাপরুদ্র সৈন্যসামন্ত হাতি-ঘোড়া বেষ্টিত একজন শক্তিমত্ত পরাক্রমশালী নরপতি হলেও, মানসিকতার দিক থেকে খুব আত্মশক্তি সম্পন্ন ছিলেন বলে বিশ্বস্ত হবার খুব কারণ নেই। যদিচও আমাদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও অন্যতম চৈতন্য বিশেষজ্ঞ ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় মশাই '(catalogue of Sanskrit Mss, at the India office library in London ; Ed. by Dr. Eggelling, P. 419) গ্রন্থখানি থেকে ওড্রারাজ প্রতাপরুদ্রের একটি সুদীর্ঘতম শিরোপা আবিষ্কার করেছেন (ডঃ মুখোপাধ্যায়ের 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অন্যত্র ঐতিহাসিক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'The History of Modieval Vaishnavism in Orissa' গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে (Chap-xi) লিখেছেন, It is difficuit to link this Sickening tale of moral tarpitude with the Chaitanya Movement,.. .Thus Vaishnavism or no Vaishnavism—the succession of weaklings, the moral degeneration of high officials of the State and the decline in the military strength of the nation would have brought about the downfall. (Page-177-78).

আবার একথাও বেশ স্পষ্ট হয়, রাজা প্রতাপরুদ্র সৈন্যবল এবং মানসিকতায় যদিচ শক্তিশালী হয়েও থাকেন, তবু, ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক দুর্নৈতিকতা তাঁর মানসিকতার শক্ত জমিতে কীর্তিনাশা পদ্মার মতো ক্রমান্বয়ে আঘাত হেনেছিল।

এমত এক রাজনৈতিক তমসঘনয়মান আবহাওয়ায় চৈতন্যের নীলাচলে পদার্পন ঘটলো।

অনেক সন্ন্যাসী, আউল-বাউল, দরবেশ, পর্যটক, ধর্মযাজক দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে অনায়াসে বেরিয়ে পড়েছে নতুন মানুষ, নতুন দেশের সন্ধানে। চীন-ভারত-রোম-চম্পা-সুমাত্রা বলিদ্বীপ কোন কিছুই তাঁদের কাছে প্রতিবন্ধক ছিল না। মাহুয়ান, ইবন-বতুতা, অথবা ইতালীর মার্কোপোলো বা ইউরোপীয় বারবোসা, টেরি, বার্নিয়ে অথবা পারসিক আব্দুররজাক কিংবা পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ ও নুয়েজের যুগ থেকে আমরা এ কথা শুনে আসছি। তেমনই এদেশেও সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতল ভূমির মানুষ অনায়াসে চলে গিয়েছে সুদূর দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে। দাক্ষিণাত্যের মানুষ গিয়েছে আর্যাবর্তের কুরু, পাঞ্চাল অথবা পর্বতময় গান্ধার দেশে।



সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাধু-সন্ত, পর্যটকদের এ আনাগোনা কোন নতুন ঘটনা নয়। চৈতন্য নামে কে এক মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া-ভেকধারী এলো কি গেল এ নিয়ে কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রের মাথা ঘামানোর কোন কারণ ছিল না। এমন কি বাসুদেব সার্বভৌম ওরফে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো প্রতিভার

সুপারিশ থাকলেও এক যুদ্ধব্যস্ত রাজা এক অহিংস-নিরস্ত্র-কৃষ্ণভজা সন্ন্যাসীর প্রতি বর্ষার মেঘের মতো অতো চটজলদি ঝুঁকে পড়বেন বলে আমাদের প্রত্যয় হয় না। তাহলে কলিঙ্গরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র হঠাৎ এক ছোকরা সন্ন্যাসীর প্রতি অমন আনুগত্য দেখালেন কেন ? যখন তাঁর মাথার ওপর অন্যতম রাজগুরু কাশীমিশ্র রয়েছেন। পুরাধিষ্ঠাত্রী জগন্নাথ-বলদেব রয়েছেন। ঠিক এই জায়গাটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে খুব গভীরভাবে। কেননা, এর মধ্যেই রয়েছে, এক রাজদ্রোহী, পলাতক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক আপাত বিপন্ন রাজার ঘনিষ্ঠতাজনিত রহস্যের অঙ্কুরোদ্গম।

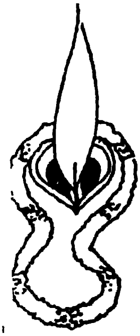
এ'বিষয়ক দুটি কারণ আমাদের ভাবিত করে। এক, চৈতন্যের কাজী তথা হুসেন শাহীর বিরোধিতার কথা হয় প্রতাপরুদ্র পূর্বাহ্নেই জানতেন, অথবা চৈতন্য আগমনের পর বিশেষ কারু মুখে শুনে থাকবেন। সে ক্ষেত্রে হুসেন শাহীর শত্রু অর্থাৎ শত্রুর শত্রু একজন মিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। এবং দ্বিতীয় কারণ হলো, 'চৈতন্য চকড়া'র পরাক্রমশালী অনন্ত গোচ্ছিক.কে সামান্য একটা হাত-ঝাপটা দিয়ে 'অনসর পিণ্ডি'তে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি। এ ঘটনা শুধু দেশের জনগণকেই নয়, ওড্রদেশের রাজাকে বিস্মিত করেছিল। তারপরই আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, এখনকার টাইসনের মতো বীর সেই লৌহমানব অনন্ত অনায়াসে চলে এলো চৈতনেয্যর পংক্তিতে। এটা দেশের রাজা ও জনগণকে আরও বিস্মিত করেছিল।

তারপর এলো লাবণ্যের উপাখ্যান। কে লাবণ্য ? না তদানীন্তন জগন্নাথ মন্দিরের এক অসামান্য সুন্দরী নর্তকী।* আভিধানিক ভাষায় যাকে বলা হয়, দেবদাসী। এই পীনপয়োধরা সুন্দরী দেবদাসীর সাথে চৈতন্যের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলো অবশেষে। ক্রমে এক বীর ও এক অনন্যা সুন্দরী চৈতন্যের করতলগত হলো।

প্রতিহারী অনন্ত গোচ্ছিকার কথা ইতোপূর্বে বলেছি, অতঃপর নর্তকী লাবণ্যের কথা কিছু ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

সেদিন বৈশাখ মাসের শুক্ল পঞ্চমীর দিন। তার ওপর অক্ষয় তৃতীয়া তিথি। স্বভাবতই প্রচুর জন সমাগম হয়েছিল জগন্নাথের মন্দিরে। এর মধ্যে ভক্ত আছেন, দর্শকও আছেন। এ প্রসঙ্গে 'চৈতন্য চকড়া' লিখেছে, 'স্তম্ভর সমীপে ভীড় ন যায় নিঃশ্বাস।' এমনই ভীড় যে জগন্নাথের মণিকোঠা থেকে গরুড় স্তম্ভ পর্যন্ত ছয়লাপ ভীড়ে মানুষের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো।

ক্রমে আরতির সময় এগিয়ে এলো। প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে সহস্রাধিক মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। মুহুর্মুহঃ উঠছে হরিধ্বনি। সে শব্দ মন্দিরের নিরেট খচিত প্রস্তর দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে দর্শকদের মাঝে। এমন সময় আলোক বর্তিকার মতো রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলেন পীনপয়োধরা নর্তকী, লাবণ্য। নামের সঙ্গে বড়ো সাযুজ্য তার। শরীরী সৌন্দর্যের সঙ্গে কণ্ঠটিও



*দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে যেমন দেবদাসী প্রথার রেওয়াজ ছিল বা এখনো আছে, তেমনই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরেও সুন্দরী দেবদাসীদের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। এখানে তিন প্রকার দেবদাসী ছিল বলে জানা যায়। যথা, গায়িকা, নর্তকী আর বাহির গায়নী। লাবণ্য ছিলেন বোধহয় বাহির গায়নী অর্থাৎ জগন্নাথের 'বড় শৃঙ্গার' এর সময় ব্যতিতও তিনি গান গাইতেন। বড় শৃঙ্গার হতো রাত্রে। এসময় দেবদাসীদের শরীরের উর্দ্ধদেশ অর্থাৎ বক্ষযুগল উন্মুক্ত থাকতো। লাবণ্য ছিলেন এই দেবদাসী সম্প্রদায়ের প্রধানা দেবদাসী।

বড়ো সুধাময় । অতঃপর লাবণ্যের সুর মূর্ছনায় ঝংকারিত হলো গীতগোবিন্দের একটি মধুময় স্তোত্র ।

নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণ মনু বিন্দতি খেদমধিরম্ ।
ব্যাল নিলয়- মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরম্ ।
সা বিরহে তব দীনা---

অর্থাৎ, হে মাধব ! তোমারি বিরহে বিরহিনী শ্রীমতি, দীনা শ্রীমতি আজ পঞ্চশরজনিত বানের আঘাতের ভয়ে তোমার ধ্যানের আশ্রয় নিয়েছে । কেননা, শীতলতর যে চন্দন, আর স্নিগ্ধময় চাঁদের কিরণও আজ হয়ে উঠেছে আগুনের মতো জ্বালাময় । এই যে মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস, তা ও আজ আমার কাছে বিষময় যন্ত্রণা ।

[গীতগোবিন্দ/জয়দেব/চতুর্থ সর্গ]

গীত শেষোক্ত প্রায় । এমতো সময় সংবিৎ এলো রূপাভিমানী দেবদাসীর। সবিস্ময়ে দেখলেন, এই জনসমুদ্র, আর পায়েয় নীচে এক গৈরিক বসনধারী ভূ-লুণ্ঠিত । সর্বাঙ্গে চন্দন চর্চিত । আর গলায় তুলসীর মালা । শুধালেন, কে গো তুমি ! তারপরই কেঁদে উঠলেন উচ্চৈঃস্বরে ।

'প্রভু পাদে পড়ি সেই আকুলে কান্দিল ॥
ন্যাসী পায়ে পড়ি দাসী আকুল বচনে ।
মহাপাপী ক্ষমত্তু আকুলিত মনে ॥
ত্রাণ কর ক্ষম দোষ পতিতে উদ্ধার ।
অজ্ঞান দাসীরে অপরাধ ত্রাহি কর ॥'

[চৈতন্য চকড়া/পৃঃ ৯]

বস্তুত ভীড়ের মাঝে, অবজ্ঞাতে, দেবদাসী লাবণ্য ভুলুণ্ঠিত চৈতন্যের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে গেছলেন । তারপর যখন সংবিৎ এলো, আর দেখলেন, এক গৈরিক বসনধারী দেবসাদৃশ্য মানুষের পিঠের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তখন, শঙ্কা আর ধর্মভয়ে কেঁদে উঠলেন উচ্চৈঃস্বরে । বললেন, তুমি যেই হও, আমি অজ্ঞানে দেখিনি তোমাকে, তুমি এ অযাচিত দোষ আমার ক্ষমা করো ।

চৈতন্য বিহ্বল চোখে তাকালেন দেবদাসীর পানে । দু'চোখে জল । বললেন, তাই তো ! কে কাকে ক্ষমা করে । আহ, আমি বড়ো ভাগ্যবান আজ, যে সতত জগন্নাথের ভজনা করে তার চরণরেণুর স্পর্শ পেলাম । আমি ভক্ত, তুমি তারও চেয়ে বড়ো ভক্ত তাঁর । কেননা, এই যে অহংবোধ, আমি জানতাম এতোকাল ধরে নারীর অঙ্গ স্পর্শ সন্ন্যাসীর মহা অপরাধ, এই স্পর্শজনিত আনন্দে সে অজ্ঞতা তুমিই আমার চূর্ণ করে দিলে ।

এবং এভাবে অনন্ত গোচ্ছিকার মতো ক্রমে দেবদাসী লাবণ্যও চৈতন্যের অনুগামিনী হলেন । তিনি দীক্ষা নেননি চৈতন্যের কাছে ঠিকই, কিন্তু গলায় তুলসীর মালা ধারণ করেছিলেন । কপালে ত্রিপুণ্ড্র । দিনমান একটি বার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীকে না দেখলে তার স্বোয়াস্তি থাকতো না ।



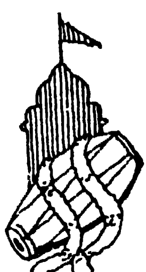
এই যে প্রতিহারী অনন্ত গোচ্ছিকা, আর দেবদাসী লাবণ্যের চৈতন্য আনুগত্য, এ ঘটনা চৈতন্যের প্রথম নীলাচল পদার্পনের দিনগুলিতেই ঘটেছিল বলে মনে হয় । যদিচও চৈতন্য চকড়ায় দুটি ঘটনার ব্যবধান বেশ কয়েক মাসের । প্রথমে ঘটেছিল অনন্ত প্রতিহারীর ঘটনা । তারপর লাবণ্য দেব-দাসীর । অনন্ত প্রতিহারী জনিত ঘটনাটি ঘটেছিল, রবিবার কার্ত্তিক দশমীর দিন । আর নর্তকী লাবণ্যের সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল বৈশাখ মাসে,

শুক্লা পঞ্চমীর দিন। তার মানে দুটি ঘটনার ব্যবধান অন্তত পাঁচ মাসেরও অধিক সময়ের। কিন্তু চৈতন্য যখন প্রথমবার পুরীতে আসেন তখন অনূন্য মাস খানিকের বেশি ছিলেন বলে মনে হয় না। কোন কোন চৈতন্য চরিতকার এই সময়কাল সাকুল্যে ১৮ দিনে বেঁধে দিয়েছেন (কবি কর্ণপুরের মহাকাব্য ১২/৯৪ অংশ দ্রষ্টব্য)। তারপর সুদীর্ঘ দু'বছরের জন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সুতরাং চকড়ায় যে পাঁচমাসের মতো ব্যবধানে অলক্ষ্য প্রতিহারী ও লাবণ্য দেবদাসীর ঘটনা দুটি বর্ণিত হয়েছে তা ওই মাস খানিক কাল সময়ের মধ্যে ঘটিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

এরপর দেখা গেল চৈতন্যের করতলগত হয়েছেন ওড্রদেশের আরেকজন মানুষ। তিনি বাসুদেব সার্বভৌম। অধিকাংশ চরিতকাররা এঁকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য নামেই অভিহিত করেছেন। একমাত্র 'বাসুদেব' নামটি পাচ্ছি লোচনের গ্রন্থ থেকে। মহা পণ্ডিত মানুষ। ওড়িশায় বসবাস করলেও ইনি বাঙালি ছিলেন। এঁর পূর্ব নিবাস ছিল নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরল্যা (বর্তমান নাম পার্রুলিয়া) গ্রামে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জানা যায়, তিনি মুসলমানের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে বাঙলাদেশ ছেড়ে উৎকলদেশের পুরীতে পালিয়ে এসেছিলেন। এবং পুরীতে এসে নিজের পাণ্ডিত্যের জোরে ওড়িশার রাজার সভাপণ্ডিতের পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সার্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বর ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে বাহিনীপতি উপাধি (Military title) পেয়েছিলেন বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশায়ের 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' নামক পুস্তকের ৩৫৪ পৃষ্ঠা থেকে জানা যাচ্ছে।

সুতরাং সার্বভৌম শুধুমাত্র পণ্ডিত ছিলেন না, তৎকালীন ওড়িশাদেশে তিনি একজন রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন বলেও বলা যেতে পারে। এরকম একজন যুগপৎ পণ্ডিত ও রাজনীতিব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের সাথে দহরম-মহরম করা খুব চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু চৈতন্য তা পেরেছিলেন। হয়তো নিজে একজন বাঙালি বলে সন্ন্যাসী বাঙালি যুবকটির প্রতি তাঁর কিছুটা দুর্বলতা থাকতে পারে। এবং সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সার্বভৌমের সেই দুর্বলতম জায়গাটির কতোখানি অধিকার ভুক্ত করে নিয়েছিলেন চৈতন্য তা আমরা নিম্নোক্ত আখ্যানটি পাঠ করলেই জানতে পারবো।

কি প্রাক্ সন্ন্যাসে, কি সন্ন্যাস উত্তর জীবনে চৈতন্য যে প্রচুর আহার করতে পারতেন তা অল্প বিস্তর সকল চরিতকারেরাই বলে গেছেন। বিশেষত কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত থেকে আমরা এ বিষয়টি অধিকতর জানতে পারি। যদিও বৃদ্ধ কবিরাজ কোন কোন স্থলে তা অতি-রঞ্জিতও করেছেন বলে মনে হয়। যেমন তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'নীলাচলে ভোজন তুমি কর বাহান্নবার।/এক এক ভোগ অন্ন খাও শত শত ভার।' এটা বাস্তবিক রাক্ষুসে কথা। মহাভারতের বক রাক্ষসের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হতে পারে। দিনে বাহান্নবার টুকিটাকি খেলেও খেতে পারেন। কিন্তু এক এক বারে শত শত ভার খাওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না। এটা কবিরাজ গল্পের গরু গাছে তোলার মতো খুব বাড়িয়ে বলেছেন। তবে চৈতন্য ভাগবতে, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যেরকম চৈতন্যের মুহুর্মুহুঃ, ভোজনের বর্ণনা আছে তাতে করে এটা বেশ প্রমাণ হয় যে, চৈতন্য একজন বেজায় ভোজন রসিক মানুষ ছিলেন।



একদিন সার্বভৌমের বাড়িতে চৈতন্যের নেমন্তন্ন। বিরাট খাবার দাবারের আয়োজন করেছেন সার্বভৌম। শাকই করেছেন দশ প্রকার। তার ওপর আছে

নিমের সুক্তা, মরিচের ঝাল, মোচাঘন্টা, মোচাভাজা, ফুলবড়ি, পটলভাজা, মাষ ও মুদগ কলায়ের ডাল, মুদকবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, মানচাকী ভাজা, বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডের ব্যঞ্জন, পাঁচ প্রকার টক, পিঠা, ক্ষীরপুলী, নারকেলপুলী, আম, চাপাকলা, ঘন দুধ, মথিত দধি, রসাল সন্দেশ, ঘৃতসিক্ত পরমান্ন (বোধহয় পোলাও), দুধ চিড়া ইত্যাদি ইত্যাদি, একেবারে এলাহি ব্যাপার। তা বত্রিশখানা কলার পাতে এইসব থরে থরে সাজানো আছে। মধ্যিখানে ভোজনে বসেছেন চৈতন্য।

ঠিক এমন সময় হাজির হলেন সার্বভৌমের জামাই অমোঘ পণ্ডিত। চৈতন্যের আহারের বহর দেখে তিনি তো একেবারে 'হাঁ'। তা শ্বশুরের সামনেই অতিথিকে বলে বসলেন :

'এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ-বারজন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥

[চৈ. চরিতমৃত/মধ্য/পঞ্চদশ অধ্যায়]

একেবারে পাকা গণতন্ত্রীদের মতো কথা। শুনেই সার্বভৌম জামায়ের ওপর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। দেখেই অমোঘের ভোঁ দৌড়। সার্বভৌম লাঠি হাতে তেড়ে গেলেন জামাইকে পেটাই দেবার জন্য। পেলেন না। অগত্যা গালিগালাজ। শুনে চৈতন্য হাসতে লাগলেন। এমন সময় হাজির হলেন সার্বভৌমের পত্নী। তিনি সব শুনে স্বামীর চেয়েও জামাইয়ের ওপর তেরিয়া হয়ে উঠলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে বলেই বসলেন :

'শুনি ষাঠীর মাতা বুকে শিরে হাত মারে।
ষাঠী আজি রাঁড়ি হোক বলে বারে বারে॥'

এই ষাঠী হলো সার্বভৌমের একমাত্র কন্যা। তো মা হয়ে মেয়েকে রাঁড়ি অর্থাৎ বিধবা হবার অভিশাপ দেওয়া খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার। জামাই শত দুর্বিনীত হলেও। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এরও চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটি আমাদের শুনিয়েছেন চৈতন্য চরিতের উপাদান গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশাই। তিনি তাঁর গ্রন্থের ৫৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ শ্রীচৈতন্যের আহারের পরিমাণ দেখিয়া বক্রোক্তি করিলে সার্বভৌম পত্নী বলিয়াছিলেন যে ষাটি বিধবা হউক (চৈ. চ. মধ্য, ১৫)। এক বাউল আমাকে বলেন যে এই গালির মধ্যে গূঢ় তত্ত্ব আছে। অমোঘ নাকি শ্রীচৈতন্যের সহিত ষাটির সম্বন্ধ দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া সার্বভৌম পত্নী ঐরূপ গালি দিয়া শ্রীচৈতন্যের পরকীয়া সাধনের পথ নিষ্কন্টক করিতে চাহিয়াছিলেন।' পরক্ষণেই বাউলের এ হেন উক্তিটিকে ডঃ মজুমদার 'সমাজ ধ্বংসকর' বলে খারিজ করে দিলেও চৈতন্য যে সার্বভৌম পরিবারের খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না।

অনন্ত গোচ্ছিকা, লাবণ্য দেবদাসী ও সার্বভৌম পণ্ডিত—এই তিনজন উৎকলবাসী মানুষকে করতলগত করার সীমায়িত গণ্ডির মধ্যেই চৈতন্য বিষয়ে দেশের রাজার উৎসাহ—উদগ্রীবতা লুকানো আছে। আর তেমনই এ-ও সত্য, এই তিনজন মানুষের চৈতন্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মধ্য থেকেই চৈতন্য বিদ্বেষের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল নীলাচলে। প্রথমত, মাসলম্যান অনন্ত গোচ্ছিকাকে পরাজিত ও পরাভূত করায় বেশ কিছু উৎকলবাসীর, সেই সঙ্গে দেশের রাজার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল চৈতন্যের দিকে। উৎকলের সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বরের বেদীতে বসার এটা ছিল চৈতন্যের প্রথম সোপান।



আর দেশের রাজার কাছে এমনই এক মানুষের খুব প্রয়োজন ছিল এতোদিন। একদিকে দুর্ধর্ষ কৃষ্ণদেব রায় অন্যদিকে হুসেন শা। তারই মাঝে সন্তর্পণে ঘুণপোকা কাটার মতো সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্রান্ত। এই ত্রয়ী শত্রুর কাছে পর্যুদস্ত রাজা অতঃপর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভেবে তরুণ সন্ন্যাসীটিকে 'গড ফাদার' ঠাওরে নিলেন। এতোকাল জগন্নাথ ও জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা-পুরোহিতদের যে জনপ্রিয়তা ছিল চৈতন্য যেন এক লহমায় তার সবটুকু কেড়ে নিলেন। রাতারাতি উৎকলবাসীদের চোখে তিনি হয়ে উঠলেন সচল জগন্নাথ। মুড়ি মুড়কির মতো ভক্ত আসতে লাগলো তাঁর কাছে। এরপর ঘটলো, জগন্নাথ মন্দির থেকে একনিষ্ঠ দেবদাসী লাবণ্যকে দলে টেনে নেওয়ার ঘটনা। সুন্দরী লাবণ্য। মন্দিরের প্রধান প্রহরী অনন্ত ও প্রধান দেবদাসী লাবণ্যকে দ'লে টেনে নেওয়ায় জগন্নাথের পুরোহিত ও পাণ্ডারা স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো চৈতন্যের ওপর। তারা অনুভব করলো চৈতন্যের জন্য তাদের আবহমান কালের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আর পাণ্ডা পুরোহিতদের ঈর্ষার আগুনে ক্রমান্বয়ে ঘি ঢালতে লাগলো সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর। চৈতন্যের প্রতি রাজার আনুগত্য বিদ্যাধরের পছন্দ ছিল না। দুর্বল রাজার পাশে চৈতন্যের মতো একজন শক্তিশালী বুদ্ধিমান মানুষ সহায় হোক এটা চাইছিল না গোবিন্দ বিদ্যাধর। তেমনই চৈতন্য-বিরোধিতা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলেন আরেকজন মানুষ–তার নাম জগন্নাথ। ইনি মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথ নন। ওড়িশার পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথ দাস। তাঁকে বলা হতো 'অতিবড়ী' জগন্নাথ। এই 'অতিবড়ী' আখ্যাটি চৈতন্যই তাঁকে দিয়েছিলেন বলে শোনা যায় (দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' দ্রঃ)। এই পঞ্চসখার নাম ছিল যথাক্রমে জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাস। 'পঞ্চসখা'কে শুধু মাত্র পাঁচজন সখা (পঞ্চ পাণ্ডবের পাঁচ ভায়ের মতো) ধরে নেবার কোন কারণ নেই। পঞ্চসখা পাঁচজন কবি দ্বারা সৃষ্ট একটি সম্প্রদায়ের* নাম চিহ্নিত করে। এই পঞ্চসখা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় তার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই 'পঞ্চসখা' বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা চৈতন্য মতকে কখনও পুরোপুরি গ্রহণ করেন নাই (পৃঃ ৪৮০)। বিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু মশাইও তাঁর 'Modern Budhism in Orissa' বইতে সেই একই কথা লিখেছেন (পৃঃ ৩৯-৪০)। কিন্তু উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার প্রভাত মুখোপাধ্যায় তার 'The History of Medieval Vaishnavism in Orisa' গ্রন্থে আলোচ্য পঞ্চসখাকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'Achyutananda and his associates were pious and sincere Vaishnavas. They Exalted the Worship of the Void no doubt, but they took it to be a future of Vaishnavism.' (Page 112-13).



পঞ্চসখা প্রসঙ্গে এরকম নানা মুনির নানা মত রয়েছে। তবে পঞ্চসখা বা পঞ্চসখা সম্প্রদায় যে বৌদ্ধবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যের

*'প্রায় সমসাময়িক কালে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে উড়িষ্যায়ও 'পঞ্চসখা' সম্প্রদায় বলিয়া একটি ভক্ত বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস চৈতন্য দাস, প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন। ('শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ'/ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত/পৃ-২৮৫)।

প্রভাবে কিছুটা বৈষ্ণব ধর্মে প্রত্যয়ী হয়েছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

তো আমাদের আলোচ্য পঞ্চসখার জগন্নাথ দাস ছিলেন এমনই এক বিশিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। বস্তুত, জগন্নাথ দাস যে তৎকালীন পুরী মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যমণি ছিলেন তাই নয়, একাধিকক্রমে তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধানা মহিষী পট্টমহাদেবী শ্রী গৌরীর (শ্রীপদ্মা) গুরুও ছিলেন। এবং একথা সত্য যে, এমন একটা সময় ছিল যখন জগন্নাথ দাসের প্রভাব, ঐশীশক্তি চৈতন্যের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না ওড়িশায়। বিশেষত ওড়িশী রমণীদের কাছে। এই বিরাট প্রভাবশালী জগন্নাথ দাসকে অবশেষে রাজার কারাগারে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সে সব অনেক পরের ঘটনা। পাঁচকড়ি দে'র রহস্য লহরী সিরিজের মতো সে সব রোমাঞ্চকর ও বৈসাদৃশ্য পর্বের অনিবার্য মুখোমুখির আগে, পূর্বোক্ত আলোচ্যে আমরা এটুকু আভাস পেলাম যে, চৈতন্য ওড়িশায় প্রবেশ করে প্রথমে একটি শঙ্কটের আবর্ত তৈরি করলেন। এটি তাঁর স্বনির্বাচিত, স্বপ্রত্যাশিত বলা যায় না। আসলে সহজভাবে পথ চলতি পথিককে যেমন সরাইখানা বা জলসত্রের মুখীন হতে হয়, তেমনই। কোন কাঁটাও তার পায়ে বিঁধে কখনো, অলক্ষ্যে রক্তাক্ত করে। তদ্রূপ ভাবে, চৈতন্য যেমন মানসিকতার জন্য লাবণ্যকে পেয়েছিলেন, অনন্ত প্রতিহারীকে পেয়েছিলেন, বাসুদেব সার্বভৌমকে পেয়েছিলেন, তেমনই, সেই একই মানসিকতার জন্য জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। একই জঙ্গলে দুই সিংহের উপস্থিতির মতো 'ডিবেট' শুরু হয়ে গেছলো জগন্নাথ দাসের সঙ্গে। আর দেশের রাজা তখন দেশের সেনাপতির প্রধান শত্রু। সেই শত্রুর সাথে মিত্রতার গাঁটছড়া বাঁধায়, অতঃপর সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরেরও চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী চৈতন্য।

[বাইশ]
চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

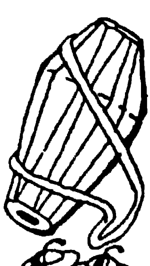
এ অধ্যায়ের শুরুতে স্বভাবতই আমাদের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দেবে, তা হলো, চৈতন্য যখন নদীয়া-নবদ্বীপ ছেড়ে প্রায় স্থায়ী ভাবে নীলাচলে বসবাসের মনস্থ করলেন, তখন, সেই নীলাচলে আসার মাস খানিক যেতে না যেতে হঠাৎ প্রায় (বিনা নোটিশে) সুদূর দাক্ষিণাত্য সফরে বেরিয়ে পড়লেন কেন? নীলাচলে থিতু হয়ে বসতে না বসতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের এতো চটজলদি সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন কেন? যখন দেশের রাজা, দেশের রাজপণ্ডিত, খ্যাতিবান নর্তকী ও শক্তিবান অনন্ত গোছিকার মতো মানুষ তার অনুরক্ত। তখন কোন আশঙ্কায় তিনি পুরী ছাড়লেন? পাণ্ডাদের বিরোধিতায়? কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর, জগন্নাথ দাস বা জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের বিরোধিতা তখনো প্রত্যক্ষ রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে হয় না। বিশেষত দেশের রাজা যখন চৈতন্যের সহায়। তাছাড়া পাণ্ডাদের কোন বিরোধিতার আশঙ্কায় তিনি যদি উৎকল ত্যাগ করেন তাহলে বছর দুই পর আবারো সেই পাণ্ডা অধ্যুষিত পুরী শহরে তিনি ফিরে এলেন কেন?



এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে আমরা আরেকবার সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর 'প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত' উপন্যাসটির শরণাপন্ন হবো। কেননা, সমরেশবাবু তার উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন, 'চৈতন্যের মনে কি আরেকটি অভিপ্রায় ছিল ? নিজের ধর্ম প্রচার ছাড়াও দাদা বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করাও কি তার একটি উদ্দেশ্য ছিল ?'

হ্যাঁ, সমরেশবাবু আপনি ঠিকই প্রশ্ন তুলেছেন। চৈতন্য সন্ন্যাসী হয়েছিলেন সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করে। কিন্তু সংসার তাকে কোনদিন ত্যাগ করেনি। বিশেষত মাতৃজনিন পিছুটান। তাছাড়া শিষ্য, আপ্তবর্গ, পার্ষদ-পরিকর এ নিয়েও গড়ে উঠেছিল তাঁর এক নতুন সংসার। সন্ন্যাসী হলেও তিনি জনারণ্য থেকে দূরে যাননি। হিমালয়ের নির্জনতর সানুদেশ তাঁর বাঞ্ছিত ছিল না। সমাজ-সংসারে, মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার গণ্ডির মধ্যে থেকে তিনি স্থিতি চেয়েছিলেন। সিদ্ধি চেয়েছিলেন। কোন দীন পর্ণকুটীরে নয়, ইঁট কাঠের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তাঁর আবাস ছিল। যদিচও তিনি একাধিকবার বলেছেন, নারী দর্শন বিষ ভক্ষণ তুল্য। এবং বলেছেন, 'সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দর্শনে'। বলেছেন, রাজা-রাজরা জাতটা হলো 'কালসর্পাকার' (চৈ. ভাগবত ২।১১।৬, ২।১১।৮)। তবু কার্যত দেখা যাচ্ছে, প্রাক সন্ন্যাসে তো বটেই কিন্তু সন্ন্যাসোত্তর জীবনেও সন্ন্যাসী চৈতন্যের সাথে একাধিক নারীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এর মধ্যে যেমন ধর্মপ্রাণা ধর্মাত্মা নারী ছিল, তেমনই পাপীয়সী বারবনিতা, নর্তকী-দেবদাসীও ছিল। আর যাকে তিনি বলেছেন, 'কালসর্পাকার',–সেই রাজা, রাজপুরুষ, রাজগুরু, রাজ পারিষদ ও রাজমন্ত্রী সকলকার সঙ্গে ছিল তাঁর নিয়ত ওঠাবসা। এমন দিন ছিল যখন ওড্রুরাজ প্রতাপরুদ্রের সাথে তার দৈনন্দিন সাক্ষাৎ ঘটতো। রায় রামানন্দ, রূপ (সাকর মল্লিক), সনাতন (দবিরখাস) এঁরা সকলেই ছিলেন রাজ কর্মচারী। এমন কি পরোক্ষ ভাবে বাসুদেব সার্বভৌমও। কিন্তু এদের সাথে চৈতন্যের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

আসলে বৈষ্ণব মহাজনদের লিখিত চৈতন্য চরিত এক অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান। কিন্তু যুক্তিবাদের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তার সমস্থানিক নয়। আধ্যাত্মিক অনুভূতির নিবিড়তায় ভক্তের ভাবময় উৎকণ্ঠার প্রাবল্যই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং অবতারত্বের কুহেলিকায়, ও ঐশীবাদের তাত্ত্বিকতায় মানুষ বিশ্বম্ভর মিশ্রের আগে, শিশু-অবস্থায় 'নিমাত্রি' থাকাকালীন, স্বল্প-স্থায়িত্ব, সাংসারিক জীবনে ও উত্তর সন্ন্যাসকালে শুধুমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের' ছবিই আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্বম্ভরের দুঃখ-বেদনা, আশা-আশাহীনতা, সুখ-অতৃপ্তি সব কিছু সেখানে চৈতন্যময়। এ প্রসঙ্গে আমাদের অগ্রজ ঐতিহাসিক ভূদেব চৌধুরী মশায়ের কিছু কথা খুব মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছেন, 'সাধারণ দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম-প্রবর্তক-মহাপুরুষ, অবতার কিংবা রাধাকৃষ্ণের লীলারসঘন পরিপূর্ণ দেবমূর্তি, বৈষ্ণব সাধকের ভাষায় তিনি, "রাধা ভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ"। ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের এ পরিচয় যতই মহিমাময় বলে মনে হোক না-কেন, সাহিত্য ইতিহাসের পক্ষে তা সর্বপ্রধান বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/প্রথম পর্যায়/ভূদেব চৌধুরী/পৃঃ ৯৫)। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ফুল্লরা, মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর বেহুলা, ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী লাউসেনের মতো চৈতন্য চরিতে এক নরচন্দ্রমার বিজয়গাথা শুধু গাওয়া হয়েছে। ফেরারী ভায়ের (বিশ্বরূপ) জন্য, এবং স্বনির্বাচিত বধূ লক্ষ্মীর



অকাল মৃত্যুজনিত এক মানুষের যে উৎকণ্ঠা, যে দুঃসহ হারানোর ব্যাকুলতা চৈতন্য চরিতে তার এক প্রচ্ছন্ন সঙ্কেত পাই মাত্র। বোধকরি সে যুগের আবহাওয়ায় নরচন্দ্রমার নিছক মানুষী প্রকৃতি ভক্ত লেখকদের বাঞ্ছিত ছিল না।

অতঃপর আবার সমরেশবাবুর সেই অমোঘ প্রশ্নটিতে আমরা ফিরে আসি। তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'চৈতন্যের মনে কি আরেকটি অভিপ্রায় ছিল ? নিজের ধর্মপ্রচার ছাড়াও বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করাও কি তার একটি উদ্দেশ্য ছিল ?' অতি অবশ্যই ছিল। অতি অবশ্য বলছি এ জন্য যে, বিশ্বরূপ চৈতন্যের বড়োদাদা, বিয়ের নাম শুনে যখন ঘর থেকে ফেরার হন, সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে যান, চৈতন্য তখন নেহাৎই বালক। যে বয়সে স্মৃতি মানুষকে আঁচড় কাটে না এমন দুগ্ধপোষ্য তখন ছিলেন না তিনি। যদিচ পরবর্তী পূর্ণ জ্ঞানাবধি কালে সে বাল্য স্মৃতির বিভ্রমও ঘটে, সন্তান হারানো মায়ের উৎকণ্ঠা যে স্মৃতির পূর্ণাবয়ব রচনা করবে। কিন্তু দুঃখ এই, যে হারানো ভায়ের জন্য ভায়ের যে অনুসন্ধিৎসা, স্পৃহা তা আমরা চৈতন্য চরিতে কখনো পাইনি। কেন ? বোধকরি, মানুষের সহজাত প্রবণতা অবতারের মানসিকতায় প্রতিফলন ঘটিয়ে গাম্ভীর্যময় ঐশী শক্তির ক্রম বিস্তৃত ও গতিশীল পথটি কিছুমাত্র আটপৌরে মানবমুখীন রাস্তায় একত্রিত করার পক্ষপাতি ছিলেন না চরিতকারগণ। চৈতন্যচরিতের কি জন্মলগ্নে কি শৈশবে, কৈশোরে, অথবা দুঃখের আধিপত্যে বা মৃত্যুর অনুভূমিক পটভূমিকায় নায়ক বিশ্বম্ভরের মানবলীলা এক দৈবিক মায়ালোকে প্রচ্ছন্ন, যা আমরা ভাববাদে প্রত্যয় করি, কিন্তু যুক্তিবাদে সতত অনুভূত হয় না।

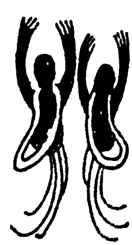
তো এই যে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফর, যার কারণ হিসেবে সাহিত্যিক সমরেশবাবুর মনে একটা সংশয় দেখা দিলো। কিন্তু বড়োদাদা বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করার মতলব নিয়ে চৈতন্য দাক্ষিণাত্য গেছলেন এমন একটা সন্দেহ সমরেশবাবুর বহু আগে আরেকজন করেছিলেন। তিনি অন্যতম চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ। যাকে আমরা বারংবার কবিরাজ গোস্বামী বলে অভিহিত করেছি। কিন্তু সাকুল্যে ওই একজন ব্যতীত আর কোন চরিতকার (এমন কি কর্মকার গোবিন্দদাসও) লেখেন নি যে, বড়ো ভাই বিশ্বরূপকে সন্ধান করার জন্য চৈতন্য দাক্ষিণাত্যে গেছলেন। কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, চৈতন্য ১৪৩৫ শকে (১৫১০ খ্রীঃ-এর ৭ই বৈশাখ) দাক্ষিণাত্য সফরের প্রাক্কালে নীলাচল স্থিতি নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ আদি ভক্তগণ সহ সার্বভৌমকে বলছেন,

> 'সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসিব যাবৎ।
> নীলাচলে চল তুমি সব রহিবে তাবৎ॥'

কেন তিনি অকস্মাৎ সেতুবন্ধে যাচ্ছেন তার কৈফিয়ৎও দিয়েছেন পরক্ষণে,

> 'বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
> একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব॥'

এবং পরবর্তী পয়ার দেখলে মনে হয় স্বয়ং পদকর্তা যেন চৈতন্যের হয়ে স্বগতোক্তি করছেন : 'বিশ্বরূপে সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল/দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥' (চৈ. চরিতামৃত ২।৭ অংশ দ্রষ্টব্য)।



চৈতন্যের বড়োদাদা বিশ্বরূপ বিয়ে-থা করে সংসারী হবার ভয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে ফেরার হয়েছিলেন, এ কথা আগে বলেছি। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে এসব কথা লেখাও আছে। কিন্তু বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে

গেছলেন এমন কথা কোন চরিতকার স্পষ্ট করে কোথাও লেখেন নি। তাহলে চৈতন্য ভূ-ভারতে এতো জায়গা থাকতে (বিশেষত সাধু সন্তদের আস্তানা হিমালয় থাকতে) হঠাৎ দক্ষিণীদের দেশে বিশ্বরূপকে খুঁজতে গেলেন কেন? তিনি কি জানতেন বিশ্বরূপ দক্ষিণদেশে গেছেন? এমন কোন কি হদিশ পেয়েছিলেন? বোধকরি পেয়েছিলেন তাই। কেননা, সে কথা সম্পষ্ট করে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে আমরা লক্ষ্য করেছি। কবিরাজ এক জায়গায় লিখছেন ঃ

'সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥'

কিন্তু দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ স্থিতি কালে বিশ্বরূপের সঙ্গে চৈতন্যের কোন সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে মনে হয় না। তা সম্ভব হলে অন্তত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতে সেটা আমরা দেখতে পেতাম। বস্তুত কৃষ্ণদাস তা লেখেন নি। তাহলে বিশ্বরূপ গেলেন কোথায়? তার কোন হদিশ নেই চরিতামৃতে। বোধকরি একমাত্র সমরেশবাবুই একটা হদিশ বাতলে দিয়েছেন আমাদের। সেটা কি? না—'বিশ্বরূপ মারা গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক মন্দিরে। চৈতন্য গিয়েছেন তারপর।' (প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত/১৩৯০ এর শারদীয় প্রসাদ/পৃষ্ঠা-৪৭৮)। কিন্তু এ তথ্য সমরেশ বসু কোথাও পেয়েছেন না বিষয়টি তাঁর একান্ত ধারণাপ্রসূত আমরা জানি না।*

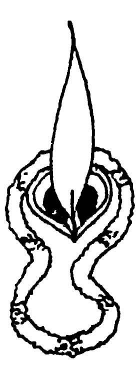
বস্তুত, চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফর যদি বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করা একমাত্র কারণ হয় তাহলে তা সফল হয়নি বলা যায়। কিন্তু তিনি বিফল মনরথে নিষ্ফল হয়ে ফিরে এসেছিলেন সে কথা স্পষ্ট করে বলা দুষ্কর। তিনি বিশ্বরূপকে পাননি সত্য, বিনিময়ে দুঃখই শুধু পেয়েছিলেন। কিন্তু সে দুঃখের দিনে তাঁর দুঃখজাত পরিধির মধ্যে সুখকর সান্ত্বনাও কিছু ঢুকে পড়েছিল। ফলত, সেই সব কারণে তাঁর দাক্ষিণাত্য সফর আগাগোড়া নিষ্ফল হয়েছিল এ কথা আমরা বলতে পারি না।

প্রথমত, চৈতন্যের এ সফরে বড়ো লাভ হয়েছিল যেটা তা হলো, রামানন্দের সাথে চৈতন্যের পরিচয়। যদিচ এ সফরে রায় রামানন্দের ও চৈতন্যের সাক্ষাৎকার বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী ছিল, কেননা, পুরী থেকে নিক্রমণের আগে বাসুদেব সার্বভৌম রায় রামানন্দের সংবাদটি আগেই চৈতন্যের কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বলে ছিলেন,

'রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা॥'

[চৈ. চরিতামৃত/মধ্য/সপ্তম পরিচ্ছেদ]

কেন সার্বভৌম রায় রামানন্দের সঙ্গে 'অবশ্য মিলিবা' বলেছিলেন



*সাহিত্যিক সমরেশ বসু 'ভ্রমর' ছদ্মনামে প্রসাদ পত্রিকা (শারদীয়া ১৩৯০) তে চৈতন্য বিষয়ক 'প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত' যে উপন্যাস লিখেছিলেন সেটি লেখার আগে তিনি পুরী গেছলেন এবং আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে 'সিটিং' নিয়েছিলেন পাঁচদিন। 'প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত' বস্তুত জয়দেব বাবুর গবেষণার একটা খণ্ডচিত্র ধরা পড়ে। কিন্তু বিশ্বরূপের মৃত্যু বিষয়ক তথ্যটি সমরেশবাবু অন্য কোন লিখিত বা মৌখিক সূত্র থেকে পেয়েছেন।'

চৈতন্যকে ? কে এই রামানন্দ ? একজন রামানন্দ ভারত বিখ্যাত এক ছত্রপতি রাজার গুরু ছিলেন, আরেক রামানন্দকে আমরা এক মহাকবির কবিতার ছত্রে পেয়ে থাকি। কিন্তু গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যানগরবাসী এই রামানন্দ কে ? উপরোক্ত পয়ারাংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রায় রামানন্দ জাতে শূদ্র হলেও বেশ বিষয়ী লোক। কিন্তু এটা কি তাঁর বড়ো পরিচয় ছিল। বোধহয় না। কেননা কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত পরবর্তী ছত্রে আমরা দেখছি, সার্বভৌম এক জায়গায় চৈতন্যকে বলছেন, 'তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহোঁ একজন।' অর্থাৎ যোগ্যতায় রায় রামানন্দকে চৈতন্যের সমগোত্রীয় বলা যায়। অন্তত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলছেন। এটা বোধহয় নীতি ধর্মের ক্ষেত্রে। কিন্তু পারতপক্ষে দেখা যাচ্ছে, রায় রামানন্দ আরও দুটি অভিজ্ঞতার অনিবার্য অধিকারী ছিলেন। এবং তা তৎ অবধি পরিশীলিত ছিল। তা হলো, তিনি একাধারে ছিলেন রাজ অভিজাত শাসক এবং সে কারণে রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যোদ্ধা ও পারঙ্গম ছিলেন। পরন্তু সে যুগে তিনিই বোধহয় একজন শূদ্র ব্যক্তি যাঁর বর্ণাঢ্য রাজসম্মান প্রাপ্তি দেশের রাজার কাছে অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছিল। এবং সেই কারণে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। আসলে এই যে রায় রামানন্দ এই 'রায়' কথাটা এসেছে ওই রাজদত্ত উপাধি থেকে। মহাশয়ের পদবি ছিল পট্টনায়ক। ওড়িয়া। পিতার নাম ভবানন্দ পট্টনায়ক। (অবন্তীকুমার স্যানালের ব্যাখা ও টীকা সম্বলিত চৈতন্যচরিতামৃতের ১৭৫-৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রায় রামানন্দ শুধুমাত্র তাত্ত্বিকই ছিলেন না, রাজনীতিকও ছিলেন। এবং উচ্চ রাজকর্মচারী হওয়া হেতু বিষয়ী ও বাহ্যিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান ছিলেন। এক কথায় যাকে আমরা বলি বুদ্ধিমান অর্থবান এবং ক্ষমতাবান। অর্থাৎ বুদ্ধির জোর, লাঠির জোর ও অর্থের জোর এই ত্রয়ী শক্তিরই অধিকারী ছিলেন রামানন্দ। বস্তুত চৈতন্যের চেয়ে রামানন্দ এক কদম অধিক গুণের অধিকারী ছিলেন বলা যায়। এই যে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের সাধ্যসাধন তত্ত্ব নিয়ে বর্ণময় আলোচনা, যা একমাত্র কৃষ্ণদাসই বলেছেন, অন্তত বিবৃত ও বিশ্লেষিত করে–এতে তাঁর দার্শনিকতা ও কবিত্বশক্তির দক্ষতা অনিবার্য প্রমাণ করে ঠিকই, কিন্তু তাতে আদপই প্রমাণিত হয়নি যে ধর্ম ও দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ববাদে চৈতন্যাপেক্ষা রামানন্দ কিছু অদক্ষ ছিলেন। পরন্তু রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব বিশেষত সখীসাধনের প্রকৃত স্বরূপ–যেখানে রাধাপ্রেমকে 'না সো রমণ না হাম রমণী' বলা হয়েছে, এটি সম্পূর্ণ রামানন্দের নিজস্ব তত্ত্ব ছিল যা পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মে সংযোজিত হয়েছে। বাহ্যতঃ, চৈতন্য রামানন্দকে গুরু হিসেবেই বরণ করেছিলেন যদিচও বিনয়ী রামানন্দ তা স্বীকার করেন নি, বরং বলেছেন, 'মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি

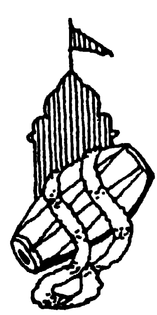
যদিও রামানন্দের সঙ্গে আদৌ সাধ্য সাধনতত্ত্ব নিয়ে চৈতন্যের আলোচনা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কৃষ্ণদাস লিখেছেন এক রকম, চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সঙ্গীর দাবীদার গোবিন্দ কর্মকার লিখেছেন আরেক রকম। আবার অন্যত্র সদ্য প্রকাশিত ওড়িয়া পুঁথি 'চৈতন্য চকড়া'য় সাধ্য সাধন তত্ত্বের কোন উল্লেখই নেই। কিন্তু সাধ্য সাধন বিষয়ক জটিল তাত্ত্বিকতায় না গিয়েও এ কথা বেশ বলা যায়, রায় রামানন্দের সাথে চৈতন্যের পরিচয় ওড্রদেশীয় এক অন্যতম বিচক্ষণ ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য সংযোজন সূচিত করেছিল। যার লাভের অঙ্কের চৈতন্যেরই যোগফল ছিল বেশি।



দেখা যাচ্ছে, দাক্ষিণাত্য সফরে গিয়ে আরও কিছু পরোক্ষ লাভ হয়েছিল চৈতন্যের। সে লাভের অঙ্ক বিশ্বরূপজনিত বিফলতার পরিপূরক নয় যদিও। কিন্তু বেশ্যা, বেশ্যার দালাল, দুর্ধর্ষ খুনী বা ভট্টমারীদের মতো কুচক্রীদের চৈতন্যের আনুকূল্যে যদি কিছুমাত্র পট পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে, বিশ্বরূপ অন্বেষণের বিফলতায় কিছুটা সান্ত্বনা এনেছিল বলা যায়।

অনুল্লেখিত সেই তিন চারটি বিষয় অতঃপর সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে। চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফর কালে বেশ কয়েকজন কুলটা বারবণিতার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এরকম কিছু অত্যাদ্ভুত বর্ণনা আমরা গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় পেয়ে থাকি। এটা কতোদূর সত্য বলা দুষ্কর। কিংবা আদপেই সত্য কিনা বলতে পারি না। কিন্তু কড়চার সত্যতা প্রসঙ্গে যিনি এক বাক্যে অবিচল ছিলেন সেই বৈদ্যকুলোদ্ভব পণ্ডিত ব্যক্তিটির বিরুদ্ধাচারণ করতেও দুঃসাহসিকতার অভাব বোধকরি। কেননা, অন্তত চৈতন্য বিষয়ক নির্ভীক ঐতিহাসিক বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন কতিপয় তাঁদেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু সেই অর্থ এই নয়, যে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মেনে নিয়েছেন বলেই 'গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা'র অকৃত্রিমতা আমরা স্বীকার করছি; আবার এর কৃত্রিমতাও অস্বীকার করি না। বস্তুত স্বীকার ও অস্বীকার এই দু'মুখী নীতি দ্বন্দ্বে আমাদের প্রবিষ্ট হতে হয় এই কারণে যে, গোবিন্দ কর্মকার নামে একজন চৈতন্য পরিকর যেমন ছিলেন তেমনই তিনি চৈতন্য জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন একথা তো পুরোদস্তুর অসত্য নয়। মূলত কর্মকার কবির কাব্য নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে পাণ্ডিত্যের লড়াই বেঁধেছে দুটো কারণে। তা হলো, এই চৈতন্যচরিত অর্থাৎ গোবিন্দ দাসের (কর্মকার) কড়চা রচয়িতা গোবিন্দ কর্মকার আদৌ চৈতন্যের দক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন কিনা। আর দ্বিতীয় সন্দ হলো, তাঁর রচিত কড়চা বা রোজনামচা জাতীয় কাব্য নিয়ে। এ প্রসঙ্গে একটু উপক্রমণিকা করা দরকার, তা হলো এই বিতর্কিত 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামক পুঁথিটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন জনৈক জয়গোপাল গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি। ইনি অদ্বৈতবংশীয় এবং নদীয়া শান্তিপুরের মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন বলে জানা যায়। কড়চার প্রথম প্রকাশকাল হলো ইং ১৮৯৫ সাল। কিন্তু ইতিহাস বলে, পুঁথিটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ হওয়ার আগেই পুঁথির প্রামাণিকতা নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধিয়েছেন স্বয়ং প্রকাশক জয়গোপাল গোস্বামী নিজেই। কিন্তু এটা তাঁর সদিচ্ছাজনিত কারণে ঘটেছিল বলে মনে হয়।

হেডপণ্ডিত জয়গোপাল গোবিন্দ দাস কৃত পুঁথিটি পেয়েছিলেন আরেক শান্তিপুরবাসী জনৈক কালিদাস নাথের কাছ থেকে। নাথ মশাই আবার পুঁথিখানা পেয়েছিলেন অন্যজনের নিকট। অর্থাৎ নাথ মশাইও এর হকদার ছিলেন না। স্বভাবতই অন্যের গচ্ছিত জিনিষ জয়গোপালকে তুলে দিতে তাঁর ইতস্তত: ছিল। কিন্তু জয়গোপাল গোস্বামীর সনির্বন্ধ অনুরোধও তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। কথা হলো জয়গোপাল গোস্বামী কয়েকদিনের মধ্যে নাথ মশাইকে পুঁথিখানা ফেরৎ দেবেন। তা তিনি দিলেনও। কিন্তু সেই কয়দিনে পুঁথিখানা আদ্যপান্ত নকল করে নিলেন জয়গোপাল। তিনি ভালো অনুলিপিকার অর্থাৎ নকলচী ছিলেন বলে মনে হয়।



অতঃপর এই নকল করা পুঁথিটি নিয়েই জমে উঠলো নাটক। জয়গোপাল 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র শিশির কুমার ঘোষকে নকল করা পুঁথির কিছুটা অংশ (প্রায় দু'ফর্মার মতো) পড়তে দিলেন। কথা হলো সাত দিনের মধ্যে শিশির

কুমার জয়গোপালকে তার কপি করা গোবিন্দ দাসের কড়চার পৃষ্ঠাগুলি রেজেষ্টারি ডাক মারফৎ ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু কার্যত তা তিনি দিলেন না ইতোমধ্যে শিশির কুমারের হাত থেকে জয়গোপাল গোস্বামীর অনুলিপি করা ওই পৃষ্ঠাগুলি চলে গেছে তৎকালীন 'Rais and Ryot' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হাতে। আর এই শম্ভুচন্দ্রের হেপাজত থেকে দুর্ভাগ্যক্রমে কাগজগুলি গেল হারিয়ে। এদিকে জয়গোপাল গোস্বামী ভায়া কালিদাস নাথের নিকট থেকে যে মূল কড়চার পুঁথিখানি পেয়েছিলেন সেটি আরেকবার পাবার কোন আশা ছিল না। স্বভাবতই পুঁথির খণ্ডাংশের নকল নিয়ে জয়গোপাল বেশ হতাশায় পড়লেন। ঠিক এর কিছুদিন পর জয়গোপাল গোবিন্দ দাসের কড়চার আরেক খানা নকল করা পুঁথির সন্ধান পেলেন। এবারের পুঁথির মালিক হরিনাথ গোস্বামী। গোস্বামী মশাই তা দিলেনও জয়গোপালকে। কিন্তু পুঁথিখানার হাল ছিল যা তাই পাঠ করা জয়গোপালের কাছে অতীব দুরুহ মনে হলো। তার ইতোপূর্বের খণ্ডাংশ নোট থেকে তবু কষ্টেসৃষ্টে তা তিনি পুনরুদ্ধার করলেন। এবার আর জয়গোপাল অনুলিপি করা কাগজ কারুকে পড়তে দেবার ভরসা পেলেন না। সিধে পাঠিয়ে দিলেন প্রেসে। অতঃপর গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা নামক পুঁথিখানি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ হলো ১৮১৭ শকে, ইং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

আর এই পুঁথিখানা প্রকাশিত হবার পরই পুঁথির প্রামাণিকতা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠলো বাঙলার সাহিত্যসেবীদের মধ্যে। এ বিতর্কে শিশির কুমারের অনুজ মতিলাল ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখরা জড়িয়ে পড়লেন। এঁরা ছিলেন মূলত জয়গোপালের বিপক্ষে। আবার কড়চার সপক্ষেও কেউ কেউ কথা বললেন, যেমন 'গৌরপদতরঙ্গিনী'র সম্পাদক জগবন্ধু ভদ্র।

অতঃপর ১৩৩৩ সালে (ইং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘটা করে গোবিন্দ দাসের কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হতেই কড়চা বিরোধী নাটক জমে উঠলো আরও গুরুতর ভাবে। দু'নম্বর সংস্করণ প্রকাশের পুরোধা ছিলেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। সেই সঙ্গে পয়লা সংস্করণের প্রকাশক জয়গোপাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বনোয়ারীলাল। জয়গোপাল গোস্বামী ততোদিনে গঙ্গালাভ করেছেন।

যাই হোক, কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পাওয়ার পর বিতর্কের 'টাগ অব ওয়ার' শুরু হয়ে গেল মূলত দীনেশচন্দ্র ও মৃণালকান্তি ঘোষের মধ্যে। যুগপৎ মৃণালকান্তি ঘোষ মশাই যেমন কড়চার বিপক্ষে প্রমাণ দেখালেন বিস্তর তেমনই ডঃ দীনেশ সেনেরও কড়চার সপক্ষে প্রামাণিকতার বড়ো অভাব ছিল না। এই হলো 'গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা'র ইতিহাস।

তো এই কড়চার এক জায়গায় গোবিন্দ দাস বারবণিতাদের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাতের কথা লিখেছেন। অবিশ্যি এরকম বিস্ময়কর ঘটনা একাধিকবার বর্ণিত আছে গোবিন্দের কড়চায়। এরকম দুজন বেশ্যা নারীর নাম যথাক্রমে সত্যবাঈ ও লক্ষীবাঈ। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন, '১৫১০ খ্রীঃ ৭ বৈশাখ চৈতন্য প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। পুরী হইতে গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তথা হইতে ত্রিমন্দনগর গমন করিয়া তুঙ্গ ভদ্রবাসী ঢুণ্ডিরাম তীর্থকে ভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বর গমন করেন, এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সত্যবাঈ ও লক্ষীবাঈ



নাকম বৈশ্যাদ্বয় দ্বারা চৈতন্য প্রভুকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন।' (পৃষ্ঠা-৩৪৭)।

আর চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফরের সঙ্গী গোবিন্দ কর্মকার লিখছেন,

'হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্।
দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে।
সন্ন্যাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাঈ লক্ষ্মীবাঈ নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়।'

* * *

'কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন।'

(গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা)

এরপর অবিশ্যি বেশ্যাদ্বয় সত্যবালা ও লক্ষ্মীবালা সহ সেই দুষ্কৃতি ধনীকের একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটলো। যেমন জগাই মাধায়ের হয়েছিল। যেমন পাষণ্ডীপ্রধান গোপাল চাপাল অথবা সার্বভৌমের জামাতা অমোঘের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বুদ্ধের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় কতিপয় নগর নটীর প্রাদুর্ভাব আমরা দেখতে পাই। গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় এরকম আরও একাধিক বারাঙ্গনার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, কড়চা মতে এদের সকলের সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এরকম আরেকজন বারাঙ্গনার নাম বারমুখী। বারমুখী কথাটা নাম অর্থে কর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা বলা দুষ্কর। তবে বারমুখী কোন নারীর নাম হওয়া স্বাভাবিক না বলেই মনে হয়। তো এই বারমুখী প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাস তাঁর কড়চায় লিখছেন,

'বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহু ধন।
বহুমূল্য হয় তার বসনভূষণ॥
প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে।
হরিতে ধনীর ধন ফিরে পাকে পাকে॥'

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় এই বারমুখী নাম্নী বেশ্যার সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বারমুখী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'মহাপ্রভুর আলোকসামান্য ভক্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া নিজ পাপব্যবসাকে ধিক্কার দিয়া সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য মহাপ্রভুর পদতলে পড়িল। মহাপ্রভু তাহাকে তুলসী কাননে হরি ভজিতে উপদেশ দিলেন। এসব গল্প শুনিতে মন্দ নহে। কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবনে কোন দিনই এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস/চৈতন্যযুগ/পাতা-৪৬৯)।



চৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সে সময় প্রথানুযায়ী দক্ষিণ দেশের অনেক মন্দিরে দেবদাসী প্রথা চালু ছিল। এমন কি চৈতনোত্তর যুগেও এর পূর্ববৎ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এমন একটি মন্দিরের নাম 'খাণ্ডবা' মন্দির। খাণ্ডবা কথাটি কোন অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের জানা নেই। গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা অনুযায়ী জিজুরা নামক স্থানে এই মন্দিরটির অবস্থান ছিল। তো সে যুগের প্রথামতো অনেকে নিছক পুণ্য অর্জনের জন্য নিজ নিজ কন্যাদের এই খাণ্ডবা মন্দিরে দেবদাসীর কাজে নিয়োজিত করে দিতো। ঐতিহাসিক অসিতবাবু লিখছেন, 'ঐ বেশ্যাদের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।' (ঐ পৃষ্ট ৪৭০)। আর এ প্রসঙ্গে

আরেক অন্যতম ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, চৈতন্যদেব দস্যু তস্করের প্রভৃতির নিকট গিয়েছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার পশ্চাদগামী হইয়াছেন। চৈতন্য প্রভুর কোন অভিপ্রায়ে তিনি ইংগিতেও বাধা দেন নাই। কিন্তু যেদিন মুরারি বেশ্যাদিগের যাইতে উদ্যত, সেই দিন গোবিন্দ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য/১ম খণ্ড/ পাতা-৩৫৬)। গোবিন্দ বলেছেন,

'মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই।
না শুনিল মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই॥'

দেখা যাচ্ছে, গোবিন্দের এ হুঁশিয়ারিতে কান দিলেন না চৈতন্য। গোবিন্দ নিজেই তা বলেছেন। অতঃপর খাণ্ডবা মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন তরুণ সন্ন্যাসী।

তো গোবিন্দ কর্মকারের বর্ণনা ও অসিতবাবু এবং দীনেশ চন্দ্রের বক্তব্য থেকে এ ঘটনা বিষয়ক আমরা দুটি জিনিষ বেশ জানতে পারছি। প্রথমত খাণ্ডবা মন্দিরের 'বেশ্যা' দেবদাসীদের কাছে চৈতন্য নিজে যেতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু এই 'দেবদাসী' কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে 'বেশ্যা' তাও আমরা অসিতবাবুর বইতে পেয়ে যাচ্ছি অতঃপর।

গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় এই খাণ্ডবা মন্দিরের একজন বারাঙ্গনার নাম, ইন্দিরা বাঈ। ইনি বোধহয় বারাঙ্গনা দেবদাসীদের প্রধানা ছিলেন। কেননা গোবিন্দ বলছেন ইন্দিরা বাঈর বেশ বয়েস হয়ে গেছলো। যদিও তখনো বেশ সুন্দরী ছিলেন তিনি। গোবিন্দ লিখছেন,

'আসিয়া ইন্দিরা বাঈ করজোড়ে কয়।
দয়া কর আমারে সন্ন্যাসী মহাশয়॥
বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি কুকর্ম করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া॥
এত বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।
নাম দিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায়॥
হরিনাম পেয়ে তবে ইন্দিরা সুন্দরী।
গৃহ থেকে বাহিরিল সব ত্যাগ করি॥'

গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় মুহুর্মুহুঃ এসব বেশ্যা বারাঙ্গনা নারীদের প্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অসিতবাবু তাঁর বইতে লিখেছেন, 'আধুনিক পাঠকও এই বিবরণ পড়িয়া অজ্ঞানের মতোই হইবেন, এই বর্ণনা অসম্ভব, অনৈতিকহাসিক, অস্বাভাবিক ও কুরুচিপূর্ণ।' এবং যেহেতু ডঃ দীনেশ সেন গোবিন্দ কর্মকারের কড়চার সমর্থক সেহেতু দীনেশ সেনকেও তিনি একহাত নিয়েছেন। লিখেছেন, দীনেশচন্দ্র বালসুলভ আবেগে এই সমস্ত বর্ণনা মোদকখণ্ডবৎ গলাধঃকরণ করিয়াছেন, ইহাতেই দুঃখ হয়।' (বা. সা. ই/পৃষ্ঠা-৪৬৯-৭১)।



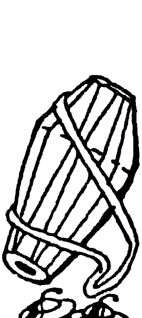
দেখা যাচ্ছে, কড়চার এৎসাদৃশ্য ঘটনা পাঠ করে শ্রদ্ধেয় অসিতবাবু খুব স্বাভাবকি ভাবেই বিভ্রান্তি বোধ করেছেন। কিছুটা ক্রুদ্ধও হয়েছেন বোধকরি সেই কারণে। আসলে, যেহেতু, গোবিন্দ দাসের কড়চার ঐতিহাসিকতা অদ্যাবধি বিতর্ক জালে আবর্তিত সেইহেতু তাঁর এ হেন বক্তব্যের হেতু জয়গোপাল গোস্বামীর জালিয়াতিকে হয়তো সূচিত করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেহেতু গোবিন্দ দাসের কড়চা মৃণালকান্তি ঘোষ প্রমুখেরা জাল গ্রন্থ বলে অভিযুক্ত করেছেন সেহেতু চৈতন্যের এই বেশ্যা দর্শন অসিতবাবু

'অনৈতিহাসিক, অস্বাভাবিক ও কুরুচিপূর্ণ' বলেছেন, নাকি চৈতন্যের ক্ষেত্রে এই বেশ্যাদর্শনের সমগ্র ব্যাপারটা তিনি অসঙ্গত, অস্বাভাবিক বলতে চেয়েছেন। এটি আমাদের আবশ্যিক, জানা দরকার।

অসিতবাবু তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে লিখেছেন, 'জয়গোপাল চৈতন্যদেবকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, মহাপ্রভু পাপী-তাপীর ত্রাণ এবং প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ বিষয়েও তিনি অন্যান্য বৈষ্ণবদের মতোই দৃঢ়নিষণ্ণ ছিলেন। কতবার চৈতন্যদেব দুর্বিনীত দস্যুতস্করকেও প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিতেছেন, এ বর্ণনা অস্বাভাবিক বা অনৈতিহাসিক নহে। কিন্তু গোল বাধিতেছে অন্যত্র। কড়চায় কয়েকস্থানে আছে যে, চৈতন্যদেব নারী সমাজে, এমন কি বারাঙ্গনাদিগকেও কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিতেছেন। যিনি চৈতন্যের জীবনকথা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জানেন, তিনিই বুঝিবেন, চৈতন্যদেবের চরিত্রের এরূপ বর্ণনা কিরূপ অন্যায়, কুৎসিত ও রুচি বিরোধী।' (পৃষ্ঠা-৪৬৮)।

হ্যাঁ, একথা খুবই সঠিক যে চৈতন্য বারংবার কারণে অকারণে মেয়েদের প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি কথা প্রয়োগ করেছেন। চৈতন্যচরিতের এটা খুব বিরক্তিকর দিক বলে আমাদের মনে হয়। শিখি মাহিতির বোন মাধবীদেবী। একজন বৃদ্ধা, তায় তপস্বিনী। ছোট হরিদাস, এ হেন মাধবীদেবীর কাছে 'ওয়াইয়া চাউল একমন' এনেছিলেন বলে এই অভিযোগে ভক্ত ছোট হরিদাস বর্জিত হয়েছিলেন চৈতন্যের কাছে। সেই অনুজ ভক্ত অবশেষে প্রয়াগে গিয়ে আত্মহননে প্ররোচিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে চৈতন্য বলেছেন, 'কাঠের নারী পুতুলও মুনির মন হরণ করে (চৈ. চরিতামৃত ৩/২/১১৭)। অন্যত্র বলেছেন, 'কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।' (চৈ. চ. ২/১১/৮)। অর্থাৎ কাষ্ঠনারী স্পর্শনেও প্রবৃত্তিগত স্পৃহা প্রকাশ পায়। বৃন্দাবন দাসের ভাগবতে এই নারীজাতি সম্বন্ধে চৈতন্যের আরও সতর্ক, আরও নির্মমতর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেখানে তিনি বলেছেন, স্ত্রী দরশর-সম বিষের ভক্ষণ (২/১১/৬)। কবি কর্ণপূরে নাটকেও চৈতন্যের এ ধরনের মানসিকতার কথা বলা হয়েছে, 'আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি' (৮।২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

তো উপরোক্ত এসব প্রমাণাদি থেকে ঐতিহাসিক অসিতবাবু সম্ভবত এই ধারণা পোষণ করেছেন যে, গোবিন্দ দাসের কড়চায় যে সকল দুষ্টবুদ্ধি বারাঙ্গনাদের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ দেখানো হয়েছে তা সর্বৈব ভুল, অনৈতিহাসিক। ঠিকই যুক্তি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সদ্য প্রকাশিত চৈতন্য চকড়া (ওড়িয়া) গ্রন্থে যে লাবণ্য দেবদাসীর কথা আছে, বাহির গায়নী ছিলেন তিনি। বোধকরি নর্তকীও। তো গরুর স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে কতোদিন চৈতন্য এই দেবদাসীর কণ্ঠে সুললিত গীতগোবিন্দ শুনেছেন। লাবণ্যের নাম না থাকলেও হুবহু এই কাহিনী কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ১৪ অধ্যায়েও আমরা দেখতে পাই। এখানে চৈতন্য বলছেন, 'আদিবেশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন।' তাছাড়াও এই কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় আরেকটি অভূতপূর্ব ঘটনার বর্ণনা আছে। এটি আমরা চরিতামৃতের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাচ্ছি। চৈতন্য তখন নীলাচলে কাশি মিশ্রের বাড়িতে (গম্ভীরা) অবস্থান করছেন। এসময় একজন 'ব্রাহ্মণ কুমার' প্রায়শ চৈতন্যের কাছে আসতেন। ব্রাহ্মণ কুমারটি ছিল নেহাৎই বালক। তো চৈতন্য এই ব্রাহ্মণ পুত্রটিকে খুব স্নেহ করতেন। দেখতে শুনতেও বেশ



সুন্দর ছিল বালকটি। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক চৈতন্যের অন্যতম শিষ্য দামোদর এই 'ব্রাহ্মণ কুমার'টির সাথে চৈতন্যের দহরম মহরম খুব ভালো চোখে দেখতেন না। এ বিষয়ে দামোদরের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল। কৃষ্ণদাস লিখছেন ঃ

'প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে॥'

তখন দামোদর নিষেধ করলেন সেই ব্রাহ্মণের পুত্রটিকে। বললেন তুমি এরপর এখানে আর আসবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বালকটি নিয়মিত আসতে লাগলো চৈতন্যের কাছে। একদিন দামোদর আর সহ্য করতে পারলেন না।

'কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারে দামু কহিতে লাগিলা॥'

বললেন, গোসাঞি, এবার নীলাচলের সবাই জানবে তুমি কেমন গোঁসাই। এবার সবাই তোমার গুণ গাইবে দেখছি।

চৈতন্য বললেন, কি বলছো তুমি দামোদর, আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিছু বুঝতে পারছো না।

না, কিছু বুঝতে পারছি না।

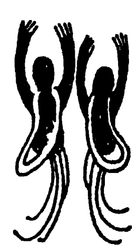
দামোদর বললেন, হ্যাঁ তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। তুমি 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'। তোমাকে কে কি বলবে। কিন্তু পরের মুখকে তুমি চাপা দিতে পারবেনা। পণ্ডিত মানুষ হয়ে তুমি এসব কি করছো আমি বুঝতে পারছি না।

'পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তদ্যপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকে কানাকানি বাতে দেহ অবসর॥'

[চৈ. চরিতামৃত/অন্ত্যলীলা/ ৩য় পরিচ্ছেদ]

সমরেশ বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই ব্রাহ্মণ বালকের মা বিধবা, সুন্দরী যুবতী। চৈতন্য তা জানতেন। দেখেওছেন নিশ্চয়ই। দামোদরের চোখে ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকতো না। এ আবার কি রকম ব্যাপার? যিনি ছোট হরিদাসকে সামান্য রমণীর কাছে ভিক্ষার জন্য বিতাড়িত করেন, তিনি কেন সামান্য বালকের সঙ্গে রোজ দিন পরম সন্তোষ কথা বলেন। বিশেষ করে তার মা যখন বিধবা সুন্দরী যুবতী।' শারদীয় প্রসাদ/১৩৯০ এর ভ্রমরের রচনা দ্রষ্টব্য) । আর মেদিনীপুর নিবাসী লেখক যুধিষ্ঠির জানা (মালিবুড়ো) তাঁর চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য জনিত বইতে লিখেছেন, 'দামোদর প্রভুর প্রকৃতি না জেনেশুনেই কি এসব কথা বলছেন। সব কিছুকেই তাঁর লীলা বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।' (পৃঃ ২০৫)।

পরিশেষে আমাদের আরেক অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশাইয়ের একটি বক্তব্য দিয়ে এই সংক্রান্ত বিষয়ের ইতি টানবো। ডঃ মজুমদার তাঁর 'চৈতন্যচরিতের উপাদান নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের একটি পয়ার উদ্ধৃত করেছেন। পয়ারটি হলো, 'রাজার শতেক



স্ত্রী প্রধান চন্দ্রকলা ।/গৌরচন্দ্র দিলা তারে গলায় দিব্য মালা ॥' এবং এই পয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'যাঁহারা "গোবিন্দ দাসের কড়চা"য় বর্ণিত বারমুখী বেশ্যার উদ্ধার কাহিনী লইয়া ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন তাঁহারা জয়ানন্দকে ছাড়িয়া দিলেন কেন ?' (পৃঃ ২৩৫) ।

বস্তুত, বেশ্যা বা বারবনিতাদের উদ্ধার করা, তাদের হৃদয় পরিবর্তন করা কোন গুনাহ, অযৌক্তিক কাজ না । একমাত্র বড়ো মাপের মানুষেরা তা পারেন । অন্তত এ কাজে যাঁরা ব্রতী হয়েছেন বা হবেন, তাঁরা কি সমাজ কি ইতিহাসে বড়ো মাপের মানুষ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকবেন । এ তো এক ধরনের পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অব্যক্ত দুঃখী মানুষকে গলি থেকে রাজপথে ফিরিয়ে আনার নামান্তর মাত্র । আমাদের পুরাতনী ইতিবৃত্তও তাই বলেছে, 'তমসো মা জ্যোতির্গময় ।' এই তমসা থেকে আলোকে ফেরা শুধু নিজের জন্য না, অন্যের জন্যেও এবং একে অন্যকে তাই প্রলুব্ধ করবে । তুমি অমৃতের সন্তান, তুমি মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে এসো । হ্যাঁ, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে আসা যায়, আনা যায় । আমাদের মহান ইতিবৃত্ত তাই বলেছে । যিনি চৈতন্য, সেই মানুষ যদি উদ্ধারণ কর্মে ব্রতী হন তাতে অনৈতিহাসিকতার কি থাকতে পারে । হ্যাঁ, তিনিই বলেছিলেন, স্ত্রী জাতি দর্শন বিষ ভক্ষণ তুল্য । তিনি তা একাধিকবার বলেছেন । একাধিক সময় । কিন্তু একজন মানুষের কোন যুক্তিই তার শেষ যুক্তি হতে পারে না । চৈতন্যের ক্ষেত্রে একথা বেশি প্রযোজ্য । কেননা তিনি চৈতন্য । সময়ের নিয়ত ঘটনাপ্রবাহে কোন সময়ন্তর যুক্তির আশ্রয় নেয় মানুষ । আবার ঘটমান সময়ের প্রভাবে সেই অমোঘ যুক্তিতেও চিড় ধরে । নতুন যুক্তির সৃষ্টি হয় পুরাতনকে অপসারিত করে । অথবা রকমফের ঘটে পুরাতনের । সুতরাং কোন অবস্থায় বা ঘটনাবশত চৈতন্য একদা কি বলেছিলেন সেটা তার শেষ কথা হেব কেন ? আমাদেরই বা এমন ভাববার কারণ কি ? একথার পরও তিনি বিশ বাইশ বছর প্রকট ছিলেন । সুতরাং এই বিশ বাইশ বছরের তাঁর মানসিকতা, তাঁর সদিচ্ছার ইতিবাচকতা দিয়ে আমরা এ দিকটির মূল্যায়ন করতে পারি ।

দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফর কালে আরও কয়েকজন উপেক্ষিত মানুষ অসামাজিকতার তমসা ছাড়িয়ে সমাজে ঠাঁই পেয়েছিল । নরোজী ও ভীলপন্থি এমনই দু'জন ব্যক্তি । এরা খুন রাহাজানিতে অভ্যস্থ ছিল । কিন্তু চৈতন্য দাক্ষিণাত্যে না গেলে এরা মনুষত্বের মর্ম কোনদিনও বুঝতো না ।

চৈতন্য কি এক দুর্নিবার অভিপ্রায় নিয়ে প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য চষে বেড়িয়েছিলেন । বিশ্বরূপের অন্বেষণই বোধহয় এর অন্যতম কারণ । তিনি প্রথমে নীলাচল থেকে যাত্রা করে আলানাথ হয়ে কর্মস্থানে এসেছিলেন । এখানে জনৈক গলৎকুষ্ঠী বিপ্রকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন । কূর্মস্থান থেকে জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র হয়ে চৈতন্য এলেন গোদাবরীতে । এখানে বিদ্যানগর নামক স্থানে রায় রামানন্দের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল । রামানন্দের কাছে কয়েকদিন অতিবাহিত করে (বোধহয় দশ দিন) চৈতন্য এলেন গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জুনতীর্থ, দাসরাম মহাদেবের স্থান, সিদ্ধিবট, স্কন্দক্ষেত্র প্রভৃতি জায়গায় । এরকম বহু তীর্থস্থান পরিক্রম করে কৃষ্ণকর্ণ সরোবর শিবক্ষেত্র হয়ে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এসে পৌঁছালেন । এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্ট নামক দক্ষিণী ব্যক্তির গৃহে চারমাস অবস্থান করলেন চৈতন্য । শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চারমাস অতিবাহিত করে চৈতন্য এলেন ঋষভপর্বতে । এখানে পুরী গোস্বামী অর্থাৎ পরমানন্দনপুরীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো । ঋষভপর্বত থেকে কামকোষ্ঠী হয়ে

চৈতন্য এলেন দক্ষিণ মথুরায় । এখানে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়িতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করলেন । দক্ষিণ মথুরা থেকে কৃতমালা, দুর্বেশন, মহেন্দ্রশৈল প্রভৃতি স্থান দিয়ে চৈতন্য এলেন সেতুবন্ধ নামক স্থানে । এই সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা । দক্ষিণ মথুরা হয়ে তাম্রপর্ণী, নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তালা তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থ, পানাগড়িতীর্থ, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্বত এবং পরিশেষে কন্যাকুমারী ও আমলীতলা হয়ে চৈতন্য এসে পৌঁছালেন মল্লারদেশে । আর মল্লারদেশে এসেই একটা মোক্ষম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন তিনি । এখানে ভট্টমারী* সন্ন্যাসীরা চৈতন্যের ভ্রমণসঙ্গী কৃষ্ণদাসকে (এই নামটি নিয়ে বিতর্ক আছে) সুন্দরী মেয়েমানুষের লোভ দেখিয়ে একদিন ভাগিয়ে নিয়ে গেল । কৃষ্ণদাসও সুন্দরী দেখে প্রলুব্ধ হয়ে সোজা চলে এলো ভট্টমারীদের আখড়ায় । ব্যাপারটা টের পেয়ে সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করতে স্বয়ং চৈতন্য এলেন ভট্টমারীদের কাছে । বললেন, দ্যাখো, তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী । তোমরা কেন আমার ব্রাহ্মণটিকে আটকে রেখেছো, ওকে ছেড়ে দাও । এখানে কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন, 'শুনি সব ভট্টমারী উঠে অস্ত্র লঞা ।/মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা ।' (২/৯/২১৪) । এখানে একটা ছোটখাটো লড়াই হলো । এবং অবশ্যই জিত হলো চৈতন্যের । ভট্টমারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল । কেউ না পালিয়ে যেতে পেরে কাঁদতে লাগলো । আর তখন চৈতন্য কৃষ্ণদাসের কেশ ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ভট্টমারীদের খপ্পর থেকে নিয়ে এলেন । এসব কথা কৃষ্ণদাস লিখেছেন ।

এইদিনই চৈতন্য মল্লদেশ ছেড়ে কৃষ্ণদাসকে নিয়ে পালিয়ে এলেন পয়স্বিনীতীরে । এখানে ব্রহ্মসংহিতার একটি নতুন অধ্যায় আবিষ্কৃত হলো । চৈতন্য তার প্রতিলিপি করে নিলেন । তারপর অনন্ত পদ্মনাভ, সিংহারি মঠ, মৎস্যতীর্থ প্রভৃতি স্থান দিয়ে, বিখ্যাত পম্পাসরোবরে পুণ্য স্নান করে, পঞ্চবটী, নাসিক, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত হয়ে চৈতন্য পুনরায় ফিরে এলেন সেই বিদ্যানগরে । আবার রায় রামানন্দের সাথে তাঁর মিলন হলো । দিন পাঁচেক কাটলো এখানে । রামানন্দ চৈতন্যকে বললেন, গোঁসাই আমি তোমার কথা মতো রাজাকে পত্র লিখেছি । তিনি আমাকে নীলাচলে যাবার আজ্ঞা দিয়েছেন । চৈতন্য খুশী হলেন শুনে । বললেন, তাহলে তো খুব ভালো হলো । আমিও নীলাচলে যাচ্ছি । তুমি আমার সঙ্গে চলো । রামানন্দ বললেন, তা তো হবার নয় গোঁসাই । তুমি আগে যাও । আমি তোমার পশ্চাতে যাচ্ছি । আমার সঙ্গে অনেক হাতি ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত থাকবে, এসব তোমার পোশাবে না ।



আলানাথে এসে চৈতন্য কৃষ্ণদাসকে বললেন, তুমি আমার আগে নীলাচলে চলে যাও, নিত্যানন্দ আদি সকলকে গিয়ে বলো, আমি এসে গেছি ।

সেই মতো কৃষ্ণদাস আলানাথ থেকে নীলাচলের পথে এগিয়ে চললেন ।

---

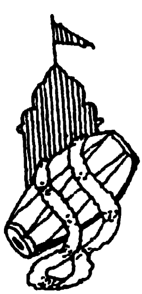
* ভট্টমারী কথায় অর্থ হলো মারীয় খ্রীষ্টানদের (Maria Christian) ভট্ট মানে Bishop. আচার্য) । (চৈতন্যের জীবনকথা/বিজিতকুমার দত্ত/পৃষ্ঠা-৭১ দ্রষ্টব্য) ।

[তেইশ]
ধর্ম—চৈতন্য ও রাজনীতি

চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ। এবং দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা সেরে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করলেন ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের (১৪৩৩ শকাব্দ) মাঘ মাসের ৩ তারিখে। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ কর্মকার লিখেছেন, 'মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়।/সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌঁছায়।' (গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা পৃ ২১৯/১ম সং)। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, 'দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল' (২।১৬।৮৪)। অর্থাৎ পুরী থেকে বেরিয়ে দাক্ষিণাত্য সফর সেরে পুনরায় পুরীতে ফিরে আসতে চৈতন্যের দু'বছর লেগেছিল। বোধহয় কৃষ্ণদাস চৈতন্যের এই দক্ষিণ সফরের সময়কাল একটা মোটামুটি হিসেবে দেখেছিলেন। তাই দু'বছরের মতোকে দু'বছরই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত অঙ্কের হিসেব করলে তা দাঁড়াচ্ছে, মোট ১ বছর ৮ মাস ২৬ দিন।

চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একমাত্র সঙ্গী কৃষ্ণদাসের মারফৎ চৈতন্যের প্রত্যাবর্তনের খবর আগেই পেয়ে গিয়েছিল নীলাচলে অবস্থিত পার্ষদ ও ভক্তরা। কেননা আলানাথ থেকে কৃষ্ণদাসকে আগেভাগে পাঠিয়ে চৈতন্য সেরকমই ব্যবস্থা করেছিলেন। দীর্ঘকাল অদর্শনে চৈতন্যকে দেখবার জন্য পুরীতে অবস্থানরত নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ আদি পরিচিত পার্ষদেরাও খুব উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা চৈতন্যের সঙ্গে মিলবার অভিপ্রায়ে পথের অনেকখানি এগিয়ে এলেন। তাঁদের সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্যও এগিয়ে গেলেন। চৈতন্যকে স্বাগত জানাতে স্বয়ং সার্বভৌম এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রতীরে। জগন্নাথ দর্শন করে চৈতন্য প্রথমে সার্বভৌমের বাড়িতেই উঠলেন। তখনো পর্যন্ত তিনি কোথায় থাকবেন স্থির ছিল না। অবিশ্যি, চৈতন্যের থাকবার ব্যবস্থা নিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে বহু আগে একটা কথা হয়েছিল সার্বভৌমের। তখন রাজা বলে ছিলেন সন্ন্যাসী ফিরে এলে তাঁকে যেন কাশী মিশ্রের বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কাশী মিশ্র ছিলেন উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের গুরু। সেই মতো কাশী মিশ্রের বাড়িতে (গম্ভীরা) চৈতন্যের বাসস্থানের ব্যবস্থা হলো।

চৈতন্যের অলৌকিক শক্তির কাহিনী ইতিমধ্যে উৎকল দেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষত জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল অনন্ত প্রতিহারীর শক্তিমত্তাকে খর্ব করার পর থেকে। এই অনন্ত প্রতিহারীর শারীরিক বল বীর্যের কাহিনী কিংবদন্তীর মতো উৎকলদেশী মানুষদের মুখে মুখে এতোকাল ছড়িয়ে ছিল। তার শক্তিকে প্রায় হেলায় খর্ব করে চৈতন্য রাতারাতি অলৌকিক শক্তির কিংবদন্তী নায়ক হয়ে উঠলেন উৎকলদেশীয় জনসাধারণের কাছে। তার পরই ঘটলো জগন্নাথ মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী লাবণ্যের চৈতন্যের প্রতি আনুগত্য গ্রহণ। সুন্দরী লাবণ্যের সুকণ্ঠ, নৃত্যপটিয়সীতার কথা উৎকলের অনেক মানুষই জানতো। বিশেষত সে যখন ছিল জগন্নাথ মন্দিরের প্রধানা নর্তকী দেবদাসী। সেই দেবদাসী একদিন সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে চৈতন্যব্রত গ্রহণ করলো। এটা উৎকলবাসীদের মনে একটা বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলেছিল নিশ্চয়। কে এই অলৌকিক শক্তিধর সন্ন্যাসী



স্বভাবতই তারা জানতে চাইলো। দেখতে চাইলো শিখা সূত্র মুণ্ডিত তরুণ সন্ন্যাসী চৈতন্যকে। কিন্তু সেই অলৌকিক শক্তিধর মানুষটি ততোদিনে তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। চলে গেছেন পুরুষোত্তম ছেড়ে সুদূর দাক্ষিণাত্যে।

সেই অলৌকিক শক্তিধর, শিখা সূত্র মুণ্ডিত গৈরিক বসনধারী, গোরবর্ণ রূপবান সন্ন্যাসী বহুদিন পর আবার নীলাচলে ফিরে এসেছেন। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পর উৎকলদেশীরা দলে দলে দেখতে আসছে সন্ন্যাসীকে। অনেকে শিষ্যত্ব নিচ্ছে তাঁর। কাশী মিশ্রের বাড়ি দিনরাত্রি কানায় কানায় পূর্ণ। সেই সঙ্গে খোল-করতাল-মৃদঙ্গ আর খঞ্জনীর আওয়াজে উদ্বেল হয়ে উঠছে নীলাচলের আকাশ বাতাস। এমন একদিন ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামে এক মৃগচর্ম পরিধেয় সন্ন্যাসী চৈতন্যকে একটা বিস্ময়কর উপাধি দিয়ে বসলেন। 'সচল জগন্নাথ'। তিনি বললেন, 'সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম হহা চলাচল।/জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত' সচল ॥' (চৈ. চ ২।১০)। দেখতে দেখতে কথাটা উড়িষ্যার জনসাধারণের মধ্যেও মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই বলতে লাগলো চৈতন্য সন্ন্যাসী মানুষ নন, মানুষরূপী স্বয়ং 'সচল জগন্নাথ'।

ইতিমধ্যে দেশের রাজা স্বয়ং উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র একদিন একটি বার্তা পাঠালেন সার্বভৌমের কাছে। রাজা 'সচল জগন্নাথ' চৈতন্যের দর্শনপ্রার্থী। সার্বভৌম সবিনয়ে রাজার ইচ্ছে চৈতন্যের কাছে নিবেদন করলেন। শুনে কানে আঙুল চাপলেন চৈতন্য। বললেন, অসম্ভব। এরকম অনুরোধ আবার করলে আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো। সেদিন থেকে আমাকে আর দেখতে পাবেন না। সার্বভৌম বিস্মিত হলেন শুনে। বললেন, কিন্তু কেন, তিনি দেশের রাজা, তাছাড়া তিনি ধর্মানুরাগী, জগন্নাথের একান্ত সেবক, তাঁকে দর্শন দিলে কি এমন তোমার ক্ষতি হবে? চৈতন্য বললেন, আমি জানি তিনি ধর্মে অনুরাগী, জগন্নাথের একান্ততম সেবক। তবু তিনি রাজা। বিষয়ী ব্যক্তি। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, রাজদর্শন করে কি করবো।

সার্বভৌম তথাপি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন চৈতন্য বললেন, 'আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িনামপি।/যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যকৃতেরপি ॥' অর্থাৎ, যেমন সর্প ও তার আকৃতি দুইই আমাদের মনে ক্ষোভ (ভয়) সৃষ্টি করে, সেরূপ স্ত্রী জাতির ও বিষয়ী লোকের আকার দেখলেও ভয় হয়। (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ৯।২৫)।

এরপর এলেন রায় রামানন্দ। একই অনুরোধ করলেন চৈতন্যকে। বললেন, অনুগ্রহ করে আপনি রাজাকে একটিবার সাক্ষাৎ দিন। তিনি (রাজা) আপনার সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় অধীর অভিলাসে অপেক্ষা করছেন। চৈতন্য এবারও রাজাকে দর্শন দেবার আর্জি প্রত্যাখ্যান করলেন। বললে, 'জুয়ার সন্ন্যাসী' হয়ে একজন রাজার মতো বিষয়ী লোককে দর্শন দিতে পারি না। এ অনুরোধ আপনারা আমাকে করবেন না দয়া করে। তবে আমার দর্শনে কিছুমাত্র দেশের রাজা যদি উপকৃত হন, তবে তাঁকে নয়, তাঁর পুত্রকে আমি দর্শন দিতে পারি। অবশেষে তাই হলো, রাজার কিশোর পুত্রকে আলিঙ্গন দিলেন চৈতন্য। অবশেষে রথযাত্রার দিন রাজা প্রতাপরুদ্রের সাথে চৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎ অবিশ্যি আচম্বিতে ঘটেছিল। বলতে গেলে চৈতন্যের অজান্তে বস্তুত রাজা প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যের আসল মিলন হয়ছিল পরবর্তী সময়ে এক নির্জন উপবনে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃতে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে এর বিশদ বর্ণনা আছে।



এই যে চৈতন্যের মতা একজন শিখা সূত্র মুণ্ডিত, গৈরিক বসনধারী, রাজ্য রাজনীতি থেকে দূরে থাকা এক ঘর সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ প্রার্থীর জন্য দেশের রাজার এই ভিখারী সুলভ ব্যাকুলতা, এর পিছনে কিন্তু একাধিক কারণ থাকতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, এক যুদ্ধব্যস্ত রাজা তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে একজন বিদেশী সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য এতো উৎসুক কেন। এই 'কেন' এর প্রথম উত্তর আমরা ইতোপূর্বে পেয়েছি। নর্তকী লাবণ্য এবং পালোয়ান অনন্ত প্রতিহারীর চৈতন্যের প্রতি বশ্যতা ও বশ্যতাজনিত কারণে চৈতন্যের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এর প্রথম কারণ ছিল। বস্তুত, এই সন্ন্যাসীর মধ্যে রাজা এক অলৌকিক শক্তিমত্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঘোর তান্ত্রিকতার যুগে, অদৃষ্টনির্ভর মধ্যযুগীয় পটভূমিকায় সমকালীন মানুষের এমন একটা ধারণা খুব অস্বাভাবিক ছিল না। বিশেষত গজপতি প্রতাপরুদ্রের মতো একজন বিমূঢ়-বিভ্রান্ত, হতাশগ্রস্থ পিছু হাঁটা রাজার ক্ষেত্রে। মানুষের সহনশীলতার পরিধি যখন সীমানা ছাড়িয়ে যায়, অসহায়তার গ্লানি যখন বিভ্রান্ত করে মানুষকে, অধৈর্য হতাশাগ্রস্থ করে, তখন তারই দুঃসহতার প্রশমনে আধিদৈবিক, অলৌকিক শক্তির কাছে ছুটে যায় মানুষ। সৃষ্টির আদিকালে প্রাকৃতিক দুর্দৈববশত এই এক নিয়মে মানুষ বন্দনা করেছে অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত শক্তিকে। ঈশ্বর সেই ঐশী শক্তির প্রতীকী মাত্র। যুদ্ধতাড়িত, হতাশাগ্রস্থ প্রতাপরুদ্র চৈতন্য নামক সেই দুর্জয় দৈব-শক্তির সহাতায় প্রতিকূল আত্মশক্তিকে অকুতোভয় করতে চাইলেন।

এই যে এক রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব, গজপতি রাজবংশের তৃতীয় পুরুষ, যাঁকে আমরা ইতোপূর্বে যুদ্ধবাজ বলেছি। স্বাধীনচেতা শক্তিবানও বলেছি পর্যায়ক্রমে। অর্থাৎ একজন যোগ্য, প্রজাপালক হিসেবে একজন রাজার যা যা গুণাবলী থাকা দরকার প্রতাপরুদ্রদেবের তা অতিমাত্রায় ছিল। কিন্তু যে রাজাকে প্রায় রাজস্ব প্রাপ্তির জন্মলগ্ন থেকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার পক্ষে তার রাজপ্রাসাদের কোন স্তম্ভে ফাটল ধরলো তা দেখা সম্ভব না। আসলে রাজা তো একটা বিরাট বিশাল ইমারতের মতো। সেই ইমারতকে ধরে রাখে অসংখ্য স্তম্ভ, খিলান। কিন্তু সেই খিলান স্তম্ভে যদি ভাঙন ধরে, ফাটল ধরে, তাহলে স্বভাবতই সে ইমারতের টিকে থাকার স্থায়িত্ব কমজোরী হয়ে পড়ে। আর সে এক একটি স্তম্ভ খিলান হলো রাজার মন্ত্রী, সেনাপতি, পার্ষদ প্রভৃতি রাজপুরুষেরা। এদের বিশ্বস্ততা, অনুগত্যই হলো রাজশক্তির প্রধান সম্বল। আমরা ইতিহাস থেকে জেনেছি, এক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির অসহায়তায় সিরাজ নামক এক অস্ত্র-সৈন্য শক্তিবান রাজা দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছে নির্মমভাবে পরাজিত হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় মশকের কাছে হস্তীর পরাজয়ের মতো, আর ষড়যন্ত্রের জন্য তা সম্ভবপর হয়েছিল। পৃথিবীতে এই একটা অভূতপূর্ব উপায়ে বহতা নদীর নিম্ন এলাকায় জল পানরত হরিণের পক্ষে উজানি জলে স্নানরত বাঘের জলঘোলা করা সহজেই সম্ভব হয়।



রাজা রাজার প্রতিপক্ষী হলে এর মধ্যে আমরা কোন অস্বাভাবিকতা দেখি না। পাশাপাশি দুই অবস্থিতি ঘিরে সংঘর্ষ আসতেই পারে। ইতিহাসেরও পাতায় আমরা সতত এই ধারা দেখে আসছি। সে যুগে রাজতন্ত্র সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় এক দেশের আয়তন, তার সীমানার বাড়াকমা নির্ভর করতো সে দেশের সৈন্যবল অস্ত্রবলের ওপর। আবার রাজ্যের প্রতিকূল আবহাওয়ায় এক রাজার পতন ঘটতো নতুন রাজার আগমনে। এই যে আভ্যন্তরিক প্রতিকূলতা

বশত রাজা, রাজ্যের পতন এর পিছনে মূলত মন্ত্রী, রাজ পুরুষদেরই অদৃশ্য হাত থাকতো। আসল কথা হলো, সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে যেমন সর্ষেপোড়া দিয়ে ভূত ছাড়ানো ওঝার পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে, তদ্রূপ দেশের মন্ত্রী সেনাপতি জাতীয় রাজপুরুষেরা যদি রাজার বিপক্ষে যায়, সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হোক, গোপনে বা সর্বসমক্ষে হোক, তাহলে শত লৌহ বর্মাবৃত করলেও রাজগদ্দি টিকিয়ে রাখা রাজার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এক বীর্যবান পরাক্রমশালী রাজারও এতবস্থায় ভীরুতা, দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া কোন বিচিত্র না।

রাজা কর্তৃক আভ্যন্তরিক বিদ্রোহ দমনের কাহিনী যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল তা কিন্তু ওড়িশার গজপতি বংশের তৃতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রদে, যাঁর নিঃস্বতা, হতাশা, দৈর্ন যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত আমরা বর্ণনা করতে চলেছি, তিনি সৈন্য অস্ত্রবলে বীর্যবান হলেও রাজার বড়ো সম্বল কূটনৈতিক দক্ষতায় তিনি খুব পারঙ্গম ছিলেন বলে মনে হয় না।। ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' নাটকের এক জায়গায় আগ্রা দুর্গে বন্দী বৃদ্ধ শাহজাহান পুত্রী জাহানারার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলছেন, সম্রাট সাজাহান নয়, পিতা সাজাহান বলছি, ঔরঙ্গজীবকে তুই ক্ষমা করে দে জাহানারা। বস্তুত, স্নেহ মমতা বাৎসল্যপ্রীতি সম্রাটের ন্যায় বিচারকেও বাধা দেয় এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানবিকতার দিক থেকে এখানে তিনি সমাজ সংসারের চোখে মহান সন্দেহ নেই। কিন্তু যিনি দেশের হাজার হাজার মানুষের মা-বাপ, তাদের সুখ দুঃখ ভালো মন্দের নিয়ামক, বিচারকের আসনে বসে রাজদ্রোহী পুত্রের জন্য তাঁর এ দুর্বলতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরাজয়ই না, তা পক্ষপাতিত্ব দোষেও দুষ্ট।

বস্তুত, এমনই এক বিদ্রোহীকে অযাচিত মার্জনা প্রদর্শন করতে গিয়েই আমাদের আলোচিতব্য রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের বড়ো রকমের রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছিল। রাজনীতিতে বিদ্রোহীকে দুধ কলা দিয়ে পোষা আর কালসাপ পোষা বোধহয় একই ব্যাপার। ইতিহাসে বিম্বিসারের (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) বেলায় আমরা এ দৃশ্য দেখেছি। প্রিয় পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন এই সম্রাট। এই যে ইতিহাসের বিরাট ঐতিহ্যময় মৌর্য সাম্রাজ্য (The Maurya Empire) যেখানে চাণক্যের মতো কূটনীতিক ছিলেন, চন্দ্রগুপ্তের মতো সম্রাট ছিলেন সেই বংশেরও পতন হয়েছিল এক রাজপুরুষের (সেনাপতি পুষ্যমিত্র) বিশ্বাসঘাতকতায়। ইতিহাসের এই শিক্ষা থেকে আমরা জেনেছি, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, জয় পরাজয় ঘটে, সন্ধি হয়। পরাজিত রাজা শর্তানুসারে রাজ্যখণ্ড ফিরে পায়। কিন্তু রাজার তলোয়ার যদি বিদ্রোহ করে তার সাথে সন্ধি চলে না। তখন তাকে বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। দেশের মন্ত্রী, সেনাপতি, আমীর ওমরাহগণ রাজার সেই তলোয়ার।

অতঃপর আমরা ইতিহাসের একটি দুর্যোগপূর্ণ সময়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো।



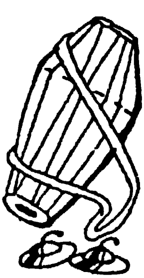
চৈতন্যের নীলাচলে পদার্পন করার এক বছর আগের ঘটনা।

ইংরাজী বছরের ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ওড্ররাজ প্রতাপরুদ্র তখন দক্ষিণ অভিযানে ব্যস্ত। এসময় বাঙলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী আরামবাগ জিলার গড় মান্দারন থেকে বেরিয়ে উৎকলদেশের যাজপুর কটক প্রভৃতি জয় করে ঝড়ের বেগে পুরীতে পৌঁছে গেলেন। এসময় মুসলমান সেনাদের হাতে প্রচুর পুরাকীর্ত্তির ধ্বংস সাধন হয়েছিল। বিশেষত প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ও হিন্দু

মন্দির। এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতে লিখেছেন, 'যে হুসেন শাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে/দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেন দেউল বিশেষে।' এসময় যাজনগর ওড়িষ্যার নামে মুদ্রা নির্মান করে মুসলমান বাহিনী বিজয় উৎসব পালন করেছিল। মুসলমান বাহিনীর এই আকস্মিক আক্রমণের খবর পেয়ে দাক্ষিণাত্য অভিযান স্থগিত রেখে প্রতাপরুদ্র সসৈন্যে দেশে ফিরে আসেন। এবং ইসমাইল গাজী সহ মুসলমান বাহিনীকে আরামবাগ জিলার গড় মান্দারন দুর্গ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। তাড়া খাওয়া ভীত মুসলমান বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য মান্দারন দুর্গে আশ্রয় নেয়। এদিকে ওড়িশার সৈন্যরা দুর্গ অবরোধ করে। বেশ কিছুদিন দুর্গ অবরোধের পর, যখন দুর্গ অভ্যন্তরে সরবরাহ অভাবে দানাপানি বন্ধ হতে বসেছে, জয় প্রায় অনিবার্য, ঠিক এসময় রাজা প্রতাপরুদ্র সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের হাতে দুর্গ অবরোধের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে ফিরে গেলেন রাজধানীতে। সেনাপতির ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। অচিরাৎ সেই বিশ্বাসের মর্যাদাও দিলেন সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর। রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হঠাৎ দুর্গ অবরোধ তুলে নিলেন তিনি। কিন্তু কেন তিনি তা করলেন। আসন্ন জয়ের মুখে হাতের মুঠোয় পেয়েও মুসলমান বাহিনীকে তিনি অবরোধ মুক্ত করে দিলেন কেন? সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের এই বিচিত্র ভূমিকা থেকে তার আসল দুরভিসন্ধি আমাদের খুঁজে নিতে হবে। এতে কি প্রমাণিত হয় না যে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতির সঙ্গে তার একটা গোপন চুক্তি হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ ষড়যন্ত্রের একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে, আর তা হলো, ছলে বলে কৌশলে গজপতি রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন যা পরবর্তীকালে সম্ভবও হয়েছিল।

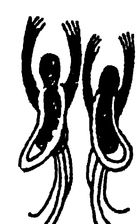
কিন্তু তারপরও রাজা প্রতাপরুদ্রদেব সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন কেন? তিনি কি বিদ্যাধরের দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে পারেন নি? কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব। অবরুদ্ধ মান্দারন দুর্গে মুসলমান সেনারা পরাজয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছলো। পরাজয় তাদের অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবু সে অবরুদ্ধ দুর্গ ভেদ করে মৃত্যুর চক্রব্যূহ থেকে তারা যখন অবলীলায় পালাতে সক্ষম হলো, তখন, অন্তত এ কথা ভেবে, রাজা প্রতাপরুদ্র কি নিজের সেনাপতির প্রতি কিছুমাত্র সন্দিহান হন নি? অন্তত ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে সন্দিহান না হলেও তার যে কোথাও একটা ভুল ছিল, গাফেলাতি ছিল, এটুকু মালুম করার মতো তাঁর কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল নিশ্চয়। এসত্ত্বেও তবু কেন তিনি অপদার্থ সেনাপতির প্রতি অনুকম্পা দেখালেন, এবং নিজের মৃত্যু ফাঁদ নিজেই রচনা করলেন, এটা আজও ইতিহাসের পরম বিস্ময়। শুধু মাত্র অকৃতকার্য মন্ত্রীকে তিনি মার্জনা করলেন তাই নয়, রাজের উচ্চপদে তাকে বহালও রাখলেন নির্বিবাদে।



ওড়িশার জগন্নাথ মন্দিরের প্রাত্যহিক ডায়েরি জাতীয় (রোজনামচা) গ্রন্থ 'মাদলাপঞ্জী'র প্রাচীন সংস্করণে আছে, এ ঘটনার পর, অর্থাৎ মুসলমান সেনাদের ওড়িশা থেকে হুগলী জেলার মান্দারনে তাড়িয়ে দিয়ে আসার পর রাজা (প্রতাপরুদ্র) সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করলেন। ('তাহাঙ্কু...রাজা রাজ্যভার দেলে।' মাদলাপঞ্জী, প্রাচীন সং)। কিন্তু উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'The history of medieval vishnavism in Orissa' গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মাদলাপঞ্জীর এ তথ্য অনৈতিহাসিক। অবিশ্যি

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই 'অনৈতিহাসিক' যুক্তিটির প্রসঙ্গে আমাদেরও কিছু বক্তব্য আছে। তা হলো, মাদলাপঞ্জীর এই তথ্যটি অর্থাৎ ১৫০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশায় মুসলমান অভিযান ও সেই অভিযান প্রতিহত করার পর, রাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক সেনাপতি বিদ্যাধরকে (মাদলাপঞ্জীতে আছে মন্ত্রী) ওড়িশার রাজ্যভার অর্পণ করার যে বিবরণ আছে তা সর্বৈব অনৈতিহাসিক বলে আমরা মনে করি না। এসময় রাজা তাঁর সেনাপতিকে রাজ্যের কোন একটি প্রদেশ খণ্ডের শাসনভার অর্পণ করেছিলেন বলে মনে হয়। এবং সেই প্রদেশটিরও নাম ছিল সম্ভবত কলিঙ্গ। কেননা, আমরা দেখছি, বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রীব্যাস রায়ের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'শ্রীব্যাস যোগিচরিতম' (রচনাকাল আনুমানিক ১৫৩৫ খ্রীঃ) এর পঞ্চম অধ্যায়ে গোবিন্দ বিদ্যাধরকে 'কলিঙ্গাধিপতি' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে লেখা আছে, 'বিদ্যাধর পাত্র নাম কলিঙ্গাধিপতি।'

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর 'The History of medieval Vishnavism in Orissa' গ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্রকে বেশ নরম প্রকৃতির শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, It is difficult to like this sickening talk of moral turpitude with the chaitanya movement, which taught mankind to be faithful and honest......Thus Vishnavism or on Vishnavism the succession of weakling, the moral degeneration of high officials of the state and the decline in the military strength of the nation would have brought about the downfall, sooner later (chap. XI, Pages 177-78)। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, রাজা প্রতাপরুদ্রদেব রাজনীতি বা রণনীতির ক্ষেত্রে নেহাৎই দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন বলে মনে হয় না। রাজমহেন্দ্রী অঞ্চলের শাসনকর্তা রায় রামানন্দের ছোট ভাই গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রতি 'চাঙ্গে' চড়ানো (এক ধরনের মৃত্যুদণ্ডের প্রথা) আদেশ থেকে তাঁর রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহীর প্রতি কঠোর মনোভাবের কথা প্রকাশ পায়। গোপীনাথ পট্টনায়কও গোবিন্দ বিদ্যাধরের মতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলের মালঝিট্যা দণ্ডপাটের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি। সুতরাং আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি, অন্তত বাড়ো রকমের রাজ বিরোধী ব্যক্তিকে তিনি কখনো ক্ষমা করতেন না। তবুও মন্ত্রী বা সেনাপতি যাই হোক গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্রতি তিনি অনুকম্পা দেখালেন কেন ? বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধীকে শাস্তিতো তিনি দিলেনই না, পরন্তু তাকে উচ্চরাজপদে বহাল রাখলেন। মাদলাপঞ্জীর বক্তব্য অনুযায়ী মনে হয়, এসময় গোবিন্দ বিদ্যাধরের পদন্নোতিও ঘটিয়েছিলেন রাজা। কিন্তু অধীনস্থ সেনাপতির প্রতি কেন এ নরম মনোভাব দেখালেন রাজা প্রতাপরুদ্র ? আসলে রাজা বুঝতে পেরেছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধরের রাজ বিরোধী চক্রান্তের শেকড় ততোদিনে যে গভীরে পৌঁছেছে সেখান থেকে এ বিষবৃক্ষ সমূলে উৎখাত করা দুরুহ। কোন রাজার পক্ষে এ ধরনের মনোভাব অবশ্যই কাপুরুষতার পরিচায়ক, কিন্তু জান মান নিয়ে বাঁচার স্বার্থে রাজাকে তা করতে হয়েছিল। অবিশ্যি ঘরভেদী বিভীষণ জাতীয় এরধনের শত্রুর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করার পিছনে রাজার একতরফা দুর্বলতার দিকটিই দেখলে আমাদের চলবে না। এর একটা ভালোর দিক, অন্তত জোড়াতালির দিকও ছিল। একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত কৃষ্ণদেব রায়, অন্যদিকে আগ্রাসী হুসেন শা। এই দুই বাইরের প্রবল শত্রুর



মাঝখানে থেকে নতুন করে আর ঘরের শত্রুকে তিনি ঘাটাতে চাননি। উচ্চপদ দিয়ে, আরও ক্ষমতা দিয়ে তাকে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন। এতে করে তাঁর আরও কিছুকাল রাজ সিংহাসনে থাকা সম্ভব হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর সিংহাসন চ্যুতির পথও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

স্বভাবতই চৈতন্যের নীলাচলে পদার্পণের কিছুকাল আগে থেকেই রাজা প্রতাপরুদ্র একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। রাজ্যের বাইরের এবং ভেতরের শত্রুদের ক্রমান্বয় আগ্রসনে উৎকলের রাজশক্তিও কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এমন সময় ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য এসে পৌঁছালেন পুরীতে। রাজা তখন যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় নীলাচলে ছিলেন না।

চৈতন্য উৎকলদেশে প্রবেশ করেই সীজারের সেই বিখ্যাত উক্তি 'ভিনি-ভিদি-ভিসি'র মতো একে একে তিনটি মানুষকে জয় করে বলতে গেলে সারা পুরুষোত্তমে সাড়া ফেলে দিলেন। একজন রাজা প্রতাপরুদ্রের অন্যতম সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। অন্যজন জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল অনন্ত প্রতিহারী। এবং তৃতীয়জন নর্তকী লাবণ্য দেবদাসী। বলা বহুল্য, সে সময় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের যা প্রতিপত্তি ছিল তাতে মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল এবং প্রধানা দেবদাসীর যুগপৎ শক্তিমত্তা এবং যৌবন সৌন্দর্যের গ্ল্যামার যে উৎকলবাসীদের মুখে মুখে ফিরতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নেই। কেননা, উৎকলবাসীর কাছে জগন্নাথ হচ্ছেন অন্যতম জাগ্রত দেবতা। স্বয়ং দেশের রাজা যাঁর পথ মার্জ্জন করেন সুবর্ণমার্জ্জনী দিয়ে, তাঁর মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল এবং প্রধানা নর্তকী যে শ্রেষ্ঠ বীর এবং শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই বীর যখন একজন অচেনা অজানা মাথা নেড়া সন্ন্যাসীর নাম মাত্র ধাক্কায় মন্দিরের পাথরের চাতালে মুখ থুবড়ে পড়লো, এবং এর কিছুদিন পরেই লাবণ্যের মতো নর্তকীশ্রেষ্ঠা যখন সেই সন্ন্যাসীর অনুরাগী হয়ে পড়লো, তখনই প্রায় রাতারাতি উৎকলবাসীর চোখ গিয়ে পড়লো ওই অজ্ঞাত তরুণ সন্ন্যাসীর ওপর। কে এই অলৌকিক শক্তিধর সন্ন্যাসী। তারা আর দেখলো রাজার অন্যতম সভা পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমও সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরক্ত। মধ্যযুগীয় সমাজে ন্যায় নীতির চেয়ে ধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো বেশি। শাসন ব্যবস্থাও ছিল একপেশে ব্রাহ্মণ প্রধান। মৌলিক চিন্তাধারার চেয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব ছিল সমাজে বেশি। স্বাভাবিক কারণে কি বাঙলায়, কি ওড়িশায় উচ্চ বংশজাত মানুষেরা ব্রাহ্মণ্য আদর্শ রক্ষার নামে ব্রাহ্মণেতর, সৎশূদ্র ও সঙ্কীর্ণ শূদ্র প্রভৃতির বিভাজন ও তাদের মধ্যে নানান ব্যবধানের বেড়া টেনেছিলেন। শুধু সেকালে নয় আজও জগন্নাথ মন্দিরে অনুশূচিত মানুষদের প্রবেশাধিকার নেই।

চৈতন্যের উৎকলে পদার্পণের মাত্র এক বছর আগে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশায় বিশেষত নীলাচলে মুসলমান আক্রমণ ঘটেছিল। অবাধে মঠ মন্দির ও তার বিগ্রহের ধ্বংস সাধন, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, খুন, নারী ধর্ষণ, সে যুগের আক্রমণে আক্রান্ত দেশের মানুষদের ওপর চরম নিষ্ঠুরতা নির্দয়তা প্রদর্শন করা হতো। ইসমাইল গাজীর ওড়িশা অভিযানের ক্ষেত্রেও এর কোন রকমফের ছিল না। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে এর কিছু কিছু উদাহরণ আছে। নীলাচলে চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ কহ্নাই খুন্টিয়া তাঁর 'শ্রীমহাভাবপ্রকাশ' নামক ওড়িয়া গ্রন্থে লিখেছেন, গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের সেনাপতি ১৭ অঙ্কে অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশা আক্রমণ করে বহু

ইন্দু কীর্তি ধ্বংস করলেন এবং পুরী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তখন কহ্নাই ন্টিয়া প্রভৃতি জগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথ বিগ্রহকে দক্ষিণ দুয়ারের গুপ্ত পথ দিয়ে প্রথমে লোকনাথ মন্দিরে রাখলেন, এবং সেখান থেকে রাতারাতি গড় কঙ্কলে (চিল্কা হ্রদ ও ভার্গবী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ওড়িশার একটি প্রাচীন বন্দর) সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এবং সেখানে চড়েই নামক একটি পাহাড়ের গুহায় জগন্নাথকে লুকিয়ে রেখে দ্রুত দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত রাজাকে খবর দিতে গেলেন।

'গুপ্ত দক্ষিণ দ্বাররে বাহার হোইলু।
বালি লোকনাথ ঠারে ব্রহ্মাকু রাখিলু॥
মাত্ররে রজনী যেহু গাঢ়তর হেলা।
হস্তিরে বসাই নরসিংহ তাকু নেলা॥
চারিদিনে গড় কেঙ্কলরে পহঞ্চিলা।
সররে স্নাহান করি সন্তোষ লভিলা॥
এ মত্ত ভয়রে নাই পরম ঈশ্বর।
রখিলে গুর্মক থিলা হরস মধ্যর॥'

[মহাভাবপ্রকাশ/তৃতীয় বৃত্ত]

ওড়িশীদের সর্বাপেক্ষা ভক্তির পাত্র জগন্নাথ। অদ্যাবধি যে জগন্নাথকে বাদ দিয়ে ওড়িশার ধর্ম-শিল্প-সংস্কৃতি কোন কিছুকে কল্পনা করা যায় না, সেই জগন্নাথকেও মুসলমান আক্রমণের সময় তাঁর নিবাসস্থ মন্দির রক্ষা করতে সমর্থ হননি উৎকলবাসী। তাঁকে গোপনে সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল গুপ্ত পাহাড়ী গুহায়। এরকম এক অভাবনীয় পরিস্থিতিতে ওড়িশা তথা পুরুষোত্তমের সাধারণ মানুষের কি পরিস্থিতি হয়েছিল তা আমরা কিছুটা কল্পনা করে নিতে পারি। আক্রমণকারীদের সেই ধ্বংসলীলা হয়তো বা থেমে গেছলো রাজা প্রতাপরুদ্রের চটজলদি আগমনে। কিন্তু সেই সব ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের রাত্রির মতো স্মৃতি বহুদিন উৎকলবাসীদের মন থেকে মুছে যায়নি নিশ্চয়। সেই ধ্বংসের উন্মত্ততাজনিত ত্রাস, আর হারানোর দুঃসহ বেদনায় ওড়িশাবাসী যখন বিভ্রান্ত, ঠিক তখন, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের মতো চৈতন্যের পদার্পণ ঘটলো নীলাচলে। আর পদার্পণ করার অব্যবহিত সময়ের মধ্যে পরপর দুটি বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হলো উৎকলে। জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান রক্ষী এবং প্রধানা দেবদাসী চৈতন্যের শরণাগত হলো। শরণাগত হলেন পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের মতো মানুষ। স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষোত্তম তথা উৎকলদেশী অপরাপর মানুষদেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো নবাগত গৈরিক, শিখা সূত্র মুণ্ডিত সন্ন্যাসীর ওপর। অদ্যাবধি সর্ব ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে বোধ-করি চৈতন্যই ছিলেন সর্বাপেক্ষা রূপবান পুরুষ। চৈতন্য শুধুমাত্র গুণাবলীর জন্য নয়, ঐশ্বরিক রূপের বিভূষণেও মানুষকে সম্মোহিত করেছিলেন। এমন এক কাঞ্চন গৌর দেহকান্তি সন্ন্যাসীর মুখে উচ্চারিত হলো এক অমোঘ কিন্তু অভিনব মন্ত্র, 'চণ্ডালোপি দ্বিজোশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' সেই চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ঈশ্বরে ভক্তি রাখে। বস্তুত মানুষের একতা, একাত্মতা নিয়ে চৈতন্যের আগে এমন কথা কেউ বলেননি ভারতবর্ষে। সুতরাং নদী যেমন সবেগে সাগরের দিকে ধেয়ে যায়, যুগযুগান্তের বঞ্চিত নিপীড়িত অবহেলিত-উপেক্ষিতেরা তেমনই ছুটে আসতে লাগলো আচণ্ডালপ্রেমী মানুষটির কাছে। তিনি আরও বললেন, 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।' তৃণাপেক্ষা নীচ ও বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হও।

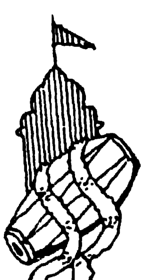


খবরটা চটজলদি পৌঁছালো দেশের রাজার গোচরে। কি ব্যাপার, না এক সন্ন্যাসী এসেছে মহারাজ, মাথা নেড়া। গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মতন ফর্সা। তো এসেই আমাদের অনন্ত গোচ্ছিকা পালোয়ানকে একটি থাপ্পড় মেরে কাহিল করে দিয়েছে। শুনে চমকে উঠলেন উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র। এ তো সামান্য সন্ন্যাসী নয়। কিন্তু কে এই অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ রাজকর্মচারীরা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বললেন, কে এই নবাগত সন্ন্যাসী তোমরা খোঁজ নাও। প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। কিন্তু তাঁর সমস্ত খবর আমার চাই।

রাজা রাজার মতো মুখে একথা বললেও মনের দিক থেকে নিঃসহায় ভিক্ষুকের মতো চৈতন্যের পদমূলে নিজেকে সেদিন থেকে সঁপে দিয়েছিলেন। সেদিন থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল তাঁর, চৈতন্যের অলৌকিক শক্তির ছত্রছায়ায় শত্রু পরিবেষ্টিত রাজনৈতিক কুহেলিকা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন তিনি। চৈতন্য কিন্তু প্রথমে রাজাকে আমল দেননি। বলেছিলেন, বিষয়ী লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিষয়ী লোকের পুত্রকে সাক্ষাৎ দিলেন তিনি। আর চৈতন্যেরও বোধকরি রাজাকে প্রয়োজন ছিল নবদ্বীপ থেকে যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি উৎকলে এসেছেন তাতে রাজা প্রতাপরুদ্রের সাথে তার পরিচিতি অবশ্যম্ভাবী ছিল বলে মনে হয়।

এদিকে রাজা স্বয়ং চৈতন্যকে পুরুষোত্তমে ঠাঁই দেবার মনস্থ করলেন। যেখানে আবহমান কাল ধরে অদ্যাবধি ধর্মীয় আবহাওয়া বিদ্যমান, সেখানে ধর্মীয় অনুশাসনে গড়া মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থায় একজন ধর্মপরায়ণ সন্ন্যাসীর প্রতি দেশের রাজার আনুগত্য প্রবণতা খুব বিচিত্র ঘটনা না। কিন্তু সদ্যাগত প্রায় অজানা সন্ন্যাসীটিকে তিনি আশ্রয় দিলেন কোথায়, না রাজারই শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেব কাশী মিশ্রের বাড়িতে। এটিই হলো সর্বাপেক্ষা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। এই expansion of idea থেকে আমরা রাজা প্রতাপরুদ্রের চৈতন্যের প্রতি যুগপৎ নিষ্ঠা ও আনুগত্যের গভীর গহনতম দিকটি অনুধাবন করতে পারি। ক্রমে দেখা গেল শুধু রাজাই নন, পুরুষোত্তমের সিংহভাগ অধিবাসী সহ বিশিষ্ট ধর্মবেত্তা মানুষেরা–যাঁদের ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, কারু বা পণ্ডিত বলে প্রচার ছিল, তাঁরাও কি এক মায়ামন্ত্রে চৈতন্যের গৈরিক ছত্রতলে একত্র হয়েছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হলো, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই-'Journal of the Behar and Orissa Research Society' পত্রিকায় চৈতন্যের ভক্তদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, চৈতন্যের সমস্ত পরিকর ভক্তরা বাঙালি ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'Himself a Bengali, his associates were all of the same nationality.' (vol. vi. pt. I p.62)। মহামহোপাধ্যায় মশায়ের এ হেন উক্তি একাধিকক্রমে বিস্ময়কর ও অযৌক্তিক। কেননা, তাঁর (চৈতন্যের) যে ৪৯০ জন বিশিষ্ট পরিকর ছিলেন তার মধ্যে ৬৩ জন অবাঙালী। এর মধ্যে ওড়িশির সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। যেমন কহ্নাই খুন্টিয়া, ভবানন্দ পট্টনায়ক, রায় রামানন্দ, শিখি মহান্তি, সিংহারি, নিরঞ্জন মহাপাত্র, পুষ্পালক কর, বটেশ্বর সাঁই, গোপীনাথ পট্টনায়ক, পরমানন্দ মহাপাত্র। এ ছাড়া জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী লাবণ্য ও দ্বারপাল অনন্ত প্রতিহারী চৈতন্যের প্রতি নির্বিবাদে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি রাজগুরু কাশী মিশ্রও চৈতন্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন ক্রমে। অবিশ্যি ওড়িশার বিখ্যাত 'পঞ্চসখা' জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুত, যশোবন্ত ও অনন্ত দাসকে আমরা চৈতন্যের প্রত্যক্ষ



ভক্ত খ্যাপন করতে কিছু সংশয় প্রকাশ করছি। প্রত্যক্ষ ভাবে চৈতন্যের সাথে তাঁদের যোগাযোগ ছিল সত্য, কিন্তু চৈতন্যের যে পথ, যে মত, যে ধর্ম ও ধর্মীয় উপলব্ধি তার সঙ্গে পঞ্চসখার মত পথের অনেক ফারাক ছিল বলে প্রত্যয় হয়। উক্ত পঞ্চসখা সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন বলে জানা যায়। অবিশ্যি কেউ কেউ পঞ্চসখা ও তার সম্প্রদায়কে চৈতন্যের অনুগত ও বৈষ্ণব বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত মশাই তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রায় সমসাময়িক কালে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে উড়িষ্যায়ও 'পঞ্চসখা' সম্প্রদায় বলিয়া একটি ভক্ত বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন।' (পৃষ্ঠা-২৮৫)।

কিন্তু শ্রীদাসগুপ্ত মশায়ের উক্তি সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত নয় বলে আমাদের মনে হয়। কেননা, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, 'though they outwardly professed the Vaishnava faith and propagated the chaitanya cult, yet in their heart of hearts they were but sincere and staunch pioneers and champions of the long neglected and almost forgotten religion of the Mahayana School. ('Modern Budhism in Orissa'/ pages. 39)। বিশ্বভারতীর ওড়িয়া ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর 'অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখাধর্ম গ্রন্থে পঞ্চসখা ও তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে চৈতন্যপন্থী সম্প্রদায়ের নানান বিরোধের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। আসলে একথা যেমন ঠিক, ওড়িশার পঞ্চসখা সম্প্রদায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন, তেমনই একথাও ঠিক যে তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মেরও ধারক ছিলেন, কিন্তু ধর্মগত ব্যাপারে ওড়িশা ও চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের প্রচুর মত পার্থক্যও ছিল। যেমন অনাকার ও শূন্যবাদের ক্ষেত্রে। যদি তর্কের খাতিরে এসত্ত্বেও ধরে নেওয়া যায় যে, চৈতন্যপন্থী ও পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের মত-পথের মধ্যে তেমন বড়ো রকমের কোন গরমিল ছিল না, তাহলে, ওড়িশার বিখ্যাত পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের শিরোমণি (যাঁদের চৈতন্যের অন্যতম পরিকর বলেও অনেকে মত প্রকাশ করেছেন) যথাক্রমে জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুৎ, যশোবন্ত ও অনন্ত দাস প্রভৃতিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে স্থান দেওয়া হলো না কেন? বস্তুত বিখ্যাত চৈতন্য চরিতকারেরা পঞ্চসখার নামমাত্রও উল্লেখ করেন নি তাঁদের বিরোচিত গ্রন্থে। অথচ পঞ্চসখার সকলেই বিশেষত জগন্নাথ দাস ছিলেন তৎকালীন নীলাচলে এক নম্বর নামকরা গুরু স্থানীয় ব্যক্তি। শোনা যায় জগন্নাথ দাসের ভাগবত পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে তদানীন্তন ওড়িশায় অনেক নিরক্ষর ব্যক্তিও সাক্ষরতা লাভ করেছিল। তাছাড়া এই জগন্নাথ দাস ছিলেন স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান মহির্ষী পট্টমহাদেবী শ্রীগৌরীর গুরু।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে একমাত্র শ্রীজীব গোস্বামীর আরোপিত বৈষ্ণব বন্দনায় ও দেবকীনন্দনের রচনায় খুব সামান্য পঞ্চসখার অন্তর্গত মাত্র দু'জনের নাম পাওয়া যায়। বলরাম ও জগন্নাথ দাসের। বোধকরি এর থেকে চৈতন্য বিরোধী পাষণ্ডী প্রধান গোপাল চাপালকেও অধিক প্রধান্য দেওয়া হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে। বলা বহুল্য, এই স্বল্প উল্লেখ বা অনুল্লেখের কারণ মূলত সাম্প্রদায়িক বা সম্প্রদায়গত।

চৈতন্য যখন নীলাচলে পদার্পণ করেছিলেন, এমন কি তাঁর স্থিতি কালেও উৎকলে পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। বুদ্ধিমান চৈতন্য বিদেশ



বিভূঁইয়ে এসে সেই কারণে হয়তো স্থানীয় ধর্মীয় গোষ্ঠী পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের সাথে কোন বিরোধ বাধাতে চান নি। তিনি পঞ্চসখার কর্তা ব্যক্তিদের বিশেষত জগন্নাথ দাসকে বারংবার দলভুক্ত করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয়। বস্তুত, চৈতন্যের এই পঞ্চসখা প্রীতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাও খুব ভালো চোখে দেখেন নি। এ ব্যাপারে বেশ কিছু চৈতন্য ভক্তের ঠাণ্ডা লড়াইও শুরু হয়ে গেছলো স্বয়ং চৈতন্যের সঙ্গে। এ কথা অপ্রত্যাশিত মনে হলেও খুব সত্য যে বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব চৈতন্যের পঞ্চসখা-প্রীতি নীতির জন্য চৈতন্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করে, পুরুষোত্তম ছেড়ে সুদূর বনবিষ্ণুপুর চলে গেছলেন। এসব কথা উৎকল কবি দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' পাঠ করলে বিশদ ভাবে জানা যাবে। দিবাকর দাস লিখেছেন, শুধুমাত্র পঞ্চসখার জগন্নাথ দাসকে 'অতিবড়' বলার জন্য চৈতন্যের ভক্ত ও নিকটতম পার্ষদেরাও তাঁর বিরোধিতা করেছিল।

'সে প্রভু প্রেম অভিলাষে। ডাকিলে অতিবড় দাসে॥
ক্ষেত্রকু যিবা সজ হু অ। তা শুনি সমস্তে বিস্ময়॥
যেউঁ কথা এতে দূর। অইলুঁ পুনি তা প্রচার॥
পুরুষোত্তমে যেবে থিবা। এহি ভাষা সিনা শুনিবা॥'

[জগন্নাথ চরিতামৃত'/দিবাকর দাস]

এসময় চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নিত্যানন্দকে বলতে শোনা গেল, 'উৎকলীয়ে দ্বিজে প্রীতির্ভবতো যদি জায়তে।/কিমিতি ন্যূনতাস্মাসু নোচিতং ভবতা কৃতম॥' উৎকলীয় ব্রাহ্মণকে (জগন্নাথ দাস) যদি আপনার ভালো লেগে থাকে উত্তম কথা। কিন্তু তাই বলে আমাদের ছোট করা আপনার উচিত হয়নি। চৈতন্য বললেন, এ দেশের কীটপতঙ্গ, কাঠ-পাথর, বালুকা সবই শ্রেষ্ঠ, মানুষ তো কথাই নেই। সেই কারণে আমি জগন্নাথ দাসকে 'অতিবড়' বলেছি। ওর সাথে আমি মিলেমিশে পুরুষোত্তমে থাকতে চাই। কথাটা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পছন্দ হলো না, তাঁরা নীলাচল ত্যাগ করে যাজনগরে চলে গেলেন। কেউ কেউ চলে গেলেন সুদূর বনবিষ্ণুপুরে। কিছুদিন পর বনবিষ্ণুপুর থেকে গৌড়ীয় পন্থী বৈষ্ণবেরা জনৈক মাধব দাসের মারফত একখানা পত্র পাঠালেন চৈতন্যকে। লিখলেন, পুরুষোত্তম ছেড়ে চৈতন্য যেন সত্বর তাদের কাছে চলে আসেন। আরও লিখলেন, চৈতন্যের পক্ষে আর নীলাচলে না থাকাই শ্রেয়। কিন্তু এ পত্র নিষ্ফল হলো। চৈতন্য বললেন, 'এ ক্ষেত্র ন ছাড়িবি মুহিঁ।' এ পত্রে এমন একটা ইঙ্গিতও ছিল, যদি চৈতন্য পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের জগন্নাথ দাসের ওপর থেকে 'অতিবড়' সম্বোধনটি প্রত্যাহার করে নেন তাহলে বিক্ষুব্ধ বৈষ্ণবেরা আবার নীলাচলে ফিরে আসবেন। 'অতিবড় পদ ছাড়াহি।/পুরুষোত্তম নেবে সেহি॥' (জগন্নাথ চরিতামৃত)। কিন্তু চৈতন্য তাঁর 'অতিবড়' কথাটি প্রত্যাহার না করে অবিচল রইলেন। সুতরাং

'বৈষ্ণব মেলানি হোইলে। বৃন্দাবনকু চলি গলে॥
প্রতি সম্বৎসরে আসন্তি। গুণ্ডিচা গহন খাটন্তি॥
অতিবড় পদে রুষন্তি। লেউটি বৃন্দাবনে যান্তি॥'

[জগন্নাথ চরিতামৃত]



দিবাকর দাস বিরোচিত উপরোক্ত পয়ার সমূহ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চৈতন্যের ওপর রুষ্ট হয়ে নীলাচল-স্থিত চৈতন্য ভক্তরা প্রথমে বনবিষ্ণুপুর ও যাজনগরে চলে যান। সেখান থেকে তাঁরা পঞ্চসখার সংসর্গ থেকে চৈতন্যকে মুক্ত করবার শেষ চেষ্টা করেও সফল হন না। তখন তাঁরাই

চৈতন্যের সংসর্গ ছেড়ে আরও দূরে সুদূর বৃন্দাবনে চলে যান চিরস্থায়ী ভাবে। অবিশ্যি দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' থেকে জানা যাচ্ছে, এসব বিক্ষুব্ধ অভিমানী ভক্তরা বছরে একবার পুরীতে আসতেন, সেটা রথযাত্রার সময়। দিবাকর দাস যাকে বলেছেন, গুণ্ডিচা যাত্রা। রথযাত্রা শেষ হতে আবার তাঁরা বৃন্দাবনে ফিরে যান। কিন্তু পঞ্চসখার সাথে সংসর্গ হেতু সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব (যারা চৈতন্য আগমনের পরে নীলাচলে এসেছিলেন) চৈতন্যকে পরিত্যাগ করে নীলাচল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে গেছলেন এমন কথা ভাববার কোন কারণ নেই। বস্তুত দাস দিবাকরও সে কথা লেখেন নি। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, স্বরূপ দামোদর, ব্রহ্মানন্দ, পরবর্তী আগত যবন হরিদাস প্রমুখেরা চৈতন্যের সঙ্গে পুরীতেই ছিলেন শেষ পর্যন্ত। আরেকজন ছিলেন ছোট হরিদাস। ছোট হরিদাসের মর্মান্তিক আত্মহত্যার কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। শিখি মাহিতির বোন মাধবীর কাছে এক মন আতব চাল ভিক্ষার অপরাধে চৈতন্য ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন। মনের দুঃখে প্রয়াগে চলে যান হরিদাস। সেখানে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন। নীলাচলে থাকাকালীন আরেকজন পার্ষদের সাথে চৈতন্যের ঘোরতর মতান্তর ঘটেছিল। তিনি অন্যতম প্রিয় পার্ষদ নিত্যানন্দ। অবধূত নিত্যানন্দ। চৈতন্যের সাথে মতের গরমিল হেতু তাঁকেও একদিন নীলাচল পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

তাহলে উপরোক্ত আলোচনা ভিত্তিক আমরা দুটি জিনিষ খুব স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে পাচ্ছি, তা হলো, ওড়িশার পঞ্চসখা সম্প্রদায় নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল, যাদের সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত ও পথের মিলের চেয়ে গরমিল ছিল বেশি। দ্বিতীয়ত পঞ্চসখা, বিশেষত জগন্নাথ দাসের সাথে চৈতন্যের সংসর্গ হেতু বেশ কিছু নীলাচলে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব নীলাচল পরিত্যাগ করে প্রথমে বনবিষ্ণুপুর ও যাজনগর এবং পরে সুদূর ব্রজভূমি বৃন্দাবনে চলে গেছলেন।

অতঃপর এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন ওঠে, আর তা হলো, গৌরনিধি চৈতন্য অকস্মাৎ পঞ্চসখার আকর্ষণে জড়িয়ে পড়লেন কেন? আকর্ষণটা পঞ্চসখার দিক থেকে এসেছিল, নাকি চৈতন্যের আকর্ষণে পঞ্চসখাই স্বতঃস্ফূর্ত এগিয়ে এসেছিলেন? এর প্রত্যুত্তরে আমরা ইতোপূর্বে ভেবেছিলাম, প্রাজ্ঞ চৈতন্য বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে বিদেশীদের একটি বড়ো ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে কোন রকম বাদ-বিসম্বাদ বাধাতে আগ্রহী ছিলেন না। এটা তাঁর একটা সহজাত বুদ্ধিমত্তার দিক হিসেবে ধরা যায়। তাই অনুগামীদের প্রত্যক্ষ আপত্তি সত্ত্বেও তিনি পঞ্চসখার সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জগন্নাথ দাসকে 'অতিবড়' শিরোনামে ভূষিত করে পঞ্চসখার সাথে একটা সৌহার্দ্য চেয়েছিলেন। তিনি হয়তো বা ভেবে ছিলেন শত শত মানুষ যখন তাঁর আকর্ষণে তাঁরই কৃষ্ণনামের ছত্রছায়ায় এসে একত্রিত হচ্ছে, তখন পঞ্চসখাও একদা একত্রিভূত হবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে। যদিও বাস্তবে তা কিন্তু হয়নি। বরং এর উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়েছে পঞ্চসখার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। পঞ্চসখার জগন্নাথ দাস--যিনি চৈতন্যের খুব কাছাকাছি সম্পর্কে এসেছিলেন বলে জানা যায়, এই জগন্নাথ সম্পর্কে আধুনিক চৈতন্য বিশেষজ্ঞরা আজ রীতিমতো সন্দিগ্ধ। কেন? না তিনি নাকি চৈতন্য বিরোধীদের বিশেষ করে গোবিন্দ বিদ্যাধরের সাথে হাত মিলিয়ে ছিলেন। তাছাড়া ওড়িশার বিশ্রুতপণ্ডিত সদাশিব রথশর্মা সম্পাদিত 'চৈতন্য চকড়া'য় চৈতন্য ও জগন্নাথ দাসের বিভাজনমুখী অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

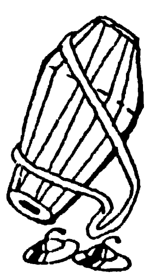


কিন্তু আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ডঃ নির্মলনারায়ণ গুপ্ত মশায়ের 'ভারতীয় সাহিত্যে চৈতন্য' শিরোনামক একটি বইতে দেখছি, 'পঞ্চসখা চৈতন্য দ্বারা প্রভাবিত নন, বরং তাঁরাই প্রভাবিত করেছেন চৈতন্যকে।' একথা ডঃ গুপ্ত নিজেই বলেছেন। পরন্তু তিনি বিশ্বভারতীর ওড়িয়া ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস মশায়ের 'অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখা' (প্রথম পীঠ) এবং ডঃ মায়াধর মানসিংহ মশায়ের 'ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস' নামক দুটি ওড়িয়া গ্রন্থ থেকে মূল ও তার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃতি করে দেখিয়েছেন, পঞ্চসখা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের থেকে একটি স্বতন্ত্র সংস্থাই ছিল না, তাঁদের মত এবং পথ ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক অংশে পৃথক। এবং চৈতন্যের আকর্ষণে পঞ্চসখা নয়, পঞ্চসখারই আকর্ষণ চৈতন্যকে প্রভাবিত করেছিল। অবিশ্যি এর অব্যবহিত পরেই ডঃ গুপ্ত আচার্য সুনীতিকুমার ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের যথাক্রমে 'The Delhi Sultanate' ও 'The History of Medieval Vaishnavism in Orissa' গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, পঞ্চসখা ছিল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। অধিকন্তু তাঁরা (পঞ্চসখা) ছিলেন চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর।

পারতপক্ষে যদি তা হয়, অর্থাৎ পঞ্চসখা সম্প্রদায় যদি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হয়, এবং পঞ্চসখার জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুত, যশোবন্ত, অনন্ত দাস প্রভৃতিরা যদি চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর হন, তাহলে পঞ্চসখার জগন্নাথ দাসের সাথে চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা পুরীতে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মেনে নিলেন না কেন ? কেন তাঁরা শুধু মাত্র এই এক কারণে নীলাচল ত্যাগ করে প্রথমে যাজনগর ও বনবিষ্ণুপুর এবং অতঃপর ব্রজভূমি বৃন্দাবনে চলে গেলেন ? দ্বিতীয়ত, শিখি মাহাতি, জনার্দন ব্রাহ্মণ, বলদেব মাহাতি, অনন্ত আচার্য কতো ওড়িশীর নামই তো চৈতন্য ভাগবত–চরিতামৃত প্রভৃতি প্রখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহলে সেখানে পঞ্চসখার নামোল্লেখ নেই কেন ? পঞ্চসখা যদি পরম বৈষ্ণব এবং চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর হন, তাহলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য রচয়িতাগণ তাঁদের সম্পর্কে এতো নিরুৎসাহী ছিলেন কেন ?

[চব্বিশ]

চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য



'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা-জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুন হাতে
সরল জীবন।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছো চিহ্নিত

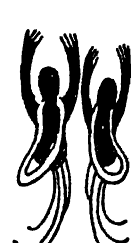
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি। '•

[রবীন্দ্রনাথ]

প্রখ্যাত ফরাসী কথা-সাহিত্যিক ফ্লবেয়া একদা বালক মোপাসাঁকে (হেনরি রেনে আলবার্ট গী দ্য মোপাসাঁ) একটি খোলা জানালার সামনে নিয়ে গিয়ে সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছিলেন। একটি হরিতাভ গাছ দাঁড়িয়েছিল তৃণভূমির ওপর অদূরে। ফ্লবেয়া জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছো? বালক মোপাসাঁ উত্তরে বললেন, গাছ। ফ্লবেয়া বললেন, আরও ভালো করে দেখো, লক্ষ্য করো। মোপাসাঁ আবারো তাকালেন খোলা জানালা দিয়ে। ফ্লবেয়া শুধালেন, এখন কি দেখছো? মোপাসাঁ বললেন, গাছ। ফ্লবেয়া হাসলেন। আরও কাছে টেনে নিলেন বালক মোপাসাঁকে। বললেন, দেখো, ওই যে গাছ, যা তুমি দেখতে পাচ্ছো, তারই নীচে সবুজ তৃণভূমি। ওপরে আকাশ। নীলাভ। তারই মাঝে কিছু খণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে। আরও দূরে ধূসর পাহাড়, আর দুধের মতো সাদা পাহাড়ী নদী। ফ্লবেয়া শুধালেন, তুমি কি এখন দেখতে পাচ্ছো? মোপাসাঁ ঘাড় নাড়লেন এবার। বললেন, পাচ্ছি মসিয়েঁ। ফ্লবেয়া বললেন, এই যে আকাশ, তৃণভূমি, পাহাড়, ভাসা মেঘ আর দুধের মতো পাহাড়ী নদী এসব নিয়েই তো তোমার গাছটির অস্তিত্ব। পরিপার্শ্বিকতা ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব কোথায়?

আমরা প্রত্যয় করি, চৈতন্যের মৃত্যুও এমন একটি ঘটনা, সে শুধু বালক মোপাসাঁ অনুভূত একখানা শুধুমাত্র গাছের মতো না, তাঁর ঘনায়মান মৃত্যুর অমোঘ অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে তাঁরই জীবন সায়াহ্নের ঘটমান ও ঘটিতব্য আবহাওয়ার ওপর। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে, এই যে প্রকৃতিজাত মৃত্যু. কোন একটি জীবনের ক্ষয়জনিত নিয়তি, আর যথার্থ সময় যাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে-অনেকের মতো দুর্লঙ্ঘ্য মৃত্যুর সে চিরাচরিত বিকাশ আমরা চৈতন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু সর্বোপরি চৈতন্য যে একজন মানুষ ছিলেন- তাঁর জনক-জননী, শৈশব-কৈশোর, যৌবনের প্রারম্ভে প্রণয় ও তাঁর উন্মেষ, এবং পত্নী বিয়োগজনিত একটি প্রাণের অস্থিরতা, আর সাংসারিক নিস্পৃহতার ও একাকীত্বের অমোঘ প্রকাশ—যাকে আমরা স্ব-নাশ সন্ন্যাস বলছি, জাগতিক জৈবলীলার এই যে কঠিন বাস্তবতা, এর অঙ্কুরোদগম-পত্রোদগম-ফলোদগম অর্থাৎ তার শৈশব কৈশোর যৌবনকে যদিচ আমরা প্রাকৃতিক আগমন নির্গমন হিসেবে মেনে নিই, তাহলে, তার নশ্বর শরীরী বিনাশকে আমরা প্রকৃতির নিয়মের পার্থিবতায় বিচার করবো না কেন?

চৈতন্যচরিত রচয়িতাগণ অনেকেই বলেছেন, বিশেষত ওড়িশী চরিতকারেরা, যে চৈতন্যের নশ্বরদেহ নাকি পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহের দারুময় শরীরে লীন হয়ে গেছে। কবে? না ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, অর্থাৎ বাঙলা বর্ষ অনুযায়ী ৯৪০ সাল, ১৪৫৫ শকাব্দ। মূলত চৈতন্যের মৃত্যু, তিরোধানের দিনটিকে কেন্দ্র করে তাঁর চরিতকারদের মধ্যে খুব বেশি বাদ-



• অসুস্থ বিশ্বকবি অপারেশন টেবলে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই সকাল ৯-৩০ মিনিটে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। এটি তিনি সহস্তে লিখতে পারেন নি। মুখে মুখে 'ডিকটেট' করেছিলেন। লিখে নিয়েছিলেন অন্যতম রবীন্দ্র-শিষ্যা শ্রীমতী রাণী চন্দ। কবিতাটি শেষ করে কবি শ্রীমতী চন্দকে বলেছিলেন, 'কিছু গোলমাল আছে, পরে ঠিক করব'খন।' বলা বাহুল্য, এটিই ছিল বিশ্বকবির শেষতম কবিতা।

বিসম্বাদ না থাকলেও তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে নানা মুনি নানান ম
দাখিল করেছেন। যথা–

১। আদি চৈতন্য চরিতকার মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপুর প্রমুখেরা বলেছেন, 'ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা/শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ।/নানালীল লাস্যমাসাদ্য ভূমৌ/ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোহসৌ জগাম॥ মেহাকাব্য ২০।৪১। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ অতঃপর সাতচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নানান লীলা নৃত্য আদি বিধানপূর্বক পৃথিবীর খেলা সমাধা করে স্বধামে গমন করেছিলেন। বস্তুত, কি ভাবে চৈতন্যের মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে আদি চৈতন্য জীবনীকাররা তাঁর বর্ণ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু কেন ? 'ধাম স্বং ততোহসৌ জগাম'–তাঁর স্বধামে গমন অর্থাৎ মৃত্যুকে তাঁরা স্বীকার করেছেন। এমন কি 'চত্বারিংশত সপ্তভাজা' অর্থাৎ সাতচল্লিশ বৎসরে যে তিনি তিরোহিত হয়েছিলেন বিষয়েও তাঁরা বিলক্ষণ অবহিত। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, পরবর্তী কৃষ্ণদাস, জয়ানন্দ, লোচন প্রভৃতিরা যখন চৈতন্যের মৃত্যু প্রাসঙ্গিকী কিছু কি লিখেছেন তখন পূর্ববর্তী লেখকরা (বিশেষত চৈতন্যের সমসাময়িকরা) কবি কর্ণপুর, মুরারি প্রমুখ ভক্ত ও পার্ষদগণ এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও অধিকত অবহিত ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়। তৎসত্ত্বেও তাঁরা কি ভাবে ও কো পরিস্থিতির মধ্যে চৈতন্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে তা বলেন নি। কেন ?

২। চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে বাঙলা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে প্রথম কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :

> 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতারি।
> অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
> চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
> চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥'

[চৈতন্য চরিতামৃত

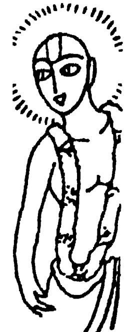
বস্তুত, সোজাসুজি বক্তব্যে চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে কিছু বলতে কবিরা কৃষ্ণদাসও কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন। কি ভাবে ও কোন বিপজ্জন পরিস্থিতির মধ্যে চৈতন্যের মৃত্যু হয়েছে তা যেন বারংবার বলতে গিয়ে তিনি বলেন নি। তিনি যে 'চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান' কথা কয়টি লিখেছেন, এই 'অন্তর্দ্ধান' শব্দটির মধ্যে আমরা একটা প্রচ্ছন্নতার ইঙ্গিত লক্ষ করছি। অন্তর্ধান কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো তিরোভাব বা তিরোহি হওয়া। আবার অদৃশ্য হওয়া, লুক্কায়িত হওয়া, অজানা দর্শনাতীত স্থানে গম এসবও এর মানে হয়। আসলে প্রত্যয়গত নিয়মে অন্তর+ধা+অনট=অন্তর্ধান এই ভাবে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এখন 'অন্তর্ধান' বলতে কৃষ্ণদাস চৈতন্যে মৃত্যুকে বুঝিয়েছেন না কোন গোপন স্থানে পালিয়ে যাওয়াকে ইঙ্গিত করেছে তা আমরা কেমন করে বুঝবো ?



বাঙলায় একটা সতসিদ্ধ প্রবচন (Proverbs) আছে, কোন অজ্ঞাতনাম দূরদর্শী একদা বলেছিলেন, 'কথা বলতে জানলে হয়/কথা শত ধারায় বয় অন্তর্ধান–একটাই কথা, এতে মৃত্যুও বোঝায় আবার লুকিয়ে পড়া, চোর গোপ্তা স্থানে পালিয়ে যাওয়া অর্থেও এই অন্তর্ধান শব্দটির প্রয়োগ হতে পারে প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী কৃষ্ণদাস শব্দের এই শত ধারায় বয়ে যাওয়ার ব্যাপার জানতেন। তাই চৈতন্যের মৃত্যুর কারণ তিনি বলেন নি, অধিকন্তু তার বর্ণি চৈতন্যের 'অন্তর্ধান' শব্দটি আদপেই চৈতন্যের মৃত্যু অর্থে ব্যবহারিত হয়ে

কিনা তাও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন রেখেছেন। কিন্তু একথাও বড়ো সত্য, কোন মৃত্যুর বেদনা, কোন হর্ষোৎফুল্ল সুখ বা দুঃখের দুঃসহতা কোন ধূলোমাটির মানুষের পক্ষে সর্বৈব গোপন রাখা সম্ভব না। আকাশের চন্দ্রমাকে যেমন পুরোপুরি ঢেকে রাখতে পারে না বাদলা মেঘ। চাঁদ ঢাকা পড়লেও তার কিছু চোরাগোপ্তা জ্যোৎস্না যেমন এসে চাঁদের অস্তিত্বকে জানিয়ে দেয় আমাদের। কোথাও ধোঁয়া উঠলে যেমন আগুনের অস্তিত্বকেই সূচিত করে, তদ্রূপ, তার সুখ বা দুঃখ কোনভাবে না কোনভাবে প্রকাশ পায় সেই দুঃখী বা সুখী মানুষটির অন্তরস্থিত আকুতি থেকে। কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থের শেষাংশে লিখেছেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।/তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥' এই যে আকুল আত্মব্যঞ্জনা, মানসিকতার দিক থেকে কতোবড়ো চৈতন্য ভক্ত হলে এমন নিপুণ আর্তি কেউ প্রকাশ করতে পারে। এমন এক বিরল মানসিকতাসম্পন্ন ভক্ত চৈতন্যের তিরোধানের অস্বাভাবিকতাকে শুধুমাত্র 'অন্তর্ধানের' কুজ্ঝটিকায় রেখে আমাদের ধাঁধায় ফেলবেন বলে মনে হয় না। অর্ধপাত্র জলকে কেউ দেখে অর্ধপাত্র খালি, আবার কেউ দেখে অর্ধপাত্র পূর্ণ। এই সূত্র ধরে তিনি আমাদের চৈতন্যের অর্ধজ্ঞাত মৃত্যু প্রাসঙ্গিকীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়েছেন। চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় মৃত্যুর স্বাভাবিকতা বিষয়ে বারম্বার আমাদের সন্দিগ্ধ করেছে। এবং একথাও খুব প্রকট যে যুগের প্রতিকূলতাকে তিনি বার বার অপ্রতিহত করতে গিয়েও স্পষ্ট বক্তব্যের অনুকূলে কখনোই যেতে পারেন নি। আর সে জন্যই বোধহয় রুটিন মাপা জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে যাওয়ার মতো নির্বিরোধ পথে হাঁটাও তাঁর সম্ভব ছিল না। বস্তুত, তাঁর রচনায় রক্ষণশীলতার খাদ মিশেছিল সত্য, কিন্তু গতানুগতিক শাস্ত্র শাসনের ছকেবাঁধা রাস্তায় না চলার অভ্যস্ত হেতু পূর্বসূরী দিকপাল চৈতন্যচরিতকার কারু রচনার সঙ্গে অন্তত চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে তাঁর রচনায় কোন সাদৃশ্যের ছবি ফুটে ওঠেনি। বরং বৈসাদৃশ্যই আমাদের চোখে ধরা পড়ে সুপ্রকট ভাবে। আসলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাথে অপরাপর চৈতন্য চরিতকারদের বড়ো রকমের ফারাক হলো এই যে, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী অন্যান্য চরিতকারেরা যেমন চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি নিটোল গল্পের সূত্রপাত করেছেন, বস্তুত কৃষ্ণদাস তার ধারে কাছে যা'ন নি। চৈতন্যচরিত লিখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অন্যান্য চরিতকারের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। কিন্তু চৈতন্যের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর একটা সতন্ত্র ধারণা ছিল। মানুষের অতীব দুঃখ যাতনা যেমনটি চোখের জল বা উঁচৈঃস্বর কান্নায় প্রকাশ পায়, তদ্রূপ দুঃখীর চূড়ান্ত স্বাভাবিকতাও আমাদের সন্দিহান করে। অর্থাৎ তার স্বাভাবিকতাই আমাদের চোখে অস্বাভাবিকতায় পর্যবসিত হয়।

এটা খুব সত্য যে, এই চন্দ্রাভিযানের যুগে আজ থেকে সাড়ে চারশো বছরের সামান্য অধিক আগে, একটি মানুষ দারুময় বিগ্রহের শরীরে বিলীন হয়ে গেছলো এটা বললে কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু তাই যদি না হবে তাহলে বৈষ্ণবিয়া চৈতন্যের সমাধি স্থানটি কোথায়? চৈতন্যের কতো ছোট-খাটো ভক্তের সমাধি রয়েছে। এমন কি যবন হরিদাসের সমাধিও আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরীতে। সেক্ষেত্রে চৈতন্যের মৃত্যু যদি সচরাচর আর পাঁচ জনের মতো ঘটতো তাহলে কি আজও পর্যন্ত তাঁর একটা নূন্যতম সমাধিবেদী নির্মিত হতো না? দূরদর্শী কৃষ্ণদাস বোধকরি ভাবীকালের এই প্রশ্নবোধক



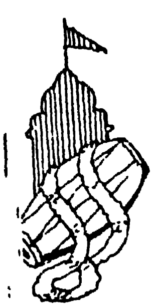
ইঙ্গিতটির আগাম টের পেয়েছিলেন। তাই যুগ-কালের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি চৈতন্যের সমুদ্রে পতনজাতীয় একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর গল্প আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু বড়ো মজার কথা হলো, 'যমুনার ভ্রমে' যে চৈতন্য অপার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউতে উপর্যুপরি হাবুডুবু খেতে খেতে অবশেষে অচৈতন্য হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। (কেননা কৃষ্ণদাস লিখেছেন যে, তাঁর 'অস্থিসন্ধি ছুটি চর্ম্ম করে নড়বড়ে।/তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে॥') সুতরাং তাঁর মৃত্যুই হয়েছিল বলা যায়। এ অবস্থায় জেলেদের জালে উঠে এলো সেই জলখাওয়া, ফুলো-ফাঁপা কিম্ভূতকিমাকার ডেডবডি। জেলেরা স্বাভাবিকভাবে প্রথমে ভেবেছিল বুঝি তাদের জালে 'বড় মৎস্য' ধরা পড়েছে। বেশ উৎফুল্লভাবে তারা জাল টেনে ডাঙায় তুললো। আর তখনই বিকৃত দর্শন শবদেহে নজরে পড়লো তাদের। প্রথমে তারা চমকে উঠলো ব্রহ্মদৈত্য ভেবে। পরক্ষণে জাল-টাল ফেলে ছুটলো ওঝা ডাকতে। ব্রহ্মদৈত্যিকে জাল থেকে নামানো দরকার। পথে স্বরূপ গোস্বামীর সাথে দেখা। স্বরূপ গোস্বামী জেলের মুখে আনুপূর্বিক সব কিছু শুনে বুঝলেন, এ ভূত-(অর্থাৎ জেলে যাকে ভূত ঠাওরেছে) তিনি চৈতন্য ব্যতীত আর কেউ নন।

'স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান॥
প্রেমাবেশে পড়িল তোঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলে আপনার জালে॥'

[চৈ. চরিতামৃত/অন্ত্য/সপ্তদশ পরিচ্ছেদ]

কিন্তু স্বরূপ কোন রকম বিচলিত হলেন না। জালিয়ার মুখে পূর্বাপর সব কিছু শুনে তিনি তার সাথে সমুদ্রের ধারে এলেন। বিকৃত শরীর, চৈতন্য পড়ে আছেন বেলাভূমিতে। সারা শরীরে ইতস্তত সমুদ্রের বালি। জেলে বললো, এটা চৈতন্য নয়, আমি তাঁকে চিনি। দেখেছি। এটা অবশ্যম্ভাবী ভূত। স্বরূপ বললেন, না, ইনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই যে বিকৃত আকার, নটকার চর্ম, অস্থিসন্ধিচ্যুত এটা একটা প্রেমের বিকার মাত্র। এই বলে তিনি চৈতন্যের ভিজে কৌপীন খুলে শুকনো কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়ে দিলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম ধরলেন। আর কি আশ্চর্য, এই কৃষ্ণনাম কর্ণমূলে প্রবেশ করতে চৈতন্য হুঙ্কার দিয়ে উঠে বসলেন।

এই মৃত্যু থেকে মৃত্যু না হওয়ার গল্প. এটা আমরা একধারে অলৌকিক, আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক বলতে পারি, কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষ্ণদাসের দুটি প্রবল গুণও প্রকট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে, তিনি অপরাপর চরিতকারদের মতো চৈতন্যের মৃত্যুর কোন নিটোল গল্প শোনান নি আমাদের, কিন্তু তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন।



চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে এরকম আমরা আরও দু' তিনটে ইঙ্গিত পাই কৃষ্ণদাসের রচনায়। যেমন কবিরাজ কৃষ্ণদাস আদিলীলায় এক জায়গায় লিখেছেন,

'নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥'

কিন্তু বৃন্দাবনবাসী ভক্তের চৈতন্যের শেষ লীলার বিবরণ জানবার এ উৎকণ্ঠা কেন ? কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত লেখার বহু আগেই তাঁরা বৃন্দাবন দাসের ভাগবতে চৈতন্যের অন্ত্যলীলা আনুপূর্বিক বিবরণ পড়েছেন। কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত শেষ হয়েছিল ১৫৩৪ শকে অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে। আর বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত রচিত হয়েছিল ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দে। অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত লেখার প্রায় ৬০ বছর আগে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত পড়েছিলেন বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা। এবং এই ভাগবতে চৈতন্যের আদিলীলা, মধ্যলীলা, শেষলীলা বা অন্ত্যলীলা সবই বিশদভাবে বর্ণিত ছিল। তবু কৃষ্ণদাসের কাছে চৈতন্যের শেষলীলা জানবার জন্য বৃন্দাবনবাসীর এতো উৎকণ্ঠা কেন ? তবে কি বৃন্দাবনবাসী ভাগবত বর্ণিত শেষলীলাকে খুব নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি ? নাকি কৃষ্ণদাসের কাছে তারা এমনই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, যার বর্ণিতব্য রচনার জন্য তারা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন ? কৃষ্ণদাস এ জায়গাটি আমাদের কাছে খুব প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। যদিও সেই প্রচ্ছন্নতার জটিলতা থেকে তার আসল বক্তব্যটি বের করা খুব কঠিন নয় বলেই মনে হয়।

বস্তুত কৃষ্ণদাস ছিলেন একজন প্রশ্নাতীত চৈতন্য ভক্ত মানুষ। ধর্মভীরুতাজনিত রক্ষণশীলতা তার অভীপ্সিত অর্থের স্পষ্টতা কিছু কিছু স্থানে বাধাপ্রাপ্ত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু নীলাচলে জনৈকা ওড়িয়া মহিলাকে কেন্দ্র করে তিনি দামোদরের মুখ দিয়ে চৈতন্য প্রসঙ্গে যে সম্মানহান কথাগুলি বলিয়েছেন (অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তাতে করে মনে হয় না যে, চৈতন্যের মৃত্যুকালীন ঘটনা অবহিত থেকেও তা প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হবেন। বোধকরি এ ব্যাপারে বৈষ্ণব মহাজনদের কাছ থেকে একটা প্রবল আপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। আর সে ওজর-আপত্তি এসেছিল সম্ভবত বৈষ্ণবদের হেড কোয়ার্টার্স বৃন্দাবন থেকে, 'চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।/সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।/বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥'

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, কৃষ্ণদাসের কাছে চৈতন্যের শেষ লীলার প্রকৃত তথ্য জানবার জন্যই বৃন্দাবনবাসীরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন, তাহলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থের মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এসে অকস্মাৎ নিজের বার্ধক্যের কথা স্মরণ করলেন কেন ? তিনি লিখলেন,

'শেষ লীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু শেষ বিস্তারিব লীলা শেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥'

এবং পরক্ষণেই তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন,

'আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥'



২। আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা ভিত্তিক একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, তা হলো, প্রায় আদিলীলার মঙ্গলাচারণ থেকেই কৃষ্ণদাস আমাদের চৈতন্যের শেষলীলার ব্যাপারে খুব উদ্‌গ্রীব করে তুলেছেন। তার কথাবার্তায় বারম্বার প্রকাশ পেয়েছে অন্ত্যলীলার কথা। যেন আদি ও মধ্যলীলার চেয়েও অন্ত্যলীলা বেশি আকর্ষণীয়। কেন ? তিনি আদিলীলায় লিখেছেন, চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ।/সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।/বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥' তারপর গ্রন্থের মাঝামাঝি এসে মধ্যলীলায় বলেছেন, 'শেষ লীলার সূত্রগণ/কৈল কিছু বিবরণ/ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।' সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণদাস বিশ্বস্ত কোন মানুষের কাছ থেকে এমন কিছু চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বিষয়ক সূত্র পেয়েছিলেন যার মধ্যে পূর্বসূরী চরিত রচয়িতাদের চেয়ে তার ভিন্নতা ছিল সর্বাধিক। বোধকরি চাঞ্চল্যকর, বিস্ময়কর কিছু সংবাদ লুকিয়ে ছিল এর মধ্যে। কিন্তু অন্ত্যলীলা বিষয়ক তাঁর প্রাপ্ত সূত্রগুলি কি তা তিনি বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আমাদের বলেন নি। উপরন্তু জরাজীর্ণ বার্ধক্যগ্রস্থের অজুহাত দিয়েছেন। আর এ বাহানা দেখা যাচ্ছে একমাত্র অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে। হিসেব করলে দেখা যাবে, তিনি তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা শুরুই করেছিলেন বার্ধক্যকালে। তিনি ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (যদিও এ সালটি নিয়ে মতান্তর আছে)। আর চৈতন্য চরিতামৃত রচনায় হাত দিয়েছিলেন ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দের পর। অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বছর বয়সে। সুতরাং তিনি কেবল শেষলীলার রচনার ক্ষেত্রে বার্ধক্যের অজুহাত দেবেন, আদি এবং মধ্যলীলার ক্ষেত্রেও তো একথা প্রযোজ্য হতে পারতো। কার্যত তা হয়নি। শেষলীলা বা অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে বারংবার এহেন বাহানা করার কারণ কি খুব গূঢ়ব্যঞ্জক নয়। বিশেষ করে চৈতন্যে মৃত্যুর প্রসঙ্গ যে লীলাখণ্ডে লেখা হয়েছে। বোধকরি কৃষ্ণদাস চৈতন্যের মৃত্যুর প্রসঙ্গে এমন বিস্ময়কর কিছু সূত্র পেয়েছিলেন যাতে করে বারবার তিনি অন্ত্যলীলার প্রাসঙ্গিকীর জের টেনেছেন। না বলতে পারার অব্যক্ত ব্যাকুলতা এই ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে বারবার। এই যে চৈতন্যের সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা, পরক্ষণে সেই জলে ডোবা 'অস্থিসন্ধি ছুটি, চর্ম নড়বড়ে', 'বিকৃত' মৃতদেহকে আবার বাঁচিয়ে দেওয়া, অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে বার্ধক্যের উপর্যুপরি অজুহাত দেওয়া, এসবের মধ্যে তিনি তাঁর অব্যক্ত যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ চৈতন্যের মৃত্যু যে স্বাভাবিক না, অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্য দিয়েই তিনি তা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে বোধকরি তিনি আমাদের মতো নিজেও সন্তুষ্ট হননি। সেক্ষেত্রে তাঁর মতো চৈতন্য ভক্ত মানুষের মধে সত্যের অপলাপজনিত একটা পাপবোধ জন্ম নেয়া অস্বাভাবিক না। কেননা, তিনি তা জানেন অথচ প্রকাশিতব্য জিনিস প্রকাশ করতে পারছেন না। বৈষ্ণব মহাজনদের দুস্তর বাধার প্রাচীর তাঁর সামনে। মহাপ্রভু চৈতন্যের, ভগবান-অবতার চৈতন্যের মরণশীল মানুষের মতো মৃত্যু ঘটুক এটা বোধকরি তাঁদের কাম্য ছিল না। মানুষের ষড়যন্ত্রে অবতার চৈতন্যের মৃত্যু সেটা আরও অকল্পনীয় তাঁদের কাছে। তাঁদের কাছে ভগবান চৈতন্য ভগবান জগন্নাথের দেহে বিলীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু পূর্বসূরী বৃন্দাবন দাস ত লিখলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর রচনায় চৈতন্যের জগন্নাথের দারুময় শরীরে বিলীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি উপস্থাপিত করলেন না। কেন ? তিনি তাঁর (চৈতন্যের) মৃত্যু সম্পর্কে অনেক আধিভৌতিক কথা ও পুনঃপুনঃ বার্ধক্যের বাহানা দিয়ে পরিশেষে মৃত্যু, তিরোধান বা তিরোভাবের স্থলে 'অন্তর্ধান'



কথাটি ব্যবহার করলেন। যার অর্থ মৃত্যু, আবার যা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে মৃত্যু না-ও হতে পারে। কিন্তু এতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, আমাদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন স্বরূপ-দামোদরের দিকে। বললেন, তোমরা স্বরূপ-দামোদরের কাছে যাও। তাঁর 'কড়চা'-র (স্বরূপ দামোদরের কড়চা) স্মরণ নিলেই অন্ত্যলীলার পাই পয়সা সব জানতে পারবে।* তিনিই অন্ত্যলীলার সব জানেন।

কিন্তু তারপরেই আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' নামক অমূল্য পুঁথিখানা হঠাৎ 'বেপাত্তা' হয়ে গেছে। অথচ কোন চৈতন্য চরিতের পুঁথির ক্ষেত্রে এমন সংবাদ আর শোনা যায় নি। একমাত্র 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' অকস্মাৎ হারিয়ে গেল। অদ্যাবধি তার হদিশ মিললো না। কেন?

৩। এবার আসছি বাঙলা ভাষার আরেক দিকপাল চৈতন্য জীবনীকার শ্রীল বৃন্দাবন দাসের কথায়। কবিরাজ গোস্বামী যাঁকে তাঁর গ্রন্থে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' আখ্যা দিয়েছেন। যদিও ক্রম অনুসারে কবিরাজ গোস্বামীর আগেই বৃন্দাবন দাসের স্থান। কিন্তু অন্ত্যলীলা, বিশেষত চৈতন্যের মৃত্যু প্রাসঙ্গিকীর গুরুত্ব অনুযায়ী কৃষ্ণদাসকেই অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত করা যেতে পারে। বৃন্দাবন দাস মূলতঃ তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত'-এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন নিত্যানন্দ গোস্বামীর উক্তিকে উপজীব্য করে। নিত্যানন্দ স্বয়ং বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্যলীলার বিশদ ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন। এছাড়াও অদ্বৈত আচার্য ও গদাধর গোস্বামীর মুখেও কিছু কিছু শুনেছিলেন। অধিকন্তু তিনি স্বরূপ-দামোদর ও মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' থেকেও প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এসব কথা 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে তিনি নিজেই বারম্বার কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন (ভাগবত ১।১৩।৪৪, ৩।১১।৫১৭, ২।২৪।৩৪৪ দ্রষ্টব্য)। এই যে নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির উক্তি, স্বরূপ দামোদরের কড়চার অনুসরণ এর মধ্যে থেকে বৃন্দাবন দাস কি এমন কোন তথ্য পাননি যাতে চৈতন্যের অলৌকিক মৃত্যু প্রসঙ্গ বৃন্দাবন দাসকে সন্দিগ্ধ করেছিল। নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈতাচার্য সকলেই তো চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। বিশেষত অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ চৈতন্যের তিরোধানের পরও প্রকট ছিলেন দীর্ঘদিন। চৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বাপর সব ঘটনা তাঁরা পেরিয়ে এসেছিলেন। চৈতন্যের মৃত্যুর আগে ও পরের ঘটনা সমূহ দেখেও তাঁরা কি এই ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, জগন্নাথের দারুময় দেহে চৈতন্য বিলীন হয়ে গেছেন?

ভিন্ন ভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তি সম্পাদিত আমাদের কাছে যে তিন চারখানা চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ রয়েছে তার প্রায় সব গুলোতেই গ্রন্থকার তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন অনেকটা আকস্মিক ভাবে। কোন তাড়াহুড়ো করে, বা তাড়াহুড়ো থাকার জন্য গ্রন্থটির আচমকা পূর্ণচ্ছেদ ঘটেছে তা কিন্তু নয়। অন্তত গ্রন্থের পরিশেষ পয়ার পর্যন্ত পাঠ করলেও তা কিন্তু মনে হয় না। লেখকের হৃদয়গ্রাহী লেখনীর বহতার যে আনুপূর্বিক ছন্দ অন্ত্যলীলার অভ্যন্তরে পৌঁছে তার কিছুমাত্র অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হয় নি। নীলাচলের কোন এক ওড়নষষ্ঠীর দিনে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির গালে জগন্নাথ কর্তৃক চড়

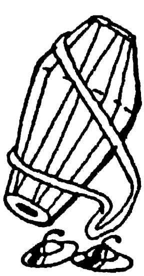


* কৃষ্ণদাস লিখেছেন, প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।/সূত্র করি গাথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥' (আদি/১৩ পরিচ্ছেদ)।

মারা এক সঙ্গিক ঘটনা দিয়ে ভাগবতের ইতি টেনেছেন বৃন্দাবন দাস। মোট একান্নটি অধ্যায়ে বিভক্ত ও প্রায় পঁচিশ হাজার ছত্র সংখ্যা বিশিষ্ট বিশালায়তন চৈতন্যজীবনী হঠাৎ একটি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করে সমাপ্তি ঘটলো কেন এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রায় প্রতিটি চৈতন্যজীবনী লৌকিক হোক বা অলৌকিক হোক মূলত চৈতন্যের কথা দিয়েই সমাপ্তি ঘটেছে। যুগপৎ চৈতন্যভক্ত কবি ও চৈতন্যভক্ত পাঠকের অভীপ্সিত লক্ষ্যের এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতের বিশেষত শেষাংশ পাঠ করলে মনে হয় বৃন্দাবন দাস নিজস্ব লক্ষ্যকে আচমকা স্থগিত করে ভক্ত পাঠকের চিরাচরিত আশাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতের আমরা যেখানে শেষ দেখছি, অর্থাৎ লেখক বৃন্দাবন দাস যেখানে এর সমাপ্তি টেনেছেন—গ্রন্থের এই স্থানে এসে যদি লেখকের যবনিকা টানার ইচ্ছে ছিল তাহলে প্রত্যেক লীলাখণ্ডের (যথা আদি, মধ্য) সূচনায় এবং অন্তরায় নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের বিশেষত নিত্যানন্দের যে স্তুতি গাথা রয়েছে গ্রন্থ সমাপ্তির ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি কি প্রত্যাশিত ছিল না ? তা নেই। তদোতিরিক্ত চৈতন্য জীবনী শেষ হয়েছে একটা অচৈতন্য বিষয়ক আখ্যান দিয়ে, যার নায়ক চৈতন্যের এক সাধারণ ভক্ত চট্টগ্রামের পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি। নিত্যানন্দ হলেও একটা কথা ছিল, কেননা তাঁর আনুকূল্য ও আদেশক্রমে ভাগবত রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন বৃন্দাবন দাস। সেক্ষেত্রে লেখকের কৃতজ্ঞতার দিকটি ভেবে নিত্যানন্দজনিত আখ্যায়িকাটির মধ্যে আমরা সমাপ্তির অপূর্ণতা দেখতাম না। কিন্তু বৃন্দাবন সমাপ্তি টেনেছেন না চৈতন্য না নিত্যানন্দের স্তুতি দিয়ে। এখানে দু'লাইনে নিত্যানন্দের স্তুতি করেছেন তিনি। পরিচ্ছেদ সমাপ্তির ক্ষেত্রে যেরকমটি তিনি সচরাচর করেছেন। সুতরাং এসব কারণে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হবার কারণ থাকে—যেখানে বৃন্দাবন দাস ভাগবতের পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন সেটা আদৌ তাঁর রচনার পূর্ণচ্ছেদ কিনা।

চৈতন্য ভাগবতের আকস্মিক সমাপ্তির কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও চৈতন্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। তাঁদের মতে চৈতন্য ভাগবত একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। যেমন অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত যে অসমাপ্ত গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' (পৃ. ১৯৮)। এখন প্রশ্ন হলো, চৈতন্য ভাগবত যদি এভাবে আকস্মিক সমাপ্ত হয়েও থাকে তাহলে এই আচমকা থেমে যাওয়ার কারণ কি ? আর যদি তা না হয়, অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবতের যেখানে সমাপ্তি সেটা যদি আদৌ সমাপ্তি না হয়, তাহলে, বৃন্দাবন দাস লিখিত পুঁথির পরিশিষ্ট অংশটুকু গেল কোথায় ? আর গেল যদি তো অতো বড়ো সুবৃহৎ পুঁথিখানা থেকে হঠাৎ অন্ত্যলীলার সেই অংশটি কেন উবে গেল, যেখানে একমাত্র চৈতন্যের মৃত্যুলীলার অংশটি উপজীব্য হতো ? তবে কি আমরা ধরে নিতে পারি, চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে এই সব পরিচ্ছেদে এমন কিছু তথ্য ছিল যা পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনদের অপ্রত্যাশিত ছিল। এবং বর্তমানে সেন্সারশিপের মতো গ্রন্থের শেষাংশ তাঁরা সেন্সার করেছিলেন সে কারণে।

আমাদের কাছে চৈতন্য ভাগবতের খানচারেক বিভিন্ন সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে, যথা—



১। সুকুমার সেন সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত।
২। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত।

৩। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত।

৪। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত।

উপরোক্ত এই চারখানি সম্পাদিত গ্রন্থে চৈতন্যের তিরোধানের কোন বিবরণ নেই। বিমানবিহারীবাবু যাকে 'অসমাপ্ত গ্রন্থ' বলেছেন এই চারটি সম্পাদিত গ্রন্থই বলা যায় তদ্রূপ।

তারপর নদীয়া-নবদ্বীপের গঙ্গা দিয়ে অনেক জোয়ার ভাটা, অনেক জল গড়িয়ে যাওয়ার পর, কিছুদিন আগে, দেনুড় শ্রীপাটের অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক বৈষ্ণবভক্ত চৈতন্য ভাগবতের অপ্রকাশিত পুঁথির খানিকটা অংশ আবিষ্কার করেছেন। খানিকটা বলছি এইজন্য যে, তিনি যে চৈতন্য ভাগবতের শেষোক্ত তিনটি অপ্রকাশিত অধ্যায় আবিষ্কার করেছেন, এর মধ্যেই যে চৈতন্য ভাগবতের পরিসমাপ্তি, তা কিন্তু তিনি বলেন নি। সুতরাং আবিষ্কারক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অপ্রকাশিত তিনটি অধ্যায় জুড়লেই যে চৈতন্য ভাগবতের পরিসমাপ্তি ঘটবে একথা বলা দুষ্কর।

যাই হোক, এই নব-আবিষ্কৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের মৃত্যু বা অন্তর্ধান প্রসঙ্গে আমাদের কিছু হদিশ দিয়েছেন। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত চৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট ১৪ অধ্যায়ে বৃন্দাবন লিখেছেন,

'গদাধর বোলে প্রভু- শুন গদাধর॥
আমি আগে যাই তুমি আসিহ পশ্চাতে।
এত বলি শ্রীদেউলে প্রবেশ কৈল নাথে॥
পরিছা বোলে-কোথা যাহ বলহ সন্ন্যাসী।
প্রভু বোলে জগন্নাথ পরশিয়া আসি॥
রহ রহ-বোলে সভে বেত্র লয় করে।
নিষেধ না শুনি প্রভু চলিলা ভিতরে॥
জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান।
দেখিতে না পায় প্রভু গেলা নিজ স্থান॥'

চৈতন্য জগন্নাথকে স্পর্শ করে অন্তর্ধান করলেন। কিন্তু গদাধর, চৈতন্যের পশ্চাতে পশ্চাতে আরেকজন যিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন, সেই গদাধরের তাহলে কি হলো? বৃন্দাবন সে কথাও লিখেছেন পরবর্তী পয়ারে।

'আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তর্ধান।
না পায় দেখিতে কেহ বোলে-রাম রাম॥
এই মতে মহাপ্রভু গদাধর লৈয়া।
নিজ স্থানে গেল প্রভু অন্তর্ধান হইয়া॥'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য একা না, তিনি পার্শ্বচর গদাধরকে নিয়েই অন্তর্ধান করলেন। কিন্তু চৈতন্যের অন্তর্ধান বিষয়টির এখানেই ছেদ টানলেন না বৃন্দাবন দাস। অধিকন্তু পরবর্তী পয়ারে বিষয়টিকে আরও রহস্যঘন করে তুললেন। যেন কি রকম একটা কুহেলিকায়, ধাঁধায় ফেলতে চাইলেন আমাদের। অথবা স্বয়ং তিনিই যেন পথ খুঁজে পেলেন না এই ধাঁধা থেকে বেরোবার। অতঃপর তিনি লিখলেন,

'এথা সে যখন প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
ন্যাসী রূপে গেলা মদনগোপালের স্থান॥
অধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে।
পুনঃ কোথা গেল প্রভু না পারে লখিতে॥



সেই দিন বৈশাখ পূর্ণিমা ত্রয়োদশী।
পাঠাইলা মনুষ্য পত্র লিখি সভে বসি॥
আসি উত্তরিলা লোক নীলাচল স্থানে।
প্রভুর বিজয় জিজ্ঞাসিল জনে জনে॥
সভে বলে—মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
প্রবেশ করিলা মাত্র জগন্নাথ স্থান॥
তান সঙ্গে ছিলা গদাধর মহাশয়।
আচম্বিতে অন্তর্ধান হৈলা নিশ্চয়॥'

অর্থাৎ জগন্নাথকে স্পর্শ করে চৈতন্য অন্তর্ধান করলেন কিন্তু পরেই আবার তাঁকে দেখা গেল জটাজুট সন্ন্যাসীর বেশে মদনগোপালের মন্দিরে। অনেকে তাঁকে এই বেশে (ন্যাসী রূপে) যেতে দেখেছিলেন মদনগোপালের মন্দিরের দিকে। এই অনেকে বলতে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন 'অধিকারী সকল'। এরা কোথাকার অধিকারী—রাজার অধিকারী কি মন্দিরের অধিকারী, তা বৃন্দাবন দাস আমাদের জানান নি। আরেকটা কথা, যেহেতু চৈতন্য ছিলেন শিখা সূত্র মুণ্ডিত সন্ন্যাসী সেজন্য ন্যাসীর বেশ ধারণ করার সময় পরচুলা অর্থাৎ কৃত্রিম চুল দাড়ির আশ্রয় নিতে হয়েছিল নিশ্চয়। কিন্তু এরকম একটা ছদ্মবেশের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন কি ছিল ? আর যদি ছদ্মবেশই নিলেন তো 'অধিকারী সকল' তাঁকে চিনতে পারলো কি ভাবে। সমস্ত ব্যাপারটা কিরকম একটা কাঁচা হাতের গোজামিল অঙ্কের মতো মনে হয়। সে যাই হোক, এই মদনগোপালের মন্দিরের পথে চৈতন্যকে শেষ বারের মতো দেখা গেল। তারপর থেকে তিনি কোথায় বে-পাত্তা হলেন কেউ আর জানতে পারলো না। সেই সঙ্গে 'গদাধর মহাশয়'ও। দিনটি নাকি ছিল বৈশাখ পূর্ণিমার দিন।

এই হলো বৃন্দাবন দাস বিরোচিত নবাষ্কৃত পুঁথির চৈতন্যের অন্তর্ধান কাহিনী। কিন্তু গোবিন্দ দাসের কড়চার মতো বৃন্দাবন দাসের এই নয়া আবিষ্কৃত পুঁথিটিতে দেখা যাচ্ছে, পণ্ডিতেরা মোটেই সদয় নন। এর প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতার ব্যাপারে অনেকেই সন্দিগ্ধ। এ বিষয়ে ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর সুবৃহৎ 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। তিনি লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত যে অসমাপ্ত গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে এত আদৃত হয়েছিল যে লোকে ইহার শেষের অধ্যায়ত্রয় বাদ দিয়া পুঁথি নকল করিবে তাহা সম্ভব নহে। সেই জন্য অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারি কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত অধ্যায়ত্রয়কে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।'

এখন প্রশ্ন হলো, অম্বিকাচরণ আবিষ্কৃত চৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট অংশের পুঁথিটি যদি সত্য সত্য নকল পুঁথি হয়, তাহলে, একজন বিশিষ্ট নামী চৈতন্য চরিতকারের নাম ভাড়িয়ে কেন এই নকল পুঁথিখানা লেখা হলো ? আর এটা কৃত্রিম বা অকৃত্রিম হোক, এটি যে কোন অবৈষ্ণব লিখেছেন তা প্রত্যয় হয় না। সুতরাং এসকল পরিপ্রেক্ষিতে এমন ধারণা কি সঙ্গত নয় যে, চৈতন্যের মৃত্যুর ব্যাপারে চৈতন্য চরিত সমূহে যে অলৌকিকতার অবতারণা করা হয়েছে তা পরবর্তী বৈষ্ণবদেরও সন্দিহান করেছিল ? এবং তারই ফল স্বরূপ চৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট অধ্যায় ত্রয়ের উৎপত্তি ?

৪। অতঃপর আমরা চৈতন্য চরিত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক বিতর্কিত লোচনানন্দ বা লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' প্রসঙ্গে আসছি। কিন্তু অপরাপর

বিষয়ে বিতর্কিত হলেও চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে লোচন আমাদের নতুন কিছু শোনাতে পারেন নি। অন্যান্য চরিতকারদের মতো জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে চৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়া কাহিনীটিরই তিনি পুনরুক্তি করেছেন আমাদের কাছে। লোচন লিখেছেন, আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথির দিন, রবিবার, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় চৈতন্য জগন্নাথের অঙ্গে বিলীন হয়ে গেলেন। কিন্তু এই বিলীন হয়ে যাওয়ার পূর্বাপর বক্তব্য থেকে একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অপরাপর চরিতকারদের সাথে লোচনের বর্ণনাব খুব মিল থাকলেও এর গরমিলের দিকটিও খুব সামান্য নয়। লোচন লিখেছেন:

'তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করি প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে॥'

[চৈতন্যমঙ্গল'/শেষখণ্ড]

এই 'তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট' কথাটি খুব গূঢ়ার্থব্যঞ্জক অর্থে লোচন ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। কখন দুয়ারের কপাট বন্ধ হলো? না চৈতন্য যখন জগন্নাথকে দর্শন করবার নিমিত্তে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। এখন প্রশ্ন হলো, একজন দর্শনার্থীর মন্দিরে প্রবেশের সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হবার কারণ কি? লোচন দাস জগন্নাথের দারুঅঙ্গে লীন হয়ে যাবার কথা লিখেছেন। তাই যদি হবে তাহলে এই পরম অভূতপূর্ব সত্যকে দ্বার রুদ্ধ করে দ্বাররক্ষক প্রচ্ছন্ন রাখলেন কেন? সুতরাং কোন ব্যাখ্যায় এর যৌক্তি-কতার প্রতিপাদ্য বিবেচিত হবে?

আমাদের পূর্বসূরী প্রদর্শক ডঃ দীনেশ সেন মশাইও এরকম একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন বহুকাল আগে তাঁর 'Chaitanya & His age' গ্রন্থে। আচমকা মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যাপারটায় তাঁরও মনে খটকা লেগেছিল, The answer is a simple one. The priests would not like to show him dying of fever as an ordinary man. They buried him somewhere under the floor of the temple and would not allow any outsider to enter it until the place was thoroughly repaired and no trace left after his burial.

অতঃপর লোচন আমাদের কি শুনিয়েছেন দেখা যাক। লোচন বললেন, চৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করে অশ্রুনেত্রে পুরুষোত্তমের সামনে দণ্ডায়মান হলেন। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন কলিযুগ। এ যুগে তোমার সংকীর্তনই একমাত্র উপায়। কিন্তু তুমি এখন কৃপা করে জীবকে তোমার কোলে আশ্রয় দাও। আমি শরণ নিচ্ছি তোমার শ্রীপাদপদ্মে।'

'এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল আপনে॥'

[চৈতন্যমঙ্গল/শেষখণ্ড]



এদিকে চৈতন্যের পরিকর ও পার্ষদরা ততোক্ষণে মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে এসে পৌঁছে গেছে। তাঁরা আকুলি ব্যাকুলি কণ্ঠে চিৎকার করছেন।

কাঁদছেন। বলছেন, 'ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে দেখি বড় ইচ্ছা।' তখন ভক্তদের আর্ত চিৎকার শুনে একজন পরিছা (জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা) বেরিয়ে এলো মন্দিরের ভেতর থেকে (কিন্তু প্রধান দরজা তখনো খোলা হলো না)। বোধহয় গুপ্ত কোন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। এসে বললো,

'ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন॥'

[চৈতন্যমঙ্গল/অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত]

লোচন বর্ণিত চৈতন্যের অন্তর্ধান বিষয় কাহিনীটি থেকে তাহলে আমরা কি দেখলাম। দেখলাম, চৈতন্য জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে ভুরি ভুরি অলৌকিক, আধিদৈবিক বর্ণনা আছে। কিন্তু মন্দিরের কপাট বন্ধের মধ্যে কোনরকম অলৌকিকত্বের খবর লোচনের বর্ণনায় পাওয়া যায় না। কেননা, চৈতন্য যখন মন্দিরে প্রবেশ করলেন তখন মন্দিরের ভেতরে একাধিক লোক ছিল। বিশেষত মন্দিরের পরিছা ও আরও কেউ কেউ ছিল। গোপন পথ দিয়ে একজন পরিছা মন্দিরের ভেতর থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলো একটু আগে লোচনের বর্ণনায় তা আমরা দেখলাম। সুতরাং দরজা বন্ধের ঘটনাটা তাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, চৈতন্যের জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার অভূতপূর্ব ঘটনাটি শুধুমাত্র সেই সব চৈতন্য বিরোধী পরিছারা প্রত্যক্ষ করলো, যারা একদিন নির্মমভাবে চৈতন্যকে প্রহার করতে কুণ্ঠিত হয় নি, অথচ চৈতন্যের প্রিয় ভক্তদের একজনেরও তা দেখবার সৌভাগ্য হলো না। এমন একটা ঘটিতব্য বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত পূর্বাহ্নে জানলো না তারা। কেন ?

৫। এবার আমরা বাঙলা ভাষায় আরেক অন্যতম চৈতন্য চরিতকারের কথায় আসছি। ইনি বিতর্কিত জয়ানন্দ। জয়ানন্দের গ্রন্থের নামটিও বিতর্কিত গ্রন্থকার লোচন দাসের অনুরূপ। অর্থাৎ চৈতন্যমঙ্গল। এই 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য প্রসঙ্গে বিস্তীর্ণ আলোচনা আছে। বোধকরি চৈতন্য চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র জয়ানন্দ চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে কিছু নতুন ও লৌকিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। জয়ানন্দের রচনার বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি রীতিসিদ্ধ পূর্বসূরীদের মতো অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বক্তব্যের সামঞ্জস্য চাননি। তার মানে এই না যে তার রচনায় ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, আধিদৈবিকতা অলৌকিকতা নেই। আছে, বরং একটু বেশি মাত্রায় আছে। সে জন্যই বোধকরি জয়ানন্দের গ্রন্থ আজও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সমাজে অনাদৃত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য চৈতন্যের মৃত্যু বা অন্তর্ধান রহস্য প্রসঙ্গে চৈতন্য চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র জয়ানন্দ বাস্তব সম্মত কথা শুনিয়েছেন আমাদের। তাঁর কাহিনীর মধ্যে তথ্যগত ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু চৈতন্যের মৃত্যুর কাহিনী শোনাতে গিয়ে কোনরকম দৈবিকতা বা নঞর্থক-লৌকিকতার আশ্রয় নেননি তিনি। জয়ানন্দ লিখেছেন :



'নীলাচলে নিশা এ চৈতন্য টোটাগ্রামে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥'

ধরাধাম থেকে বিদায় নেবার অভিপ্রায়ে ক্রমান্বয়ে উৎকণ্ঠিত চৈতন্য। কি এক অবজ্ঞাত কারণে ধুলো মাটির এই চিরাচরিত সংসার তাঁর ভালো লাগে না। কেমন একটা পলায়নী মানসিকতায় তিনি যেন মহাপ্রস্থানের প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষিত।

এমন একদিন—

'আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥'

জয়ানন্দের মতে এই ইঁটের (ইটাল) আঘাত থেকেই জীবন সংকট হয়েছিল চৈতন্যের।

'চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ণ অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥'

[চৈতন্যমঙ্গল/বিজয় খণ্ড]

অর্থাৎ পায়ে ইঁটের টুকরো বাজলো চৈতন্যের। এতে আহত হলেন তিনি। এরপর ষষ্ঠী তিথির দিন পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হলো। আশ্রয় নিলেন টোটা গোপীনাথের মন্দিরে। জ্বরদগ্ধ শরীরে গদাধরকে বললেন, কাল সপ্তমী তিথিতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় আমি ধরাধাম ছেড়ে নিত্যধামে যাত্রা করবো। পরদিন সত্যি সত্যি দেহত্যাগ করলেন চৈতন্য।*

এই হলো জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বর্ণিত চৈতন্যের অন্তর্ধান কাহিনী।

৬। পরিশেষে চৈতন্যের মৃত্যু বা তিরোধান সম্পর্কে আরেকজন বাঙলা চৈতন্য চরিতকারের বক্তব্য উদ্ধৃত করবো। তাঁর নাম ঈশান নাগর। গ্রন্থের নাম 'অদ্বৈত প্রকাশ'। লোচন দাসের মতো ইনিও পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে চৈতন্যের অন্তর্ধান হবার কথা বর্ণনা করেছেন। লোচনের মতো তিনি লিখেছেন, যে চৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছলো। আশঙ্কিত ভক্তরা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের কপাট পুনরায় খুলে গেল। এবং জানা গেল গৌরাঙ্গ 'প্রকট' হয়েছেন।

'একদিন গোরা জগন্নাথ নিরখিয়া।
শ্রী মন্দিরে প্রবেশিলা হা-নাথ বলিয়া॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল॥
কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা।
গৌরাঙ্গ প্রকট সভে অনুমান কৈলা॥'

['অদ্বৈত প্রকাশ'/২১ অধ্যায়]



* সম্প্রতি 'প্রভাস খণ্ড' নামে একটি মুদ্রিত গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে। বইটি সম্পাদনা করেছেন জনৈক শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এবং বইখানা প্রকাশ করেছেন কলকাতার 'অক্ষয় লাইব্রেরি'। এই বইতে উল্লেখ আছে, নীলাচলে থাকাকালীন একটি নিম্ব (নিম) বৃক্ষের তলায় নিত্যানন্দের কোলে মাথা রেখে চৈতন্য নাকি দেহত্যাগ করেছিলেন। এবং নিত্যানন্দ স্বয়ং অগ্নিকর্তা হয়ে চৈতন্যের শবদাহ করেছিলেন সমুদ্রতীরে চিতা সাজিয়ে। তারপর অর্ধদাহ অবস্থায় দেহটি ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রের জলে।

চৈতন্য সুদীর্ঘকাল বাস করেছিলেন উৎকলদেশের পুরীধামে । ১৫১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রায় ১৮ বছরেরও অধিক সময় তিনি জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে কাটিয়েছেন । চৈতন্যের দৈবানুগ্রহপুষ্ট রূপ ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব উৎকলবাসী-দের আকৃষ্ট করেছিল, সম্মোহিত করেছিল । চৈতন্যের মণীষায় ও বৈদগ্ধে বহু উৎকলবাসী অবলীলায় এসেছিলেন এই তরুণ সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে ।

চৈতন্যের আলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব ওড়িশাবাসীদের কতখানি মুগ্ধ করেছিল তা ওড়িশী ভাষায় রচিত চৈতন্যের জীবনী গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায় । বৈশিষ্ট্যের খুব অসাধারণ প্রকাশ না ঘটলে কারু জীবনীগ্রন্থ রচিত হয় না বিশেষত বিদেশে, বিদেশীদের হাতে । বাঙলার ছেলে চৈতন্য মননশীলতার অসামান্য ক্ষমতায় যুগপৎ বাঙলার মতো ওড়িশায়ও মানব থেকে মহামানবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন অবিসম্বাদিত ভাবে ।

চৈতন্যের জীবন কাহিনী নিয়ে অজস্র গ্রন্থ রচনা হয়েছে ওড়িশা ভাষায় । বোধকরি বাঙলার চেয়েও এর সংখ্যা অধিক । অন্তত প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে । সম্প্রতি দুটি চৈতন্য বিষয়ক অপ্রকাশিত পুঁথি মুদ্রিত হয়েছে । দুটিই ওড়িয়া করণী লিপিতে রচিত । শোনা যায় এরকম অসংখ্য চৈতন্য বিষয়ক অনাবিষ্কৃত পুঁথি পুরীর বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠগুলিতে রয়েছে । আশা রাখি জয়দেববাবুদের মতো সত্যান্বেষীদের লক্ষ্যবেধিতায় সেগুলিও একদিন মঠের ইঁট কাঠের দেওয়াল পেরিয়ে সূর্যালোকে প্রকট হবে ।

স্বভাবতই চৈতন্যের জীবন কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কেবলমাত্র সংস্কৃত বা বাঙলা চৈতন্যচরিতে পাওয়া যাবে না । তাঁর দিব্যজীবনের পূর্বার্ধে নবদ্বীপ লীলা ও উত্তরার্ধে নীলাচল লীলা । সুতরাং তাঁর, বিশেষত নীলাচল লীলার অনুপুঙ্খ বিবরণ জানতে হলে ওড়িয়া ভাষায় লিখিত চৈতন্য চরিতগুলি আমাদের কাছে আবশ্যিক পঠিতব্য । সুতরাং ওড়িশী জাতি ও ওড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নে পরিচয় না থাকলে চৈতন্য জীবনীর অন্ত্যপর্বের পরিচিতির সামগ্রিকতার রূপটি খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ থেকে যায় ।

ওড়িয়া সাহিত্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রচিত চৈতন্য চরিত গ্রন্থের সংখ্যা ছ'খানি । যথা (এক) ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত' । (দুই) মাধব রথের 'চৈতন্যবিলাস' । (তিন) দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' । (চার) কহ্নাই খুণ্টিয়া বা খুটিয়ার 'মহাভাব প্রকাশ' । (পাঁচ) অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা' । এবং (ছয়) গোবিন্দ দেবের 'গৌরকৃষ্ণোদয় কাব্যম্' । শেষোক্ত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত । এছাড়াও সম্প্রতি বিখ্যাত ওড়িয়া পণ্ডিত পদ্মশ্রী সদাশিব রথ-শর্মা মশাই দু'খানা ওড়িয়া (করণীভাষায় লিখিত) পুঁথি আবিষ্কার করেছেন । সেগুলি হলো, (ক) গোবিন্দ দাস বাবাজী রচিত 'শ্রীচৈতন্য চকড়া' । এবং (খ) 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া', লেখক বৈষ্ণব দাস । এই দ্বিতীয় উল্লেখিত পুঁথিটি চৈতন্যের মৃত্যুর তিন বৎসর পর ১৪৫৮ শকে (চতুর্দশ অষ্টাধিক পচাশত শকে) লেখা সম্পূর্ণ করে লেখক বৈষ্ণব দাস তদানীন্তন রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে পুঁথিটি সমর্পণ করেছিলেন বলে জানা যায় । সুতরাং বৈষ্ণব দাস যে শুধু চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি তাই নয়, চৈতন্যের নীলাচল লীলার অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন বলেও ধরা যেতে পারে । বিশেষ করে চৈতন্যের মৃত্যু রহস্যের ব্যাপারে, অর্থাৎ কেন ও কোন পরিস্থিতির মধ্যে এই তরুণ সন্ন্যাসীর মৃত্যু ঘটেছিল । বৈষ্ণব দাসের বক্তব্য এক্ষেত্রে খুবই নির্ভরযোগ্য, বিশেষ করে উন্মোচনের ক্ষেত্রে ।



অতঃপর চৈতন্য জীবনীর দ্বিতীয় পরার্ধে অর্থাৎ তাঁর নীলাচল অবস্থানকালীন ঘটনাবলীকে প্রাধান্য করে যে সকল ওড়িয়া সাহিত্য রচিত হয়েছিল চৈতন্যের তিরোধাম বিষয়ে, তাঁরা কি মতামত দিয়েছেন তা এখন আমরা প্রত্যক্ষ করবো।

১। ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর অভিমত ঃ

ওড়িয়া কবি ঈশ্বর দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে চৈতন্যের তিরোভাব বা মৃত্যু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, সেদিন ছিল চন্দন যাত্রার দিন। হাঁড়িতে হাঁড়িতে চন্দন গোলা হচ্ছিলো। এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরকে দর্শন করার নিমিত্তে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দর্শন হলো। সিংহাসনের নীচ থেকে চুয়া চন্দন কর্পূর ইত্যাদি শ্রীভুজে নিয়ে জগন্নাথের অঙ্গে লেপন করতে লাগলেন চৈতন্য (এমন সময় একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো)। শ্রীজগন্নাথ আনন্দিত হয়ে চৈতন্যকে কোলে তুলে নিলেন। অতঃপর শ্রীমুখ বিস্তার করে (অর্থাৎ হাঁ করে) চৈতন্যকে গ্রাস করলেন তিনি। সকলে দেখলো জগন্নাথ চৈতন্যরূপ ধারণ করেছেন।

'এমন্তে সন্তঘড়ি বেল। চন্দন যাত্রা অনুকুল।
অঙ্গে চন্দন লাগি করি গোবিন্দ যেনি দণ্ডধারী।
নরেন্দ্র শৌচে নাবকেলি। চন্দন হাণ্ডি হাণ্ডি গোলি।
সেঠারু চৈতন্য গোঁসাই। জগন্নাথ ছামুরে যাই।
নৃপতি করে দেই কর। দর্শন ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
সিংহাসন তলে যাই। চৈতন্য দিয়ন্তি বঢ়াই।
চন্দন চুয়া গন্ধসার। মিশাইছন্তি শ্রীকর্পূর।
চৈতন্য শ্রীভুজে ঘেনিন। লেপন্তি প্রভু অঙ্গে পুণ।
সর্বাঙ্গে শ্রীচন্দন বোলি। আনন্দে প্রভু বনমালী।
আনন্দে শ্রীচৈতন্য কোল। কলেক প্রভু আদিমূল।
শ্রীমুখ বিস্তারি গোঁসাই। গর্ভে চৈতন্য লীন হোই।
শ্রীজগন্নাথঙ্ক স্বরূপ। দিশন্তি চৈতন্যরূপ।
দর্শন পাইলে সকল।

[চৈতন্যভাগবত (ওড়িয়া) ৬৫ অধ্যায়]

চৈতন্যের তিরোভাবের এরকম এক অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ঈশ্বর দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত কাব্য শেষ করলেন। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে তা শেষ হয়েও শেষ হলো না। একদিন জগন্নাথ মন্দিরের মুক্তি মণ্ডপে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীরা ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবতের পাঠ শুনে প্রশংসা করেছিলেন। এমন সময় সেখানে চৈতন্য ভাগবতের লেখক ঈশ্বর দাস ও বাসুদেব তীর্থ নামে এক সন্ন্যাসী• উপস্থিত হলেন। ঈশ্বর দাস তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যের যে তিরোভাবের বর্ণনা দিয়েছেন বাসুদেব তীর্থ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন লেখককে, তুমি এসব কথা লিখলে কেন ? লেখক ঈশ্বর দাস কাঁপতে লাগলেন। বললেন, আমি নারায়ণের যা আজ্ঞা পেয়েছি, তাই লিখেছি। কিন্তু জগন্নাথ বিগ্রহ 'হাঁ' করলেন আর অবলীলায় চৈতন্য সেই বিস্তার করা হাঁ মুখে ঢুকে গেলেন এরকম একটা অলৌকিক ঘটনা লিখতে গিয়ে কবি ঈশ্বর দাসেরও বোধকরি সংশয় হয়েছিল। তাই বাসুদেব তীর্থ যখন এই অলৌকিক



• ইনি চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি। শ্রীজীব গোস্বামী আরোপিত বৈষ্ণব বন্দনায় এঁর উল্লেখ আছে। যথা, 'বন্দে বাসুদেবং তীর্থং শ্রীলানন্তপুরীং ততঃ।'

কাহিনীর প্রতিবাদ করলেন, তখন ঈশ্বর দাস তাঁর গ্রন্থের আরেকটি অধ্যায় সংযোজন করলেন। এবং সেই নতুন অধ্যায়ে তিনি কিছু বাস্তব সম্মত কথা যোগ করলেন। বললেন,

'চৈতন্য চন্দন লেপন্তি। শ্রীঅঙ্গে লীন এ হুঅন্তি।
কহিলে চৈতন্য ঠাকুর। শ্রীজগন্নাথ কলেবর।
অদ্ভুত হইল নির্ণয়। মোতে সে লাগিলা সন্দেহ।'

[চৈতন্যভাগবত (ওড়িয়া) ৬৫ অধ্যায়]

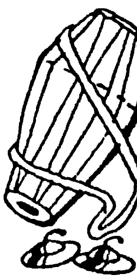
বললেন, ব্যাপারটা সত্যিই গোলমেলে। জগন্নাথের গায়ে চন্দন লেপন করতে করতে একটা মানুষ জগন্নাথের দারুঅঙ্গে লীন হয়ে যাবে এটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে আমি সন্দিগ্ধও। অতঃপর নতুন সংযোজিত অধ্যায়ের শেষ দিকে তিনি লিখলেন, চৈতন্যের মায়া শরীর মন্দিরেই পড়েছিল। তখন জগন্নাথ ক্ষেত্রপালকে আদেশ করলেন, 'এ পিণ্ড শরীর কোন গোপন (অন্তরীক্ষ) পথে দ্রুত নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও। ক্ষেত্রপাল জগন্নাথের আজ্ঞাক্রমে চৈতন্যের পিণ্ড শরীর গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলো।

২। এরপর আমরা বিখ্যাত 'পঞ্চসখা' গোষ্ঠীর অন্যতম কবি অচ্যুতানন্দ দাসের কথায় আসছি। চৈতন্যের তিরোধান রহস্য প্রসঙ্গে তিনি কি মন্তব্য করেছেন দেখা যাক। অচ্যুতানন্দ চৈতন্যের জীবনী সম্বোলিত যে গ্রন্থখানি লিখেছিলেন তার নাম 'শূন্যসংহিতা'। এই শূন্যসংহিতা গ্রন্থে কবি চৈতন্যের তিরোধান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

'এমন্তে কেতেহে দিন বহি গেলা শুনিমা অপূর্বরস।
প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারাত্রটর পাশ॥
এমন্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি।
দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি॥
মহাপ্রতাপ দেব রাজা ঘেনিল পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে।
হরি ধ্বনিয়ে দেউল উছুলই শ্রীমুখ দর্শন রঙ্গে॥
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিশি গলে॥'

['শূন্যসংহিতা' (ওড়িয়া) ১ম অধ্যায়]

অর্থাৎ পূর্বোক্ত কবি ঈশ্বর দাসের মতো জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে চৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়া অতি-লৌকিক কাহিনী অচ্যুতানন্দও অকপটে ব্যক্ত করেছেন। শুধু ঈশ্বর দাসের সঙ্গে অচ্যুতানন্দের পার্থক্য এটুকু, ঈশ্বর দাস বলেছেন, চৈতন্য জগন্নাথের বিস্তারিত মুখ গহ্বরে প্রবেশ করে লীন হয়ে গেছেন। আর অচ্যুতানন্দ বলেছেন, জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে চৈতন্য বিদ্যুৎপ্রায় মিশে গিয়ে জগন্নাথে বিলীন হয়ে গেছেন। এছাড়াও অচ্যুতানন্দ একটি নয়া তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা হলো, চৈতন্যের এই বিদ্যুৎপ্রায় জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটির সময় স্বয়ং কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্র সপার্ষদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত এমন উক্তি এক অচ্যুতানন্দের কাব্যে ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। বিশেষত চৈতন্যের জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে লীন হয়ে যাওয়ার সময় কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রের উপস্থিতি।



অতঃপর আমরা দেখবো, জগন্নাথের শরীরে চৈতন্যকে বিলীন হওয়ার অভূতপূর্ব মুহূর্তটি কবি তাঁর 'শূন্যসংহিতা' কাব্যে কিভাবে উপস্থাপন

করেছেন। তিনি লিখেছেন,

'কলারে কলা　　মিশিলা নোহিলা
সে বারি।'

যার অর্থ জগন্নাথের কৃষ্ণময় অঙ্গে কৃষ্ণরূপ চৈতন্য মিশে গেলেন। কলারে কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি, কালোর সঙ্গে কালোর মিশ্রণ ঘটে দুই কালো একাকার হয়ে গেল।

৩। এবার আমরা দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থে বর্ণিত চৈতন্যের তিরোধান প্রসঙ্গে আসছি। বস্তুত, দিবাকর দাস চৈতন্যের তিরোধান প্রসঙ্গে নতুন কিছু বলেন নি। অপরাপর ওড়িয়া চৈতন্য চরিতকারদের মতো তিনিও 'কলারে কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি' জাতীয় অলৌকিক প্রসঙ্গেরই অবতারণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, একদিন চৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীমূর্তির কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করলেন। বললেন, 'কলিযুগ দুরন্ত, এ ধামে আমি আর থাকতে চাই না। এবার আমি নিজ ধামে যেতে চাই। তারপর?

'এমন্ত ভাবি শ্রীচৈতন্য।
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।'

['জগন্নাথ চরিতামৃত'/সপ্তম অধ্যায়]

এরপর কিভাবে তিনি (চৈতন্য) মিলিয়ে গেলেন, কেন মিলিয়ে গেলেন, তারও একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন দিবাকর দাস। তিনি লিখেছেন,

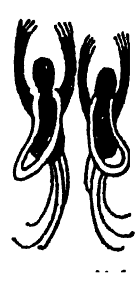
'গোপন হোইলে স্বদেহে।
দেখি কাহার দৃষ্টি নোহে॥
পূর্বে যহিঁরু আসিথিলে।
লেউটি সে অঙ্গ মিশিলে॥'

[জগন্নাথ চরিতামৃত (ওড়িয়া) ৭ম অধ্যায়]

অর্থাৎ তিনি এসেছিলেন ভক্তি সাধনা করতে। মানুষকে ভক্তির পথ দেখাতে। জগৎ সংসারে সেই ভক্তি দান করে তিনি নিজ ধামে চলে গেলেন।

৪। এবার আমরা যে ওড়িয়া গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করবো তার নাম 'চৈতন্য চকড়া' এর লেখক গোবিন্দ দাস বাবাজী। ১৪৫৮ শকে (চতুর্দশ অষ্টাধিক পচাশত) অর্থাৎ চৈতন্যের মৃত্যুর তিন বছর পর এই গ্রন্থখানি লেখা সমাপ্ত করে লেখক তদানীন্তন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। সম্ভবত রাজা প্রতাপরুদ্রের আনুকূল্যে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। তারপর কোন কারণ বশত বোধকরি মূল পাণ্ডুলিপির 'কপি'টি হারিয়ে যায়। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এর একটি প্রতিলিপি করা হয়েছিল। লিপিকার পুরীর গঙ্গামাতা মঠের অধিকারী রসিকরাজ প্রভুর শিষ্য বাবাজী শ্রীল ভগবান দাস গোস্বামী মহান্ত। অতঃপর মূল গ্রন্থ থেকে অনুলিপি করা এই পুঁথিটি দীর্ঘকাল মঠবন্দী হয়ে থাকার পর উক্ত গঙ্গামাতা মঠের বর্তমান মোহান্ত বনমালী দাস গোস্বামীর অনুগ্রহে ও উৎসাহে পুঁথিটি ১৯৮২ খ্রীঃ এর ২৬শে জুন তারিখে, এবং ১৯৮৫ সালে এটি ২১।২ বিডন স্ট্রীট কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়ে সর্বসমক্ষে প্রকাশ পায়। যার নাম 'চৈতন্য চকড়া'।

তো এই মুদ্রিত 'চৈতন্য চকড়া'র শেষাংশের এক জায়গায় লেখা আছে,



'চতুর্দশ অষ্টাধিক পচাশত শকে।
চকড়া শেষ করলু করমানু বিপাকে॥

চকড়া পাঞ্জী লেখি ছামুরে জনাই ।
ক্ষেত্রর চরিত এথি অন্য লীলা নাই ॥
নয়নে দেখিন সাধুবাণী অনুরূপ ।
চকড়া সমাপ্ত কলু আজ্ঞারে প্রত্যক্ষ ॥'

[চৈতন্য চকড়া' । শেষাংশ]

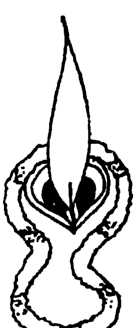
যার বাংলা অর্থ হলো, '১৪৫৮ শকাব্দে আমি এই গ্রন্থখানি শেষ করলাম । এই কচড়া পঞ্জীটি লিখে আমি রাজার সামনে নিবেদন করলাম । এতে কেবল পুরী শ্রীক্ষেত্রে আচরিত চরিত ভিন্ন অন্য কোন লীলা নেই । যা আমি চোখে দেখেছি, যা আমি সাধু মুখে শুনেছি তাই লিখে রাখলাম প্রত্যক্ষ রাজাজ্ঞায় ।' (চৈতন্য চকড়া/সদাশিব রথশর্মা অনুদিত) ।

সুতরাং উপরোক্ত এই বক্তব্য থেকে খুবই স্পষ্ট জানা যাচ্ছে, চৈতন্য চকড়া গ্রন্থের রচয়িতা গোবিন্দদাস শুধু মাত্র চৈতন্যের সমসাময়িক না, সমকালীনও । অর্থাৎ চকড়া যেখান থেকে শুরু হয়েছে তাতে অনুমান হয়, লেখক বৈষ্ণব দাস শুধুমাত্র চৈতন্য ভক্তই ছিলেন না, চৈতন্যের নীলাচলে আগমনের কাল থেকে তিরোভাব লীলা সব কিছুরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষীও ছিলেন । এবং বোধকরি সেই কারণে রাজা (প্রতাপরুদ্র) উপযুক্ত ব্যক্তি অনুমান করেই গোবিন্দ দাসকে চৈতন্য চরিত লিখবার আজ্ঞা করেছিলেন ।

অতঃরপ এই 'চৈতন্য চকড়া' গ্রন্থে চৈতন্যের তিরোভাব বা মৃত্যু রহস্য প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাস ভাবী প্রজন্মের জন্য কি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা এবার দেখা যাক ।

প্রত্যক্ষদর্শী গোবিন্দ দাস সন্ন্যাসী চৈতন্যের অভূতপূর্ব অন্তর্ধানের মুহূর্তটি এভাবে উপস্থাপন করেছেন আমাদের কাছে । তিনি লিখেছেন,

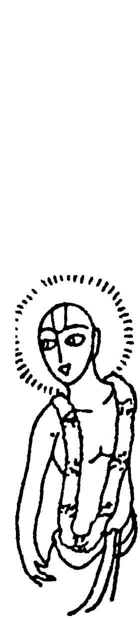
'চতুর্দ্দশ ষষ্ঠাধিক পঞ্চশত শাকে । অপূর্ব্ব লীলা ঘটিলা প্রত্যক্ষে ॥
শুক্লা সপ্তমী তিথি যে অবশ কইলা । আতুরে ভাবেরে গোরা কীর্ত্তনে গমিলা ॥
আড়প মণ্ডপে চারি সম্প্রদায় সহ । উদ্দণ্ড নর্ত্তন অস্তব্যস্ত প্রভু দেহ ॥
গোবিন্দ স্বরূপ দুহুঁ আকুলিত তনু । শ্রীঅঙ্গ সম্ভালিবারে চকিত সুতনু ॥
পাদুক কুণ্ড সমীপে বেঢারে বসিলে । বিরহ কীর্ত্তনে সর্ব্বে অসম্ভাল কলে ॥
ফিটি বহির্বাস গলা মালা অসম্ভাল । মহারাসস্থলী রাসগীতে অনর্গল ॥
সর্ব্বনেত্র তার পূর্ণ আকুল বদন । রায় পাশে বসি করে আকুল ক্রন্দন ॥
মৃদঙ্গ বেতাল স্বর কাতরে বেতাল । সর্ব্বে অনুভব কলে সম্বরণ কাল ॥
সন্ধ্যা আরতি দরশনে সেবকে গ্রাইলে । • • •
বিজে দ্বার সেই গলে গোরাঙ্গ ঠাকুর । গরুড় স্তম্ভ সমীপে দরশনে আতুর ॥
সন্ধ্যা আরতি উঠিলা পড়িলা চহল । ছিণ্ডি পড়িলা প্রভুঙ্ক অধরর মাল ॥
সহসা শতেক চন্দ্র উদিয়ার তেজ । প্রকাশরে নেত্র সর্ব্ব কি ঘটিলা আজ ॥
দিব্য জ্যোতি প্রায় তেজ গরুড় পছরু । জগন্নাথ ছামু পড়ে ধাতি কারু ॥
হরি হরি জয় নীলাচল পতি জয় জয় । শবদে আড়প কম্পে ন' ধরিলা থর ॥
স্তম্ভ পাশে থিলে প্রভু ন' দিশে বদন । কেনে গলে ভক্ত সর্ব্বে আকুলিত মন ॥
কেহ বলে সিংহাসন পথে অবাগলে । প্রতিহারীগণে বাক্য অস্বীকার কলে ॥
আকুলে খোজন্তি সর্ব্বে বৈষ্ণব মণ্ডলী । দেখিলে নিরেখি আড়পর বনস্থলী ॥
কেহ বোলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সর পথে গলে । খোজিন স্বরূপ এথি নিরাশ হইলে ॥
নৃসিংহ বল্লভ আই তোটারে খোজিল ॥ গোবিন্দ সেবক সঙ্গে বৈষ্ণব কেতেক ॥
সমুদ্র পন্থা খোজই করি মহাশোক ॥ • • •



সেবক ভকতগণ বড দেউলবে। খোশন্তি সিদ্ধ বকুলে নগর মধ্যরে।
অনন্ত সিংহ পাত্র যে অম্বরে আরোহী। গোরাচান্দ গলে কেনে অবাক কঁহি॥
তোটা গোপীনাথ তাঙ্কক প্রিয় স্থলী। রায় বোলে অবা থিবে ধর্ম সেহি স্থলী॥
সকলে খাবন্তি বস্ত্র বেশ অসম্ভালি। • • •
গোপীনাথ বেঢা ঠারে বহির্বাস দেখি। স্বরূপ বৈষ্ণবগণে হেলে মহাসুখি॥'

['চৈতন্য চকডা'/(ওড়িয়া) /পৃ ৬৯, ৬০]

যার বাঙলা অর্থ হলো, 'চৌদ্দশ, ছাপান্ন শকে (১৫৩৩ খৃঃ) এক অদ্ভুত লীলা সংঘটিত হ'ল। আষাঢ় শুক্ল নবমী তিথি। আতুর ভাবে গোরা কীর্তন করতে লাগলেন। সেই গুণ্ডিচা মন্দির। অস্ত ব্যস্ত শরীর। উদ্দণ্ড কীর্তনে মত্ত। বিহ্বল গোবিন্দ ও স্বরূপকে ধরে পাদুকা কুণ্ডের সমীপে বসে পড়লেন। অপূর্ব বিরহ কীর্তন। মহারাসস্থলী প্রকম্পিত হলো। বহির্বাস খুলে গেল। গলার মালা ছিঁড়ে পড়ে গেল। মহারাসস্থলী রাসগীতে অবিরাম মুখরিত। বিরহে মিলন। সবার হৃদয়ে আকুল ক্রন্দন। রায় রামানন্দের পাশে বসে সবাই কাঁদছেন। সব কিছু বেতাল। স্বর বেতাল। মৃদঙ্গ বেতাল। সবাই অনুভব করলেন, 'লীলা সম্বরণের' কাল উপস্থিত। সন্ধ্যারতির সময় হলো। সেবকরা আদর করে ডেকে নিয়ে গেল গৌরাঙ্গ ঠাকুরকে। প্রভু গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আকুল চিত্তে দর্শন করতে লাগলেন। আরতির ধ্বনি উঠলো। চারিদিকে নামের ঐক্যতান। এই সময় জগন্নাথের গলার মালা হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ে গেল। সহসা মহাভাব যেন শত চন্দ্রোদয়ের জ্যোতির মতো দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশিত হলো। সকলের চোখের সামনে গরুড় স্তম্ভের পিছন থেকে একটি জ্যোতি গিয়ে জগন্নাথের শরীরে বিলীন হয়ে গেল। জয় হরি। জয় গৌর হরি জয় নীলাচলপতি ধ্বনিতে সমস্ত গুণ্ডিচা মণ্ডপ মুখরিত হয়ে গেল। প্রভুর স্বরূপ আর দেখা গেল না। সবাই বললে কোথায় গেলেন? কেউ বললে সিংহাসনের দিকে গেলেন। প্রতিহারীরা বললে না, প্রভু সিংহাসনের দিকে তো যান নি। বৈষ্ণবরা আকুল হয়ে গুণ্ডিচা মণ্ডপের বনস্থলী খুঁজতে লাগলেন। কয়েকজন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়েও নিরাশ হলেন। কিছু লোক নৃসিংহ বল্লভ আই টোটায় সন্ধান করলেন। সেবক গোবিন্দর সঙ্গে কিছু বৈষ্ণব শোকাকুল হয়ে সমুদ্রের ধারে খুঁজে দেখলেন। শ্রীমন্দির, সিদ্ধকুল সব জায়গা দেখা হ'ল কোথাও কোন সন্ধান মিললো না। কর্মচারী অনন্ত সিংহ অশ্বারোহণে খুঁজতে বেরোলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। কোথায় গেলেন প্রভু? রামানন্দ রায় বললেন হয়তো তিনি গোপীনাথের মন্দিরে থাকবেন। দেখলেন সেখানে বহির্বাস পড়ে আছে।'



উপরোক্ত 'চৈতন্য চকড়া' থেকে চয়ন করা ওড়িয়া কবিতার বঙ্গানুবাদ এখানেই শেষ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চকড়ার কবি গোবিন্দ দাস বাবাজী চৈতন্যের আরও কিছু গোপন কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যেমন, গোপীনাথের মন্দিরে এসে ভক্তরা দেখলেন, চৈতন্যের বহির্বাস সেখানে পড়ে আছে। তাহলে চৈতন্য গেলেন কোথায়? তখন বৈষ্ণবরা ভাবলেন, প্রভু বোধহয় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। কোন ভক্তজন-বৈষ্ণব প্রভুকে নিশ্চয় এখানে নিয়ে এসেছে। না হলে প্রভুর বহির্বাস এখানে এলো কোথা থেকে? এমন সময় রায় রামানন্দ বললেন, শোকে অধীর হওয়া বৈষ্ণবদের লক্ষণ নয়। এ সাধারণ লোকের লক্ষণ। বললেন, দ্যাখো, এখানে প্রভুর বহির্বাস পড়ে আছে। আরও দ্যাখো, টোটা গোপীনাথের জানুদেশে একটি ক্ষত চিহ্ন

হয়েছে যা আগে আদপেই ছিল না। আমার মনে হয়, দিব্য সত্তা এই পথ দিয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছেন।

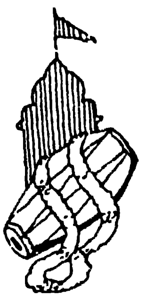
এই হলো চৈতন্য চকড়ার লেখক গোবিন্দ দাস বাবাজীর চৈতন্যের অন্তর্ধান প্রসঙ্গে আদ্যপান্ত বক্তব্য। প্রকারন্তে গোবিন্দ দাস অন্যান্য চরিত রচয়িতাদের মতো চৈতন্যের দেহ জগন্নাথে লীন হওয়ার কথাই বোধকরি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তার পরেও টোটা গোপীনাথের মন্দির ও গোপীনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তিনি। অর্থাৎ অন্যান্য চৈতন্য রচয়িতাদের মতো চৈতন্য জগন্নাথের শরীরে বিলীন হয়ে গেছে বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন নি। সেই সঙ্গে টোটা গোপীনাথের জানুদেশে একটি ক্ষত চিহ্নের ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন, এবং তারপরই রায় রামানন্দের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,

'দেখ অদভুত বস্তু এথারে ঘটিছি।
প্রভু অঙ্গবাস মালা এ-ঠারে পড়িছি॥
গোপীনাথ জানুদেশে ক্ষতর আকার।
ন'থিলা ত কদা এহু বিচিত্র ব্যাপার॥
দৈবী সত্ত্বা দেব সঙ্গে বিলীন লভিলা।
একে দেখি প্রভুলীলা সম্বরণ কলা॥' [পৃ ৬০]

অর্থাৎ, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, প্রভুর মালা, বহির্বাস এখানে পড়ে আছে অথচ প্রভু নেই। গোপীনাথের জানুদেশে একটি ক্ষত চিহ্ন লক্ষ্য কর, এরকম চিহ্ন এর আগে কদাপি ছিল না। রামানন্দ বললেন, আমার মনে হয়, এই যে ক্ষত চিহ্ন, চৈতন্যের দিব্য সত্তা এর ভেতর দিয়েই গোপিনাথের বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেছে।*

এখানে কবি গোবিন্দ দাস বাবাজীর বক্তব্যে আমরা সামঞ্জস্যহীনতা এবং প্রছন্নতা দুটোই লক্ষ করছি। প্রথমত, চৈতন্য যদি জগন্নাথ বিগ্রহের সাথে বিলীন হয়ে গেলেন, যা তিনি বলেছেন, তা হলে টোটা গোপীনাথের জানুর ফুটো দিয়ে চৈতন্যের দিব্য সত্তা প্রবেশের অবতারণা করার কারণ কি? এবং দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন হলো, যদি চৈতন্যের দিব্য সত্তা গোপীনাথের জানুর ক্ষত ধরে বিগ্রহে লীন হলো তাহলে চৈতন্যের 'শব' দেহটি গেল কোথায়?

৫। এবার আমরা সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত একটি ওড়িয়া গ্রন্থের আলোচনা করতে চলেছি। গ্রন্থটির নাম 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া'। প্রাচীন উৎকলীয় করণী লিপিতে লেখা তালপাতার এই কীটদগ্ধ জীর্ণ পুঁথিখানি ১৯৬২ অব্দে



* তোটা গোপীনাথের দরজার ঠিক মাথার ওপরে কালোর ওপরে সাদা রঙে লেখা চার লাইনের একটি বাঙলা কবিতা আছে, 'কি করিব কোথা যাবো বাক্য নাহি স্ফুরে।/হারাইলাম গোরাচাঁদে গোপীনাথের ঘরে॥/গোপীনাথের ঘরে গেলা দর্শন করিতে। অপ্রকট হইলা গোপীনাথের অঙ্গতে। আমরা উক্ত কবিতার প্রসঙ্গ তুলতে গোপীনাথ মন্দিরের মহান্ত হরেকৃষ্ণ দাস মশাই তোটা গোপীনাথের জানুদেশের ক্ষত চিহ্নের কথা উত্থাপন করেছিলেন। চৈতন্য গোপীনাথের এই নুব্জ মূর্তিটি পেয়েছিলেন সমুদ্রের বালির ভেতর থেকে। মনে হয়, পুরীতে মুসলমান আক্রমণের সময় কোন ভগ্ন মন্দির থেকে পাথরের এই মূর্তিটি এখানে কেউ ফেলে দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে মূর্তিটির কোন অংশে ভগ্ন চিহ্ন বা অস্ত্রের দাগ থাকা বিচিত্র না। গোপীনাথের জানুদেশে যে ক্ষত চিহ্ন বলে কথিত সেটি এরকম কোন ভগ্ন চিহ্নও হতে পারে।

ওড়িশার গঞ্জাম জিলার শিবুল' গ্রামের রাধাকৃষ্ণ পাণ্ডার বাড়ি থেকে পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা মশাই আবিষ্কার করেছিলেন। পরে এই পুঁথিটির খণ্ডাংশের দুটি ভাগ করে এক ভাগ শ্রী জয়লাল ডালমিয়া ও অন্যভাগ আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়কে তিনি দান করেন সম্ভবত গবেষণার জন্য। জয়দেববাবুকে দেয় পুঁথির খণ্ডাংশটি আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে গবেষক জয়দেববাবুরই অনুগ্রহে। খুবই অস্পষ্ট লিপি।

'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া' নামক এই পুঁথিটির লেখকের নাম সম্ভবত বৈষ্ণব দাস। সম্ভবত বলছি এজন্য যে, এই প্রাপ্ত পুঁথিটিও পূর্বোক্ত 'চৈতন্য চকড়া'-র মতো অনুলিপি করা। তাছাড়া দীর্ঘকালের অযত্ন বশত পুঁথিটির প্রথম দিককার পাতাগুলো বিশ্রীভাবে জুড়ে যাওয়ার জন্য শেষভাগ ব্যতীত অন্যান্য লিপি উদ্ধার করা সঙ্গত কারণে সম্ভবপর হয়নি। নিয়মরীতি অনুযায়ী হয়তো গোড়াতে লেখকের নাম পরিচয় ছিল। যা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। শুধু পুঁথিটির ৩৭ ও ৪০ পৃষ্ঠায় রচয়িতা হিসেবে একজন বৈষ্ণব দাসের নাম উল্লেখ আছে।

'এ পোথি রচিল দীন বৈষ্ণব দাস।' (পৃষ্ঠা ৩৭)

'দীন হীন বৈষ্ণবের চকড়া রচনা।' (পৃষ্ঠা ৪০)

এই দুটি লাইন থেকে 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া'র লেখকের নাম যে বৈষ্ণব দাস তা স্পষ্ট করে বলা সঙ্গত নয়। কেননা, পরম বৈষ্ণব ভক্ত বশতঃ 'দীন বৈষ্ণব দাস' বলা লেখকের পক্ষে অসম্ভব না। আবার লিপিকারও নিজের নামটি এভাবে, বা এই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। যেমন কাশীরাম দাস বা ওঝা কৃত্তিবাস তাঁদের স্ব স্ব অনূদিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে নিজেদের নামটি জুড়ে দিয়েছেন।

তো এই যার নাম 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া' এই পুঁথিটির সাথে অন্যান্য সকল চৈতন্যচরিত গ্রন্থের একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করছি। বিশেষত চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য ব্যাপারে। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের কোনও লেখক বলতে পারেন নি যে চৈতন্যের অন্তর্ধান বা দেহত্যাগের সময় তিনি (লেখক) সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মানুষ চৈতন্যের জীবনে কি ঘটনা ঘটেছিল। বস্তুত একমাত্র বৈষ্ণব দাসই সেই বিরল মানুষদের একজন, যিনি দাবী করেছেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে, চৈতন্যের দেহত্যাগের সময় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কোথায়, না পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রের মূল মন্দিরে। এবং তারও চেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হলো, বৈষ্ণব দাস জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে চৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেন নি। অধিকন্তু তিনি বলেছেন,

'রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল,
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে।
কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে॥'

['চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া']

অর্থাৎ রাত্রি দশ দণ্ডে (এগারোটা নাগাদ) চন্দন বিজয়ের পর মহাপ্রভুর (চৈতন্যের) দেহ গরুর স্তম্ভের পিছনে পড়ে গেল। উপস্থিত বৈষ্ণবগণ সকলে আকুলি-ব্যাকুলি করে কেঁদে উঠলো। আর লেখক বৈষ্ণব দাস নিজেকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে ঘোষণা করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, এই চকড়া লেখক বৈষ্ণব দাসের বক্তব্যের সাথে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর একটা খুব কাছাকাছি



সাদৃশ্য রয়েছে। জয়ানন্দ, লোচন ও বৈষ্ণব দাস তিনজনই বলেছেন চৈতন্যের তিরোভাব ঘটেছিল আষাঢ় মাসে, রথযাত্রার সময়ে। সুতরাং তিথিটা ছিল অবশ্যই শুক্ল পক্ষ। জয়ানন্দের মতে সপ্তমী আর বৈষ্ণব দাসের মতে পূর্ণিমা। আর কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্র যে সে সময় পুরীতে ছিলেন এ ব্যাপারে প্রায় সকল চরিতকার একমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এবার আমাদের চৈতন্যের দেহাবসানের সময়টি খুঁজে বের করতে হবে। লোচন দাস বলেছেন,

'তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥'

আর বৈষ্ণব দাস বলছেন,

'রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল,
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে।'

রাত্রি দশ দণ্ড মানে প্রায় এগারোটা। আর লোচন বলেছেন, 'তৃতীয় প্রহরে বেলা রবিবার দিনে,' অর্থাৎ বিকেল তিন কি চারটে নাগাদ। উক্ত দুই চরিতকারের বক্তব্য থেকে এই ধারণা করা যেতে পারে যে বিকেল তিন কি চারটে থেকে রাত্রি এগারোটা নাগাদ কোন এক সময় চৈতন্য দেহত্যাগ করেছেন।

অতঃপর ঠিক কোথায়, কেমন করে, ও কোন পরিস্থিতির মধ্যে সন্ন্যাসী চৈতন্যের মাত্র ৪৭ বৎসর ৪ মাস ১০ দিনের মাথায় অকাল মৃত্যু ঘটলো সে বিষয়ে আমাদের কিছু অবগতির জন্য আরেকবার আমরা জগন্নাথক্ষেত্র পুরীর উদ্দেশ্যে যুগপৎ পূর্বশ্রুত ও অশ্রুতপূর্ব পথে যাত্রা করবো।

[পঁচিশ]
চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য—দুই

বাইবেলে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ উক্তি আছে, 'He that hath knowledge spareth his word' অর্থাৎ, যে মানুষ যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী সে খুবই কম কথা বলে। এই যে জগন্নাথ বিগ্রহের দারুঅঙ্গে চৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়া জনিত ঘটনা এটি একটি আপাত অ-লৌকিক ব্যাপার মনে হলেও এর অভিপ্রেত সত্য কিন্তু অভিভূত লৌকিকতার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। যেমন ঝড় আসার আগে নিসর্গলোকের একটি কঠিন স্বরূপ অনুভূত হয়, এবং তার প্রকাশকালীন অনিশ্চয়তার বৈপরীত্যে আমরা আগুয়ান হই, দরজা জানালা বন্ধ করে প্রকৃষ্ট নিশ্চয়তা খুঁজি, কিন্তু ঝড়ের অনিবার্য স্বকীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তদ্রূপ, পরিস্থিতির বিপাকে চরিতকারগণ অতিলৌকিতার বাতায়ন কপাট রুদ্ধ করে মৃত্যু নামক ঝঞ্ঝার সত্যতাকে বিগ্রহের অঙ্গে মানুষের বিলীন হয়ে যাওয়া গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।



কথা হলো পরিস্থিতির প্রতিকূলতা নিয়ে, কি এমন পরিস্থিতির বিরূপতার কারণে চৈতন্য চরিতকারেরা, বিশেষত চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গটি যুগপৎ সংক্ষিপ্ত ও প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তা আমাদের এ প্রসঙ্গের পূর্বাহ্নেই জ্ঞাত থাকা দরকার।

চৈতন্যের তিরোভাবের সময় ওড়িশার রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহাওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'The History of Medieval Vaishnavism in Orissa' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Assassination, rebellion and struggle for power brought about internal anarchy' (P 177).

কিন্তু কোন অবস্থায় ও কি পরিস্থিতির মধ্যে ওড়িশায় এ হেন রাজনৈতিক অস্থিরতার সূত্রপাত ঘটেছিল ? দেশে দস্তুরমতো রাজা থাকতে, রাজ শাসন থাকতেও এরকম অরাজকতা, নৈরাজ্যতার কারণ কি ? এ প্রসঙ্গে জানতে হলে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ চৈতন্যের নীলাচলে আগমনের এক বছর আগের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখতে হবে আমাদের।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর নেতৃত্বে মুসলমান সেনারা যখন ওড়িশা আক্রমণ করলো, ঠিক তার অব্যবহিত পরেই গড় মান্দারন দুর্গের নিভৃতে শুরু হয়েছিল কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে পয়লা চক্রান্ত আর এই চক্রান্তের নায়ক ছিলেন কলিঙ্গরাজের অন্যতম সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর। গড় মান্দারনের অবরুদ্ধ দুর্গের ভেতর মুসলমান সেনারা যখন খানা পানীর অভাবে প্রায় বেহেস্তে যেতে বসেছে ঠিক সেই সময় গোবিন্দ বিদ্যাধর হঠাৎ দুর্গ প্রতিরোধ তুলে নিলেন কেন ? এর সম্ভাব্য উত্তর দাঁড়ায় একটাই। আর তা হলো, উৎকলের সিংহাসনের বিনিময়ে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে বিদ্যাধরের গোপন আঁতাত।

এই যে দেশের রাজার বিরুদ্ধে দেশের সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা এর প্রকাশ গড় মান্দারনে ঘটলেও এতো বড়ো একটা রাজদ্রোহিতার ঘটনাকে আকস্মিক ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। এর সূচনা ঘটেছিল বোধকরি এর অনেক আগেই। আর রাজবাড়ীর অন্দর মহলের মধ্যেই সম্ভবত এই দুষ্প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটেছিল।* যদি যুক্তি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, রাজা প্রতাপরুদ্র সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের কোন দুরভিসন্ধির ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ অবহিত ছিলেন না, তাহলে, গড় মান্দারন যুদ্ধে সেনাপতির ক্ষমাহীন শৈথিল্যতাকে রাজা মুখ বুজে মেনে নিলেন কেন ? উপরন্তু এরপর দেখা গেল, রাজদ্রোহী সেনাপতিকে শাস্তি দান তো দূরের কথা উচ্চপদে বহাল রাখলেন তিনি। এ কি শুধু মাত্র রাজার উদারতা ? নাকি এই উদারতা অনন্যোপায়তার ফলশ্রুতি ?

এর এক বছর পর ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য এলেন ওড়িশায়। এসে আটন নিলেন পুরুষোত্তমে। কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্র তখন বিদেশে। দক্ষিণদেশের রাজা বিজয় নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত। অন্যদিকে গৌড় বাঙলা ও উৎকল সীমান্তে দাবানলের মতো সীমান্ত যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রমান্বয়ে। একদিকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়, অন্যদিকে মুসলমান সুলতান হুসেন শা, এই দুই পরাক্রান্ত শত্রুর মাঝখানে ঘরভেদী বিভীষণ গোবিন্দ বিদ্যাধরের অবস্থান। অনেকটা একদিকে রাহু, অন্যদিকে কেতু ও মাঝে দুষ্ট শনি—এই ত্রয়ী বিরুদ্ধ শক্তির



* কেউ কেউ এরকম ধারণা করেন যে ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্রের কোন মহিষীর সঙ্গে নাকি সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের গোপন প্রেম ছিল। তা যদি হয়, তাহলে রাজার বিরুদ্ধে রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলেই ষড়যন্ত্র নামক বীজের উন্মেষ ঘটেছিল বলা যায়।

মাঝখানে ছিল রাজা প্রতাপরুদ্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। বস্তুত, এই নিরন্তর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যেতে গিয়ে এক রকম পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলেন কলিঙ্গরাজ। হয়তো বা স্বাভাবিক কারণেই নিজের ওপর কিছুটা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এমন এক সময় মেঘ চাইতে বৃষ্টির মতো অনিন্দ্যসুন্দর, শিখা সূত্র মুণ্ডিত এক যুবা সন্ন্যাসীর আগমন ঘটলো নীলাচলে। এসেই সীজারের সেই বহু বিখ্যাত 'ভিনি ভিদি ভিসি' উক্তির মতো তৎকালীন পুরীর একজন খ্যাতনামা মাসলম্যান (অনন্ত প্রতিহারী) ও জনৈকা সুন্দরী নর্তকী দেবদাসী লাবণ্যকে কৃষ্ণনামে বশীভূত করে প্রায় রাতারাতি দৃষ্টি আকর্ষণে এলেন ওড়িশার মানুষদের। অলৌকিতা তান্ত্রিকতার যুগে আচমকা চৈতন্য অনন্ত প্রতিহারীর মতো বলশালীকে কুপোকাৎ করে, ও লাবণ্যের মতো মন্দির নর্তকীকে বিষয় থেকে বৈরাগ্যের গৈরিক পথে টেনে এনে যে অভাবনীয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন তাতে ওড়িশী মানুষদের কাছে রাতারাতি তিনি যে একজন গড ফাদারে পরিণত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেশের রাজা তখন দাক্ষিণাত্যের রণক্ষেত্রে। কথাটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে রাজার কানেও পৌঁছালো। অসহায়, যুদ্ধক্লান্ত রাজা কোন অলৌকিক শক্তিধর পরাক্রমশালী মানুষ ধারণা করে আশ্রয় নিলেন চৈতন্যের ছত্রছায়ায়।

আর তখন চৈতন্য তাঁকে উপদেশ দিলেন,

'কৃষ্ণকার্য বিনা তুমি না করিবে আর ॥'
নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণের সংকীর্তন।
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন ॥'

[চৈ. ভাগবত : ৩/৫/২০০-২]

যদিচও রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের কাছে কোন দীক্ষা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু দীক্ষিত না হলেও তিনি চৈতন্যকে বলতেন, 'প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা'। প্রথমে চৈতন্য কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রকে 'বিষয়ী রাজা' বলে দর্শন দিতে চাননি। যার উত্তরে রাজাকে বলতে শোনা গেল,

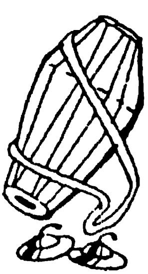
'মোর প্রতিজ্ঞা তাহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই দর্শন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥'

[চৈ. চরিত্রামৃত/মধ্য/১২ পরিচ্ছদ]

কৃষ্ণদাস বিরোচিত উপরোক্ত এ পয়ারাংশ থেকে বেশ অনুমান হয় যে রাজা প্রতাপরুদ্র কি ভীষণ রকম ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন চৈতন্যের কাছে। 'চৈতন্য' নামক নদীতে তখন প্রবল জোয়ার। সেই জোয়ারের অবদমিত তোড়ে খড়কুটোর মতো ভেসে চলেছে ওড়িশার অগণিত মানুষ। এমন কি স্বয়ং দেশের রাজা পর্যন্ত। এক এক দিন প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে রাজা অবাক হয়ে দেখতেন দর্শনোৎকণ্ঠা মানুষ জগন্নাথকে দর্শন না করে আগে চলেছে চৈতন্যকে দর্শন করতে।

'—সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসায় আগে চলিল ধাইয়া ॥'

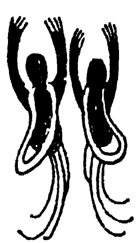
অর্থাৎ পরিস্থিতি তখন এমনই চৈতন্যের অনুকূলে যে দেশের রাজা প্রজা সবাই চৈতন্যের কথায় উঠছে বসছে বলা যায়।



কিন্তু 'Catalogue of Sanskrit Mss, at the India office library

in london', Ed. by Dr. Egglling P. 419. গ্রন্থে যাঁকে যুদ্ধজয়ী, অমিতবীর্য মহাপরাক্রমশালী নরপতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামক গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে যাঁকে বলা হয়েছে, 'ইনিই (প্রতাপরুদ্র) ছিলেন পূর্বে জগন্নাথ দেবের অর্চক মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, তিনিই এখন ইন্দ্রসম ঐশ্বর্যশালী প্রতাপরুদ্রদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন ।' (১১৮ অংশ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । রায় রামানন্দ তাঁর 'জগন্নাথ বল্লভ নাটকম্' গ্রন্থে (১ম অঙ্ক, ৫-৭ শ্লোকে) যার সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাঁর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেকেন্দর নামক যবনরাজ ভয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করেন, 'গুলবার্গ দেশের (Gulbarga in Karnat) রাজা মৃত্যুভয়ে কম্পিত হয়ে নিজ স্বজনবর্গের প্রতি সাশ্রুনেত্রপাত করতে থাকেন, গুর্জর নৃপতি নিজ রাজধানীকের অরণ্যের ন্যায় শ্বাপদ-সংকুল এবং বিপজ্জনক মনে করেন, গৌড়াধিপতি নিজেকে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, ক্ষুদ্র পোতারূঢ় মানুষের মতো অসহায় বোধ করেন ।' ('কাহা গেলে তোমা পাই'/ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়/পৃঃ ৫০-৫১) । এমন একজন অমিত বিক্রমশালী রাজা কোন পরিস্থিতির মধ্যে এসে অস্ত্রের ঝনঝনি, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ভুলে একজন সন্ন্যাসীর ছত্রছায়ায় এসে কৃষ্ণভক্তি রসে নিমজ্জিত হলেন তা আমাদের কাছে খুব দুর্বোধ্য হবার কারণ নয় । এই রোবট কম্পিউটারের যুগেও মানুষ তার মহত্তর ও অতি গরীয়ান প্রতীক নিজের প্রতি বিশ্বস্ততা হারিয়ে, অলৌকিকতা ও দৈবশক্তির মধ্যে দিয়ে কঠিন বাস্তবতার মোকাবিলা নিতে চায় । খুব বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষকেও আমরা দুঃখদুর্দৈব ও দুভার্গ্যের দিনে বাস্তব স্বাতন্ত্র্য ভুলে আধিদৈবিকতা, অলৌকিকতার শরণাপন্ন হতে দেখি । বস্তুত, এখানে এর প্রয়োজনীয়তা বা নিষ্প্রোজনীয়তা কোন বড়ো কথা না, বাস্তবতার প্রতি সত্যের এবং সত্যের প্রতি বাস্তবতার সংঘাতই এর বড়ো কারণ । রোমের কবি লুকান, লেবিসান, নাট্যকার টেরেনস্, দার্শনিক ক্যাটো, মার্ক অ্যান্টনি, ব্রুটাস, ক্লিওপেট্রা প্রমুখেরা আত্মহননে প্ররোচিত হয়েছিলেন এই কঠিন সংঘাতের আবর্তে পড়েই । মধ্য প্রস্তর যুগ (mesolithic) নব্য প্রস্তর যুগ (neolithic) বা উচ্চ প্রস্তর যুগের (upper palacolithic) অরণ্যচারী মানুষেরা গাছ, পাথর-বারিধি প্রভৃতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো, অর্চনা করতো । কেন না প্রকৃতির বিপর্যয় যথা অতিবৃষ্টি, প্লাবন, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, বা বনে দাবানল লাগার কারণ বা এসব থেকে পরিত্রাণের কোন প্রকৃষ্ট উপায় তাদের জানা ছিল না । এই নিরুপায়তা থেকে মুক্তির অন্বেষণই হলো দৈবি শক্তির আরাধনা ।

স্বভাবতই যুদ্ধক্লান্ত, ঘরে বাইরে শত্রুবেষ্টিত রাজা চৈতন্যের সান্নিধ্যে এসে সেই দৈবি শক্তির সামর্থ নিয়ে জাগতিক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হতে চাইলেন । ফলত, যা হবার তাই ঘটতে লাগলো । অথবা বলা যেতে পারে, যা ঘটনীয় ঘটিতব্য তাই সংঘটিত হতে লাগলো কলিঙ্গের ভাগ্যাকাশে । একের পর এক দুর্গের পতন ঘটতে লাগলো । একে একে উদয়গিরি, বেণীকোণ্ডা, কোণ্ডা, নাগার্জুন, কোট্টারামা, অদ্দাংকি, কোণ্ডাবিড়ু, বেল্লামা প্রভৃতি কেল্লাগুলি ওড়িশার সীমানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুপক্ষের দখলে চলে গেল । ক্রমে প্রতাপরুদ্রের সময় যে ওড়িশার সীমা বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের গুন্টুর (Guntur) জেলা ও তেলেঙ্গানার প্রায় অধিকাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই উৎকল রাজ্যের সীমানা



অবশেষে ছোট হতে হতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী থেকে উত্তরে রূপনারায়ণ তীরবর্তী 'পিছলদা' (Pachalda) গ্রামে এসে ঠেকেছিল। * আর রণক্ষেত্রে রাজা প্রতাপরুদ্র যতোবার নির্মমভাবে পরাজিত হতে লাগলেন, একটির পর একটি দুর্গ ও দেশের ভূখণ্ড তাঁর হাতছাড়া হতে লাগলো, চৈতন্য বিরোধীরা ততোবার ওই পরাজয়ের কারণ হিসেবে দেশের জনসাধারণের কাছে চৈতন্যকে দায়ী সাব্যস্ত করতে লাগলেন। তারা আরো প্রচার করলো যে ওই নর্তন কীর্তনে মজে থাকা, ছিচকাঁদুনে, মাথানেড়া গুরুর খপ্পরে পড়েই রাজার এ হাল হয়েছে। বোধকরি এই প্রথম জনসাধারণেরও সন্দেহের কারণ হলেন চৈতন্য। স্বভাবতই তাদের মনে প্রশ্ন জাগলো, চৈতন্য যদি দৈবি শক্তিধর সন্ন্যাসী তাহলে তার একনিষ্ঠ ভক্ত দেশের রাজার এ পরাজয় কেন ?

এমন কি তৎকালীন শুধু চৈতন্য বিরোধী গোষ্ঠীই নয়, ইদানীং কালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিকেরাও রাজা প্রতাপরুদ্রের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধানত চৈতন্যকেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, 'Chaitanya was one of the principal cause of the political decline of the empire and the people of Orissa' (History of Orissa, Vol–I, Page, 330-36)। এবং এই একই কারণে চৈতন্যের মাথায় সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে আরেক ঐতিহাসিক ও ওড়িশার প্রাক্তন রাজনীতিবিদ্ ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতব লিখেছেন, 'The attempt to make the Bhakti Cult a mass riligion and to influence the King and his officers by its sweet pessimistic philosophy had no doubt been fatal to the Social and Political life of the country' (History of Orissa Vol-I, pp 329)।

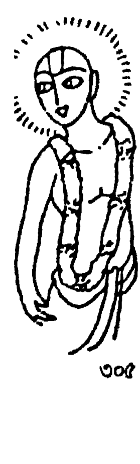
কিন্তু চৈতন্যের প্ররোচনাকে যারা ধ্বংসোন্মুখ ওড়িশার জন্য দায়ী করেছেন তাঁরা সম্ভবত ইতিহাসের উপাদান সমূহ বিশ্লেষণ করার সময় কোন আবহাওয়ায় ও কি পরিস্থিতির মধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন সে দিকটি নিয়ে তেমন চিন্তা ভাবনা করেন নি। বোধকরি এটিই ছিল এর 'পজিটিভ' দিক। আর সে কারণে নৈতিক ঔচিত্যের নিরীক্ষার বাস্তবতার দিকটি এ ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায়, চৈতন্য যদি উৎকলে না আসতেন, অথবা চৈতন্যের ভাবাদর্শে যদি উৎকলের সাধারণ মানুষ বা দেশের রাজা অণুপ্রাণিত না হতেন তাহলেও কি ধ্বংসোন্মুখ ওড়িশাকে সে সময় কিছুমাত্র বাঁচানো যেতো ? বরঞ্চ আমাদের মনে হয়, চৈতন্যের সত্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও অপরিসীম দূরদর্শীতা সেদিন মুসলমান শাসকের অবশ্যম্ভাবী আগ্রাসনের হাত থেকে ওড়িশাকে রক্ষা করেছিল। গড় মান্দারন দুর্গের অবরোধ তুলে নেওয়ার মধ্যে গোবিন্দ বিদ্যাধরের যে গোপন অভিসন্ধির সংকেত মেলে তারও পর, চৈতন্য যদি গোপনে হুসেন শাহর অন্যতম দুই মন্ত্রী রূপ (সাকর মল্লিক) ও সনাতন

---

* কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রের সময়কার ওড়িশা রাজ্যের সীমানা ও সীমানা সংকোচন প্রসঙ্গে বিশদ জানতে হলে Further Sources of Vijaynagar History Vol-I, এবং Dr. S.K. Ayangar-এর Cambridge History of India Vol-III দ্রষ্টব্য।

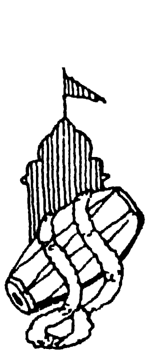
, ররখাস) প্রতাপরুদ্রকে নিজের অনুকূলে না আনতেন তাহলে সেদিন ওড়িশার
চিত্রের চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যেতো। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ধ্বংসলীলার
সে জগন্নাথের মন্দিরসহ যে কয়টা মঠ মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল তার সম্পূর্ণ
লুপ্তি ঘটতো নিঃসন্দেহে। অথচ এর পারিপার্শ্বিকতায় চৈতন্যকে বিচার
করার কোন উদ্যম ঐতিহাসিকদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। এরই
প্রেক্ষিতে বোধকরি ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'
লিখেছেন, 'এখনকার দিনে অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে চৈতন্য বাঙ্গালী
জাতিকে নির্বীর্য করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ বৈষ্ণবভাব পাইয়া বাঙ্গালী
সংগ্রামভীরু ও জীবনধর্মে পলাতক হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এমনও
বলিতে করিয়া থাকেন যে চৈতন্যের প্রভাবে বীর্যবান উড়িয়ারা স্বাধীনতা
হারাইয়াছিল। এমন ভাবনা অলস কল্পনা মাত্র, ইতিহাস সমর্থিত যুক্তিযুক্ত
কথা নহে।' (প্রথম খণ্ড)/ পূর্বার্ধ/ পৃঃ ৩১৪)।

ওড়িশা তথা প্রতাপরুদ্রের ভাগ্যাকাশে তখন নিরবধি কালো মেঘের
ঘনঘটা। ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী মশায়ের ইতিহাস থেকে জানা যায়,
১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র যে বৎসর সিংহাসনে আরোহন করেন
সেসময় থেকে ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যোগে বৎসর পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণে
র প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। (A History of South
India. P, 280-61)। যদিও এর আগে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার তাঁর
অনুপস্থিতির সুযোগে রাজ্যে চরম বিপর্যয় ঘটেছিল। কিন্তু শাস্ত্রী মশায়ের
হিসেবে বোধকরি একটু ভুল থেকে যাচ্ছে। কেননা, কার্যত আমরা দেখছি,
১৫১৩ খ্রীঃ থেকেই মূলত ওড্রুরাজ প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটতে থাকে। কলিঙ্গ
দক্ষিণে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৪ খ্রীঃতে ওড়িশার উদয়গিরি
অঞ্চল দখল করে নিলেন। এরপর ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের দখলে চলে
গেল উৎকলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, গুন্টুর জেলার কোণ্ডাবিড়ু
(Kondavidu)। তারপরই কলিঙ্গ তথা প্রতাপরুদ্রের ভাগ্যাকাশে ঘটলো
আরেক চরম বিপর্যয়। আর এই কঠিন বিপর্যয়েই বোধকরি কলিঙ্গরাজের
অবশিষ্ট মনোবলটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন,
শনিবার, বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের মঙ্গলগিরি অনুশাসনে উল্লেখিত
তারিখ থেকে জানা যায়, প্রতাপরুদ্রের ফৌজকে পরাস্ত করে কৃষ্ণদেব রায় শুধু
মাত্র যে গুন্টুর জেলার কোণ্ডাবিড়ু অঞ্চল দখল নিলেন তাই না, প্রতাপরুদ্রের
অন্যতম পুত্র বীরভদ্রকে বন্দী করে ওড়িশার সীমহাচলম নামক স্থান পর্যন্ত
এগিয়ে এলেন। বীরভদ্র ছিলেন কোণ্ডাবিড়ু দণ্ডপাটের প্রশাসক (Governor)।
গোবিন্দ দাস বাবাজীর 'চৈতন্য চকড়া'-এ উল্লেখ আছে এ যুদ্ধে বীরভদ্র মারা
গেছলেন। চকড়ায় সময়টি নির্দেশিত আছে, ১৪৩৮ শকাব্দ অর্থাৎ ইংরাজির
১৫১৬ খ্রীঃ)। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আঠারো দিনের মাথায় দক্ষিণদেশ থেকে
চরম দুঃসংবাদ এসে পৌঁছালো রাজার কাছে। রাজা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন
খবর শুনে। এবং ওই রাতেই তিনি পুরী ছেড়ে চলে গেলেন 'বিড়ানেসী'
অর্থাৎ কটকে। মাথায় দু'হাত চেপে প্রতিহারী এই সংবাদ চৈতন্যকে এসে
বললেন। আর তখনই চৈতন্য সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি গৌড়দেশে যাবেন। এর
সাতদিন পর দেখা গেল তিনি পার্ষদদের নিয়ে কটকের পথে যাত্রা করলেন।
সঙ্গে চললেন, রামানন্দ রায়, কানাই (কাহ্নাই ?) খুন্টিয়া এবং শিখি মাহিতি
(মহান্তী ?)। তিনদিন কটকে অবস্থান করলেন চৈতন্য। রাজাকে সান্ত্বনা
দিলেন। তারপর নিকটতম কয়েকজন পার্ষদকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন



এদিকে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সৈন্যরা একটির পর একটি ভূখণ্ড জয় করে প্রবল বিক্রমে এগিয়ে আসছিল প্রতাপরুদ্রের রাজধানীর দিকে। কৃষ্ণদেব রায় তার প্রধানমন্ত্রী আপ্পাজীর পরামর্শক্রমে প্রতাপরুদ্রের অধিনস্থ এক মন্ত্রীকে (সম্ভবত বিদ্যাধর) গোপনে ধনরত্ন উৎকোচ দিয়ে দলে টেনে নিলেন, এবং রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রায় ঝটিকা বেগে রাজধানীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করে নিলেন। অতঃপর পুত্র শোকাতুর নিরুপায় বৃদ্ধ রাজা সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে। সন্ধিও হলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ইতিহাস বলছে, এই সন্ধির বিনিময়ে রাজা প্রতাপরুদ্রকে মূল্য দিতে হয়েছিল অপরিসীম উপঢৌকন হিসেবে নিজের আদরিনী কন্যা তুক্কাকে নিরুপায় হয়ে তুলে দিতে হয়েছিল জন্মশত্রু কৃষ্ণদেব রায়ের হাতে। সেই সঙ্গে যৌতুক হিসেবে দিতে হয়েছিল কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত তার অধিকৃত সমস্ত ভূ-খণ্ড। কৃষ্ণদেব রায়ের একটি লিপিতে দেখা যায় গজপতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভদ্র ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রের যৌথ নির্দেশক্রমে কৃষ্ণদেবের প্রাপ্য বিবাহের যৌতুকাদি তাঁর লিঙ্গদলির (Lingadhalli) প্রাসাদে পাঠিয়ে দিচ্ছেন Dravila Mandaleshvara Gajapati Pratapa Rudra Maharaja's Son Virabhadra Maharaja Who in 1516 (the year of the record), on being directed by Krishna Ray and Pratapa Rudra Maharaja, remitted the marriage dues payable to his palace in the lingadhalli Country' (Mysore State Gazetteer, Chitradurga District, pp-50-51)।

আমরা মনে করছি, গজপতি প্রতাপরুদ্র ও বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের মধ্যে এ সন্ধিচুক্তি হয়েছিল চৈতন্য গৌড়দেশ সফর করে ফিরে আসার পর। গোবিন্দ দাসের চকড়ায়ও দেখছি সেরকম উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ এ সন্ধি চুক্তির পিছনে চৈতন্যের হাত থাকা খুব অসম্ভব না। ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রীও তাঁর 'A History of South India' গ্রন্থে এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের শান্তিচুক্তির পিছনে চৈতন্য ও কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রীব্যাস রায়ের বিশেষ ভূমিকা থাকা অসম্ভব না। কেননা, চৈতন্য ও শ্রীব্যাস রায় উভয়েই ছিলেন, মাধব সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীব্যাস রায়ের সঙ্গে চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করে শাস্ত্রী মশাই লিখেছেন, 'These Singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaraya, and the visit of Chaitanya to the South in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song (Page—392-93)।



এদিকে চৈতন্য খুব সঙ্গোপনে মাত্র জনাছয়েক শিষ্য নিয়ে পুরী থেকে বৃন্দাবন যাবার নাম করে সোজা গৌড়দেশের রামকেলী গ্রামে এসে পৌছালেন। এখানেই গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের জাঁদরেল দুই কর্মচারী সমরমন্ত্রী সাকর মল্লিক (রূপ) ও প্রহিভেট সেক্রেটারি সনাতন (দাবিরখাস) গোপনে মিলিত হলেন রাত্রির অন্ধকারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত থেকে জানা যায় সনাতন অর্থাৎ দবিরখাসের সঙ্গে চৈতন্যের চিঠি চালাচালি আগেই শুরু হয়েছিল। এবার গৌড়ের মুসলমান রাজার দুই মন্ত্রীকে সুকৌশলে দলে টেনে নিলেন চৈতন্য। বলতে গেলে হুসেন শাহের ডান হাতখানা খুব

সুকৌশলে ভেঙে দিলেন। সাকর মল্লিক, দবিরখাস আর ইসমাইল গাজী এই তিনজনের বুদ্ধি, কৌশল ও শক্তিমত্তা কাজে লাগিয়ে ওড়িশা জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন হুসেন শাহ। চৈতন্যের অপরিসীম দূরদর্শীতায় সে স্বপ্ন অংকুরে বিনষ্ট হয়ে গেল। সেই সঙ্গে মুসলমান সেনার ধ্বংসোম্মাদনার করাল ছায়া থেকে রক্ষা পেলো ওড়িশা।

এখানে একটা প্রশ্ন আছে, তা হলো, যাঁরা ওড়িশার জনগণ ও রাজাকে হীনবীর্য করার জন্য চৈতন্যকে দায়ী করেছেন তাঁরা কি চৈতন্যের এই রাজনৈতিক সফলতার দিকগুলি একবারও ভেবে দেখেন নি ? কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি, এবং সুকৌশলে হুসেন শাহের মন্ত্রীদ্বয়কে ওড়িশার অনুকূলে টেনে আনা—সেদিন এই দুই রাজনৈতিক সফলতা যদি সম্ভব না হতো তাহলে আরেকবার দয়া নদী, মহানন্দা, কাঠজুড়ি, বৈতরনীর জল আরেক চণ্ডাশোকের খড়্গাঘাতে লাল হয়ে উঠতো। দেবনাগরী ভাষায় একটি বহু আলোচিত শ্লোক আছে,

> 'যে' ধ্রুবানি পরিত্যাজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে,
> ধ্রুবানি তস্য ন শান্তি,
> অধ্রুবম নষ্টমেব চ।'

অর্থাৎ, যা পাওয়া যেতে পারে আবার পাওয়া নাও যেতে পারে তার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে যা অবশ্যই পাওয়া যাবে তার প্রতি যারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তারা শেষ পর্যন্ত দুটোই হারায়।

সুতরাং, ঘর এবং বাইরের এই দ্বি-শত্রু পরিবেষ্টিত রাজা সেদিন যদি চৈতন্যের শরণাগত না হতেন তাহলে শত্রুর চক্রান্তে শুধু রাজ্যখণ্ডই হারাতেন না সেইসঙ্গে চৈতন্যের অমৃত সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিত হতেন।

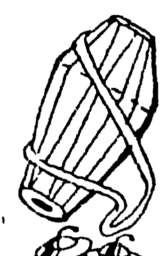
এদিকে চৈতন্য বিরোধী চক্র ক্রমান্বয়ে সক্রিয় হয়ে উঠছিল। অবশ্যম্ভাবী পতনের হাত থেকে এই যে বার বার রাজাকে বাঁচিয়ে দেওয়া এটা সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের পক্ষে প্রধান শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠলো। ওড়িশার রাজ সিংহাসনের ওপর ছিল তার বরাবরের লোভ। কিন্তু পতনোন্মুখ রাজাকে সুকৌশলে বাঁচিয়ে দিয়ে চৈতন্য তার অন্তরায় সৃষ্টি করলেন। স্বভাবতই গোবিন্দ বিদ্যাধরের একটা চাপা অসন্তোষ চৈতন্যের ওপরে গিয়ে পড়লো। শোনা যায় চৈতন্য নাকি রাজ্যের প্রশাসনের ওপরও হস্তক্ষেপ করেছিলেন। সে সময়কার মালজ্যাঠা দণ্ডপাটের (মেদিনীপুর) প্রশাসক রায় রামানন্দের ভাই গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজার তহবিল তছরূপ করে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। সে কারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন গোপীনাথ। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে একমাত্র চৈতন্যের ইচ্ছাক্রমে গোপীনাথ নাকি বেঁচে গেছলেন। রাজা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মুকুব করে বেকসুর খালাস করে দিয়েছিলেন দোষী গোপীনাথকে। এবং এই দণ্ডাজ্ঞা মুকুবের সমগ্র ব্যাপারটা নাকি ঘটেছিল চৈতন্যের ইচ্ছাক্রমে। যেহেতু গোপীনাথ রায় রামানন্দের ছোট ভাই এবং রামানন্দ যেহেতু চৈতন্যের অনুগত ভক্ত সেজন্যই নাকি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত গোপীনাথের মুক্তির জন্য চৈতন্য তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার করেছিলেন। প্রশাসনের ওপর এই যে চৈতন্যের অযাচিত হস্তক্ষেপ এতে রাজ্যের মন্ত্রী, আমলা, অমাত্য-আদি রাজকর্মচারী সকলেই অল্প বিস্তর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।



অন্যদিকে জগন্নাথ মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডা, স্মার্ত এবং বৌদ্ধদের একটা চাপা অসন্তোষ ক্রমান্বয়ে ধূমায়িত হচ্ছিলো চৈতন্যের বিরুদ্ধে। বলা বাহুল্য,

চৈতন্যের জন্য পাণ্ডাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেকটা কমে যাচ্ছিলো। পুণ্যার্থীরা জগন্নাথকে দর্শন করতে এসে আগে জগন্নাথ দর্শন না করে ছুটতো চৈতন্যের কাছে। এটা তাদের কাছে স্বভাবতই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। উৎকলবাসীরা 'সচল জগন্নাথ' বলে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো চৈতন্যের কাছে। বলতে গেলে চৈতন্যের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। এমতো অবস্থায় চৈতন্যের একজন প্রতিপক্ষ খাড়া করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলো পাণ্ডারা। চৈতন্য সন্ন্যাসী সুতরাং কোন সন্ন্যাসীকেই দাঁড় করাতে হবে তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে। কথাতেই আছে 'কণ্টকে নৈব কণ্টকম' [illegible] কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো কাকে খাড়া করা যায় চৈতন্যের বিপক্ষে। চৈতন্যের মতো আরেকজন চৈতন্য বানাতে হলে কোন লোকপ্রিয় লোককে দিয়ে তা সম্ভব না। এমতো অবস্থায় প্রথমে যার নাম মনে আসে তিনি জগন্নাথ দাস। [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] জগন্নাথ দাস ওড়িশায় সেসময় [illegible] জগন্নাথের [illegible] দেশের রাজা [illegible] প্রতাপরুদ্রের [illegible] ছিলেন [illegible] জগন্নাথের শিষ্য [illegible] ভেবেছিল জগন্নাথ দাসের [illegible] বেশ ধারণ করে [illegible] গ্রামে গ্রামে ঘুরে [illegible] বিখ্যাত 'বৃহৎ [illegible] ইতিহাস' [illegible] উড়িষ্যার রমণী [illegible] জগন্নাথ দাসের [illegible] রমণীগণ [illegible] মহারাজ [illegible] বড় হয়ে [illegible] উৎকলের রমণীগণ [illegible] চাইলেন [illegible] সহজে [illegible] প্রতাপরুদ্রদেব [illegible] করলো। [illegible] জগন্নাথ দাস [illegible] পালিয়ে গেলে [illegible] চারিদিকে প্রচারিত হতে লাগলো জগন্নাথ দাসের [illegible] দ্বিতীয় চৈতন্যদেব হতে জগন্নাথ দাসের আর কোন সময় লাগলো না। প্রতাপরুদ্র কষ্ট হয়ে মঠ ত্যাগ করে চলে [illegible] আদেশ দিলেন জগন্নাথ দাসকে। তখন কিন্তু জগন্নাথ দাস তাঁর ঘাঁটি শক্ত করে ফেলেছে। জগন্নাথের পাণ্ডারা আর গোবিন্দ বিদ্যাধর পূর্ণ সমর্থন করছেন তাঁকে।

দেখতে দেখতে উড়িষ্যার সেদিনকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিষ্কার দু'ভাগ হয়ে গেল। একদিকে প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্য সম্প্রদায়। আর একদিকে গোবিন্দ বিদ্যাধর, মন্দিরের পুরোহিতকুল ও জগন্নাথ দাস। (চৈঃ অ র/পৃঃ ২২৭)।



সুতরাং উপরোক্ত এই 'কোড' করা অংশটুকু পাঠ করলে স্বাভাবিকভাবে মনে একটা প্রশ্ন জাগে, 'অতিবড়ী' জগন্নাথ দাস গোবিন্দ বিদ্যাধরের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। আর বিদ্যাধর ছিলেন জন্ম চৈতন্য বিরোধী। তবে কি জগন্নাথ দাসও চৈতন্য বিরোধীদের সাথে গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রকে প্রকারান্তে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ?

এবার আসছি স্মার্তদের চৈতন্য বিরোধীতার কথায়। নবদ্বীপে থাকাকালীন স্মার্ত নৈয়ায়িকরা ছিলেন চৈতন্যের বড়ো রকমের প্রতিপক্ষ। নীলাচলে এসেও সেই স্মার্তদের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন চৈতন্য। পুরীর আনন্দময়ী

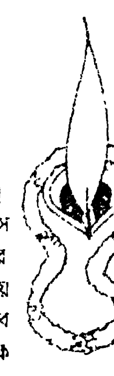
আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর পর সাতদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করার পর যেদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আদি শংকরাচার্যের নিন্দা করলেন, বললেন শংকর ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ। বললেন মায়াবাদীগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। আমার মনে হয় শংকরানুরাগী স্মার্তরা সেদিন থেকেই বিষ নজরে দেখতে শুরু করলেন সদ্য নীলাচলগত নবদ্বীপজাত বিপ্লবী সেই প্রেমধর্মীকে। এই স্মার্ত পণ্ডিতরাই এর পরে যখন দেখলেন মায়াবাদী স্মার্তচূড়ামণি রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৌরাঙ্গের একজন প্রচারকারী ভক্তে রূপান্তরিত হলেন। তখন তাঁদের মস্তিষ্কে যে ঈর্ষা ও ক্ষোভের দাবানল প্রজ্বলিত হলো তা সর্বগ্রাসী, তা বড়ই ভয়ংকর। এর ওপর আবার রাজমহেন্দ্রীর রাজ প্রতিনিধি প্রবল প্রতিপত্তিশালী রাজা রায় রামানন্দ পট্টনায়ক যখন শ্রীচৈতন্যের উপদেশে কৃষ্ণনাম কণ্ঠে নিয়ে অতবড় সম্মানিত রাজপদও ত্যাগ করলেন হাসতে হাসতে, যখন উড়িষ্যাধিপতি গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণকমলে। তখন স্মার্ত সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সারা উৎকলের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ও রাজার পরিজনবর্গও মনে মনে আগুন হয়ে উঠলেন চৈতন্যের ওপরে।' (কোথা গেলে তোমা পাই/পৃঃ ৪৬-৫০)।

এবার আসছি বৌদ্ধদের চৈতন্য বিরোধিতার কথায়। নবদ্বীপে তৎকালীন এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সাথে চৈতন্যপন্থীদের প্রায়ই সংঘাত বাধতো। সেই ঘাত-সংঘাতের কথা ইতঃপূর্বে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি, বৌদ্ধদের সাথে বিশেষতঃ বৌদ্ধ তন্ত্রবাদীদের সাথে বৈষ্ণবদের একটা 'আদায় কাঁচকলায়' সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকেই। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, 'আর একটি শব্দ পাষণ্ডী ইহা বৌদ্ধগণ ও অনার্যধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি ব্যবহার হইত। (পৃঃ ৪১৪)। হিন্দুদের মধ্যে নিম্নজাতের এক শ্রেণীকে যেমন অস্পৃশ্য বা ম্লেচ্ছ বলা হয়। মুসলমানদের মধ্যে 'কাফের' কথাটির ব্যবহার আছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যেমন 'Infidel' শব্দটির চল আছে। সেই অর্থে বৈষ্ণবরা বৌদ্ধদের প্রতি এই 'পাষণ্ডী' শব্দটি প্রয়োগ করতো।'

এই পাষণ্ডীরা কি সাংঘাতিক রকম চৈতন্য বিদ্বেষী ছিলেন তা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের নিম্নলিখিত এই শ্লোকটি পাঠ করলেই বোঝা

'কেহো বোলে—কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ, হের পেটপোষাগুলা সব॥
কেহো বোলে এগুলার বাকি হাথ পায়।
জলে ফেলি, জীয়ে যদি তবে ধন্য গায়।
কেহো বোলে, আরে ভাই! জানিহ নিশ্চিত।
গ্রামখানি লুটাইব নিমাঞি পণ্ডিত॥'

[ভাগবত২/২৩/৯-১১]



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভারতের প্রথম আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বৌদ্ধধর্ম' নামক একটি গ্রন্থে দেখা যায়, বুদ্ধের তিরোভাবের পর ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধরা ধর্মের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জনের প্রণালীই তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের গভীর ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক

ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল। (পৃঃ ৭০)। মূলত, বৌদ্ধদের এই তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেই ছিল চৈতন্যের জেহাদ।

পুরীতে (ওড়িশা) এসে আবার সেই বৌদ্ধদের খপ্পরে পড়লেন চৈতন্য চৈতন্য যখন নীলাচলে এসেছিলেন (১৫১০ খ্রীঃ) তার বহু আগে থেকেই বৌদ্ধদের আধিপত্য ছিল ওড়িশায়। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি পাহাড়ের বৌদ্ধ গুম্ফাগুলি আজও তার সাক্ষ দেয়। এমন কি এক সময় পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরটিও যে বৌদ্ধদের ছিল এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এই ত্রয়ী বিগ্রহের সৃষ্টি যে বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ ধর্মযন্ত্র থেকে উদ্ভুত বলে বিখ্যাত ঐতিহাসিক কনিংহাম সাহেব মত প্রকাশ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম্ম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'হুয়েন সাং উৎকলের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতটে চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। ঐ চরিত্রপুরই এক্ষণকার পুরী মনে হয়। উহার নিকট পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। কনিংহাম সাহেব মনে করেন তাহারই একটি জগন্নাথের মন্দির। খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন এই মন্দির প্রস্তুত হয়।---জগন্নাথের রথযাত্রা সম্ভবত খোটানস্থ বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার অনুকরণ, এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বৌদ্ধত্রিমূর্ত্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে।' (পৃষ্ঠা-১৮৬)। এমন কি কলিঙ্গরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র নিজে বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন বলে একটা ধারণা চালু আছে (এ বিষয়ে বিশদ জানতে হলে মনমোহন গাঙ্গুলির 'Orissa and his Remains' এবং নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'Mayurbhanj Archeological Survey, Vol-I গ্রন্থ দুটি দ্রষ্টব্য)।

ওড়িশায় থাকাকালীন অবশেষে এই বৌদ্ধদের সাথে সংঘাত বাধলো চৈতন্যের। অবিশ্যি নীলাচলে পদার্পনের পর থেকে 'তর্কযুদ্ধ' জাতীয় ছোটখাটো সংঘাত প্রায়শ বাধতো বৌদ্ধদের সাথে চৈতন্যের। কিন্তু তাতে কেউ কারো প্রতি বড়ো মাপের বৈরীভাবাপন্ন হয়ে ওঠেনি। বোধকরি চৈতন্যের জন্যই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য গোড়া থেকেই বৌদ্ধদের সঙ্গে একটা সদ্ভাব চেয়েছিলেন। ওড়িশার পঞ্চসখা নামক সেসময় একটি জবর্দস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু এই পঞ্চসখা ছিল মূলত বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। নগেন্দ্রনাথ বসু, তাঁর 'Modern Budhism in Orissa' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বাইরের আচার ব্যবহার তাঁরা চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের অনুগত মনে হলেও মূলত তাঁরা (পঞ্চসখা) ছিলেন দীর্ঘ অবহেলিত ও বিস্মৃতপ্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধারের প্রথম অগ্রণী।' (পৃঃ ৩২-৪০)।



তো এই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী 'পঞ্চসখা' সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবক্তা জগন্নাথ দাসের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করায় ও তাঁকে 'অতিবড়ী' নামে সম্বোধন করায় সেসময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এমন কি চৈতন্যের জগন্নাথ দাসের প্রতি সহমর্মিতা গড়ে ওঠায় নীলাচলস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা চৈতন্যকে ত্যাগ করে প্রথমে বনবিষ্ণুপুর ও যাজনগর এবং পরে বৃন্দাবনে চলে গেছলেন। কিন্তু এতো কিছু করেও চৈতন্য বৌদ্ধদের অনিবার্য বিরোধিতার জালেই অবশেষে জড়িয়ে পড়লেন।

আর এই বিরোধের সূত্রপাত ঘটলো ওড্রারাজ প্রতাপরুদ্রের অন্যতম মহিষীকে কেন্দ্র করে। রাজা প্রতাপরুদ্রের চারজন মহিষী ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁর নাম পদ্মাবতী ইনি বীরসিংহ নামে এক বৌদ্ধধর্মীর বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এ কারণে স্বভাবতই রাজ্যের হিন্দু পণ্ডিতরা ও ব্রাহ্মণেরা খুব

অসন্তুষ্ট, রুষ্ট হয়ে উঠলেন। মধ্যিখানে বেচারা রাজা পড়লেন ফাঁপরে। একদিকে প্রিয়তমা রাণী। অন্যদিকে পূজ্যপাদ দেশের ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ। অবশেষে স্থির হলো বিচারসভা বসবে। কিসের বিচার ? না কে বড়ো, 'বৌদ্ধ না সনাতন ধর্ম। অবশেষে ব্রহ্মণ্যবাদীদেরই জয় হলো। হেরে গেল বৌদ্ধরা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তান্ত্রিকতার সাহায্যে একটি আধারে ঢেকে রাখা একটা সাপকে অদৃশ্য করে যুক্তিবাদী বৌদ্ধদের বোকা বানিয়ে তর্ক যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। এ খেলায় নিঃসন্দেহে শঠতার আশ্রয় নিয়েছিল ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু চাতুরীর সাহায্যে যে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের পরাস্ত করলো সেই ব্রাহ্মণদের ওপর না হয়ে বৌদ্ধদের যতো রাগ গিয়ে পড়লো নন্দঘোষ চৈতন্যের ওপর। তাদের নিশ্চিত ধারণা জন্মালো যে, রাজা চৈতন্যের কূট পরামর্শে ওই বিচার সভার আয়োজন করে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাদের পরাভূত করেছেন। এবং বৌদ্ধদের নিধন করতে রাজাকে প্ররোচনা দিয়েছেন। জগন্নাথ মন্দিরের সুপ্রাচীন রোজনামতা 'মাদলাপঞ্জী'-তে উল্লেখ আছে মোদলাপঞ্জী প্রাচীন সং ১ম ১৯৫০) রাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক আদেশক্রমে বহু বৌদ্ধের শিরচ্ছেদ হয়েছিল।

সুতরাং এসব কারণে বৌদ্ধরাও অবশেষে জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা, স্মার্ত এবং রাজপুরুষ গোবিন্দ বিদ্যাধরের মতো আরেক চৈতন্য বিরোধী হয়ে উঠলো অনতিবিলম্বে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, চৈতন্যের বিরোধী-চক্র ক্রমান্বয়ে বর্ষার নদীর মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সর্বগ্রাসী বেনো জল ক্রমশ কূল ছাপিয়ে চতুর্দিক বেষ্টন করে এগিয়ে আসছে চৈতন্যের দিকে। আর সন্ন্যাসী চৈতন্য, দোর্দণ্ড প্রভাবশালী ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন চৈতন্য তারই নিশ্চিত ও দুর্বার আগ্রাসনে ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন গম্ভীরার এক ক্ষুদ্র চোরাকুঠরীতে। যেন বিষামৃতময় সংসারে অমৃতের ভাগ অপরকে দান করে কেবলমাত্র গরলটুকু আত্মসাৎ করাই তাঁর একমাত্র নিয়তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বহু আগেই চৈতন্যের ওপর ক্ষুণ্ন হয়ে নীলাচল পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে গেছেন। বাইশ বাজার খাওয়া হরিদাস তিরোহিত। অভিমানী ছোট হরিদাস অবজ্ঞাত পথে চলে গেছেন বহুদিন। বৃদ্ধ গোদাধর তাঁর গোপীনাথকে নিয়ে তোটায় থাকেন আপন মনে। দামু—দামোদর, তিনি ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন চৈতন্যকে। আর নিত্যানন্দ—চৈতন্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতম পার্ষদ, পরিকর, সেই নিত্যানন্দের নামে চারিত্রিক শিথিলতার নানান অভিযোগ অনুযোগ আসতে লাগলো চৈতন্যের কাছে। তখন তিনি অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন,

> 'পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
> এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল ॥'

অধিকন্তু তিনি বললেন,

> 'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
> তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমাকে ॥'

[ভাগবত/৩/৭/১১৬]



কিন্তু মুখে এসব বললেও কার্যত তিনি নিত্যানন্দের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন। পরিশেষে তিনি এই বহুদিনের সাথী, বন্ধু, সুহৃদ, প্রিয় পার্ষদের সাথে একটা বিচ্ছিন্নতার সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, নিত্যানন্দ তুমি আর নীলাচলে এসো না। গৌড়ে ফিরে যাও। সেখানে তোমার সাথে আমার দেখা হবে।

'নিত্যানন্দ কহেন তুমি না আইস বার বার
তথাই আমার সঙ্গ হইব তোমার।'

এ প্রসঙ্গে অসংখ্য পুরাণ ও মহাকাব্যিক কাহিনীর চয়নকার লেখক ও বিখ্যাত 'হরিবংশ' গ্রন্থের সম্পাদক ডঃ দীপক চন্দ্র লিখেছেন, 'চৈতন্যের ভুরু কুঁচকে গেল। একটু অস্বস্তি বোধ করল। প্রসঙ্গটা খুবই লজ্জাজনক। চুপ করে কয়েকটা মুহূর্ত অপলক তার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বলল : ভিতরে ভিতরে তুমি ভীষণ বদলে গেছ। তোমার স্বভাব, চরিত্রও বেশ একটু পরিবর্তন হয়েছে। তোমার পান দোষ, সঙ্গ দোষ, এবং ইদানীং নারী সংসর্গ ঘটেছে। তুমি থাকলে এ রোগ প্রত্যেকের ভেতরে সংক্রামিত হবে। তুমি বরং গৌড়ে গিয়ে বিয়ে থা করে সংসারী হও। গৌড়ে তোমার যোগ্যতা দেখানোর প্রচুর সুযোগ পাবে।' ('সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'/ পৃঃ ২৭৩)।

এদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যেও ততোদিনে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে চৈতন্যের প্রতি নিষ্ঠা, আনুগত্য, সর্বোপরি তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় পথ থেকে পার্থক্যের গণ্ডী চিহ্নিত করে ক্রমান্বয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবপন্থীরা নিজেদের মধ্যে এক একজন নেতা নির্ণয় করে বিশাল সমুদ্র বক্ষে ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো নিজেদের পরিধি নির্দিষ্ট করলেন। এমনতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গোড়া থেকেই বাদ বিসম্বাদ শুরু হয়ে গেছলো। চৈতন্যের অন্যতম তিন পার্ষদ–নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি কেউ কারুকে বড়ো একটা সহ্য করতে পারতেন না। নিত্যানন্দের নামে অদ্বৈতাচার্য চারিত্রিক শিথিলতার অজস্র অভিযোগ এনেছিলেন। অন্যত্র অদ্বৈত আচার্যের পুত্রেরা (পাঁচ পুত্র) কেউই চৈতন্যের অবতারত্বকে স্বীকার করেন নি। উপরন্তু তাঁরা নিজের পিতা অদ্বৈতাচার্যকেই 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' বলে ঘোষণা করেছিলেন। চৈতন্য নীলাচলে অবস্থানকালীন তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই প্রবর্তিত তারই নৈষ্ঠিকতা ও নিয়রবাধ স্বেচ্ছাশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবদল অবস্থানির্বিশেষে পৃথক পৃথক সত্তায় ছড়িয়ে পড়লো। একদল অদ্বৈত আচার্যের পক্ষ নিলো। আরেক দল নিত্যানন্দকে চৈতন্যের সমকক্ষ বলে প্রচার আরম্ভ করলো। এমন কি গদাধর গোস্বামীরও পক্ষ নিলো কেউ কেউ। সর্বাপেক্ষা বড়ো ট্র্যাজেডি এই যে, যে চৈতন্য নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকে বারম্বার খর্ব করে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, যাঁর জীবনবাদের মূল মন্ত্র ছিল, 'চণ্ডালোপি-দ্বিজোশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ। যিনি নিজের উপবীত পর্যন্ত পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের শেষ অহমিকাটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন নির্বিশেষে, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাই একদিন সেই উদাত্ত সাম্যবাদী পুরুষের পথ হতে চ্যুত হয়ে উপবীত ধারণ করলেন। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের আদলে গড়ে উঠলো বৈষ্ণবীয় আচরণের গ্রন্থ, 'হরিভক্তি বিলাস'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক চৈতন্য কদাপি জাত পাতের তোয়াক্কা করতেন না। যবন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে তুলে যিনি প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেছেন, শূদ্র রায় রামানন্দকে বারম্বার আলিঙ্গন করেছেন নির্বিবাদে, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উত্তরকালে জাত্যাভিমানের মানসিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেল। যে গোড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ ও উগ্র স্মার্ত শাসন থেকে স্বতন্ত্রতা রেখে এবং নিজেদের একটা পৃথক প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি দিয়ে নীচ অধম শূদ্র ও অধঃপতিতদেরজন্য চৈতন্য এক নয়া সাম্যবাদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা অচিরাৎ 'পুনঃর্মূষিক ভবঃ' হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের ও তান্ত্রিকতার কূটসে পূর্বাপর একীভূত হয়ে গেল। আর এ ট্র্যাজেডির সূত্রপাত ঘটেছিল চৈতন্যের জীবদ্দশায়।



আর চৈতন্য, বিশ্বরূপের ভাই বিশ্বম্ভর, শচীমাতার নিমাঞি, নবদ্বীপ নাগরিয়াদের গোরা-গৌরাঙ্গ—তার কি হলো ? যিনি যৌবনে ঘর-সংসার ত্যাগ করে, মাতার স্নেহ, পত্নীর আনুগত্য থেকে স্ব-নির্বাসন নিয়ে পথকে ঘর করলেন সেই পথ তাঁকে কোথায় এনে দাঁড় করালো ? জীবনের সর্বাপেক্ষা বর্ণোজ্জ্বল ও ভোগবিলাসের দিনগুলি কৃচ্ছ্রসাধনের রূঢ়তা দিয়ে যিনি সাধনা করলেন মানুষের অনুকূলে সেই মানুষ তাঁকে কি প্রতিদান দিলো ? বস্তুত, আমরা এখন এই বোঝাপড়া করে নেওয়ার জায়গায় এসে পৌছে গেছি । মহাকবি সেক্সপীয়র বলেছেন, 'Sweet are the uses of adversity' অর্থাৎ দুর্ভাগের সদ্ব্যবহার করতে জানলে পরিণাম সুখকর হয় । চৈতন্য তাঁর পারিবারিক বিপর্যয়ের কন্টকাকীর্ণ পথে গৌরি ধূলি উড়িয়ে সেই পথকে কুসুমাকীর্ণ করতে চেয়েছিলেন জাগতিক নৈরাশ্য, দুর্দৈন্যের প্রাণোচ্ছ্বাস গোপন রেখে । সেই সুদীর্ঘ দুরূহ, অনিশ্চয়তাভরা আগামী ভবিষ্যত কিভাবে গ্রহণ করেছিল এই ভূয়োদর্শীর অনন্ত সত্তাকে সেইটিই এখন আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করবো ।

এমন এক দুঃসময়ের মুহূর্তে চৈতন্য যখন সন্তর্পণে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন কাশী মিশ্রের গম্ভীরা ভবনের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, ঠিক এমন এক দিনে জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফৎ অদ্বৈতাচার্যের একটি দুর্বোধ্য বার্তা এসে পৌছালো চৈতন্যের কাছে । ডঃ সুকুমার সেন যাকে বলেছেন, 'হেঁয়ালি কবিতা' তর্জার আকারে লেখা চার লাইনের এক আলাভুয়া দুরূহ কবিতা । কবিতাটি জগদানন্দ পড়ে শোনালেন ।

'বাউলকে কহিও লোক হইল আউল ।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল ।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥'

কবিতাটি শুনে চৈতন্য ম্লান হাসলেন । কিন্তু এ প্রসঙ্গে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না । জগদানন্দ যে নবদ্বীপ থেকে মাসাধিক পরে ফিরলেন, যাঁকে চৈতন্যই নদীয়াতে পাঠিয়েছিলেন- প্রতি বৎসরই পাঠাতেন, সেই জগদানন্দ নবদ্বীপ থেকে ফিরে আসতে মায়ের কুশল খবর পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন না তিনি । তর্জা কবিতাটি শোনার পর 'তাঁর এই আজ্ঞা' বলেই কেমন গুম হয়ে গেলেন । পাশেই স্বরূপ গোস্বামী ছিলেন । শুধালেন, প্রভু এই দুর্বোধ্য তরজার অর্থ কি ? চৈতন্য ঈষৎ হাসলেন । বললেন স্বরূপ, তুমি আগম শাস্ত্রে পরম বিদ্বান, পারঙ্গম ব্যক্তি । তুমি এ তর্জার অর্থ বুঝতে পারছো না ? উপাসনার্থে দেবতাকে আবাহন করা হয়, আবার তাঁকে বিসর্জনও দেওয়া হয় । এই বলে চৈতন্য পরক্ষণেই বললেন, 'মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজার সমর্থ ।/আমিও বুঝিতে পারি তরজার অর্থ ।' বললেন, আচার্যের এ তর্জার অর্থ কিন্তু আমিও বুঝতে পারিনি । কিন্তু মুখে 'আমিও বুঝিতে পারি তরজার অর্থ' বললেও কার্যত বিলক্ষণ তিনি এর অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন । মহাত্মা শিশির কুমার, পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই দুর্বোধ্য তর্জাটির গূঢ় অর্থের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, পারতপক্ষে ওই হেঁয়ালি কবিতাটি জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফৎ পাঠিয়ে চৈতন্যকে গোপনে হুঁশিয়ার করে দিতে চেয়েছিলেন অদ্বৈতাচার্য । আসলে পুরো তর্জার ব্যাপারটা একটা সমাসন্ন বিপদের সতর্কবাণী মাত্র । বস্তুত, চৈতন্য উৎকলে বসে যে কার্যকলাপ চালাচ্ছিলেন, তার প্রয়োজনীয়তা যে ক্রমে ফুরিয়ে আসছিল, অথবা এই কার্য করণের বিধেয় (predicate) রূপটি ঈপ্সিত লক্ষের অনুকূল-ভ্রষ্ট হতে চলেছে

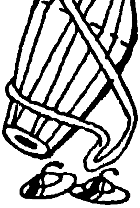


চৈতন্যের চেয়ে অর্ধশতাধিক বয়োঃজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য নবদ্বীপে বসে তা টের পেয়েছিলেন। এটা বয়সের দীর্ঘকালীনতার সাতত্য উপলব্ধিই না, তিনি নবদ্বীপে বসেও উৎকলের রাজনৈতিক হালহকিকৎ সম্পর্কেও পূর্বপর জ্ঞাত ছিলেন। বোধকরি তাই এই নঞর্থক (আর নয়) নির্দেশসূচক (Indicative) পত্রের অবতারণা।

সুতরাং তর্জার প্রাতিপক্ষিক ও অনবধাত্মক দিকটির বিশ্লেষণ করে যে বিয়োজক বা (Alternative) সুরের প্রচ্ছন্ন ইংগিত আমরা পাচ্ছি, তাতে স্বভাবতই একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ওঠে। এবং তা হলো, অদ্বৈতাচার্য যদি চৈতন্যের নীলাচলস্থ কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলেন তাহলে, কার্যকারণহীন চৈতন্যের নীলাচলে অবস্থিতি কি এর পরও খুব যুক্তিযুক্ত ? বিশেষত সদাকর্মী চৈতন্যের ক্ষেত্রে। ধন্দ হয়, তবে কি অদ্বৈত আচার্য নীলাচল পরিত্যাগের যুক্তি দিয়েছিলেন পুত্রপ্রতীম 'নিমাত্রি'কে ? অন্তত তাঁর চিরদুঃখিনী মা, স্ত্রীর কথা ভেবে। স্পষ্টত তা আমরা জানি না। কিন্তু তর্জা প্রাপ্তির পরবর্তী আবহাওয়া সতত ইংগিত দেয়, কঠিন ঘটিতব্য একটা সংকেতের প্রচ্ছন্নতা (যা তর্জায় ছিল) চৈতন্যের কাছে চটজলদি প্রকট হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর কারু কারু বারণ বা সমর্থন কারু কারু কাছে নিজের স্বোপার্জিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ক্ষুরধার বুদ্ধির চেয়েও প্রখর মনে হয়। বাহান্ন বৎসরের বয়োঃজ্যেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য ছিলেন চৈতন্যের কাছে তৎস্বরূপ। এক দণ্ডমুণ্ডের রাজাও যেমন নিঃসঙ্কোচে তার শিক্ষাগুরুর চরণ স্পর্শ করে, গুরুর দীক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়ে আপন মহতীকেই প্রতিষ্ঠিত করে, তদ্রুপ, তর্জা প্রাপ্তির উত্তর সময়কার আবহাওয়া চৈতন্যকৃত অদ্বৈতাচার্যের উপদেশ নির্দেশাত্মক ভূমিকার স্বীকৃতিদানকেই সূচিত করে।

'সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।' [চৈ চরিতামৃত / ৩/১৯]

ঠিক 'সেই দিন' অর্থাৎ তর্জাটি হাতে আসারদিন থেকে চৈতন্যের 'বিরহদশা দ্বিগুণ' বেড়ে যাওয়ার কারণ কি ? চৈতন্য তো বহু পূর্বেই কৃষ্ণ-বিরহী বা রাধা-ভাববেগে বিরহ প্রকাশ করেছেন। সে ভাব, সে অভূতপূর্ব প্রকাশিতব্য বিরহের 'দ্বিগুণ' প্রকাশিত হবার প্রকৃষ্ট মুহূর্ত জগন্নাথ দর্শনের উত্তরকালে ঘটলো না, যাঁর দর্শনার্থে চৈতন্য 'দণ্ডী' কেটে (সরীসৃপের মতো বুকে হামাগুড়ি দিয়ে) মন্দিরগর্ভে প্রবেশ করেছিলেন, তাই চার লাইনে লেখা একটা দুর্বোধ্য চিরকুট থেকে কেমন করে সম্ভবপর হলো ? এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, ওই অদ্বৈতচার্য প্রেরিত তরজায় এমন ইংগিত ছিল যা চৈতন্যকে ভাবিত করেছিল, বিহ্বলিত করেছিল। এবং সর্বোপরি নিজেকে একক, সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো তৈরি করে নেওয়ার পথটিকে প্রশস্ত করেছিল। কিন্তু সুদূর নবদ্বীপে বসে উৎকলের রাজনৈতিক পালাবদলের যথেষ্ট সংবাদ বোধকরি অদ্বৈতাচার্যের গোচরে পৌছেনি। যা পৌছেছিল অর্থাৎ যে সংবাদ অদ্বৈতাচার্যকে তর্জা লিখতে ক্ষিপ্রতর করতো তা বোধকরি প্রয়োজনীয়তার চেয়ে গড়িমসি ভাবকে তরান্বিত করেছিল বেশি। অবশেষে যখন তর্জার সংবাদটি পৌছালো, তখন, ঈশানের মেঘ ঈশানের আকাশ ছাড়িয়ে অগ্নি—নৈঋত-বায়ু সর্বকোণে সর্বাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং-----



সুতরাং ঝড় সমাচ্ছন্ন---------

[ছাব্বিশ]

চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য—তিন

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অন্যতম চৈতন্য গবেষক বিমানবিহারী মজুমদার, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, বিখ্যাত 'ইতিহাসের চৈতন্য' গ্রন্থের রচয়িতা অমূল্যচরণ সেন এবং সর্বোপরি ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রায় সকলেই তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থে এমন একটা ধারণা পোষন করেছেন—যা চৈতন্যের মৃত্যুর অস্বাভাবিকতাকেই সূচিত করে'। কিভাবে, কেন, কোথায় ও কোন পরিস্থিতির মধ্যে চৈতন্যের জীবনে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘনকৃষ্ণ যবনিকা নেমে এসেছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অল্পবিস্তর তা-ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের বিশ্লেষিত গ্রন্থসমূহে।

অর্থাৎ এই যে এতোগুলি বিশিষ্ট মানুষের ঐতিহাসিক বিশ্বাসের কথা উল্লেখিত হলো, এই বিশ্বাসকে শুধুমাত্র স্মরণ করলে তাঁদের দেশ-দশ-বিশ্রুত প্রজ্ঞা ও মণীষা আমাদের চিরাচরিত চৈতন্যের 'জগন্নাথে লীন' হওয়া ধারণাকে উল্টো খাতে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তবু, তৎসত্ত্বেও এই কঠোর-কঠিন ও সতত উদগ্রীব করা বিষয়টি প্রসঙ্গে আমাদের কোথায় যেন একটা অনীহাও ছিল। এটা পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততা অথবা প্রচ্ছন্নতা অথবা চিরাচরিত বিশ্বাসের বিপক্ষে দাঁড়াবার আমাদের নিজস্ব অক্ষমতা বশতও হতে পারে। অর্থাৎ আমরা আবহমানকালের ট্র্যাডিশন ভেঙে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা নিচ্ছি, কিন্তু প্রচেষ্টার অনুকূলে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতায় যা দিলে, যা পেলে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে তার যেন কিছু একটা অভাববোধকেও উপলব্ধি করছি। সুতরাং এতোকাল আমাদের কাছে চৈতন্যের রহস্যাবৃত অন্তর্ধানের ঘটনাটি ছিল জোয়ারে এগিয়ে যাওয়া ও ভাটায় পিঁছিয়ে আসার মতো। অবিশ্যি দীনেশচন্দ্র প্রমুখ উল্লেখিত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি জোয়ার বা ভাটাও হয় তবে তার অনুকূলে আমরা দু'পা বেশিই এগিয়ে গেছলাম।

এমন এক দো-টানা সময়ে, সেই জোয়ার ও ভাটার মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালো একটি চিঠি। আর সেটা ছিল অবশ্যই চৈতন্যের মৃত্যু বিষয়ক দেখা গেল এই চিঠির লেখক দীনেশচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিদের আশঙ্কাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যেও চৈতন্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু স্বীকৃত। এবং তা কঠিন ও কঠোরভাবে। আর এই প্রতিস্থাপনায় আমাদের নিত্যকার ভাববাদীতার মধ্যে যিনি যুক্তিবাদের ভাষায় কঠোর কিন্তু অনিবার্য নিয়তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক, রাবীন্দ্রিক তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Emeritus ডঃ নীহাররঞ্জন রায়! ৫/৮/৭৬ তারিখে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে তিনি তাঁর এক অন্তেবাসী গবেষক ছাত্রকে চৈতন্যের অন্তর্ধান প্রাসঙ্গিকীর 'নিঃশঙ্ক' কথাটি ব্যক্ত করেছেন নিঃসংকোচে, কিন্তু অন্যরকম ভাবে। তিনি লিখেছেন,



'শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে গুম খুন্ করা হয়েছিল পুরীতেই এবং সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের দেহের কোন অবশেষের চিহ্নও রাখা হয়নি কোথাও। এবং তা হয়নি বলেই তিনটি কিম্বদন্তী প্রচারের প্রয়োজন হয়েছিল।'

তিনি লিখেছেন,

'ঐ গুমখুনের সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বহুদিনের চিন্তিত, বহুজন সমর্থিত

চক্রান্তের ফল। কে বা কারা ঐ চক্রান্ত করেছিলেন সে সম্পর্কে আমার অনুমান একটা আছে কিন্তু তা বলতে পারব না। কারণ এখনও আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই। চৈতন্যদেব, গান্ধী martyr হতে পারেন আমার martyr হবার কিছুমাত্র বাসনা নেই।'

এই বিশ্বাসে টানটান কিন্তু আশঙ্কার বিহ্বলতায় ভরা চিঠিটি আমাদের নীহাররঞ্জনের আশীর্বাদধন্য পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে দেখেছিলাম। চিঠিটি লিখেছিলেন মাস্টারমশাই নীহাররঞ্জন তাঁর অন্যতম ছাত্র জয়দেবকে। নীহাররঞ্জনের নিজস্ব প্যাডে লেখা ও হস্তাক্ষরিত পত্র। চিঠির ওপরে মনোগ্রাম। সেদিন, সে রাতে ও নীহাররঞ্জন রায়ের পত্র ছাড়াও ভারতের অবিসম্বাদিত নেত্রী ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরও জয়দেব বাবুকে লেখা কয়েকটি অভূতপূর্ব চিঠি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। চৈতন্যের কুহেলিকাময় মৃত্যু রহস্যের কঠিন সত্যটি উদ্ঘাটন হোক এটা তিনিও চেয়েছিলেন বোধহয়। কারণ তিনি ছিলেন 'কঠিন সত্যরে ভালবাসো' এই মন্ত্রে দীক্ষিত এক সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের শিষ্য।*

অতঃপর আমরা দুটি ব্যতিক্রম ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে এর দীর্ঘ অতীত পরিক্রমা শেষ করব।

আমরা ইতিপূর্বে বলা হয়েছি অধিকাংশ চৈতন্য চরিতকারেরা চৈতন্যের তিরোভাবের মুহূর্তটি এক অভূতপূর্ব অলৌকিক আখ্যায়িকার মধ্যে সংযুক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন চৈতন্যের দিব্য সত্তা অবশেষে লীন হয়ে গেছে জগন্নাথের দারুব্রহ্ম শরীরে। এটা কিন্তু কিংবদন্তী না, সর্বজনসিদ্ধ সত্য ঘটনা। আমরা এতকাল তাই বিশ্বাস করে এসেছিলাম। যদি অনাদি কাল থেকে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম প্রবৃত্তিবাদের পূত চেতনার ধারায় সতত প্রবাহিত এই গঙ্গা যমুনা বিধৌত আর্যাবর্তে উপলব্ধি বিশেষত অধ্যাত্ম উপলব্ধির চেয়ে বড় সত্য বড়ো সত্য আর কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এই প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় আমাদের পরমা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয় করেছি। আমাদেরও করতে হয়। আস্তিক এবং অনাস্তিকদের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আস্তিক ও নাস্তিকদের নিত্য কলহ আজ আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। ক্রমে যে আবহাওয়ায় স্তনদায়িনী স্নেহদায়িনী মা আপন সন্তান শোক কাটিয়ে ওঠেন এ নির্বিকার (বোধকরি বাঁচার চেতনায়) পৃথিবীর শক্ত জমিনে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ান সেই আভূমি প্রণত সত্যের নিরিখে আজ আমরা আবহমানকালের এক কঠিন সত্তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। এই যে সত্য, দীর্ঘকালীন যার প্রতি পিতা-পিতামহ-আদি আমরা সদর্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল কে? না মানুষ। আর সে সত্যের পূর্ণতার প্রতি, বাস্তবতার প্রতি তার তত্ত্বকারক ও তত্ত্ব নাশকতার প্রতি যে সন্দেহদ্যোতক (Dubious) আত্মজিজ্ঞাসায় লিপ্ত হলো সে-ও মানুষ। সুতরাং এ কাহিনীর সদর্থক দিকটি যে মানুষের যুক্তির ভিত্তিতে আমরা গ্রহণ করেছি। এর নঞর্থক দিকটি শুধু মাত্র বর্জন করে সেই মানুষের যুক্তির নৈতিকতাকে আমরা অস্বীকার করবো কেমন করে? বস্তুত, এ শুধু গ্রহীতার গ্রহণাত্মক খেলা। সেই গ্রহণের খেলা এখন আমরা দুটি ব্যতিক্রম ঘটনা দিয়ে শুরু ও সারা করবো।



---

* রবীন্দ্রনাথের 'রূপনারায়ণের কূলে' কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

এই যে চৈতন্যের জগন্নাথের দারুঅঙ্গে লীন হওয়ার ঘটনা তা সংগত ঐতিহাসিকগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ভেতরে কিছু ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ অধিকাংশ স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু সকলে দেননি তাঁদের কেউ না। তিনি অন্যতম চৈতন্য জীবনীকার জয়ানন্দ যাঁর পিতৃদত্ত নাম গুইয়া তো তিনি লিখেছেন,

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে

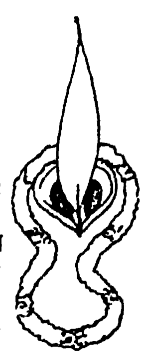
• • •

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ।
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি ।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি ॥

[চৈতন্যমঙ্গল]

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের রথের সময় নাচতে নাচতে ইটের আঘাতে চৈতন্যের বাম পা জখম হয়। এই ক্ষতস্থানে বোধহয় সেপটিক হয়ে যায়। মানসিক যন্ত্রণা প্রবল হয় ষষ্ঠীর দিন থেকে। অতঃপর জ্বরদগ্ধ শরীরে তিনি আশ্রয় নিলেন টোটা গোপীনাথের মন্দিরে। আর এখানেই শায়িত অবস্থায় তিনি চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে। আর তাঁর পঞ্চভূতের দেহ পড়ে রইলো সেখানে অর্থাৎ টোটায়।

এই যে চিরাচরিত এক মানুষের মৃত্যুর বর্ণনা এর মধ্যে প্রকৃতির নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আমরা দেখিনা। খুব সহজ সরল স্বাভাবিকতা স্পর্শ লাগা এ গল্প স্বভাবতই খুব মাটির কাছাকাছি মনে হয়। আর এই অলৌকিকতা বর্জিত মৃত্যুর কাহিনী সূত্র ধরেই বোধহয় যুক্তিবাদের পরম উন্মেষ ঘটেছিল। যেন জয়ানন্দ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, একটি মনুষ্য কদাপি এক নিম্ব কাঠের তৈরি বিগ্রহের সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে পারে না। যে বিগ্রহ নিমকাঠ গঁদ ও ধুনোর আঠা আর পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে তাঁর দিব্য সত্তা (অর্থাৎ যাকে আমরা আত্মা বলি) তা দেহ থেকে নির্গত হয়ে ওই বিগ্রহ জগন্নাথেই লীন হয়েছিল, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাঁর পঞ্চভূতের তৈরি শরীর অর্থাৎ শবদেহটা তাহলে গেল কোথায়? পুরীতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি আছে, সমাধি আছে কুলদা ব্রহ্মচারী, ন্যাংটাবাবা মায় যবন হরিদাসের পর্যন্ত। তাহলে চৈতন্যের সমাধি নেই কেন? বস্তুত, জয়ানন্দের বক্তব্যের স্বাভাবিকতা এসব প্রশ্নের উন্মেষ তথা অংকুরোদ্গম ঘটিয়েছে আমাদের মনে। মহাভারতের মুষল পর্বে ব্যাধের বিষ তীরে অভিশাপগ্রস্ত শ্রীকৃষ্ণের অপঘাতজনিত মৃত্যু আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু যিনি কৃষ্ণ তাঁরও মৃত্যুর পর পঞ্চভূতের দেহ অবশিষ্ট ছিল। অর্জুন সহ আত্মবর্গ তাঁর শেষকৃত্য করেছিলেন, মৃতদেহ দাহ করেছিলেন। চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৈষ্ণবদের শবদেহ দাহ করার নিয়ম নেই। কিন্তু সমাধিস্থ করার নিয়ম আছে। কিন্তু চৈতন্যের ক্ষেত্রে এবং উক্ত দিনে অন্তর্হিত হওয়া চৈতন্যের আরও দুই পার্ষদ গদাধর ও স্বরূপ দামোদরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। যদি ধরা যায় চৈতন্যের আত্মা ও পঞ্চভূতের দেহ দুইই জগন্নাথের দারুঅঙ্গে বিলীন হয়ে গেছলো, তাহলে, ওই দিনে আরও দুজন, গদাধর গোস্বামী ও স্বরূপ দামোদর যে লোপাট হয়ে গেল—তাঁদের শরীর দুটো গেল কোথায়? পরিশিষ্ট চৈতন্য



ভাগবতে আছে, চৈতন্যের জগন্নাথের দারুঅঙ্গে লীন হওয়ার অব্যবহিত পরে গদাধরও অন্তর্ধান করলেন। আর চৈতন্যের অন্তর্হিত হওয়া সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ দামোদরের বুক ফেটে প্রাণবায়ু নির্গত হলো। এসব চৈতন্য চরিতে আছে। কিন্তু স্বরূপের, গদাধরের পঞ্চভূতের দেহগুলির কি গতি হলো, কোথায় গেল এর কোন সুনির্দিষ্ট হদিস চৈতন্য চরিতে নেই। কেন? তাঁরা কার, কোন বিগ্রহের দেহে লীন হলেন। তাঁদের পবিত্র পঞ্চভূতের দেহ শায়িত আছে কোন সমাধির গহ্বরে। এর কোন সদুত্তর কোন চৈতন্যচরিতে নেই।

সুতরাং এসব সন্দেহদ্যোতক (Dubious) ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই অপরাপর চৈতন্য জীবনীকারদের চেয়ে জয়ানন্দের বক্তব্যই আমাদের বেশি আকর্ষণ করে। কিন্তু জয়ানন্দের বর্ণিত পায়ে-ইঁটের আঘাত লেগে সেই ক্ষতস্থান বিষিয়ে গিয়ে চৈতন্যের মৃত্যু ঘটেছিল এ কাহিনী যেমন অযৌক্তিক না, তেমনই অন্যান্য চরিতকারদের লেখা চৈতন্যের জগন্নাথের দারুঅঙ্গে লীন হওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা যুক্তি-বর্জিত কোন আষাঢ়ে গল্প হিসেবে বলতে পারি না। কেননা, এই অলৌকিতার মধ্যেই লৌকিতার প্রকৃত কথাটি নিহিত আছে। কোন্ সময় ও কি অবস্থার মধ্যে এই অতি-লৌকিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তার পর্যালোচনার মধ্যে এর আসল সত্যটির আমরা হদিশ পেতে পারি।

এবার আমরা অন্যতম দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হওয়ার ঘটনাটিতে আসছি। আমরা প্রথম ব্যতিক্রম হওয়ার ঘটনাটি জয়ানন্দের বক্তব্যে লক্ষ্য করেছি। দেখা যাচ্ছে পূর্বসূরীদের বর্ণিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে একমাত্র জয়ানন্দ আমাদের চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে একটা বাস্তব কথা শোনালেন। এটা একটা অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম।

আর ঠিক এরকমই আরেকটি অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে ঘটেছিল। তারিখটি ছিল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন (জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার (Julion Calender) হিসেবে)। আর গ্রেগরিয়ান (Gragorian Calender) হিসেবে তারিখটা ছিল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ৯ তারিখ। আর এদিন ছিল আষাঢ় মাস, ওড়িশার সর্বাপেক্ষা সাড়ম্বর উৎসবের দিন, রথ- যাত্রা। বস্তুত, আজ থেকে চারশো ছাপান্ন বছর আগে ১৫৩৩ সালের রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা এই ঘটিতব্য ঘটনার সূত্রপাত হবার আগে বা ঘটমান সময়ের পরেও আজ অবধি এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর দেখা যায় নি। ইতিহাস বলছে, ওড়িশার এহেন এক ঐতিহ্যপূর্ণ জাতীয় উৎসবের দিন (যা দারুব্রহ্ম জগন্নাথ ও বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্রবিন্দু করে সূচিত হয়) দেখা যাচ্ছে, সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত জগন্নাথের মন্দির পুণ্যার্থী দর্শনার্থীদের জন্য অন্তত সাত ঘণ্টা একটানা বন্ধ ছিল। কিন্তু এ বিস্ময়োদ্দীপ্ত ঘটনার কারণ কি? কিন্তু তারও আগে কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা আমাদের জানা দরকার।



এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ দীনেশ সেন লিখেছেন, 'We may, however, make a reasonable guess as to the fact of the case. Chaitanya was in the Jagannath Tample....when the priests apprehended his end to be near, they shut the gate against all visitors. ('Chaitanya and His age', pp-259-60)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কার্য এবং কারণ দুটোরই আমরা একটা ইতিবাচক হদিশ পাচ্ছি জগন্নাথ মন্দির সাত ঘন্টা বন্ধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। এবং সেই সঙ্গে এটাও আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি যে, যে সাত ঘন্টা জগন্নাথ মন্দির সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল সেই দীর্ঘ সাত ঘন্টা বন্ধ মন্দিরের ভেতর চৈতন্য ছিলেন। কিন্তু কেন ? যদি দর্শনার্থী হয়ে তিনি জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে থাকেন (অন্যান্য দিন যেমনটি যেতেন) তাহলে জগন্নাথ দর্শনের সঙ্গে দরজা বন্ধের কারণ কি ?

আমাদের জানার ও জানানোর সুস্পষ্টতার জন্য আনুপূর্বিক ঘটনাটা এখার গোড়া থেকে শুরু করা যাক। এতে বোধকরি চৈতন্যের মৃত্যুর সঙ্গে মন্দির বন্ধের কোন নৈকট্য যোগ আছে কিনা এবং তা থাকলে কেনই বা তার আমরা একটা অনুপুঙ্খিক বিবরণ জানতে পারবো।

জয়ানন্দ লিখেছেন, আষাঢ় বঞ্চিত•রথ বিজয়া নাচিতে।/ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।' পায়ে আচমকা ইঁটের আঘাত লাগে চৈতন্যের। কিন্তু রথের সময় অতো শত্যে লোক থাকতে বেছে বেছে আচমকা চৈতন্যের পায়েই ইঁটের আঘাত লাগলো কেন ? যদি ধরে নেওয়া যায় যে চৈতন্য আত্মসমাহিত ভাবোন্মত্ত ছিলেন, স্বভাবতই তাঁর পক্ষে রাস্তায় কোথায় ইঁট কাঠ পড়ে আছে দেখা সম্ভব না। ভালো কথা। কিন্তু তাঁকে ঘিরে তাঁর যে সব অনুচর পার্শ্বচর আপ্তবর্গরা ছিল তাদেরও কি কারু নজরে পড়লো না নৃত্যরত চৈতন্যের রাস্তায় পড়ে থাকা সেই বিপজ্জনক ইঁটের টুকরোটি। জয়ানন্দের মতে এই ইঁটের আঘাতে জখম ও মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছিল চৈতন্যের জীবনে। অথচ অতো পার্ষদ পার্শ্বচর থাকতেও চৈতন্যের চলার পথে পড়ে থাকা এই বিপৎপাত বস্তুটির ওপর কারু নজর পড়েনি। দুঃখ এই, একথা আজ আমাদের অনিবার্য ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। আজ থেকে চারশো পঞ্চাশ বছর আগে পুরীর রথযাত্রার সময় যে পথে স্বয়ং দেশের রাজা নগ্ন পায়ে হেঁটে যেতেন সোনার ঝাড়ু হাতে পথ মার্জনা করতে করতে, সেইদিন, সেই পথের ওপর পড়ে থাকা ইঁটে চৈতন্যের পা জখম হলো এর থেকে 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্' আর কি হতে পারে পৃথিবীতে ? তাই সন্দেহ হয়, রথযাত্রার ভিড়ভাট্টার সুযোগ নিয়ে কোন নেপথ্যচারী এই ইঁটের টুকরোর আশ্রয় নিয়েছিল কিনা ? পরবর্তী ও তারও পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আশঙ্কা কতোখানি যুক্তিযুক্ত তা আমাদের সকলেরই বিচার্য।

এই 'ইটাল' বা ইঁটের টুকরোর আঘাতে চৈতন্যের বাম পা বোধকরি খুব বড়ো রকমের জখম হয়েছিল। স্বভাবতই রক্ত ঝরেছিল এবং ক্ষতও হয়েছিল নিশ্চয়। তারপর ধুলোবালির সংস্পর্শে সে ক্ষত বিষিয়ে উঠেছিল ক্রমান্বয়ে। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আসাও অসম্ভব ছিল না।

এই যে ইঁটের টুকরোর আঘাতে জখম হওয়া ও সেই জখম স্থান বিষিয়ে যাওয়া আর বিষিয়ে যাওয়া হেতু জ্বরগ্রস্ত হওয়া এসব কারণে চৈতন্য বেশ কয়দিন বন্ধ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেন নি অনিবার্যভাবেই। এখন প্রশ্ন হলো, যে কোন কারণ বশত ইঁটের আঘাত লাগুক কিন্তু সেই আঘাতে সঠিক কবে নাগাদ আহত হয়েছিলেন চৈতন্য ? সেটা কি রথের দিন না রথের সময় ? যদি ধরে নেওয়া যায় রথের দিন (সেটাই সম্ভব) তাহলে দেখা যাচ্ছে, লোচন দাসের বক্তব্য অনুযায়ী চৈতন্য যেদিন শেষ বারের মতো জগন্নাথ মন্দির এসেছিলেন তখন মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না। কেননা রথের দিন মূল মন্দির থেকে বিগ্রহত্রয়কে নিয়ে যাওয়া হয় গুণ্ডিচাবাড়ি

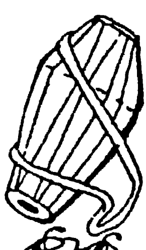


(মাসির বাড়ি) নামক অন্য মন্দিরে। এবং এর ছ'দিন পর সাত দিনের মাথায় আবার বিগ্রহত্রয়কে মূল মন্দিরে বা 'বড় দেউলে' ফিরিয়ে আনা হয়।

লোচন এবং জয়ানন্দ দুজনেই বলেছেন চৈতন্য অন্তর্হিত হয়েছিল সপ্তমী তিথিতে। অর্থাৎ যেহেতু তৃতীয়া তিথিতে রথোৎসব সেহেতু এরও চারদিন পর তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী পেরিয়ে সপ্তমীর দিন চৈতন্য কেন এসেছিলেন। যদি জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছে ছিল তাহলে তো তিনি তা গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু কার্যত তা ঘটেনি। জয়ানন্দ ইটালের আঘাতে চৈতন্যের অসুস্থতার কথা বলেছেন। কিন্তু লোচন দাস তা বলেন নি। সুতরাং এই দুই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

প্রথমত, ইটের আঘাতে জখম হওয়া হেতু চৈতন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এবং সেই অসুস্থতার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কয়েকদিন জগন্নাথ দর্শন ব্যাহত হয়েছিল। যিনি দৈনন্দিন জগবন্ধু দর্শনার্থী তাঁর ক্ষেত্রে এ হেন বাধা বিপত্তিও খুবই মনস্তাপের কারণ হতে পারে। আর এই মনস্তাপজনিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ তাঁর দর্শন স্পৃহাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এই প্ররোচনামূলক কাজে সেই প্ররোচনাকারীর ক্ষেত্রে নানান ধর্মীয় যৌক্তিকতার আবহাওয়া তৈরি করা অসম্ভব নয়। যাতে করে প্রভু-দর্শন-চিত্ত চৈতন্যকে সাধিকতর দর্শন উন্মুখ করে কাশী মিশ্রের সুরক্ষিত চৌহদ্দি থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, লোচনের অভিমত মতো আদ্যোপান্ত ধরা গেল চৈতন্যের পায়ে কোন ইটের আঘাত লাগেনি। তিনি স্বভাবতই সুস্থ। এক্ষেত্রে তিনি সুস্থ স্বাভাবিক শরীরে পায়ে হেঁটেই মন্দিরে এসেছিলেন বলা যায়। বস্তুত দেখা যায়, দেবতা নিরঞ্জনের পরও দেবালয় শূন্য থাকে না ভক্তিবাদী মানুষের কাছে। যেমন জগন্ময়ী দুর্গার কথা ধরা যাক। তিনি চারদিনের জন্য আসেন এ ধূলার ধরণীতে। সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী। তারপর পুনরাগমনায়চঃ মন্ত্র অন্তে বিসর্জ্জিত হন সলিলে। এই নিয়ম। কিন্তু অতঃপর দেবশূন্য দেবালয় কি কদাপি দেবতাশূন্য হয় ভগবৎপ্রেমী, ঈশ্বরবাদী মানুষের কাছে। অর্থাৎ দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠান ও অধিষ্ঠান কালে এবং তার নির্গমনের পরও পূর্বপর একই অনিঃশেষ আবহাওয়া বিরাজ করে সেখানে। সেক্ষেত্রে বিগ্রহের সাময়িক অবস্থানজনিত হেরফেরের জন্য জগন্নাথ মন্দিরে দর্শনার্থী চৈতন্যের আগমন খুব বিস্ময়কর নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, (নিঃসঙ্গ নন) তাঁর সঙ্গে যাদের থাকবার কথা এবং আবশ্যিক, তারা ব্যতীত একলা মন্দিরে আসা তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব হলো? রথের সময় প্রচুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব আসতেন নীলাচলে। তাঁরা চৈতন্যের পরিচিত। চৈতন্যের সান্নিধ্যেই তাঁরা থাকতেন এসময়। এদের সমাগম ব্যতীতও গদাধর গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতিরা সম্বৎসর নীলাচলেই থাকতেন। এবং তা বহুলাংশে চৈতন্যের আকর্ষণেই। এবং তারও চেয়ে বড়ো কথা হলো, দিবারাত্রি পাহারা দেবার জন্য চৈতন্যের একজন জবরদস্ত দেহরক্ষী ছিল. তার নাম কাশীশ্বর। একজন সর্বত্যাগী নিতান্ত সন্ন্যাসীর দেহরক্ষীর কি প্রয়োজন বা কতোটা প্রয়োজন সে প্রশ্নে এখন আমরা যাবো না। কিন্তু সেই বলবান দেহরক্ষী কাশীশ্বর সেসময় কোথায় ছিল যখন চৈতন্য প্রায় একাকী এসে প্রবেশ করলেন শত্রুব্যূহে, দুর্গ বিশেষ জগন্নাথের মন্দিরে? তবে কি ধরে নিতে পারি, পার্ষদ পরিবৃত এবং দেহরক্ষীদ্বারা সুরক্ষিত প্রায়, নিরাপদ চৈতন্যকে ঘর থেকে ফুঁসলে শত্রুব্যূহে আনার পিছনে



চৈতন্যের অন্তরতম শিষ্যদের মধ্যেই কেউ যুডাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু কে সে ? নিত্যানন্দ, স্বরূপ-দামোদর, গদাধর, মুকুন্দ অথবা স্বয়ং আচার্য অদ্বৈত—কে ? (এই নামটি বা এ জাতীয় একাধিক নির্দিষ্ট নামের জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। চৈতন্যের নিকট শিষ্যদের মধ্যে কে বা কারা শত্রুর সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে ছিলেন তা রায় রামানন্দ একটি চিঠিতে চৈতন্যকে জানিয়েছিলেন। বোধকরি সে চিঠি চৈতন্যের গোচরে আসেনি। কিন্তু সেই বিস্ময়কর চিঠিটি বর্তমানে ওড়িশার রাজমহেন্দ্রী মহাফেজখানার অবরুদ্ধ দেয়াল দরজা পেরিয়ে পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের জয়দেববাবুর হাতে এসে গেছে। হয়তো বা এ গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা সেই কলঙ্কিত নামের উল্লেখ দিতে পারবো)।

তারপর আমরা কি দেখলাম। না লোচন দাস বলছেন,

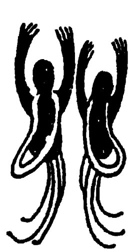
'তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥'

এই যে লোচন লিখেছেন, 'নিজ লাগিল কপাট' এই কপাট 'নিজ' লাগার ব্যাপারটা কেমন করে সম্ভব। আমাদের ছা-পোষা মানুষদের বাড়ি-ঘরের মতো পলকা কাঠ পেরেক দিয়ে তৈরি নয় জগন্নাথ মন্দিরের দরজা। রীতিমতো কাঠ লোহালক্কড় দিয়ে তৈরি। অন্তত একাধিক জোয়ান মানুষ না হলে তা বন্ধ করাও দুষ্কর। অর্থাৎ দমকা হাওয়ায় বা সমুদ্রের বাতাসের ঝাপটায় তা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেছলো একথা বলা যাবে না। আর তাই যদি বন্ধ হয়ও, তাহলে, চৈতন্য মন্দিরে প্রবেশের পর ও দরজা বন্ধ হবার অব্যবহিত পরে যখন চৈতন্যের শিষ্য-পারিষদরা এসে 'ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা' বলে ব্যাকুল হয়ে দরজায় করাঘাত করতে লাগলেন তখন একাধিক মানুষের করাঘাতে বন্ধ দরজা খুললো না কেন ? এতে কি প্রমাণ হয় না যে ভেতর থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ? কিন্তু কেন ?

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ দীপক চন্দ লিখেছেন :

'প্রবেশ করা মাত্রই মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হলো। সঙ্গে ছিল শুধু গদাধর। মন্দিরের অভ্যন্তরে ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হিংস্র একটা দৈত্যের মতো গদাধরকে কে যেন ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল। মুখে টু পর্যন্ত করতে পারলো না। চৈতন্য অন্ধকারে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আচম্বিতে অন্ধকারে কে যেন প্রহারে প্রহারে তাকে জর্জরিত করে ফেলল। সেই নিদারুণ প্রহারে তার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল চৈতন্যের মুখে। * * * বেদীর খুব কাছে একজন রাজপুরুষ তার কোমরবন্ধে আবদ্ধ দীর্ঘ অসির স্বর্ণমণ্ডিত হাতল মুষ্ঠিতে ধরে তীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করল। রাজপুরুষ হল গোবিন্দ বিদ্যাধর। ঘৃণায় জ্বলতে জ্বলতে বলল: সন্ন্যাসী হলে কি হবে ? সুদর্শন চেহারা আর বিনয় ব্যবহার দিয়ে লোককে যাদু করেছ। অনেক গভীর জলের মাছ তুমি, জালে টেনে তোলা তোমায় কঠিন : এবার বাছা জব্দ। সন্ন্যাসী হয়ে রাজনীতি করতে আসার বিড়ম্বনা দ্যাখো।

পরিছা আবার বেত্রাঘাত করল। খুব ভারী অচল অনড়, শবদেহের মতো পড়ে থাকা দেহে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু ভেতরটা ঠিকই তার অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল। আর একটু একটু করে অতল অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল তার চেতনা। সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটার আগে একবার চোখ খুলে চতুর্দ্দিকে কাকে যেন খুঁজল। দেখল, একটা অতি পরিচিত মুখ, তার মুখের



ওপর ঝুঁকে পড়েছে। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা দেখছে। চোখ টান টান করে তার দিকে তাকিয়ে অতি কষ্টে উচ্চারণ করলঃ জগন্নাথ তুমি ?

এর নীচে একটি পাদটীকা রয়েছে। এখানে ডঃ চন্দ প্রথমে উড়িয়া কবি ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থ থেকে চারটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন এবং অতঃপর তার নীচে লিখেছেন, 'সমকালের উড়িয়া কবি ঈশ্বর দাস বলেছেন জগন্নাথের সামনেই চৈতন্যের দেহ পড়েছিল। তখন জগন্নাথের আজ্ঞায় শবদেহ কাঁধে করে বহন করে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হল। এই পংক্তিটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বিগ্রহ জগন্নাথের সামনে চৈতন্যের দেহ পড়ে থাকা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু কোন্ জগন্নাথের আজ্ঞায় শবদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হল ? এই জগন্নাথ বিগ্রহ নয়, মানুষ। তাহলে সে কে ? এই প্রশ্ন সূত্রে পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথের নামটা মনে পড়ে যায়। ('সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'/পৃষ্ঠা—৩৩০-৩১)।

আর দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, This they did to make time for burying him within the temple. If he left the world at 4 P.M. the doors, we know were kept closed till 11 P.M.—this time was taken for burying him and repairing the floor after burial. The priests at 11 P.M. opened the gate and gave out that chaitanya was incorporated with the image of Jagannath.' (Chaitanya and His age)।

বস্তুত ডঃ সেন সাম্প্রতিককালে যে কথা লিখেছেন বহু কাল পূর্বে লেখা ওড়িয়া কবি বৈষ্ণব দাসের পুঁথি আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে সেন মহাশয়ের অনুমান মিথ্যে নয়।

বৈষ্ণব দাস লিখেছেন :

'রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল,
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে।
কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে ॥'

[চৈতন্য চকড়া]

বৈষ্ণব দাস লিখছেন, তিনি রাত্রি দশ দণ্ডের সময় অর্থাৎ এগারটা নাগাদ চৈতন্যের মৃতদেহ গরুড় স্তম্ভের পিছনে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। অর্থাৎ সচক্ষে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এ অভূতপূর্ব মর্মান্তিক দৃশ্য।

তাহলে আমরা কি দেখলাম ? না দেখলাম, শুধু গোবিন্দ বিদ্যাধর বা তার অনুচরেরাই না, চৈতন্যের অন্যতম বন্ধু পঞ্চসখার জগন্নাথ দাসও এই চৈতন্য বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। এটা আমরা ডঃ দীপক চন্দ মশায়ের বই থেকে পাচ্ছি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, হত্যাকারীরা মৃত চৈতন্যের শবদেহটা কিভাবে ও কোথায় পাচার করলো ? পুরীতে কোন চৈতন্যের সমাধিবেদী অদ্যাবধি নেই। তাহলে ? এ প্রসঙ্গে পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, পুরীর ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের বর্তমান কর্মসচিব স্বামী অভিনবানন্দজী এক পত্র লিখে তাঁকে জানিয়েছেন যে, 'তাঁর সুনিশ্চিত ধারণা মহাপ্রভুর দেহটিকে মণিকোঠার রত্নবেদীর নিম্নেই সমাহিত করা হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মশাইয়েরও এ ধারণা। অন্যত্র জয়দেববাবু তাঁর বইতে আরও দুটি স্থান যথা 'বৈকুল্য-বৈকুণ্ঠ' ও তোটা গোপীনাথের মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া গুণ্ডিচা-বাড়িতে চৈতন্যকে সমাহিত করা হয়েছিল এ



কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। কিন্তু জয়দেববাবুর বইয়ের শেষাংশ–যেখানে প্রভুজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী মাধবী আনন্দ (জয়দেববাবুকে) বলছেন, 'সে জায়গাটা আমিই দেখিয়ে দিতে পারি তোমাকে, যদি অবশ্য একটি শর্ত রক্ষা করতে রাজী হও তুমি।' (পৃষ্ঠা–১৪৫)। না, চৈতন্যব্রতী মস্তকমুণ্ডন গেরুয়া বসনধারী দীর্ঘদেহী আনন্দের পক্ষে বিদুষী মাধবীর এ শর্ত রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কোন জায়গায় মাধবী আনন্দকে এই সমাধি দেখিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন ? না ঠিক তোটা গোপীনাথ মন্দিরের সামনে কাঁঠাল গাছের মতো দেখতে যে পলাং গাছগুলি আছে তারই ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে। তোটা গোপীনাথের মন্দিরেই চৈতন্যকে সমাধিস্ত করা হয়েছিল এটাই কি মাধবী আমাদের ইংগিত দিতে চেয়েছেন ? বোধকরি সেটাই সম্ভব। কেননা, পুরীর এতো জায়গা থাকতে তোটা গোপীনাথের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মাধবী এ কথা বলবেন কেন ? এ ছাড়াও পুরীর বিশিষ্ট পণ্ডিত পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মারও স্থির বিশ্বাস ছিল তোটা গোপীনাথের মন্দিরের বাঁধানো উঠোনের মাঝখানে (একটু বাম পাশ ঘেঁষে) যে দুটি ছোট তুলসী মন্দির আছে তার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মন্দিরটির নীচে চৈতন্যকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। বস্তুত, আমরা দেখেছি , তোটা গোপীনাথের মন্দির সংলগ্ন স্থান আজও যেরকম নির্জন ও জঙ্গলাকীর্ন তাতে মনে হয় আজ থেকে চার সাড়ে চারশো বছর আগে সেখানে বাঘ সিংহ বিচরণ করার মতো গভীর জঙ্গল ছিল। জগন্নাথ মন্দিরে হত্যাকাণ্ডের পর এমন একটা গহিন জঙ্গল ও নির্জন স্থানে শবদেহ লুকিয়ে ফেলার পক্ষে খুব উপযুক্ত জায়গা বলা যায়।

পরিশেষে একটা বিস্ময়কর তথ্য পাচ্ছি। এই যে, চৈতন্যকে হত্যা করা হয়েছিল পণ্ডিতেরা বলছেন, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কে হত্যা করেছিল চৈতন্যকে ? গোবিন্দ বিদ্যাধর চৈতন্যের অপসারণ চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্বহস্তে বোধকরি একাজ করেন নি। এই ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব নাকি ছিল জগন্নাথ মন্দিরের দ্বার রক্ষক বাহিনীর প্রধান দলপতির ওপর। তার নাম, দীনবন্ধু প্রতিহারী। আমরা ইতিপূর্বে জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল অনন্ত প্রতিহারীর নাম শুনেছি। অনন্ত চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর এই দীনবন্ধু প্রতিহারীকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, এই দীনবন্ধুই নাকি 'বুকের ওপর বসে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছিল প্রভুকে'।

পরিশেষে আমরা চৈতন্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী কয়েকটি ঘটনার পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো চৈতন্যের মৃত্যু খুব স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি। অন্তত তাঁর মৃত্যুর পর ঘটে যাওয়া পর পর ঘটনা সমূহ তারই ইঙ্গিত দেয়। যেমন–



১। চৈতন্যের অন্তর্হিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্র সাত-তাড়াতাড়ি পুরী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন বিড়ানেসী অর্থাৎ কটকে। কিন্তু কেন ? প্রতাপরুদ্র যে চৈতন্যকে এতো ভক্তি করতেন, যার জন্য নিজ রাজ্য পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন, সেই চৈতন্যের অন্তর্ধান সংবাদ শোনার পর, পুরীর বিখ্যাত রথযাত্রা উৎসব ফেলে রাজা অমন অতর্কিতে চুপি চুপি পুরী ছেড়ে কটকে পালিয়ে গেলেন কেন ?

২। চৈতন্যের অন্তর্হিত হবার সাথে সাথে পুরীর যাবৎ চৈতন্যপন্থী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা উৎকল ছেড়ে সুদূর বৃন্দাবনে পালিয়ে গেলেন কেন ?

৩। চৈতন্য অন্তর্হিত হবার অব্যবহিত পরেই চৈতন্যের নিকটতম দুই পার্ষদ গদাধর গোস্বামী ও স্বরূপ দামোদরকে আর জীবিত অবস্থায় দেখা গেল

না। বলা হলো,

> 'গদাধর জানিলেন—প্রভুর গমন।
> প্রভুর বিরহে তান না রহে জীবন ॥
> আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তর্ধান।'

[চৈতন্যভাগবত/অন্ত্যলীলা]

কিন্তু প্রশ্ন হলো, জগন্নাথের দারুঅঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়াজনিত চৈতন্যের অন্তর্হিত হবার একটা কারণ আমরা পাচ্ছি। যদিও সেটা অভূতপূর্ব অলৌকিক। কিন্তু গদাধর কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্হিত হলেন তা আমরা জানতে পারি না। কেন? নাকি 'গদাধর জানিলেন—প্রভুর গমন' শুধুমাত্র এই 'প্রভুর গমন' জানার জন্যই তাঁকে পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত করা হয়েছিল?

আর স্বরূপ দামোদরের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'দেখা গেল স্বরূপের হৃদয় ফেটে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।' (অমিয় নিমাই চরিত/মহাত্মা শিশির ঘোষ/৬ষ্ঠ খণ্ড/পঞ্চদশ অধ্যায়)। কিন্তু কেন ও কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষের বুক ফেটে প্রাণবায়ু নির্গত হতে পারে? তবে কি চৈতন্যের নিকটতর অনুচর ছিলেন বলেই কোন চৈতন্যবিরোধী আততায়ীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাঁর এহেন 'হৃদয় ফেটে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে' গোছের মৃত্যু হয়েছিল?

৪। চৈতন্য অন্তর্হিত হবার অব্যবহিত পরে মাস কয়েকের ব্যবধানে পর পর দুটি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল উৎকলে। ওড়িশার দুই যুবরাজ (প্রতাপরুদ্রের নাবালক পুত্রদ্বয়) যথাক্রমে কালুয়া দেব (Kalua Dev) ও কখাড়ুয়া দেব (Kakharua Dev) নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রের হাতে। (অবিশ্যি জগন্নাথ মন্দিরের 'মাদলা পঞ্জী'তে ৩২ জন রাজ পুত্রকে গোবিন্দ বিদ্যাধর হত্যা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে)। এবং ('মাদলাপঞ্জী' প্রাচীন সং ১৯৪০ পৃ. ৫৮) তে আমরা জানতে পারছি, চৈতন্যের মৃত্যুর এক বছর পর ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশার সিংহাসনে যিনি বসলেন তিনি গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই। এখন চৈতন্যের মৃত্যু ও অব্যবহিত পর দু-দুটি নাবালক রাজপুত্রের নিহত হবার ঘটনা এবং তার অব্যবহিত পর উৎকল রাজসিংহাসনে ভোই রাজবংশের (Bhoi Dynasty) প্রতিষ্ঠা এসব পর পর ঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা চৈতন্যের মৃত্যুর স্বাভাবিকতার চেয়ে অস্বাভাবিকতাই কি বেশি দেখতে পাই না?



৫। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ এজ' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারছি যে চৈতন্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাঙলাদেশ এবং উৎকলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমস্ত রকম প্রচার এবং পশার এবং এমন কি নূন্যতম কীর্তন গান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছলো। দীনেশ চন্দ্র লিখেছেন, For fifty years after the tirodhan of the great teacher, the Vaisnav Community lay exervated by the great shock. Their Krishna music which had taken the whole country by surprise stopped for a time after that melancholy went and was not heard for nearly half a century in the great provinces of Bengal and Orissa. (p.259)। কিন্তু চৈতন্যের অন্তর্হিত হবার সাথে সাথে বাংলা ওড়িশা থেকে বৈষ্ণবদের সমস্ত কাজকর্ম এমন কি 'কৃষ্ণ মিউজিক' পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল কেন? যদি চৈতন্য জগন্নাথের দারুঅঙ্গে বিলীন হয়ে গেছলেন তাহলে সেই অভূতপূর্ব ঘটনা মানুষের মনে চৈতন্য ও বৈষ্ণবপন্থার প্রস্ফুরণ

ঘটবার কথা, কিন্তু কার্যত তা দেখা যায় নি। উপরন্তু, চৈতন্যের অন্তর্হিত হবার পর দীর্ঘকাল যাবত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের ওপর একটা প্রগাঢ় সংকট এসেছিল।

জয়দেববাবু লিখেছেন, 'যে কারণে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর পঞ্চাশটি বছর উৎকল এবং বঙ্গের বৈষ্ণবমণ্ডলী নিদারুণ আতঙ্কে স্তব্ধ করে রেখেছিল নিজেদের পরমপ্রিয় নামসংকীর্তনকে, ঠিক সেই কারণেই চৈতন্যদেবের ওপর লেখা প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থই ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছে চৈতন্য তিরোধানের শেষ মুহূর্তের দৃশ্য বর্ণনাকে। আর সেই জন্যই দেখতে পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ এঁদের কারুর বর্ণনার সঙ্গে কারুর বর্ণনার কোথাও মিল নেই। অথচ একই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লিখেছেন কিন্তু তাঁরা সবাই এবং লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক।' (কাঁহা গেলে তোমা পাই/পৃ ৬৫-৬৬)।

এই হলো চৈতন্যের মৃত্যু ও মৃত্যুজনিত প্রচ্ছন্নতাব আদিপর্ব। সুতরাং বলা যেতে পারে প্রতিস্থাপনায় চৈতন্য পরিক্রমারও আমরা ইতি টানলাম এখানে। কিন্তু শেষেরও বোধকরি একটা পরিশেষ থাকে। তো সেটা কি? না তা হলো, এ দীর্ঘ পরিক্রমা আমরা মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু করেছিলাম, অর্থাৎ কোন মহামানবের জীবনবৃত্ত যদি স্মৃতিসৌধ হয়, তাহলে, তার শিলান্যাস এবং তার সম্পূর্ণতার উদ্বোধন করবেন আমাদের অন্তরতম মানুষটি। রবীন্দ্রনাথ।

তিনি বলেছেন,

> 'সত্য যে কঠিন,
> কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
> সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

তাঁর অমৃত চরণরেণুমণ্ডিত পথ ধরে সেই দুর্নিবার সত্যের গোষ্পদ সাদৃশ অন্বেষণ। □

